# শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

## নির্বাচিত প্রবন্ধ

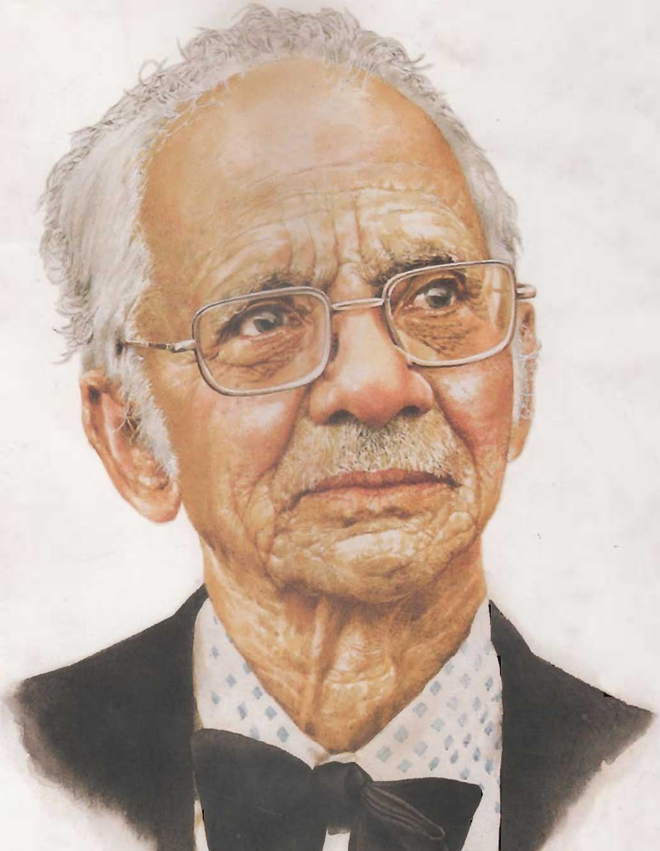

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব জাতির
মানসিক জীবনে যা আবহমান কাল
ধরে চিরন্তন সত্য বলে স্বীকৃত ও প্রচারিত হয়ে
আসছে, তাকেই সমসাময়িক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত
করে লেখা হয়েছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ।
নানা স্বাদের এই রচনামালায়
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তেমনই
উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

9 788172 157524

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী প্রবীণতম বাঙালি লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী বাংলা ভাষায় এ-যাবৎ যা লিখেছেন, তা নির্দ্বিধায় পাঠক মেনে নেয়নি। কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন চিত্তের দোলাচলে উদ্বেলিত হয়েছে পাঠককুল। চিরমেধাবী, প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী ও আজীবন অনমনীয় নীরদচন্দ্র পাঠকদের এই অনুরাগ ও বীতরাগের মধ্যেই ভাস্বর হয়ে আছেন আপন গরিমায়।

এই সংকলনে সংগৃহীত তাঁর লেখাগুলি পাঠ করলে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯২৮-এ প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি থেকে ১৯৯৪-এ লিখিত রচনাটি পর্যন্ত তিনি সমান সজাগ, প্রাণবন্ত। শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেই নয়, আমাদের দেশের সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য মননশক্তি ও প্রখর বিচারবুদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে এই সব বিশ্লেষণধর্মী রচনায়। ইংরেজি শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালির যে-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে-কথা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনই বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাঙালির জীবনের সর্বস্তরে যে-অবক্ষয় শুরু হয়, তার গতি-প্রকৃতিও বিচার করেছেন।

শতজীবী এই লেখকের তীক্ষ্ণ মন্তব্য আমাদের অনেক সময়েই সচকিত করেছে ; কখনও বা প্রতিকূল সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু কোনও দিনই নীরদচন্দ্র নিজের বিশ্বাস ও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি : সযত্নে সংকলিত ও স্থানবিশেষে সচিত্র, এই বিষয়নির্ভর প্রবন্ধগুলিতে চিরন্তন সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের অভিজ্ঞতা, গভীর প্রত্যয়, পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি আর সূক্ষ্ম পরিহাসপ্রিয়তা। তাঁর পছন্দ-অপছন্দের তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বাংলা ও বাঙালি।

~~দুনিয়ার পাঠক এক হও!~~ ~ www.amarboi.com
ISBN 81-7215-752-5

জন্ম : ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৭, পূর্ববাংলার (অধুনা : বাংলাদেশ) ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। বাবা উপেন্দ্রনারায়ণ, মা সুশীলাসুন্দরী।
তেরো বছর বয়স পর্যন্ত জন্মভূমিতে কাটিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এম-এ পরীক্ষায় দুইটি পেপার দিয়ে আর বসেননি। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই অবসান।
পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর, কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল আশৈশব এবং অতি প্রবল। একটানা বেশি দিন চাকরি করেননি কোথাও। ১৯২৮-এ মডার্ন রিভিয়ুতে সহকারী সম্পাদকের চাকরি। ১৯৩২-এ বিবাহ। স্ত্রী—অমিয়া। বিবাহের পরে মডার্ন রিভিয়ুর চাকরি ছাড়েন। তিরিশের দশকের শেষে শরৎচন্দ্র বসুর সচিব নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন কলকাতা রেডিওতে—যুদ্ধের ঘটনাবলির ভাষ্যকার। পরে, ১৯৪২ সালের মার্চে, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে যান। সেখান থেকেই অবসর। ১৯৭০ সাল থেকে বিলেতে আছেন। এখন ব্রিটিশ নাগরিক।
১৯৫১-তে প্রথম বই, 'দি অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান'। বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ ১৯৬৮ সালে, 'বাঙালী জীবনে রমণী'।
১৯৮৯ সালে পেয়েছেন অক্সফোর্ডের সাম্মানিক ডি. লিট.। সে-বছরেই পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, 'দাই হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক' বইটির জন্য।
১৯৬৬ সালে পেয়েছিলেন ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কার, তাঁর ইংরেজি বই 'দি কন্টিনেন্ট অফ সার্সি'-র জন্য। ১৯৯৩ সালে ইংলন্ডের রানি তাঁকে C.B.E. উপাধি দেন। ১৯৯৭-তে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com
প্রচ্ছদ □ বিমল দাস

# নির্বাচিত প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

## নির্বাচিত প্রবন্ধ

সম্পাদনা

ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-752-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ক্রিয়েশন ২৮বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

NIRBACHITO PROBONDHO
[Essay]
by
Niradchandra Chowdhury

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

IK750

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## সম্পাদকের নিবেদন

২৩শে নভেম্বর ১৯৯৬ সনে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী একশো বছরে পা দিয়েছেন। আজ ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষায় লেখার জন্য তিনি বিখ্যাত। অথচ ১৯৪২ সন পর্যন্ত তিনি প্রধানত বাংলা ভাষাতেই লিখতেন এবং সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রে নানা বিষয়ে তাঁর অসংখ্য মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সেইসময়ের কয়েকটি বিশিষ্ট সাময়িকপত্রের সম্পাদনার কাজেও তিনি জড়িত ছিলেন। যেমন 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'নূতন পত্রিকা', 'সমসাময়িক' ইত্যাদি।

বহু বছর পরে ষাট দশকের শেষে ইংরাজি লেখার পাশাপাশি বাংলা লিখতে শুরু করেন ও সুদূর বিলেতে বসে গত পঁচিশ বছরে বহু মূল্যবান রচনা ও বই লেখেন। তাঁর প্রথম জীবনের ও পরের দিকের বাংলা লেখার সংকলন নিয়ে এই বইটি প্রকাশিত হল কিছু অনুরাগীর উদ্যোগে।

প্রথম রচনাটি শ্রীহিমানীশ গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রাসঙ্গিক বিতর্কটি সরবরাহ করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য।

যতদূর সম্ভব রচনাগুলির প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বহু রচনার প্রকাশস্থান বা কালের সঠিক হদিশ না পাওয়ায় কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। কিছু ত্রুটিও থাকা সম্ভব। পাঠককে অনুরোধ জানাব রচনাগুলি পড়ার সময়ে সম্ভবক্ষেত্রে রচনাকাল সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকা। কারণ, তখন লেখকের সামনে যে উপলক্ষ ছিল এখন হয়তো আর তা নেই। পরিস্থিতি হয়তো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কিন্তু শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর এই অমূল্য লেখার সম্পদ সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার লুপ্তপ্রায় পাতা থেকে উদ্ধার করে বই আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা আমার কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীনিখিল সরকার ও আনন্দ পাবলিশার্স-এর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, যিনি বাদলবাবু বলে খ্যাত, যদি প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্যোগ না নিতেন তাহলে এই রচনাগুলি সংগ্রহ করা দুরূহ হতো। এ ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীশক্তিদাস রায়ের সহযোগিতার জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী

## লেখকের সাফাই
## (Apologia Pro Scripta Sua)

এই বইটি বহুকাল ধরিয়া ও বহু বিষয়ে আমার সাময়িক রচনার সঙ্কলন। এগুলির প্রথমটি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৮ সনে, শেষটি ১৯৯৪ সনে। এই দীর্ঘকাল জুড়িয়া, আমি দেশে যে-সব রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম প্রবন্ধগুলিতে তাহারই আলোচনা করিয়াছিলাম, অর্থাৎ এগুলি সাময়িক লেখা।

এই জাতীয় লেখা সম্বন্ধে একটা পুরাতন বাংলা পদ প্রয়োগ করা যায়, উহা 'বেনো-জল'। বানের জল যখন আসে তখনই চারিদিক ভাসাইয়া দেয়; কিন্তু উহা তেমনই তাড়াতাড়ি নামিয়া যায়; উহার দ্বারা কোনো স্থায়ী হ্রদ বা জলাশয় সৃষ্ট হয় না। সাময়িক লেখাকেও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী প্লাবন বলা চলে। তাহা হইলে এগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সার্থকতা আছে কি?

আমি কিন্তু লেখকবৃত্তিতে সাময়িক ঘটনা ও ব্যাপার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইতে কখনই পারি নাই। ইহা শুধু আমারই অভ্যাস বলা যায় না। যুগ যুগ ধরিয়া শক্তিশালী লেখকেরা দুইটা বিরোধী রূপ দেখাইয়াছেন। উঁহাদের এক শ্রেণী সাময়িক ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া 'বিশুদ্ধ সাহিত্যিক' হইয়াছেন। আর এক শ্রেণী 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ঘটনা ও ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া উহার আলোচনা করিয়াছেন, এমন কি দল-দলীয় উত্তেজনা এবং কলহপ্রবণতা দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর লেখকদের ইউরোপীয় ভাষায় engge's বলিয়া বিশিষ্ট করা হয়।

তবে ইহা বলা চলে না যে, তাঁহারাই সাহিত্যে 'ভেজাল' আনিয়াছেন। তাহা হইলে অতি প্রাচীন কালের ইহুদী Prophet (নবী), যেমন Isaiah, Jeremiah, Ezekiel প্রভৃতিকে, ইউরোপীয় মধ্যযুগের Dante-কে, সপ্তদশ শতাব্দীর মিল্টন ও Leibnitz-কে, অষ্টাদশ শতাব্দীর Voltaire-কে, ঊনবিংশ শতাব্দীর Hugo, Lamartine, Zola প্রভৃতিকে 'ভেজাল'-ব্যবসায়ী বলিতে হয়। উহা বিচার-মূঢ়তার পরিচায়ক হইবে। সাহিত্যে ইঁহাদেরও স্থান আছে, স্বীকার করিতে হইবেই।

আমি লেখকবৃত্তিতে ইঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। ইহা কোন্ উপদেশ মানিয়া করিয়াছি তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি? তবু স্মরণ করাইয়া দিতেছি উপদেশটা এই—মহামানবগণ যে-পথে গমন করিয়াছেন উহাই 'পন্থা'।

তবে সাময়িক ব্যাপার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আমি কখনই নিজেকে কেবলমাত্র সাময়িক মতামত বা ধ্যান-ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রাখি নাই। মানবজাতির মানসিক জীবনে যাহা আবহমান কাল ধরিয়া চিরন্তন সত্য বলিয়া স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছে, আমার সাময়িক আলোচনাকে উহার সহিত যুক্ত রাখিয়াছি। আমি অশাশ্বতের সহিত শাশ্বতের যোগ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আছে, তাহা সর্বদাই দেখাইয়াছি। আমার সাময়িক লেখার মধ্যে যদি নিজস্ব বিশিষ্টতা কিছু থাকে উহা এই যোগস্থাপনে। আমার সাময়িক রচনা পুনঃপ্রকাশিত করিবার ইহাই সঙ্গত কারণ।

আমার রচনাগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন সমালোচকেরা এই যোগটা লক্ষ্য করেন নাই। সেগুলি ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালী-মাত্র মনে করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন, এমন কি অত্যন্ত তীব্র কটূক্তিও করিয়াছেন।

আমি এই সব নিন্দা ও অপমানে কখনই বিচলিত হই নাই ; নিজেকে এই বলিয়া দৃঢ় রাখিয়াছি যে, যাঁহারা আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখান আমার প্রযত্ন তাঁহাদের জন্যে নয়—আমার সমধর্মী শুধু যে জন্মিবে তাহাই নয়, বর্তমানেও রহিয়াছে, কারণ কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা।

হয়ত এখন বলিতে পারি যে, আমার ভরসা অমূলক প্রমাণিত হয় নাই। তবু আমার লেখার মূল্য-বিচারের ভার আমি পাঠকদের হাতেই সমর্পণ করিলাম, কালিদাসের একটি উক্তি স্মরণ করিয়া। তিনি লিখিয়াছিলেন—

> শক্তিমান লেখকেরা জ্ঞানী হইলেও একমাত্র নিজের উপরই আস্থা রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহাদের রচনা বিদ্বান ব্যক্তিদের পরিতোষ না জন্মায় ততক্ষণ তাঁহাদের 'প্রয়োগবিজ্ঞান' সাধু নয়।

সংস্কৃত ভাষায় কালিদাসের উক্তিটি এইরূপ—

সূত্রধার নটীকে বলিল—

> 'আর্য্যে, কথয়ামি তে ভূতার্থম্।
> আ পরিতোষাদ্বিদুষাং
> ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
> বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥'

এই বইটির সমর্থনে আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

অক্স্ফোর্ড
১লা নভেম্বর, ১৯

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## সূচি

বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি ১৩
মতান্তর ২৪
ধর্মত্যাগী বাঙালি ৩৬
"বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" : পঞ্চাশ বৎসর আগে ও পঞ্চাশ বৎসর পরে ৫০
বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি ৫৫
পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা ৬৮
"ভোট-মঙ্গল" : সেকালের বাঙালির চোখে ইলেকশন ৯০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৯
শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে ? ১১২
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী : পেন্সিল-ড্রয়িং ১২৮
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী : জের ১৩৬
সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য ১৪৫
বাঙালি ও রমণীর রূপ ১৫৮
অসতীত্ব : পুরাতন ও নূতন ১৬৯
বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম ১৮২
'খাঁটি বাঙালি ব্যভিচারিণী থাকিব—না, মেকী ইয়োরামেরিকান ব্যভিচারিণী হইব !' ১৯৮
"পাসকরা মাগ" বা সেকালের বাঙালির চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা ২১১
হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন ? ২১৯
আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র ২৩১
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী ২৪১
আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল ২৭৩
নন্দলাল বসুর একটি ছবি ২৭৭
নন্দলাল বসু ২৮১
নন্দলাল বসু : চিত্রকর ২৮৩
ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে ২৮৯
শঙ্কর-প্রকৃতি ও রবারের টায়ার ৩০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি

প্রভাতী-সংঘের সভ্যগণ তাঁহাদের সাম্বৎসরিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য প্রতিবারই কলিকাতা হইতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে আহ্বান করিয়া আনেন। এবারে তাঁহাদের এই আহ্বান যখন একজন প্রতিষ্ঠাহীন অ-সাহিত্যিকের নিকট পৌঁছিয়াছে তখন ধরিয়া লওয়া বোধ করি অন্যায় হইবে না যে প্রভাতী-সংঘের সভাপতি নির্বাচন সাহিত্যিক হওয়া বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষাও বেশি নির্ভর করে কলিকাতাবাসী হওয়ার উপর। এই সম্মান কলিকাতার প্রাপ্য। গত একশত বৎসর কাল ধরিয়া ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্মস্থান কলিকাতা, কলিকাতাতেই উহার পরিণতি এবং কলিকাতা হইতেই উহা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে যদি কাহারও মনে সংশয় থাকে, তবে তাঁহাকে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা, রাজনীতিতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের কথা, সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা, চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কথা, এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ইঁহারা সকলেই কলিকাতায় শিক্ষিত বা প্রধানত কলিকাতাবাসী। বর্তমান ভারতের আরও দুই জন চিন্তাবীর, রাধাকৃষ্ণণ ও চিত্তুর ভেঙ্কটরমণের পূর্ণবিকাশের ক্ষেত্রও কলিকাতা ইহাও বোধ করি নিতান্ত কাকতালীয় ন্যায় নয়।

কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার এই অবিসম্বাদিত প্রাধান্য নষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজ কলিকাতা হইতে বাহিরে আসিলে সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কলায়, এক কথায় কালচারের আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে প্রবাসী বাঙালির অনুরাগ। এই শ্রদ্ধা, উৎসাহ, ও একনিষ্ঠতার তুলনা নব্যভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায় আর পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়টি আমি যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যেও করিয়াছেন, এবং কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে আপনাদেরও কেহ কেহ অনুভব করিয়া থাকিবেন। বস্তুত, যে পূর্ণতা, সৃষ্টির ঐশ্বর্য, ও অভ্যন্তরীণ সংহতি জীবন্ত ও উদীয়মান কালচারের লক্ষণ তাহা আমাদের মধ্যে ক্রমেই বিরল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কালচার-সৃষ্টির পথে আজ ভিতর ও বাহির হইতে সমান বাধা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে ; একদিকে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার চাপ আমাদিগকে যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চা হইতে বিচলিত করিতেছে, আর একদিকে অভ্যন্তরীণ আদর্শ-সংঘাত তেমনই আমাদের স্বল্পপরিসর কালচার-সৃষ্টির একাগ্রতা নষ্ট করিতেছে। এই ক্ষোভ ও অশান্তির কথা আপনাদের নিকট বলিবার আগ্রহ হওয়া দূরে থাকুক, এখানে আপনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশয়বিমুক্ত সাহিত্যানুরাগ দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

But fly our paths, our feverish contact fly!
For strong the infection of our mental strife,
Which, though it gives no bliss, yet spoils for rest;
And we should win thee from thy own fair life,
Like us distracted, and like us unblest.
Soon, soon thy cheer would die,
Thy hopes grow timorous, and unfixed thy powers,
And thy clear aims be cross and shifting made,
And then thy glad perennial youth would fade.
Fade, and grow old at last, and die like ours.

তবু কালচারের ক্ষেত্রে কলিকাতার দান শুধু অতীতের ইতিহাস এ-কথাটা স্বীকার করিতে যেন মন সরিতেছে না। সুপরিচিত বৌদ্ধ পর্যটক রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। মাস দুই পূর্বে তাঁহার মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন তিব্বতে ছিলেন তখন এক বিদ্বান লামা তাঁহাকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, সুমেরু ও কুমেরু পর্বত, এবং ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপন্ন হইয়া রাহুল সাংকৃত্যায়নকে স্বীকার করিতে হইল, ভারতবর্ষের লোক এখন আর দেবতাদিগের সংবাদ তেমন রাখিতে পারিতেছে না। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া লামা প্রশ্ন করিলেন, সে কি কথা। যে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে ধর্ম আসিয়াছে সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আর দেবতাদিগের সংবাদ রাখে না? রাহুল উত্তর করিলেন, সত্যই রাখে না; দেবতারা আর ভারতবর্ষে নাই; ভারতবর্ষের আকাশে এখন হাওয়াই জাহাজ উড়িতেছে; হাওয়াই জাহাজের তেলের গন্ধ দেবতারা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া স্বদেশ ছাড়িয়া তিব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

প্রবাসে ও স্বদেশে বাঙালির সাহিত্যচর্চার পার্থক্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ এই গল্পটি মনে পড়িয়া গেল: সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতো প্রশ্ন জাগিল—ইহার সহিত আমাদের অবস্থার কোনও সাদৃশ্য নাই তো? যেমন বর্তমান জগতের যান্ত্রিক জীবনযাত্রা হইতে সুরক্ষিত তিব্বতের গোম্পাতে গোম্পাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবতাদের স্মৃতির উপর অবিশ্বাসের ছায়ামাত্রও পাত হয় নাই, তেমনই প্রবাসী বাঙালির অপেক্ষাকৃত সচ্ছল আর্থিক জীবন ও এই আর্থিক সচ্ছলতাপ্রসূত মানসিক স্থৈর্যের জন্যই তাহাদের মধ্যে আমাদের পুরাতন সাহিত্যচর্চা আরও অবিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান নয় তো? এই অনুমান যে একেবারে অসঙ্গত এরূপ মনে করিবার কারণ দেখি না। প্রত্যেক বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই একটা বিশিষ্ট বৈষয়িক ভিত্তি আছে। ভারতবর্ষে এতশত বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতির যে ধারা চলিয়া আসিতেছে, যে ধারার প্রবর্তক বাঙালি ভদ্রলোক, উহার ভিত্তি বাঙালি ভদ্রলোকের সরকারি চাকুরি ও ইংরেজের সাহচর্যলব্ধ আর্থিক সাফল্য। আজ বাঙালির স্বদেশে তাহার বৈষয়িক জীবনের এই কাঠামো ধ্বসিয়া পড়িতেছে, প্রবাসী বাঙালির মধ্যে উহা এখনও বর্তমান। তাই যে কালচার প্রবাসী বাঙালির নিকট এখনও শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু তাহার সম্বন্ধে আমাদের সংশয় জাগা অসম্ভব নয়। এই দিক হইতে দেখিলে আমাদের অশান্তি ও বিক্ষোভকে সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতার লক্ষণ মনে না করিয়া আর একটা নূতন সংস্কৃতিসৃষ্টির জন্মবেদনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অন্তত, সকল বাধাবিপদ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রম করিয়া, সংশয়, আশঙ্কা, ও ব্যর্থতার অনুভূতিকে জয় করিয়া আমাদিগকে নূতন পথ যে বাহির করিয়া লইতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেজন্যই যে কলিকাতা হইতে একদিন ভারতবর্ষের নব্য সংস্কৃতির পথনির্দেশ হইয়াছিল, সেই কলিকাতা হইতে আসিয়া আপনাদের নিকট বর্তমান ভারতের একটি গুরুতর সংস্কৃতি-সমস্যার কথা উত্থাপন করিতে ভীত হইতেছি না।

এই সমস্যার পরিচয় দিবার পূর্বে বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির মূলসূত্র কি তাহা জানা প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এই সূত্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের সমাজে যখন পাশ্চাত্য প্রভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন এই নূতন ধারার প্রতি দুইটি মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ইংরেজ তখন মুসলমানের হাত হইতে রাজশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরত জয়লাভ করিতেছে, নূতন শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে। এই সকল ব্যাপার ভারতবর্ষের সাধারণ ও অসাধারণ উভয় শ্রেণীর লোকের নিকটই এরূপ অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল যে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য অসামান্য ও অসাধ্যসাধনকারী জাতি বলিয়া ইংরেজ সম্বন্ধে একটা ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত ভক্তির ভাব সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করিতেছিল। এই ধারণার ফলে এক দল লোকের নিকট আচারব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণই জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া জ্ঞান হইল। কিন্তু তখনই আর এক দল লোকের নিকট হইতে ইহার প্রতিবাদ আসিতে লাগিল। ইঁহারাও যে ইংরেজকে অসামান্য জাতি বলিয়া স্বীকার না করিতেন তাহা নয়, তবে তাঁহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিলেও সামাজিক জীবনে উহাদের অনুকরণ করিতে যাইব কেন? এখানে বলা প্রয়োজন, এই দুই দলের কোনওটির মধ্যেই যুক্তি বা বিচারবিশ্লেষণের আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। উহাদের এক পক্ষ যেমন শুধু বিজেতা ও ক্ষমতাশালী জাতি বলিয়াই তুচ্ছ বাহ্যিক আচারব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণে মত্ত, আর এক পক্ষও নূতনত্ব বা পরিবর্তনের বিরোধী বলিয়া তেমনই অন্ধভাবে প্রচলিত দেশাচার ও শাস্ত্রের দোহাই দিতে ব্যগ্র। এই তর্ককে উচ্চতর স্তরে তুলিয়া মীমাংসার পথ প্রথম প্রদর্শন করেন রামমোহন রায়। তিনি শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রয়োগের সপক্ষে ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যে সংস্কৃতিধারাকে তিনি এদেশের সত্য ধারা ও প্রকৃত সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন তাহাকেও ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার পূর্বে দুই-এক জন লোকের মনে এই কথাটা জাগিলেও, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার সমপর্যায়ের একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া এ দুইয়ের সমন্বয়ের মধ্যেই যে নব্যভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টির একমাত্র পথ, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এই মতের প্রচার প্রথমে করেন রামমোহন রায়। এই জন্যই তিনি বর্তমান ভারতের জন্মদাতা। তবে ধর্মসমস্যাই রামমোহনের যুগের প্রধান সমস্যা ছিল বলিয়া তিনি নিজেকে মুখ্যত ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই সমন্বয় একমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—ধীরে ধীরে সাহিত্যে, দার্শনিক চিন্তায়, সমাজ-সংস্কারে, চিত্রকলায়, বিজ্ঞানচর্চায়, রাজনীতিতে, এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া যে নূতন সংস্কৃতিসৃষ্টির প্রয়াস মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহাই আজ 'ইন্ডিয়ান রিনেসেন্স' বলিয়া সর্বত্র খ্যাত এবং ইহারই ফল মধুসূদন, বঙ্কিম,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা, কেশব-বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচার, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা, ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা।

কিন্তু আজ এই 'রিনেসেন্স'-জোয়ারে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আপনাদের কেহ এই জিনিসটা অনুভব করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, ১৯১০-১১ সন হইতে ১৯১৮-১৯ সন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মোড় ফিরিবার কাল। যে প্রথম উদ্যম ও উৎসাহ একশত বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সংমিশ্রণে একটা নূতন সাহিত্য, চিত্রকলা, দার্শনিক চিন্তা, ও ধর্মসাধনা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা যেন এই কয় বৎসরের মধ্যে অবসাদের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতপ্রস্তাবেও এই যুগের পর বর্তমান ভারতে সত্যকার কোনও সৃষ্টি হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গণিত, রসায়ন, বা পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া যাঁহারা এ যুগে খ্যাতি অর্জন করিতেছেন তাঁহাদের কথা এখানে ধরিতেছি না, কারণ তাঁহাদের এই সকল কার্যকলাপ এতটা বিশিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন যে সমগ্র জাতীয়জীবনের সহিত উহাদের সম্পর্ক কি, এমন কি সম্পর্ক আছে কি নাই, এখনও তাহা বুঝিবার সময় হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখিতেছি, এই যুগের পর আমাদের অসামান্য ব্যক্তিরা নিজেদের অনুকরণ করিতেছেন ও সামান্য ব্যক্তিরা অপরের অনুকরণ করিতেছে। এই বিচারহীন অনুচিকীর্ষা আজ এত দূর গড়াইয়াছে যে আমাদের সংস্কৃতিসৃষ্টির চেষ্টা আমাদের জীবনের সত্যকার প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও বাহ্যিক একটা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে সর্বপ্রথমে নব্যভারতীয় চিত্রকলার কথা বলিব। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় 'অ্যাকাডেমিক' চিত্রকলা হইতে মুখ ফিরাইয়া অবনীন্দ্রনাথপ্রমুখ শিল্পীরা যখন ভারতবর্ষের সত্যকার ধর্ম, জীবন, ও রীতির সহিত সুসমঞ্জস একটা চিত্রকলাসৃষ্টির প্রয়াস আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেরই মনে আশা হইয়াছিল এই পদ্ধতির মধ্যে বর্তমান ভারতের প্রকৃত রূপ দেখা যাইবে। কিন্তু আজ উহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে? সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা না করিলে কিংবা অন্য পদ্ধতির সহিত তুলনা না করিলে নব্যভারতীয় চিত্রকলাকে অবশ্য একটা নূতন ও মৌলিক জিনিস বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই ভ্রম আর থাকে না, তখন বুঝিতে পারা যায় উহা বিষয়বস্তুতে যেরূপ গতানুগতিক অঙ্কনপদ্ধতিতেও সেইরূপ পরানুচিকীর্ষু।

এই কথা বলিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, পূর্ববর্তী শিল্পধারার অনুবর্তন মাত্রকেই আমি অন্যায় বলিতেছি। বরঞ্চ বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পচর্চার এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যাহার ফলে যিনিই আজ ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তরযুগের চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় চিত্র পর্যন্ত, চীন-জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই এ যুগে চিত্রশিল্পীর কৃতিত্ব ও সাফল্য সেইখানেই যেখানে তাহার অনুবর্তন জগতের 'আর্ট ট্রেডিশ্যন'গুলিকে আয়ত্ত করিয়া নিজস্বতা অর্জন করিয়াছে, বিশুদ্ধ অনুকরণ মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। আমাদের দেশের কয়জন চিত্রকরের মধ্যে সত্যকার প্রতিভার এই লক্ষণ বর্তমান? এবং শুধু অঙ্কনপদ্ধতিতেই নয়, বিষয়বস্তুর নির্বাচনেও তাঁহাদের কয়জন যুগোপযোগিতা দেখাইতে পারিয়াছেন? আজ নব্যভারতীয় চিত্রকলায় রাম সীতা ও রাধাকৃষ্ণের যে বাহুল্য দেখিতেছি তাহা শুধু পীড়াদায়কই নয়, অনেক সময়ে দুর্বোধ্যও হইয়া উঠিতেছে। কাংড়ার চিত্রকর দানলীলার ছবি আঁকিতেন, কারণ তাঁহার চিত্র যাঁহারা ক্রয় করিতেন কিংবা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দা-প্রশংসা করিতেন তাঁহাদের নিকট দানলীলা সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজিকার দিনের শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট এই সকল প্রাচীন উপাখ্যান এতই অজানা হইয়া উঠিতেছে যে প্রবীণ সম্পাদকেরা এই সকল কাহিনীর চিত্র প্রকাশ করিয়া উহাদের পরিচয় না দেওয়া পাঠকদের পক্ষে বিশেষ বিরক্তিকর একটা ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। তবু এই বিচারহীন বিষয়বস্তু নির্বাচনের কিছুমাত্র বিরাম নাই।

ঠিক এই অনুচিকীর্ষা আমাদের সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও সমাজসংস্কারের চেষ্টার মধ্যেও পূর্ণভাবে বর্তমান, তবে শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে স্থলে উহা অতীতমুখী, এই সকল ক্ষেত্রে উহা পশ্চিমমুখী। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে উহাকে বাংলা ভাষাভাষীর জন্য বর্তমান যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাষান্তরকরণ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ? ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা সাহিত্যে রিনেসেন্স ও গ্রিক উৎপাতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছু দিন পূর্বে ওয়াল্টার পেটারের 'রিনেসেন্স' শীর্ষক বিখ্যাত পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। তখন হঠাৎ বাংলা উপন্যাসে বেয়াত্রিচে, মিকেল এঞ্জেলো, পলিজিয়ানো, পিকো দেলা মিরান্দোলার আবির্ভাব হইয়াছিল। আবার এক সময়ে ঐস্‌কুলস্‌ ও সোফেক্লেস পাঠ্য হইল ; তখন আবার বাঙালির সাহিত্যচর্চায় জিউস, হেরা, আর্টেমিস, ডানাই দেখা দিলেন। এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই অল্‌ডুস্‌ হাক্সলি, জে-বি প্রিস্টলি, বা টি-এস ইলিয়ট হইবার যশোলোভী নব্য বাঙালি সাহিত্যস্রষ্টারা তাঁহাদের পুস্তকে এমন সব বিষয় ও ভাবের অবতারণা করিতেছেন যাহার সহিত সাধারণ বাঙালি পুরুষ ও নারীর দূরে থাকুক তাঁহাদের নিজেদেরও সত্যকার কোনও যোগ নাই। এই অনুকরণ স্পৃহাই তাঁহাদের লেখনীর একমাত্র প্রেরণা, নহিলে তাঁহাদের ভাব ও ভাষা এ দুইয়ের কোনটিকেই বাংলাদেশের স্বাভাবিক সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিবার কোনও হেতু নাই।

এই কৃত্রিমতা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা বাস্তব পরিবেষ্টনীর সহিত সম্পর্কবর্জিত হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতের মতো বিশুদ্ধ অর্থনীতি বা বিশুদ্ধ রাষ্ট্রনীতি বলিয়া কোনও জিনিসের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, কারণ জলবায়ুর সহিত মানুষের পোশাকপরিচ্ছদ বা আবাসস্থানের যে সম্বন্ধ, যে অবস্থায় উহা প্রযুক্ত হইবে তাহার সহিত রাষ্ট্র ও অর্থনীতিরও তেমনই নিকট ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আমাদের সামাজিক চিন্তায় অধিকতর বাস্তবপন্থী হইবার চেষ্টা করিতেছি ? কিংবা যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার ধারা ইউরোপ হইতে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে তাহাকে দেশোপযোগী করিবার কোনও চেষ্টা করিতেছি ? তাহা তো নয়ই, বরঞ্চ দেশের প্রকৃত অবস্থার সহিত আমাদের অপরিচয় দিনে দিনে যেন আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহার অন্য কোনও প্রমাণ না দিয়া এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে আজ ভারতবর্ষের প্রকৃত সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কি তাহা জানিবার জন্য ইংরেজরচিত সরকারি ও বেসরকারি পুস্তক ভিন্ন গত্যন্তর আমাদের নাই।

এই তো গেল আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট, অন্ধ অনুচিকীর্ষা ও সৃষ্টিশক্তির অভাবের কথা। ইহা ছাড়া আমাদের কালচারের একটা বাহ্যিক সঙ্কটও আছে। কালচার-সৃষ্টি কেবলমাত্র সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নয়, তা তাঁহারা যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন। সেজন্য যুগে যুগে দেশে দেশে যখনই একটা বড় কালচারের সৃষ্টি হইয়াছে তখনই তাহাকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, যাচাই করিয়া লইবার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযুক্ত, সাহায্য করিবার উপযুক্ত একটা বৃহত্তর সমাজেরও আবির্ভাব হইয়াছে। বড় কালচার গড়িয়া উঠিবার এই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আমাদের দেশে তাহার অভাব আছে, কারণ যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই কালচারের অবলম্বনস্বরূপ হইবার কথা, যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এক সময়ে এই ভার গ্রহণও করিয়াছিল, যে কোনও কারণেই হউক উহার আজ সে ক্ষমতা আছে কিনা তাহা প্রশ্ন ও সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমেই দেখিতে পাই, মধ্যবিত্ত সমাজের বার আনা লোকই কালচারের প্রতি উদাসীন। দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, ধর্মচর্চা, শিক্ষা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে তাহাই ইহারা স্বীকার করে না। সংবাদপত্রসেবী হিসাবে একাধিক বাংলা সাময়িক পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে বাংলা সাহিত্যের পাঠক কত, কি শ্রেণীর লোক পাঠক, এই সকল প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই উঠিয়াছে। সন্ধান লইয়া দেখিয়াছি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকারও গ্রাহকসংখ্যা আসলে সাত-আট হাজারের বেশি নয়, সাধারণত পত্রিকার গ্রাহক দুই হইতে তিন হাজার, বাংলা উপন্যাস বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন তিন-চার বৎসরে এক হাজারের বেশি বিক্রয় হয় না, অন্য পুস্তক পাঠ্যপুস্তক না হইলে ইহার এক-চতুর্থাংশও বিক্রয় হয় না—অথচ বাংলাদেশে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা নিশ্চয়ই দশ হাজারের বেশি এবং সাহিত্যের জন্য মাসে পাঁচ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যাও উহার কম নয়। ইহার অপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও কিশোরের সংখ্যাই বেশি। যে সকল উপার্জনশীল ভদ্রব্যক্তির নিকট জাতীয় সংস্কৃতি সাহায্য ও সমাদর প্রত্যাশা করিতে পারে, যেমন উকিল, ডাক্তার, চাকুরিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, জমিদার, ইহাদের অধিকাংশ শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, সাহিত্য মাত্রেরই প্রতি উদাসীন। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই সাহিত্যিক ও দার্শনিক হইবেন কিংবা সাহিত্য ও দর্শন লইয়া বিভোর হইয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রত্যেক সভ্যসমাজেই ভদ্র বলিয়াই পরিচিত হইবার একটা ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে, যাহা না থাকিলে কোনও ব্যক্তিরই সেই সমাজে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকে না ; সুতরাং সামাজিক শাসনের ভয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ না থাকিলেও, সকলে সেই আদর্শ মানিয়া চলে। আমাদের দেশেও প্রাচীন কালে কৌলীন্যের একটা আদর্শ ছিল, তাহা পালন করিবার জন্য সামাজিক শাসন ছিল। কালধর্মে সেই পুরাতন আদর্শ ও শাসন লোপ পাইয়া তাহার স্থলে একটা নূতন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই নূতন আদর্শ পার্থিব সম্পদের। বর্তমানে আমাদের ভদ্রসমাজ যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অর্থহীন হইলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা পদে পদে, কিন্তু কালচার-হীন হইলে কোনই আশঙ্কা নাই।

এইবার যাঁহারা কালচারের প্রতি উদাসীন নহেন তাঁহাদের কথা ধরা যাক্। ইঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাহা একটা ভাবনার কথা বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ভাবনার কথা ইঁহাদের কালচার-প্রীতি সহজ, সরল, ও স্বাভাবিক নহে। প্রায়ই দেখিতে পাই, যাঁহারা আমাদের সমাজে সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা বা এইরূপ কোনও বিষয়ের অনুরাগী তাঁহারা এই বিষয়ে অর্থাৎ নিজেদের সাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রকলার চর্চা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজ্ঞান, এবং শুধু তাই নয় এই কলারসিকতার জন্য তাঁহারা যথোচিত সমাদর পান নাই এইরূপ একটা বিশ্বাসের বশে মনে মনে যেন অত্যন্ত অভিমানী। এই দুর্বলতা কেন ? আমরা যে শিশুর মতো হামা না দিয়া বা কোলে পিঠে না থাকিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতেছি তাহার জন্য তো আমরা কাহারও প্রশংসা আশা করি না। সভ্য ও পরিণত সমাজে দৈহিক বৃদ্ধির


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো মানসিক বৃদ্ধিও স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, ইহার জন্য কেহ কাহারও বাহবার অপেক্ষায় থাকে না। আমাদের সমাজও যদি অন্যান্য সভ্য সমাজের মতো অগ্রসর হইত, তাহা হইলে আমরাও কালচারের অন্বেষণে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের তৃপ্তির মধ্যেই উহার যথোচিত সাফল্য পাইতাম।

আমাদের কালচারড সমাজের দ্বিতীয় দুর্বলতা প্রায় সর্বদাই একটা আয়াস ও শ্রান্তি অনুভব এবং একটু অসতর্ক হইলেই নিম্নস্তরে নামিয়া আসা। যে ব্যক্তি স্বভাবতই দ্রুতপদে চলে তাহার সহিত চলিতে স্বভাবতই ধীরপদে যে চলে তাহার যেমন কষ্ট হয়, মার্জিত বুদ্ধি ও মার্জিত আবেগের একটি নির্দিষ্ট আদর্শ সর্ব অবস্থায় রক্ষা করিতে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরও সেইরূপ কষ্ট হইতে দেখিয়াছি। সেজন্য যে ব্যক্তি একটু আগেই ধ্রুপদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কিংবা টমাস হার্ডির কঠিন সমালোচনা করিতেছিলেন তাঁহার পক্ষে পরমুহূর্তেই জনপ্রিয় গজল গান শ্রবণে কিংবা নবীন ঔপন্যাসিক লিখিত গল্প পাঠে অভিভূত হইয়া পড়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এই মানসিক সাম্যের অভাব, এই চাপল্য প্রকৃত কালচারের লক্ষণ নয়। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম, আগুনের ধারে ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া প্লেটোর রচনা পড়িতে না পারা পর্যন্ত কাহারও গ্রিক ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে। তেমনই, কি লোকচক্ষুর সমক্ষে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে, কি কর্মে কি বিশ্রামে, একই আদর্শ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে অনুসরণ করিতে না পারা পর্যন্ত কালচার কাহারও ধাতস্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

আমাদের কালচার-অন্বেষণের তৃতীয় দুর্বলতা আরও গুরুতর—আন্তরিকতার অভাব। কালচারের সার্থকতা কালচারে, নিজের তৃপ্তিতে, আত্মার আনন্দে। যখনই এই উদ্দেশ্য ভিন্ন কালচারের সাহায্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিবে তখনই বুঝিতে হইবে আমাদের তপস্যার মধ্যে প্রবঞ্চনা আসিয়া দেখা দিয়াছে। অতিবিস্তার না করিয়া একটা সামান্য বস্তুগত কালচারের দৃষ্টান্ত দিয়াই ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইংরেজদের অনুকরণে আমাদের অনেকের গৃহও বর্তমানে বিদেশী আসবাবের দ্বারা সজ্জিত হইতেছে। ইহাতে জীবনযাত্রার আদর্শের—স্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-এর—উন্নতি হইতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? ইংরেজ জাতি স্বভাবতই আরামপ্রিয় ও শৃঙ্খলার অনুরাগী ; তাহাদের গৃহসজ্জা এই জাতীয় মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সকলের কথা বলিতেছি না, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই সকল জিনিসের সমাবেশ যে অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন প্রতিবেশীকে লজ্জিত করিবার অভিপ্রায়েই হইয়া থাকে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশেও এই 'স্নবারি' যে নাই তাহা নহে। সেখানেও সামাজিক সম্মানলাভের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে কালচার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তথায় কালচারের এই অপব্যবহারের পরিমাণ কালচারের প্রতি যথার্থ ও আন্তরিক অনুরাগের তুলনায় বেশি নহে। এ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা বা পরপ্রবঞ্চনার একান্ত অভাব প্রত্যাশা করা জ্ঞানীর লক্ষণ নয় ; খাদের অনুপাতে সোনা কতটুকু তাহাই বিচার্য।

বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির এই সকল দৌর্বল্য, অপূর্ণতা, সঙ্কট ও সমস্যার কথা বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়াছি, যে উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা একটা নূতন ও জীবন্ত সভ্যতা সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহা যে আজ অবসাদগ্রস্ত সে ক্লেশও মনে মনে অনুভব করিয়াছি। কিন্তু প্রথমে কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি নাই। পরে একদিন মনে হইল, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমাদের গোড়াকার হিসাবেরই একটা মস্ত ভুল। আমাদের বিগত একশত বৎসরের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমন্বয়ের চেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্বে জানা প্রয়োজন কাহাদের মধ্যে সমন্বয় হইবে; উহারা সমপর্যায়ের, সমধর্মের, এক কথায় মোটেই সমন্বয়ের উপযোগী কি না। আমার মনে হয়, আমরা এই বিশ্লেষণ সূক্ষ্মভাবে করিয়া দেখি নাই। আমরা একদিকে যেমন ধরিয়া লইয়াছি পাশ্চাত্য সভ্যতা অখণ্ড ও এক, তেমনই আর একদিকেও বিশ্বাস করিতেছি ভারতীয় সভ্যতা অখণ্ড ও এক। এই আমাদের প্রথম ভুল। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ইউরোপীয় প্রভাবসমুচ্চয় আজ আমাদের সমাজকে ঘা দিতেছে তাহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম এক নয়; এবং যে ভারতীয় সভ্যতা এই প্রভাবের সহিত মিশ্রিত হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা তাহার প্রকৃতি এবং ধর্মও এক নয়। আমাদের দ্বিতীয় ভুল, আমরা ইউরোপীয় ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সমপর্যায়ের জিনিস বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য গুরুতর। এই বিষয়গুলি আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া না উঠা পর্যন্ত বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতিতে সৃষ্টিশক্তির অভাবের মূলে কি আছে তাহা আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য একে একে উভয় পক্ষের কথাই বলিব।

প্রথমে আমাদের কথাই ধরা যাক্। ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ যে সংস্কৃতি আমাদের পিতৃপিতামহের নিকট হইতে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের মনেও স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই। এই যে সংস্কৃতি, যাহার টানার উপর ইউরোপীয় প্রভাব পোড়েনের মতো আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে উহা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই অনুবৃত্তি। ইহা আমাদের গুরুতর ভ্রম, কারণ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে অখণ্ডতাবোধ থাকিলে এক যুগের সংস্কৃতিকে পূর্ববর্তী আর একটি যুগের সংস্কৃতির অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশ যুগের অব্যবহিত পূর্বেকার সংস্কৃতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং শুধু তাহাই নহে, এক পরিণত সংস্কৃতি ভাঙিয়া আর একটি পরিণত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবার মধ্যে সমাজমাত্রেরই যে একটা অপরিণত অবস্থা থাকে, তাহার লক্ষণও আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন, আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজেও দুইটি জিনিস বর্তমান ছিল যাহার জন্য উহাকে আপাতদৃষ্টিতে পরিণত বলিয়া মনে করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অন্যায় হইত না। উহার একটি ইসলামী সভ্যতা, অপরটি হিন্দু পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা। কিন্তু এ দুইয়ের কোনটিকেই সে যুগের ভারতবাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের প্রধান খাত বলা চলে না। ইসলামী সভ্যতা প্রধানত নগরে এবং শাসকদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; উহা সাধারণ হিন্দুসমাজকে দূরে থাকুক—মুসলমানধর্মাবলম্বী নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসীকেও সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবাপন্ন করিতে পারে নাই। পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনাও তেমনই একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এ দুইয়ের কোনওটিই যে ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই বৃহত্তর সমাজের যে চিত্র আমরা সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হইতে পাই, উহা একটা শিশুসুলভ, 'প্রিমিটিভ' সমাজের চিত্র। প্রত্যেক পরিণত সমাজেই যে সমগ্রতাবোধ এবং অতীতের স্মৃতি থাকে, এই সমাজে তাহার আভাসমাত্রও নাই। এক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ভিন্ন এই সমাজে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী কীর্তির কোনও স্মৃতি ছিল না। এই কারণে উহার সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় সভ্যতার সমপর্যায়ের জিনিস বলিয়া ধরিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। উহা একটা 'ফোক সিভিলাইজেশ্যন', গ্রাম্য সংস্কৃতি মাত্র ; উহাকে পুরাতন হিন্দুসভ্যতার অপরিণত তত্ত্বরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু অনুবৃত্তি কিছুতেই বলা চলে না।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার এই রূপান্তর কবে আরম্ভ হয় তাহার কালনিরূপণ আমি এখনও করিতে পারি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ। যে হিন্দু শাসক ও অভিজাত সমাজ হিন্দুসভ্যতার অবলম্বনস্বরূপ ছিল, মুসলমানের আক্রমণে উহারা একেবারে বিনষ্ট না হইলেও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষে আর হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নাই এবং এই নেতৃত্ব হারাইয়া ভারতবর্ষের সাধারণ জনসমষ্টি সমস্ত মুসলমান যুগ ধরিয়া কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি ভাষায়, কি আর্টে, কি আচারব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা অপভ্রংশ সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। অন্তত এ কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান যুগই হিন্দুজনসমষ্টির মধ্যে অগণিত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার, লৌকিক সাহিত্য, ও লৌকিক সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টিকাল। ইহার ফলে আমরা যে গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করিয়াছিলাম, তাহাই ব্রিটিশ যুগের প্রাক্কালে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। ইহাই আমাদের প্রকৃত পৈতৃক সম্পত্তি, ইহারই সহিত ইউরোপীয় প্রভাব ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু পরবর্তী যুগে গবেষণা করিয়া সম্পূর্ণ নূতন একটা জিনিসকে আমরা ইউরোপীয় সংঘাতের সম্মুখে স্থাপিত করি। উহা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা। আমাদের পক্ষে সে যুগে এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের শরণাপন্ন হইবার বিশেষ একটা কারণ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাকে একটা বাহ্যিক ও কৃত্রিম ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই কথা বলিতেছি এই জন্য যে, এই পুরাতন সংস্কৃতি আমাদের লৌকিক সংস্কৃতির পূর্বপুরুষ হইলেও সমপর্যায়ের সংস্কৃতি নয় বলিয়া এ দুয়ের মধ্যে কোনও নিবিড় একাত্মতা ছিল না। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা উহা আমাদের অনেক বেশি নিকট-জ্ঞাতি হওয়া সত্ত্বেও উহার অনুকরণও আমাদের পক্ষে অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই হইয়া দাঁড়ায় নাই।

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, এবং উহা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস—তাহা হইলে আমাদের বর্তমান অবসাদ ও নিষ্ফলতার হেতু এক মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া সমন্বয়ের ধারণার উপর আমাদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, কিন্তু ভাবিয়া দেখি নাই প্রকৃত সমন্বয় একমাত্র তাহাদের মধ্যেই সম্ভব যাহাদের শক্তি ও প্রকৃতির সাম্য আছে। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে সহজ গ্রাম্য সংস্কৃতিকে পাইয়াছিলাম, তাহার তুলনায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তি ও পরিণতি এত বেশি যে এ দুইয়ের মধ্যে সার্থক মিলনের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমার মনে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দুই পক্ষের শক্তির তারতম্যের কথা উপলব্ধি করিয়া একটা অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের আশঙ্কা আমাদের নবযুগ-প্রবর্তকদের মনে সজ্ঞানে না হইলেও অন্তত অজ্ঞাতসারে জাগিয়াছিল ; এবং সেজন্যই তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা কিছুকালের জন্য যে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়তো এইরূপ না করিলে স্প্যানিশ ও পর্টুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দক্ষিণ আমেরিকার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিম অধিবাসীদের যে দশা ঘটিয়াছিল আমাদেরও সেই দশা ঘটিত। কিন্তু তাই বলিয়া এ-কথাটাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে উহার ফল চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কোনও দিনই ছিল না। কেন ছিল না তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয়, যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা আপনার বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাও আমাদের লৌকিক সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত বেশি শক্তিশালী ও পরিণত, এবং উহাও শক্তি ও পরিণতির দিক হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার সমধর্মী। এই লক্ষণের জন্য শুধু ইউরোপীয় প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতকে অবলম্বনের ফল আমাদের পক্ষে কল্যাণকর না হইবার সম্ভাবনা ছিল। কাজেও ঠিক সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে। আজ আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিকে প্রাচীন ভারতীয় ও অন্যদিকে ইউরোপীয়, এই দুইটি ধারাকে অবলম্বন করিয়া আছি, কিন্তু দুইটি ধারাই আমাদের পক্ষে সহজপাচ্য নয় বলিয়া দুইয়ের অনুসরণই আমাদের বেলায় সৃষ্টির প্রেরণা না হইয়া নিষ্ফল অনুকরণ ও অবসাদের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ ও ইউরোপ এ দুইয়ের মধ্যে আমাদের এই অন্ধ আবর্তন শুধু যে আমাদের সংস্কৃতিসৃষ্টির চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিতেছে তাহাই নয়, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ জনসমষ্টির মধ্যে একটা প্রাচীরও গড়িয়া তুলিতেছে। ভদ্রসমাজ আজ একশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজের সাহচর্য করিতেছে এবং ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত স্কুলকলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছে। সেজন্য তাহার পক্ষে একটু কষ্ট করিয়া হইলেও একদিকে ইউরোপীয় ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যোগ রাখা কষ্টকর ও আয়াসসাধ্য হইলেও একেবারে শক্তির অতীত নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসমষ্টি যে সহজ সরল জীবনযাত্রার মধ্যে বর্ধিত তাহাতে তাহাদের পক্ষে এইটুকু করাও একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথাকথিত নব্য ভারতীয় রিনেসেন্সের প্রভাব যে মোটেই পরিলক্ষিত হইবে না এবং ইংরেজিশিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় ও তাহাদের মধ্যে একটা পার্থক্য যে দিনে দিনে উগ্র মূর্তি ধরিয়া দেখা দিবে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমার বিশ্বাস, এই ভেদ সম্বন্ধে, ও এই ভেদ হইতে ভারতবর্ষের একটা গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে সে সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ সজ্ঞান ; এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই তিনি কি সংস্কৃতিতে, কি রাষ্ট্রনীতিতে, কি সামাজিক আচারে, কি বৈষয়িক জীবনে আমাদিগকে অতিবৈদগ্ধ্যের প্রচেষ্টা ছাড়িয়া অতিসহজ ও সরল একটা লৌকিক স্তরে নামিয়া যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ইহাও মনে হইয়াছে যে গান্ধীজীপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনও আমাদের পক্ষে আজকাল আর সম্ভব নয়। কেন নয় তাহা বলিবার পূর্বে আমাদের উপর ইউরোপীয় সংঘাতের প্রকৃত রূপ কি তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

আজিকার দিনে আমাদের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির ভারতীয় দিককে যেমন প্রাচীন ও অর্বাচীন ভারতীয় এই দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে, তেমনই ইউরোপীয় অংশেরও দুইটি দিক আছে। উহাদের একটি ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন ও আর্ট, অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ইউরোপীয় সংস্কৃতি, অপরটি ইউরোপের বিজ্ঞান ও জীবনযাত্রার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বলা বাহুল্য এ দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ও সহজগ্রাহ্য। নব্য বিজ্ঞান যন্ত্রযুগের প্রবর্তন করিয়া মানবসমাজে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছে তাহার সহিত একমাত্র জগতে কৃষির উদ্ভাবনের পর যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল তাহারই তুলনা চলিতে পারে। মানবের জীবনযাত্রায় এই বিশ্বজনীন পরিবর্তনকে গ্রহণ করা বা না করা কাহারও ইচ্ছাধীন নয়, কারণ উহাকে গ্রহণ না করিবার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যম্ভাবী ফল জীবনযাত্রায় পরাজয়। সুতরাং ইউরোপের ব্যর্থ অনুকরণ করিবার নিষ্ফলতা হইতে বাঁচাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে যে সরল জীবনযাত্রায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ তো নয়ই, সম্ভবও নহে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য—এত দূর যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কি ? আজ আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়—অর্থাৎ যেখানে সাধারণ ভারতবাসী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই জীবনযাত্রার সেই স্তরে, বাহির হইতে তিনটি তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—(১) প্রাচীন ভারতীয় তরঙ্গ, (২) ক্লাসিক্যাল ইউরোপীয় সংস্কৃতির তরঙ্গ, (৩) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশ্যনের তরঙ্গ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির অনুশীলন করিয়া আমরা সাফল্য লাভ করি নাই, বরঞ্চ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তৃতীয়টির অনুশীলন এখনও আমাদের মধ্যে ভাল করিয়া আরম্ভও হয় নাই। আমার মনে হয়, এই পথ অবলম্বন করিলে আমাদের নিরাশ হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ বিজ্ঞান কোনও জাতিবিশেষের বিশিষ্ট সম্পত্তি নয় এবং উহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য কালচারের সূক্ষ্মতর ফল আস্বাদ করিবার মতো বৈদগ্ধ্যেরও আবশ্যক করে না। কার্যক্ষেত্রেও দেখিতেছি, যে সাধারণ ভারতবাসী ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নব্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণই দেখায় নাই, সেও যন্ত্রব্যবহারে কিছুমাত্র অনাগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। যুগধর্মের এই প্রকাশকে মানিয়া লইয়া আমাদিগকেও সাহিত্য ও সুকুমার কলার চর্চা ছাড়িয়া সর্বাগ্রে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। আসল কথা এই, আমাদের সমগ্র সমাজ জীবনযাত্রার যে স্তরে উঠিলে উহাতে সংস্কৃতিসৃষ্টি সম্ভব সেই স্তরে আমরা এখনও পৌঁছি নাই, তাই আমাদের একশত বৎসরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের নবযুগ-প্রবর্তকগণ ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া একেবারে প্রথমেই সেই পুষ্পচয়নের কামনা করিয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে উহার জন্ম সম্ভব হইবে, যে বৃক্ষে উহা ফুটিবে, তাহার কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। আজ আমাদিগকে সেই ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে, আকাশে কুসুম ফুটাইবার বৃথা স্বপ্ন না দেখিয়া হলকর্ষণে নিযুক্ত হইতে হইবে।

পাটনাপ্রবাসী বাঙালি ছাত্রসমিতি 'প্রভাতী সংঘে'র বাৎসরিক উৎসবে (১০ই মাঘ, ১৩৪৩) পঠিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# মতান্তর

## "সেই একই ভুল"

॥ ১ ॥

বিগত ইলেকশনে পশ্চিমবঙ্গে মার্কসিস্ট দল ও ইহাদের সহিত ও অন্য যে রাজনৈতিক দল যুক্ত আছে, তাহাদের প্রাধান্য হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের শাসনের অধিকারও ইহারাই লাভ করিবে। এই ব্যাপারটা ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি। শুধু পুনরাবৃত্তি বলি কেন, আগের ব্যাপারের পূর্ণতর প্রকাশ। তখন দুইবারেই উহার ফল ভাল হয় নাই, বরঞ্চ ক্ষতিই হইয়াছিল—কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটুকু স্বাধিকার পাইবার আশায় কংগ্রেস বিরোধী দলের সপক্ষে ভোট দিয়াছিল তাহা পাওয়া দূরে থাকুক, 'স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ'ই হইয়াছিল, অর্থাৎ আরও অসহায়ভাবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি এ-সূত্রে শুধু গভর্নরের দ্বারা শাসিত হইবার কথাই যে বলিতেছি তাহা নয়, মন্ত্রিসভা থাকা সত্ত্বেও গৌণভাবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের দ্বারা শাসিত হইবার কথাও মনে করিয়াছি। দুইবার কংগ্রেস বিরোধিতার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা ছাড়িয়া দিলে ১৯৪৭ সন হইতে বাংলাদেশের শাসন দিল্লির কেন্দ্র হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। মনে রাখা উচিত, বিধানচন্দ্র ও সিদ্ধার্থশঙ্কর—এই দুই রায় প্রতাপাদিত্য রায় হইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা আসলে মহারাজা মানসিংহের মতো দিল্লীশ্বরের সুবাদার, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি মাত্র ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এবারেও ইলেকশনের চূড়ান্ত ফল অতীতের অনুযায়ী হইবে, না অন্য রকমের হইবে ? এই প্রশ্নটা গুরুতর।

অবশ্য জয়ী দলের নেতা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রাধান্য হইতে জনতা দলের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সহিত পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিরোধ বা সংঘর্ষ হইবে না। কথাটা ভাল হইলেও, উহা পড়িয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি। সকল বিষয়ে জনতা দলের মতামত ও রাষ্ট্রীয় নীতি যাহা, তাহা হইতে কম্যুনিস্টধর্মী যে কোনও রাজনৈতিক দলের, এমন কি ফরওয়ার্ড ব্লকেরও মতামত এত বিভিন্ন যে, এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ না ঘটিলে বুঝিতে হইবে একপক্ষ বা অপর পক্ষ নিজেদের মতামত, এমন কি ধর্ম ছাড়িয়াছেন। এখন প্রশ্ন, কে ছাড়িবে ?

'জনতা' সমগ্র উত্তরাপথের জনসাধারণের দল, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট এই দলের আয়ত্ত। এই গভর্নমেন্টের শক্তির সহিত পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্টের শক্তির কোনও তুলনা হইতে পারে না। বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকিলেও হিন্দী ভাষাভাষী উত্তরাপথের সহিত বিরোধিতা করিয়া বাঙালি সফল হইত না, বিভাগের পর আমাদের বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এত ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, বিরোধের কল্পনা করাও নির্বুদ্ধিতা হইবে। অবশ্য বলা যাইতে পারে, শিল্প বাণিজ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভারত গভর্নমেন্টের উপর জোর আছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই শিল্প বাণিজ্য প্রধানত বিদেশী ও অবাঙালির হাতে। উহাদের সর্বদাই ভারত গভর্নমেন্টের উপর জোর আছে। কিন্তু যে-সব বাঙালি উচ্চপদস্থ বা ধনী হইয়াছে, অথবা উচ্চপদস্থ ও ধনী হইবার ইচ্ছা রাখে, তাহাদের সকলেই বিদেশী, অবাঙালি ও ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষে যাইবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাতন্ত্রের বেলাতেও ইহা দেখা গিয়াছিল। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্ট ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের মধ্যে যদি বিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহা হইলে হার পশ্চিমবঙ্গকেই মানিতে হইবে।

অপর পক্ষে, যদি কোনও বিরোধ না ঘটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মার্কসিস্ট দল খুবই নরম গাহিতেছেন, কিংবা খুব বেশি হইলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই মন্ত্র ধরিয়া খিড়কির দোর দিয়া কম্যুনিজম আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কম্যুনিজম কোথাও খিড়কির দোর দিয়া অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে নাই। তাহা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে। বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট মূলত গোঁড়া হিন্দুস্থানী হিন্দুর ও বানিয়ার গভর্নমেন্ট। বানিয়ার স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতা যেমন অসামান্য, হিন্দুস্থানী হিন্দুর গোঁড়ামিও তেমনই অবিচল। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহারা বিচারের আগে কেবল অনুভূতি দিয়া বুঝিতে পারে। বাঙালি কম্যুনিস্ট ডালে ডালে চলিলে উহারা পাতায় পাতায় চলিবে। সুতরাং প্রাদেশিক ক্ষমতা না হারাইতে হইলে পশ্চিমবঙ্গের নূতন গভর্নমেন্টকে সমস্ত বড় ব্যাপারে নিজেদের বিশিষ্ট মতামত ও পথ ছাড়িতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মার্কসিস্ট দলকে ভোট দিবার কোন্ সার্থকতা থাকিতে পারে? কংগ্রেস বা জনতা, যে কোনও দলকে ভোট দিলেও ফল একই হইত।

॥ ৩ ॥

সুতরাং বিরোধ হউক আর না-ই হউক কার্যক্ষেত্রে ইলেকশনের ফল হইতে কোনও ইতরবিশেষ হইবে না, এই কথা বলা চলে, তবু বলিতে হইবে, মার্কসিস্ট দলের জিত হইবার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। উহাকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মামুলি দলগত আবর্তন মাত্র মনে করিলে গুরুতর ভুল হইবে। ইহার পিছনে বাঙালি জীবনের দুইটি প্রবল স্রোত আছে। দুইটিই অমঙ্গলজনক। কিন্তু এই দুই স্রোতকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বাঙালি এই দুইটির অস্তিত্ব এবং শক্তি সম্বন্ধে অবহিতও নয়। সুতরাং স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

ইহার মূলে বাঙালি মনের একটা অক্ষমতা ও বাঙালি চরিত্রের একটা দুর্বলতা রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি নূতন জিনিস নয়। ইহার উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র একশত দশ বৎসর আগে করিয়াছিলেন। আজও তাহার পরিবর্তন হয় নাই। তিনি ১৮৬৬ সনে লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।" বিগত ভোটের ব্যাপারেও সেই পুরাতন ধারায় চলাই দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ বাঙালি অবস্থার দাস হইয়াই ভোট দিয়াছে। মার্কসিস্ট চিন্তাধারায় খানিকটা প্রভাবান্বিত হইবার ফলে বরঞ্চ অবস্থার দাস হইবার অভ্যাস বাঙালির আরও দৃঢ় হইয়াছে, কারণ মার্কসবাদ বাহ্যিক অবস্থাকেই মানব জীবনের নিয়ন্তা বলিয়া প্রচার করে। কি অবস্থা তাহাদের এইভাবে ভোট দিতে প্ররোচিত করিয়াছে, উহার বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এখনই বলিলাম, এই অবস্থার মধ্যে দুইটি স্রোত আছে। উহাদের একটি বাহিরের ব্যাপার, দ্বিতীয়টি ঘরের। বাহিরের ব্যাপারটা এই—বাঙালির মনে উত্তরাপথের, অর্থাৎ হিন্দী ভাষাভাষী হিন্দুস্থানের, জনসাধারণের প্রতি একটা বিরূপ ভাব আছে, এই বিরূপতা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্বেষের রূপ ধরিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ ঘরের ব্যাপারটা এই—বাঙালি ভদ্রসমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ এখন উগ্রভাবে বর্তমান। উহার প্রকাশ ভয়াবহ। দুইটি ব্যাপারেই আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে শুধু উত্তরাপথের সহিত বিরোধের কথাই বলিব।

এইখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার উত্তর আগেই দিয়া রাখি। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাঙালি যদি উত্তরাপথের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকে তাহা হইলে সে অবস্থার দাস হইয়াছে এ-কথা বলা চলে না, বরঞ্চ বলা উচিত, সে হিন্দুস্থানীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইতিহাসের দ্বারা সৃষ্ট একটা অবস্থাকে অগ্রাহ্যই করিতেছে। যদি এই ইচ্ছা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমিও এই কথাই বলিতাম। কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহ মানসিক উত্তেজনা মাত্র, কখনও কার্যত সফল হইবে না, তখন এই বিরোধিতাকে অবস্থার দাস হইবার আর একটা দিক বলিব। অবস্থার বশীভূত হইবার একটা নিষ্ক্রিয় ও আর একটা সক্রিয় রূপ আছে। নিষ্ক্রিয় রূপ, বাহ্যিক অবস্থাকে মানিয়া লইয়া অবস্থা অনুযায়ী হইয়া স্বার্থ রক্ষা ; সক্রিয় রূপ, নিষ্ফল ক্রোধে হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অপরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা। বর্তমান যুগে দেখা যাইতেছে, এই দুই ধরনেই অবস্থার বশীভূত হওয়ার ক্ষমতা বাঙালির অসীম। এখন প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই।

॥৩॥

উত্তরাপথের সহিত বাঙালির রাজনৈতিক বিরোধ সম্প্রতি দেখা দেয় নাই, এমন কি ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হইতেও উহার উদ্ভব হয় নাই। উহা প্রথম স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২০-২১ সনে, ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইতে। কিন্তু তাহার পিছনেও একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। উহার কথা এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। কেবল মূল কথাটা বলিয়া রাখিতেছি। না বলিলে বাঙালির রাজনৈতিক আচরণের তাৎপর্য বোঝা যাইবে না।

রাজনৈতিক আচরণ বুঝিতে হইলে একটা সাধারণ সূত্র মনে রাখা প্রয়োজন। কোনও জনসমষ্টি রাজনীতির ক্ষেত্রে কিভাবে চলে, তাহার মূলে স্বার্থবোধের চেয়ে অনেক বেশি থাকে 'অহঙ্কার' (অর্থাৎ অহং জ্ঞান ও আত্মাভিমান)। যদি এই অহঙ্কারে আঘাত লাগে তাহা হইলে স্বার্থ ক্ষতির ও অবিচারের অভিযোগ সৃষ্টি করিতে বেশি সময় লাগে না, তখন তিলকে তাল করা হয়, এমন কি সম্পূর্ণ মিথ্যা বা কাল্পনিক অভিযোগও দেখা দেয়। এ ব্যাপারটা দাম্পত্য জীবনে খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতিকূলতা থাকে, তাহা হইলে অভিযোগের অন্ত-অবধি থাকে না, এবং যে পক্ষ দুর্বল হয় তাহারই, অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে পত্নীরই, অভিযোগ শোনা যায় বেশি। উত্তরাপথের সহিত বিরোধেও বাঙালি পত্নী স্থানীয়। তাহার আত্মাভিমানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, সুতরাং ক্রমাগত গোঁসাঘরে বসিতেছে। আমি এই মনোভাবের আলোচনা বিস্তারিতভাবে 'বাঙালীত্বের স্বরূপ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৯৩৪ সনে করি। উহা সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে আমার মূল বক্তব্য ছিল এই—

প্রাচীন হিন্দু যুগে ও মুসলমান শাসনের সময়ে প্রতিটি যুগের শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল উত্তরাপথ। বাঙালি উহার অনুবর্তী মাত্র হইয়া টেরে পড়িয়া ছিল। তখন উত্তরাপথের শাসক সম্প্রদায় বাঙালিকে একটু হীনই মনে করিত। কিন্তু ইংরেজের আধিপত্য কলিকাতা ও বাংলাদেশ হইতে বিস্তার পাইবার ফলে এই পুরাতন ধারা একেবারে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্টাইয়া গেল। তখন ইংরেজদের পার্শ্বচর হইয়া ও প্রথম ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া বাঙালি সমগ্র উত্তরাপথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইল। তবে ইহার মূলে সত্যকার শক্তি ছিল, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে যে নূতন ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্রষ্টা বাঙালি। তাহার উপর ইংরেজ শাসনতন্ত্রে রাজকার্যেও বাঙালির প্রাধান্য ও প্রভাব বেশি ছিল। কিন্তু উত্তরাপথে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির প্রাধান্যের সঙ্কোচ হইতে আরম্ভ হইল। হিন্দুস্থানীরা শুধু যে সমকক্ষতা দাবি করিল তাহাই নয়, প্রাধান্যও চাহিল। ইহাতে বাঙালির আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। বাঙালি উত্তরাপথের সাম্যের দাবিকে সুস্থ মনে নিতে পারিল না। সেই সময় হইতেই উত্তরাপথের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও আরম্ভ হইল। সুতরাং ১৯৩৪ সনে আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙালিত্বের স্বরূপের পিছনে তিনটা জিনিস আছে—প্রথম প্রাক্ ব্রিটিশযুগের হীনতার স্মৃতি, ব্রিটিশযুগের আত্মগৌরব ও গান্ধীযুগে আহত আত্মাভিমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহার পূর্ণ আবির্ভাব ১৯২০-২১ সনের অসহযোগ আন্দোলন হইতে হয়। কিন্তু উহার প্রায় দশ বৎসর আগেই ব্যাপারটার সূচনা হইয়াছিল একটা ঘটনায়—ইংরেজ দ্বারা ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়াতে। ইংরেজ শাসনতন্ত্রে বাঙালির প্রভাব ও প্রধান্য হ্রাস করাই যে এই রাজধানী স্থানান্তরিত করার একটা কারণ, তাহা সকলেরই জানা আছে।

কিন্তু রাজনীতি, বিশেষ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে বাঙালির প্রাধান্য লোপ পাইল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব হইতে। ১৯২০ সনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করেন, তখন বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা উহার সমর্থন করেন নাই। ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে এই প্রস্তাবের বিচার হয়। উহা গ্রহণে বাধা দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ দলবল লইয়া নাগপুর যান। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহাকে বুঝাইয়া অবশেষে দলে টানিয়া নেন। সুতরাং তখনই গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস ও উত্তরাপথের সহিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছাড়াছাড়ি হইল না। কেবলমাত্র বিপিনচন্দ্র পাল অসহযোগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া জাতীয় আন্দোলনের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। চিত্তরঞ্জন বাঁচিয়া থাকিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালির সহিত কংগ্রেসের কি সম্পর্ক দাঁড়াইত বলা চলে না। কিন্তু ১৯২৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হইবার আগেই আর এক বাঙালির নেতৃত্বে বাঙালির সহিত গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের মনোমালিন্য শুরু হইল।

## বাঙালি ভদ্রলোকের উগ্র জাতীয়তা বনাম উত্তর ভারত

॥ ৪ ॥

যে নেতার জন্য বাংলা ও উত্তরাপথের রাজনৈতিক বৈষম্য শুরু হইল তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলার সহিত উত্তরাপথের রাজনৈতিক বিরোধের স্বরূপ বুঝিতে হইলে গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের সহিত সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতার কারণ কি তাহার সন্ধান লইতে হইবে, কারণ এ-বিষয়ে তাঁহাকে বাঙালির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯২১ সনের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র ইংলন্ড হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। তখনই তাঁহার সহিত মহাত্মাজীর দেখা হয়। তখন অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলিতেছে। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া পঁচিশ চলিতেছে, গান্ধীজীর বয়স তখন একান্ন পূর্ণ হইয়া বাহান্ন চলিতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র যিনি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন তিনি বালগঙ্গাধর টিলক। তিনি ১৯২০ সনে বিগত হইয়াছিলেন। যুবা সুভাষচন্দ্র এই একবার মাত্র সাক্ষাতের ফলে মহাত্মাজী সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব লইয়া ফিরিলেন। ইহা হইতে পরে ক্রমে ক্রমে দুইজনেরই পরস্পরের প্রতি বিরূপ ভাব বাড়িতে লাগিল। বাহিরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে মানিয়া লইলেন এবং গান্ধীজীও সুভাষচন্দ্রকে স্নেহ দেখাইলেন, কিন্তু দুইজনের সত্যকার একাত্মতা কখনও হয় নাই। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে কখনও শ্রদ্ধা করেন নাই, মহাত্মাজীও সুভাষচন্দ্রকে কখনও বিশ্বাস করেন নাই। অবশেষে ১৯৩৯ সনে মহাত্মাজীর কাছে হার মানিয়া সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে বিদায় লইতে হইল। ইহাতে বাঙালি মনের সহিত উত্তরাপথের মনের বিরোধ আরও উগ্র হইয়া পড়িল। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের বিরাগের কারণ কি তাহা জানা প্রয়োজন।

কারণ অনেকগুলি, এবং সবগুলিই সুভাষচন্দ্রের খাঁটি বাঙালিত্ব হইতে প্রসূত। সেগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করিতেছি—

১। সুভাষচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনে বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পন্থার অনুগামী ছিলেন। এই ধারার প্রধান ধর্ম ছিল সামরিক মনোবৃত্তি। আমার আত্মজীবনীতে আমার বাল্যকালে স্বদেশী আন্দোলনের বিবরণ দিতে গিয়া আমি নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম—

"This (the proper method of achieving independence), in the ultimate analysis, we could think of as nothing but armed rebellion. From the outset we judged all political action by the criterion of insurrection. We took it as an axiom that only military power, actual or potential, could drive out the English."

আমি ময়মনসিংহ জেলার ছোট শহর কিশোরগঞ্জে বড় হইয়া যেমন এই ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলাম, সুভাষচন্দ্রও তেমনই কটকে বড় হইয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আমি ১৯০৮ সনে দশ বৎসর বয়সে 'যুগান্তর' কর্তৃক প্রকাশিত ও গভর্নমেন্টের দ্বারা বাজেয়াপ্ত 'বর্তমান রণনীতি' পড়িয়াছিলাম। এখনও যে-সব বাঙালি গুয়েভারা, কাস্ত্রো বা মাও-র বেনামীতে 'বন্দুকের ডগায় শক্তি'—এই বুকনি আওড়ান, তাঁহারাও বাঙালির জাতীয়তাবোধের মধ্যে প্রথম হইতেই যে সামরিক ঝোঁক ছিল তাহারই বশবর্তী। খুব বেশি হইলে সেই পুরাতন ধারাকে তাঁহারা প্যান্ট পরাইয়াছেন।

এই সামরিক মনোভাব সুভাষচন্দ্রের শেষ পর্যন্ত ছিল তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধী অহিংস পন্থা অবলম্বন করিয়া সুভাষচন্দ্রের সহিত কখনই একমত হইতে পারেন নাই। ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র যে একটু সামরিক সাজসজ্জা দেখাইয়াছিলেন, গান্ধীজী উহাকে ব্যঙ্গ করিয়া এক বিলাতি সার্কাসের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

২। সুভাষচন্দ্র উচ্চবর্ণের বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন। এই ভদ্র শ্রেণীর বাঙালির বাংলাদেশেও নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীর প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল। সুতরাং অন্য প্রদেশের বানিয়ার প্রতিও তেমনই অবজ্ঞা হইবার কথা। মহাত্মা গান্ধী বানিয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধী হইবেন সে সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের কোনও ভুল থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, অবজ্ঞা হওয়াও স্বাভাবিক।

৩। সব সময়ে গোঁড়া হিন্দুয়ানী না দেখাইলেও সুভাষচন্দ্র উচ্চবর্ণের বাঙালি ভদ্রলোকের মতো শাক্তধর্মী ছিলেন। মহাত্মাজী ছিলেন বৈষ্ণব, তাও আবার গুজরাটী


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষ্ণব। সুতরাং এ-দুই জনের মধ্যে একাত্মতা হইবার উপায় ছিল না। বাঙালি ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ঘোরতর বোষ্টম বিদ্বেষী।

৪। সুভাষচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অন্য উচ্চশিক্ষিত বাঙালির মতো তাঁহারও বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ গর্ব ছিল, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার.গর্ব। তাঁহার মনে গান্ধীজীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে কোনও উচ্চ ধারণা হইবার কোনও উপায় ছিল না। সেজন্য প্রথম দেখার পরই তিনি বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতা লাভ করিবার কার্যক্রম সম্বন্ধে মহাত্মাজীর কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। আর একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তাহার সমস্ত 'ইন্টেলেকট' একজনের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।

নিজেদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত বুদ্ধির উপর বাঙালির অবিচল আস্থা। ইহার বশে উচ্চশিক্ষিত বাঙালি জবাহরলাল নেহরুকেও 'ইন্টেলেকচুয়েল' বলিয়া মানে নাই। এই অবজ্ঞা যে কি অদ্ভুত রূপ ধরিয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯৩৯ সনে একদিন আমি কেমব্রিজ-প্রত্যাগত ২২/২৩ বৎসর বয়স্ক এক বাঙালি যুবকের সহিত জাতীয় আন্দোলনে ইন্টেলেকচুয়াল অক্ষমতা সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম। এই সূত্রে আমি বলিলাম, কংগ্রেসের মধ্যে একমাত্র জবাহরলালই 'ইন্টেলেকচুয়াল'। যুবক আমার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া ইংরেজিতে বলিল,

"Oh, you call him an intellectual. Do you? Well, I travelled in the same compartment with him in the train from Bombay, but did not feel like speaking to him."

হ্যারো এবং কেমব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত জবাহরলালের প্রতিই যদি এই মনোভাব হয়, তাহা হইলে গান্ধীজীর প্রতি কি হইতে পারে তাহা অনুমান করা সহজ।

এই মনোভাব ক্রমশ সুভাষচন্দ্রকে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাব তিনি ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত 'The Indian Struggle' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, বাহিরে ভদ্রতা, সম্মান বা স্নেহের অভাব না দেখাইলেও সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে সদ্ভাব কখনও হয় নাই। অবশ্য অবস্থাচক্রে গান্ধীজী ১৯৩৮ সনে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করিতে প্রায় বাধ্য হন। তবু প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁহার কার্যকলাপের সমর্থন করেন নাই, পক্ষান্তরে বহু ত্রুটি ধরিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সুভাষকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট করিতে সম্মত হন নাই। তবু যখন সুভাষ জিতিলেন তখন প্রকাশ্য বিবাদ দেখা দিল। অবশেষে তাঁহাকে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হইল। আমি ১৯৩৭ সন হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বসুর সেক্রেটারি ছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটার ভিতরের ইতিহাস আমার জানা। ইহাতে কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে মনোমালিন্য প্রকাশ পাইল তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। সবচেয়ে ক্ষোভের বিষয় সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ হার। অথচ তিনি যে বাঙালি ভদ্রলোকের আসল নেতা ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহার হারকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙালির হার বলিয়াই ধরিতে হইবে।

॥ ৫ ॥

কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইবার কোনও উপায়ই ছিল না। প্রথম কথা, বাংলাদেশের বিশিষ্ট জাতীয় আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ধারা। ভারতবর্ষের অন্যত্র উহাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরই ছিল। কিন্তু ততদিনে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আন্দোলনে টানিয়া আনেন। তাহার মধ্যেও আবার হিন্দীভাষী হিন্দুস্থানী জনসাধারণেরই প্রাধান্য হইল। ইহাদের পক্ষে বাঙালির প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তাহাদের সম্মুখে গান্ধীজীর পথ ভিন্ন আর কোনও পথ ছিল না।

ইহার ফলে গান্ধীজীর দিকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইতেই যে জোর দেখা দিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি বাঙালি ভদ্রলোকের ছিল না। এমন কি বাঙালি জনসাধারণও বাঙালি ভদ্রলোকের আন্দোলনের ধারা ছাড়িয়া গান্ধীজীর দিকেই গেল।

কিন্তু এই দুর্বলতার জন্য যতটুকু বুঝিয়া-সুঝিয়া কাজ করা উচিত ছিল বাঙালি ভদ্রশ্রেণী তাহা করে নাই। উহার মূলে ছিল হিন্দুস্থানীর উপর অবজ্ঞা, হিন্দুস্থানীর প্রাধান্যের লক্ষণ দেখিয়া এই অবজ্ঞা বিরাগে, এমন কি বিদ্বেষে পরিণত হইল। এই মনোভাব যে কত প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে, ও উহা কত ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা অনুভব করিয়া আমি 'বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ' এই নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখি। ১৯৩০ সন কিংবা ১৯৩১ সনে ঠিক মনে পড়িতেছে না (প্রবন্ধ হাতে নাই), এই দুই বৎসরের কোনও একটায় আমি প্রবন্ধটা একটা সভায় পড়ি। উহাতে অন্যান্য গণ্যমান্য সাহিত্যিক ছাড়া প্রমথ চৌধুরী ও অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও আমার বক্তব্যে আপত্তি করিলেন। আমি এইমাত্র বলিয়াছিলাম যে, বাঙালিকে এখন বাঙালিত্ব বোধের উগ্রতা এবং যুগের অনুপযুক্ত আত্মাভিমান ছাড়িয়া উত্তরাপথের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে। প্রবন্ধটি পরে প্রবাসীতে ছাপা হইল। তাহার জন্য অনেক গালি খাইলাম। এমন কি, উহার পর এই বিষয়ে যে আর একটি প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহা রামানন্দবাবু ছাপিলেন না। উহার যুক্তিই পরে বঙ্গশ্রীর প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করি।

কিন্তু আবেগের বশে বিদ্রোহী হইলে কি হইবে আচরণে বাঙালিকে কংগ্রেসের অনুবর্তী হইতে হইল। অন্য পথ ধরা সম্ভবও ছিল না। ১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলনে বাঙালি জনসাধারণ এবং অধিকাংশ ভদ্রলোক যোগ দিল। তবে উহার সঙ্গে পুরাতন বিপ্লববাদী কার্যকলাপও চলিল ও এইজন্য ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত শত শত বাঙালি যুবক বিনা বিচারে বন্দী রহিল। শরৎবাবু পর্যন্ত বন্দী হইলেন, সুভাষবাবুকে ইউরোপে নির্বাসনে যাইতে হইল।

এই ব্যাপারে একদিকে কংগ্রেসের প্রতি ভদ্র বাঙালির বিরূপতা বাড়িল, অন্যদিকে বাঙালির বিশিষ্ট জাতীয় আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সন্দেহও বাড়িল। তবে ১৯৩৭ সনে যখন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক শাসনে দেশের লোক অধিকার পাইল, তখন বাংলাদেশে শরৎবাবুও কংগ্রেস দলেরই নেতা হইলেন। এমন কি ১৯৩৯ সনে সুভাষচন্দ্র যখন নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন, তখনও শরৎবাবু কংগ্রেসের সহিত যুক্ত রহিলেন। ভ্রাতার দলে যোগ দিলেন না। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙালির মনের উপর সুভাষচন্দ্রের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, বাংলার কংগ্রেস হইতে তিনি বাঙালির দ্বারাই বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। শরৎবাবুর সেক্রেটারি হিসাবে এই ব্যাপারটার ভিতরের ইতিহাস আমার সম্পূর্ণ জানা আছে। ইহার সহিত কংগ্রেস দলে শরৎবাবুর সহযোগীরাও জড়িত ছিলেন। বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা এখন কংগ্রেসের পক্ষে না গেলে গান্ধীজী ও তাঁহার সহযোগীরা বাংলাদেশের কংগ্রেস হইতে সুভাষচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে সুভাষবাবু মুষ্টিমেয় সহকর্মী লইয়া একঘরে হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পক্ষে এই নিষ্ক্রিয়তা মানিয়া লইয়া চুপ করিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। তবু ১৯৪০ সন পর্যন্ত তিনি সহ্য করিয়া ছিলেন। পরে ১৯৪০ সনের মাঝামাঝি ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল বিদেশে গিয়া অ্যাকসিস পক্ষের সহায়তা জোগাড় করিতে পারিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে। তাই দেশে কোনও পথ খোলা নাই দেখিয়া তিনি বিদেশে চলিয়া গেলেন। এইভাবে বাংলাদেশ সুভাষবাবুর নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইল। যদি তিনি ১৯৪৭ সনে বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যরকমের হইত। এই সমস্ত ভুলের পিছনে ছিল বাঙালি মন ও কার্যকলাপের দ্বিত্ব—মনে এক, কাজে আর। ইহাতে বাঙালি দুই কুলই হারাইয়াছে। একদিকে গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের সহানুভূতি ও সহায়তা পায় নাই, অন্যদিকে গান্ধী-বিরোধী হইয়াও কৃতকার্য হয় নাই। এই অবস্থার জন্য ১৯৩৭ সন হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমে ১৯৩৭ সন হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ক্ষতির কথা বলি, কারণ পরের ক্ষতি উহারই অনুবর্তন মাত্র।

## বিরোধে মঙ্গল নাই, দাসত্বেও নাই

॥ ৬ ॥

১৯৩৭ সনে ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইন-অনুযায়ী নূতন প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ইলেকশনের ফল যখন জানা গেল, তখন দেখা গেল পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও আসাম ছাড়া সর্বত্র কংগ্রেসের জয় হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই সব প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। ইহাতে আপাতত কংগ্রেসের হাতে প্রাদেশিক ক্ষমতা না আসিলেও স্থায়ী কোনও ক্ষতি হইল না, কারণ কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে যে কোনও সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। কয়েকমাস পরেই, অর্থাৎ ১৯৩৭ সনের মাঝামাঝি রাজাগোপালাচারি, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্য বাস্তববাদী নেতাদের চাপে জবাহরলালের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করাই স্থির করিল। পাঞ্জাবেও কোনও ক্ষতি হইল না, কারণ সেখানে মুসলমান, শিখ ও হিন্দু মিলিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল। ক্ষতি হইল বাংলাদেশের এবং তাহার আর কোনও প্রতিকার না হওয়াতে বাঙালি বঙ্গ-বিভাগ অর্থাৎ সর্বনাশের পথেই চলিল। কিরূপে বলিতেছি।

সামান্য ব্যতিক্রমের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলাদেশে ১৯৩৭ সনে ইলেকশনের ফলে তিনটি রাজনৈতিক দল দেখা দেয়—দুটি মুসলমান, অর্থাৎ লীগ ও প্রজা পার্টি ; একটি কংগ্রেসদলীয় হিন্দু। ইহার পরই প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সহিত মিলিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমতি পাইল না। ফজলুল হক মোসলেম লীগের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইলেন। ফলে বাংলার নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্রভাবে হিন্দুর কোনও স্থান হইল না।

সুভাষবাবু তখন বাংলাদেশে ছিলেন না, শরৎবাবু কংগ্রেসের মতানুযায়ী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর বাংলাদেশের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ এইভাবে যে কাটিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। ইহার মূলে ছিল, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রথম সিদ্ধান্ত। যখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল, তখন বাংলাদেশের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-অনিষ্ট হইয়া গেল তাহার সুরাহা করিবার পথ আর রহিল না।

এই ক্ষতির মূলে ছিল, বাংলাদেশের ও বাঙালির শুভাশুভ সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ উদাসীনতা। এই উদাসীনতা না থাকিলে, বাংলাদেশের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের প্রথম সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করিয়া বাংলার কংগ্রেসকে প্রজা পার্টির সহিত মিলিত হইবার অনুমতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দিতে পারিত। আসামের বেলাতে এই ধরনের ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। বাংলার বেলায় হয় নাই। কিন্তু এই উদাসীনতার কারণ বাংলাদেশ ও উত্তরাপথের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলের অভাব। আগে হইতেই যদি এই বিরূপ ভাব না থাকিত তাহা হইলে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কংগ্রেস এত উদাসীন হইত না। বাঙালি ভদ্রলোকের উত্তরাপথ সম্বন্ধে বিরূপভাব থাকাতে, কংগ্রেস বাঙালিকে আপনার বলিয়া মনে করে নাই।

ইহার পরও ইতিহাস আছে। ১৯৩৭ সনের শেষে যখন সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা স্থির হইল, তখন হইতে একটা চেষ্টা চলিল, বাংলাদেশের কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ভাঙিয়া কংগ্রেস ও প্রজা পার্টির মুসলমান লইয়া নূতন গভর্নমেন্ট করা যায় কি না। সারা ১৯৩৮ সন ধরিয়া ইহার আলোচনা চলিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এই প্রচেষ্টার এত বিরোধী ছিলেন যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ইহাতে সাহায্য করিলেন না।

সুভাষবাবু এই ব্যাপারে গান্ধীজীর প্রতিকূলতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিয়া তাঁহাকে একখানা চিঠি লেখেন। উহার উত্তর ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে মহাত্মাজী দেন। এই চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"My dear Subhas, I can't understand why you were shocked over my letter. I have nothing to alter in what I said to you and Sarat. I still hold the opinion that if we can form a coalition ministry with honour and dignity we should unhesitatingly do so. But from what I heard from Maulana Saheb (Abul Kalam Azad) and Nalini Babu (Nalini Ranjan Sarkar) and Ghanashyamdas (Birla), I felt as I do even now that my first instinct, which I discussed at Calcutta often enough with you, is right...

"Your complaint that I attach more value to the views of the three friends is not justified, for it is not their views which affect me; it is the evidence they gave."

মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই চিঠিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মতামত উপদেশ মাত্র, কিন্তু তাঁহার উপদেশের আসল জোর কি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমি যখন ১৯৩৮ সনে এই চিঠিখানা ও অন্যান্য চিঠি পড়ি তখন মনে হইয়াছিল, মন যদি বিরূপ থাকে তাহা হইলে যে-কোনও মতের সপক্ষে যুক্তি বাহির করা সহজ।

মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সম্বন্ধে আমি বলিব—উহার কারণ দুইটি, প্রথম—বাঙালি ভদ্রশ্রেণী ও তাহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপত্তি ও সন্দেহ; দ্বিতীয়—বাংলাদেশে অবাঙালির, বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারীর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করা সম্বন্ধে অনিচ্ছা। দ্বিতীয় কারণটি আমার অনুমান, তবে অযৌক্তিক অনুমান বলিয়া স্বীকার করিব না। প্রথম কারণটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, এ-বিষয়ে কোনও সময়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাঙালির রাজনৈতিক পথ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর এই বিরূপভাব হইল কেন? উহার কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে ও উত্তরাপথ সম্বন্ধে বাঙালির বিরূপভাব। উহা নিউটনের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থার্ড ল অফ্ মোশনে'র অনুযায়ী। বাঙালির বিরূপভাবের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের কোয়ালিশন গভর্নমেন্টকে বরখাস্ত করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গভর্নমেন্ট স্থাপন করিবার জন্য বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে অনুরোধ করেন। বড়লাট তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির মারফৎ জানান যে, উহা সম্ভব নয়। ইহার পরেও অবশ্য ১৯৪১ সনের শেষে ও ১৯৪২ সনের গোড়ার দিকে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ভাঙিয়া গেল। কিন্তু উহার কোনও স্থায়ী ফল হয় নাই। লীগ আবার প্রাধান্য পাইল। ১৯৩৭ সনের ভুলের কোনও প্রতিকার হইল না।

॥ ৭ ॥

এইবার ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর যে ক্ষতি হইল তাহার কথা বলি। যুদ্ধ শেষ হইবার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে অবস্থা দেখা দিল তাহাতে বাংলাদেশে শরৎচন্দ্র বসু নেতা হইতে চাহিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা কাহারও হইত না। তিনি যাহা চাহিতেন তাহাই পাইতেন। কারণ তখন সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে ও আই-এন-এ সম্বন্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী এরূপ উত্তেজনার স্রোত বহিতেছিল যে, সুভাষবিরোধী গান্ধীজী এবং জবাহরলাল পর্যন্ত আই-এন-এর পক্ষে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। এমন কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ও ইংরেজ সেনাপতিরাও আই-এন-এর সেনানীদের বিচার বন্ধ করিলেন। কিন্তু তখন শরৎবাবু একটা ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি বাংলাদেশে না থাকিয়া নূতন ইন্টেরিম গভর্নমেন্টে বড়লাটের সদস্যসভার মেম্বর হিসাবে দিল্লি চলিয়া গেলেন। তাহার তারিখ, আগস্ট ১৯৪৬ সন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তখন হইতে তিনি কংগ্রেসের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে পারিবেন। আমি যতদূর জানি, তিনি ভাবিয়াছিলেন, অন্ততপক্ষে বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহার সহিত বন্ধুর মতো আচরণ করিবেন। যুদ্ধের পর শরৎবাবু যখন মুক্তি পাইলেন; তখন বল্লভভাই-এর সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ তাঁহার একটা ছবিও আমি খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম। তাহাতে আমার খুবই হাসি পাইয়াছিল। কারণ আমি দুইপক্ষের পূর্বকালীন মনোমালিন্যের কথা ভাল করিয়াই জানিতাম। ১৯৩৯ সনে সুভাষবাবুর কংগ্রেস ত্যাগের পর এই মনোমালিন্য প্রায় বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। শরৎবাবু কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জানাইয়া একখানা চিঠি লেখেন। তাহার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী ২৩ মার্চ (১৯৩৯) তারিখে জানান যে, শরৎবাবুর চিঠিখানা তিনি অন্য কংগ্রেস নেতাদের দেখাইবেন, ও তাঁহাদের উত্তর পরে জানাইবেন। তার পর তিনি নিজে এই কথা লেখেন—

"With so much that you have to say against your erstwhile colleagues and they against you both, how can I act, what can I do?"

ইহার পর নেতাদের উত্তর গান্ধীজী শরৎবাবুর কাছে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে চিঠিতে (২৭ মার্চ, ১৯৩৯ সন) তিনি লেখেন—

"If you accept their repudiation, you will perhaps admit that you have been hasty in judging your colleagues. This distrust must go, if it is at all possible. Political differences may remain, will remain. But why bitterness."

এই প্রসঙ্গে শুধু বল্লভভাই প্যাটেলের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। ২৬ মার্চ, ১৯৩৯-এ তিনি মহাত্মাজীকে লেখেন—

"I have read Sarat Babu's letter with surprise and sorrow. It pains me to



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

find that he could use such language and attribute such personal motive and charges against his colleagues with whom he happended to differ in politics and thereby bring down the entire Congress politics to the lowest possible level where differences of principle or policy have no place whatever."

ইহার পর বহু বৎসর শরৎবাবুর সহিত কংগ্রেস নেতাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৯৪৬ সনে সেই পুরাতন কাহিনী ভুলিয়া কংগ্রেস নেতারা প্রকৃত হৃদ্যতা দেখাইবেন এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ শরৎবাবুর ছিল না। কিন্তু তিনি এই ভুল করিলেন। ফল এই হইল যে, তিন মাসের মধ্যে শরৎবাবু ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ইহাও ভদ্রভাবে করা হইল না। কারণ তখন আর শরৎবাবুকে প্রসন্ন রাখার কোনও কারণ কংগ্রেস নেতাদের ছিল না।

ইহার পর বাংলাদেশে ফিরিয়া গেলেও শরৎবাবুর পক্ষে বাংলার রাজনৈতিক ব্যাপারে কংগ্রেসের সাহায্য পাইবার উপায় রহিল না। উপরন্তু কয়েক মাসের মধ্যে যে ব্যাপার দেখা দিল তাহাতে রাজনৈতিক মত ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শরৎবাবু ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা দিল।

কংগ্রেস নেতারা তাঁহাদের সুবিধা হইবে বলিয়া ভারতবর্ষ ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ইহাতে একমাত্র পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের ক্ষতি হইবার কথা, সুতরাং কংগ্রেস নেতারা এ-বিষয়ে বিশেষ কোনও দুঃখ বোধ করেন নাই।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসে (তারিখটা স্মৃতি হইতে দিতেছি) শরৎবাবুর সহিত দেখা হইলে আমি বলিলাম, 'আপনি বাংলাদেশকে এই সর্বনাশ হইতে রক্ষা করুন।' তিনি বলিলেন, চেষ্টা অবশ্যই করিবেন। ইহাও বলিলেন, আগের দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত গান্ধীজীর কাথাবার্তা হইয়াছিল। উহাতে মহাত্মাজী খুবই সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু উহার দুই একদিন পরেই খবরের কাগজে মহাত্মাজীর একটি উক্তি পড়িয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, শরৎবাবুর বাংলা-বিভাগের বিরোধিতা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত নহে। এ-বিষয়ে শরৎবাবুর বিরুদ্ধে যে-মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদ বাংলাদেশেও প্রচারিত হইতেছিল, তাহার কথা এই প্রবন্ধে বলিতে চাই না। মহাত্মাজী মনে হয় ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

ফল শোচনীয় হইল। বাঙালি হিন্দুও সাময়িক ক্ষোভ ও উত্তেজনার বশে বাংলাদেশকে ভাগ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং বাংলার রাজনৈতিক কার্যকলাপে আর শরৎবাবুর স্থান রহিল না। কিন্তু আমি তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিব, বাঙালিকে বাঁচাইতে না পারিলেও তিনি বিদ্বেষ বা স্বার্থের বশে নিজের সম্মান ও রাজনৈতিক ধর্মবোধ বিসর্জন দেন নাই। বাংলা বিভাগের কাপুরুষতা, অন্ধ বিদ্বেষ ও অবিমৃষ্যকারিতার কথা স্মরণ করিলে ত্রিশ বৎসর পরেও আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

কিন্তু ফল যে বিষময় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকদিন প্রফুল্ল ঘোষ সাময়িক কর্তৃত্ব পাইলেও পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার নিয়ন্তা হইলেন। তিনি সে যুগের সাধারণ বাঙালি পলিটেশিয়ানের মাঝে বেশি বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম অবশ্যই ছিলেন। তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের অধীন থাকিয়া বাংলাদেশে নিজের আধিপত্য বজায় রাখা। বিধানবাবুর অপরিসীম দম্ভই এ-যুগের বাঙালির অপদার্থতার প্রমাণ। বাঙ্গালি জনসাধারণও আপাতত ইহাই মানিয়া লইল। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে ভারত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভর্নমেন্ট ও হিন্দুস্থানী সম্বন্ধে যে দাসসুলভ মনোবৃত্তি দেখা দিল তাহা অতি ঘৃণ্য, কারণ উহা নিছক স্বার্থপ্রণোদিত। এই ব্যাপার দেখিয়া অধীর হইয়া ১৯৫১ সনের ৩০ এপ্রিল তারিখে আমার শিক্ষক ও সাহিত্যগুরু মোহিতলাল মজুমদারকে আমি লিখি—

"আপনি জানেন, আমি কুড়ি বছর আগে বাঙালির প্রাদেশিকতার কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলাম, এবং বরাবরই আমি উত্তরাপথের সঙ্গে বাঙালির ও বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষপাতী। কিন্তু আমারও বর্তমান দাস-মনোবৃত্তি দেখিয়া ঘৃণা জন্মিয়াছে—যে দাস-মনোবৃত্তির প্রকাশ শুধু 'হাম যায়েগা, তোম আয়েগা' প্রভৃতি মুখোচিত হিন্দী কপচানিতেই আবদ্ধ নয়, বাঙালি মেয়ের মুসলমানী পোষাক পরাতেও কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বাঙালির আত্মম্ভরিতায় কোনও দিনই আত্মপ্রত্যয় ছিল না, উহা খোঁটার জোরে মেড়ার লড়ার মতো : ইংরেজের দাসত্বের অহঙ্কারে খোট্টা, মেড়ো, ছাতুখোর ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহৃত হইত, সেই জোর আজ গিয়াছে, তাই হিন্দী প্রচারের ঘটা। তবে ইহা সত্য যে, এই দাস-মনোবৃত্তি এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙালির মধ্যেই আবদ্ধ ; সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, এই দাস-মনোবৃত্তি সম্পন্ন বাঙালিই জিতিয়া যাইবে, অন্য সকলের যে ফ্রাস্‌ট্রেশন, ব্যর্থতার অনুভূতি আগে ছিল, তাহাই থাকিবে। 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'।"

কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে বাঙালি মন্ত্রীদের জবাহরলালকে কি পরিমাণ চাটুবাদ করিয়া চাকুরি রাখিতে হইত তাহা আমি জানি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাত্র তাহা পারেন নাই কিন্তু মন্ত্রিত্বও রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে শেষ পর্যন্ত মনকে চোখ ঠারা যায় না, বিশেষত স্বার্থ যখন বাঙালি জনসাধারণের নয়, শুধু একটা বিশেষ সামাজিক স্তরে আবদ্ধ। তাই ১৯৪৭ সন হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে যে-বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই ফলে ১৯৬৭ সনে কংগ্রেসের আংশিক পরাজয় হয়। কিন্তু এই পথও ভুল পথ। উত্তরাপথে যে দল প্রধান, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া বাঙালির মঙ্গল হইবে না, দাসত্ব করিয়াও হইবে না। যে-দলই উত্তরাপথে প্রধান হউক তাহার সহিত বাঙালিকে নিজের সম্মান, স্বার্থ ও আদর্শ বজায় রাখিয়া সহযোগিতা করিতে হইবে। ইহাতে উত্তরাপথেও বাঙালি নিজের উপযুক্ত ও বাঞ্ছিত স্থান পাইবে। মার্কসিস্ট হইয়া নহে। উহা নিষ্ফল ও দুর্বল প্রতিবাদ মাত্র।

ইহাও স্মরণ রাখা দরকার, 'জনতার' পিছনে আসল জোর জনসংঘ। জনসংঘ আর যাহাই হউক মেকী নয়, খাঁটি। উহা উত্তরাপথের ইতিহাস ও হৃদয় হইতে স্বাভাবিকভাবে জন্মিয়াছে। ইহাকে যদি আরও সর্বভারতীয় করিতে হয়, ঐতিহাসিক বিচারের দিক হইতে আরও উচ্চস্তরে তুলিতে হয়, তাহা হইলে বাঙালিকেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সেই পথই ঠিক পথ, ঝোঁকের মাথায় উত্তরাপথের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া নয়। কিন্তু এই পথ ধরিতে হইলে বর্তমান বাঙালি জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ভদ্র বাঙালির, একটা মানসিক পরিবর্তনের আবশ্যক। সেই পরিবর্তন হইবে কি ? বাংলাদেশের দুরবস্থার মূলে হিন্দুস্থান বিদ্বেষ ছাড়া একটা শোচনীয় গৃহবিবাদও রহিয়াছে। ইহার শেষ না হইলে বাঙালির গৃহদাহ অনিবার্য। সেই সমস্যার কথা আর এক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুন ("সেই একই ভুল"), ৩০ জুন ("বাঙালি ভদ্রলোকের উগ্র জাতীয়তা বনাম উত্তর ভারত") ও ১ জুলাই ১৯৭৭ ("বিরোধে মঙ্গল নাই, দাসত্বেও নাই")।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ধর্মত্যাগী বাঙালি

## নূতন পয়সা-পূজা

আমি বিগত ইলেকশনে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট-ধর্মী রাজনৈতিক দলের জিত সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, উহার কারণ দুটি—এক, উত্তরাপথের সহিত বিরোধ, দুই, বাঙালি ভদ্রসমাজ একদিকে ধনী ও অন্যদিকে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র, এই দুই-এর মধ্যে বিদ্বেষ। এই গৃহবিরোধ অতিশয় নীচ রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনও পৌরুষ বা বীরত্ব নাই। ইহা অত্যন্ত তামসিক। ইহার ফল শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে না, থাকেও নাই—বাঙালির সমস্ত সামাজিক ও মানসিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেজন্য উহার আলোচনা আরও গভীরভাবে করা প্রয়োজন। পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো এই প্রবন্ধে তাহাই করিতে চাই। এই অধোগতির মূলে রহিয়াছে একটা হীন অর্থগৃধ্নুতা।

॥ ১ ॥

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজ যদি অর্থবান হইতে চায়, সে সম্বন্ধে আমার আপত্তি নাই। উহাও জাতীয় উন্নতির একটা দিক, জীবনীশক্তির একটা প্রকাশ। হিন্দুর ধর্মেও অর্থ চতুর্বর্গের এক বর্গ। জীবনে ও সমাজে রাজসিকতার শুধু যে স্থান আছে তাহাই নয়, উহা কাম্যও বটে।

কিন্তু অর্থকামনার বিভিন্ন ধরন আছে, উহা ক্ষুদ্রপ্রাণ, নীচ, অসৎ, সুতরাং ঘৃণ্য হইতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ-বিষয়ে যে তারতম্য হয়, তাহা আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমার বিষয় সমাজের কোনও বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে অর্থপরায়ণতার প্রকাশ। উহাতেও বিভিন্ন ধরন দেখা দিতে পারে। যেমন বাঙালি জাতির মধ্যে বহু যুগ ধরিয়া নবশাখ সম্প্রদায়, সুবর্ণ-বণিক ও সাহারা ব্যবসা চালাইয়া অর্থোপার্জনকেই তাহাদের সামাজিক কৃত্য বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে। সমগ্র শ্রেণীর প্রচেষ্টা হিসাবে ধরিলে ইহাদের অর্থপরায়ণতা কখনও অশ্রদ্ধেয় হয় নাই, কারণ উহা এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ধর্মসঙ্গত ছিল। সকলেই জানেন, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ। তাহা ছাড়া ইহাদের অর্থোপার্জনেরও, জমিদারীর মতো একটা বনিয়াদি রূপ ছিল।

কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজের নতুন অর্থপরায়ণতা ধর্মবিরুদ্ধ। অর্থগৃধ্নুতা ইহাদের মধ্যে ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া এই শ্রেণীর বাঙালিরা হয় অল্প অর্থে ভদ্রতা বজায় রাখিয়াছে—এখানে সামাজিক ও মানসিক, দুই ভদ্রতার কথাই বলিতেছি—কিংবা নিজেরা অশোভন চেষ্টা না করিয়া বিত্তবান হইয়া, অর্থ-সঞ্চয় না করিয়া অর্থব্যয়েই বেশি উৎসাহ দেখাইয়াছে। বর্তমানে এই ধারাই উল্টাইয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াছে, অর্থাৎ বাঙালি ভদ্রলোক অর্থগৃধ্নু হইয়া অন্ন অর্থের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, এই নতুন অর্থলিপ্সার একটা ক্লীব দিকও আছে। বাঙালি বিত্তবানের মধ্যে যেমন একটা নীচ অহমিকা দেখা দিয়াছে, তেমনই বাঙালি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্রলোকের মধ্যেও অর্থবানের প্রতি একটা নিষ্ক্রিয় অথচ তীব্র মনুষ্যত্বখর্বকারী, কাপুরুষোচিত বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। ইহাও বাঙালির নূতন অর্থপরায়ণতারই উল্টাপিঠ। দুইটাই সমান হেয়।

ইহার ফলে বাঙালি সমাজে একটি নূতন দেবী দেখা দিয়াছে। এটি পয়সা-দেবী। ইহার পূজা হিন্দুর পুরাতন লক্ষ্মীপূজা নয়, যদিও সেই পুরাতন লক্ষ্মীপূজাও আজকাল বহু ঘরে যে রূপ ধরিয়াছে, তাহা নূতন পয়সা-দেবীরই পূজা। এই রূপান্তর আমার ভাল লাগে নাই। মনে পড়ে, আমার বিবাহের অল্প দিন পরে কলিকাতার ঘরে ঘরে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া লক্ষ্মীপূজার প্রসার হইতে দেখিয়া একদিন আমি আমার শাশুড়ি-ঠাকুরানীর কাছে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করি। তিনি তখনই বলিলেন, 'বাবা, তুমি এটাকে ক্ষুদ্র অর্থগৃধ্নুতা কেন বলছ? লক্ষ্মীপূজা তো পয়সার পূজা নয়। লক্ষ্মী জগতের শ্রী।' ইহা হিন্দুর প্রাচীন ধর্মের লক্ষ্মী তাহা আমি জানিতাম। রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্মী ও উর্বশীর একই সমুদ্র হইতে উদ্ভবের কথা লিখিয়া যে তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই লক্ষ্মীপূজার কথা বলি নাই। আমি যে লক্ষ্মীর নিন্দা করিয়াছিলাম, সেই দেবী বাঙালি বিত্তবানের নূতন লক্ষ্মী।

ইহার আবির্ভাবও আমি উত্তরাপথের সহিত বিরোধের মতো ১৯২০-২১ সন হইতে অনুভব করিতে আরম্ভ করি। বৎসরের পর বৎসর পয়সা-পূজার প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িতে দেখিয়া অবশেষে ১৯৩৭ সনে অর্থাৎ আজ হইতে ঠিক চল্লিশ বৎসর আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। উহা ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার নাম দিয়াছিলাম, 'আমাদের ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'। উহাতে আমাদের সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর মানসিক ধর্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্নটা তুলিয়াছিলাম তাহা এই—বাঙালি ভদ্রসমাজের উচ্চতম স্তর কি নিজের ধর্ম ছাড়িয়া ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রপ্রাণ অর্থপরায়ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে? অবশ্য প্রশ্নটা এইভাবে তোলার মধ্যে ইহার উত্তরেরও ইঙ্গিত ছিল—অর্থাৎ আমি বলিয়াছিলাম, অর্থপরায়ণ হইয়াছে।

॥ ২ ॥

প্রবন্ধটিতে এই নূতন অর্থপরায়ণতার প্রসার সম্বন্ধে আমি এই মন্তব্য করিয়াছিলাম—

'আমাদের পারিবারিক জীবন হইতে যদি আমরা এইটুকুই শিখিতাম যে অর্থ ভিন্ন জগতে আর কিছু কাম্য নাই, এই অর্থোপার্জনই মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা হইলেও অবস্থা এত মারাত্মক হইয়া উঠিত না, কারণ তখনও হয়ত অল্প সংখ্যক বিদ্রোহীর পক্ষে এই সমাজের সীমা পার হইয়া নিষ্কাম সৃষ্টির প্রয়াস করা একেবারে অসম্ভব হইত না। কিন্তু আমাদের অর্থপরায়ণতা নিজেকে শুধু বৈষয়িক পরিমণ্ডলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই—অপার্থিব সাধনাকেও আক্রমণ করিয়া সাহিত্য-সাধনা, জ্ঞান-সাধনা ও ধর্ম-সাধনাকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।'

কিন্তু তখনই আমি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, এই নূতন অর্থপরায়ণতা উচ্চস্তরের নয়। তাই উহার একটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়াছিলাম। উহার শেষটুকু শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধৃত করিতেছি। আমি লিখিয়াছিলাম—

'বাঙালির অর্থপরায়ণতা আমেরিকান অর্থপরায়ণতা নয়, এমন কি মাড়োয়ারীর অর্থপরায়ণতাও নয় ; উহার প্রাণ অনেক ক্ষুদ্র, পরিধি অনেক সংকীর্ণ। আজিকার দিনে বাঙালি ভদ্রসমাজের অর্থপরায়ণতাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার দুইটি রূপ চোখে পড়ে। ইহাদের একটি সরকারি চাকুরিজীবীর মধ্যেই বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সরকারি "টাইপ" বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য ; অপরটি নব্য বাঙালি ব্যবসায়ীর মধ্যে বেশি দেখা যায় সেজন্য ব্যবসায়ী 'টাইপ' বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।'

ইহার পর দুটি "টাইপে"র পরিচয় দিয়াছিলাম।

'এ দুই-এর মধ্যে সরকারি অর্থপরায়ণতার বিবেকবুদ্ধি আছে, কিন্তু উহা উদারতা পর্যন্ত পৌঁছে নাই। তাই সঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া যক্ষের মতো আগলাইয়া থাকিবার কল্পনাই এই শ্রেণীর অর্থসাধকের একমাত্র স্বপ্ন। কাহাকেও এই ধনের অংশ না দিয়া নিষ্প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া কিভাবে অর্থকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, এই ধ্যান করিতে করিতে ইহাদের মনে এমন একটা স্থানের ছবি জাগিয়া উঠে, যেখানে দস্যু-তস্করের ভয় নাই, লোকবাস আছে অথচ সামাজিক কর্তব্য নাই, অর্থব্যয় করিবার দায়িত্ব নাই। এমন বাঞ্ছিত দেশ নির্মম জগতের কোথাও আছে কিনা সেবিষয়ে সাধারণ বুদ্ধিতে সন্দেহ জাগিতে পারে। কিন্তু ভক্তের ভার ভগবান বহন করেন। ইস্রায়েলের দেবতা যেমন তাঁহার 'চোরনে পিপুল'কে দুগ্ধ ও মধু প্লাবিত দেশের আশ্বাস দিয়াছিলেন স্বর্ণময় দেবতাও তাঁহার সন্তানগণকে তেমনই নগরোপকণ্ঠের আশ্বাস দিয়াছেন। এই আশ্বাস দৈববাণীর মতো বাংলাদেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সরকারি 'টাইপে'র সকল অর্থসাধকের কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাই উহারা নব্য মোজেসের নেতৃত্ব ছাড়াও 'এ মিসড ল্যান্ডে' ছুটিয়া আসিতেছে।'

ইহার পর আমি ব্যবসায়ী 'টাইপে'র কথা বলি—

'ব্যবসায়ী 'টাইপে'র প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহার উদারতা আছে, কিন্তু বিবেকবুদ্ধি নাই। তাই এই শ্রেণীর অর্থসাধক একটি পয়সাকে এক বিন্দু রক্তের মতো জ্ঞান করেন না তেমনই আবার একটি পয়সার জন্য কাহারও গলায় ছুরি দিয়া এক বিন্দুর বেশি রক্তপাত করিতেও খুব বেশি সঙ্কোচবোধ করেন না। ইউক্লিড রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন, জ্যামিতি শিক্ষা করিবার কোনও প্রশস্ত পথ নাই। ইঁহারা বলেন, জ্যামিতির পথ যাহাই হউক, অর্থোপার্জনের সহজ ও প্রশস্ত পথ আছে...

'এই সম্প্রদায়ের এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহার উল্লেখ করা উচিত : ইঁহাদের আত্মপ্রত্যয় আছে, সাহস আছে, উদ্যম আছে, সর্বোপরি আছে পরস্পরের একান্তভাব। সরকারি 'টাইপে'র অর্থসাধকগণ সাধুপ্রকৃতির হইলেও অপরের সততা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দেহপরায়ণ। ব্যবসায়ী 'টাইপে'র সাধকের এই অবিশ্বাসপ্রবণতা নাই। তাঁহারা গোপনে পরস্পরকে চোর নামে অভিহিত করিলেও সম্মুখে কখনও ভদ্রতার ত্রুটি করেন না।'

এই নূতন অর্থপরায়ণ বাঙালি সমাজ আমি কি চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহারও পরিচয় দিব। আমি লিখিয়াছিলাম—

'ইহারা দুই দলে মিলিয়া বাঙালি ভদ্রসমাজের প্রায় সবটুকু ব্যাপিয়া আছেন। এই সমাজের যেখানেই গিয়াছি, তা সে সভা-সমিতিতেই হউক কিংবা মাঠে ময়দানেই হউক, আপিসে ও কর্মস্থলেই হউক আর রাস্তায় বাজারেই হউক সর্বত্র হয় ইঁহাদের একটি শ্রেণীর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গম্ভীর ও আত্মতৃপ্ত মুখ, নয় আর একটি শ্রেণীর সহাস্য ও আত্মতৃপ্ত মুখ দেখিয়াছি। দেখিতে দেখিতে আমাদের সমাজের পরিণতি সম্বন্ধে বহু কথা মনে হইয়াছে, আমাদের সংস্কৃতির কথাও ভাবিয়াছি।'

আমি চল্লিশ বৎসর আগে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, আর আজ ?

॥ ৩ ॥

আজ আমার কাছে বাংলার প্রাকৃতিক শ্রীর মতো আদর্শপরায়ণ বাঙালিও একমাত্র স্মৃতির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশের আদর্শের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহা কখনই বলিব না। কিন্তু যাহাদের মধ্যে এই দুইটি মহত্ত্ব এখনও আছে, তাহারা সকলেই নিপীড়িতপ্রাণ, নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন। যাহারা বাঙালির কলঙ্কস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ভরসা পর্যন্ত তাহাদের নাই। একমাত্র যাহারা ব্যর্থতার অনুভূতির দুর্বল বিদ্বেষের দাস হইয়াছে, তাহারা কম্যুনিস্ট দলের জন্য ভোট দিতেছে। যে জাতির প্রাণের পরিচয় একমাত্র এই ধরনের বিদ্বেষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাহাও নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো, তাহার আশা কি ?

তবু বাংলার দৃশ্যের মতো দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। আমি বাংলার জলরাশিকে কখনও ভুলি নাই—যদিও শেষ চাক্ষুষ দেখা ১৯২৭ সনের ১৪ নভেম্বর তারিখে হইয়াছিল। উহার সহিত সাদৃশ্য আমি দশ বৎসর আগে ইস্রায়েলে সি অফ গ্যালিলির পারে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়াছিলাম। আবার মাস কয়েক আগে কানাডার বিরাট ও অসীম আকাশের নীচে যেখানে সেন্ট লরেন্স নদ অন্টারিয়োর হ্রদে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে সেন্ট লরেন্সের কূলে দাঁড়াইয়া ভৈরববাজারের কাছে মেঘনার কথা স্মরণ করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমার বাল্যকালের আদর্শপরায়ণ বাঙালি আমি কোথাও আর দেখিতে পাই না। সেই কানাডার আকাশেরই নীচে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া আজিকার অর্থপূজক, স্বার্থপরায়ণ বাঙালিই দেখিলাম। এই দুঃখ রাখিবার জায়গা নাই। দুই একটি বাঙালি মেয়ের মুখ এই তামসিকতার সংস্পর্শে বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়াছি। কিন্তু মিস্ত্রি জাতীয় ধনী বাঙালি পুরুষের মুখে তাহাদের তুচ্ছ জীবনের অনুভূতির ক্ষীণ ছায়া পর্যন্ত দেখি নাই। অর্থলিপ্সা—অতি ক্ষুদ্র অর্থলিপ্সাও, মানুষের মুখকে একদিকে কিরূপ উগ্র করিতে পারে, আবার অন্যদিকে কত অসাড় করিতে পারে, তাহা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি।

বাঙালি গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটা গল্প বলি। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে আমি একদিন একজন প্রবীণ (প্রায় পিতৃস্থানীয়) বাঙালির কাছে বলিতেছিলাম যে, আমার নিজের জানা, পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় বাঙালির মধ্যে বিশ-ত্রিশজন ছিলেন যাঁহারা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা বাঙালির পূর্বকীর্তি—যে বাঙালি ভারতবর্ষের বর্তমান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার কীর্তি—শুধু যে অব্যাহত রাখিতে পারিতেন তাহাই নয়, পূর্ণতরও করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের সকলেই হয় সামান্য টাকা বা সাময়িক খ্যাতির মোহে নিজেদের প্রতিভা ও নিজেদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে একজনের নামও করিয়াছিলাম।

তখন প্রবীণ বাঙালি উত্তর দিয়াছিলেন, 'আপনি যাই বলুন, পয়সা করেছে।' আমি আবার বলিলাম, 'পয়সা ?' 'হ্যাঁ।' 'কত পয়সা ?' 'অনেক পয়সা।' আমি—'এক কোটি টাকা ?' 'আ রে, না না।' 'পঞ্চাশ লক্ষ ?' 'না না।' 'পঁচিশ লক্ষ ?' 'তাও নয়।' তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বেয়াদবির আশঙ্কায় নিরুত্তর রহিলাম, কিন্তু মনে মনে বলিলাম যে, চুরিচামারি করিয়া লাখখানেক টাকা জমাইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে একটা 'বারিকে'র মতো বাড়ি করিয়া তাহারও অর্ধেক ভাড়া দেওয়াকে আমি টাকা করা বলি না। আমাদের অর্থোপার্জনের দৌড় তো ঐ পর্যন্ত।

সে যুগের আদর্শপরায়ণ বাঙালি অন্যরকম ছিল। তখনকার দিনে বাঙালি পুলিশ কিংবা আবগারীর দারোগাও ঘুষের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিত। একজন বাঙালি পুলিশের দারোগা সম্বন্ধে ভাট ব্রাহ্মণরা এইরূপ গান গাহিত—

'দেখ, জঘন্য নগণ্য আমলা কতজন
পাঁচ টাকা বেতনে পাকা দালান করিতেছে
বাবুর দুইশত মুদ্রা বেতনে
যেমন প্রায় তেমন আছে।'

কারণ তিনি দান-ধ্যান ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু ঘুষ নিতেন না।

যাঁহারা বাঙালির কীর্তি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদের কথা বলিব না। অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় পুত্রবধূকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি হইতে পাওয়া যাইবে। আমি শুধু যাঁহারা মফস্বলের শহরে বা গ্রামে, এই মহাপুরুষদের শিষ্য মাত্র ছিলেন, যাঁহারা শিক্ষারও বড়াই করিতেন না, অর্থবান হইলে টাকারও বড়াই করিতেন না, সেই শ্রেণীর কথাই বলিতেছি। আমার পিতা সেই শ্রেণীর সাধারণ বাঙালি ছিলেন। তাঁহার মতো বাঙালি বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল। আমার পিতা সম্বন্ধে আমার শিক্ষক ও সাহিত্যগুরু মোহিতলাল মজুমদার নিজের মৃত্যুর অল্পকাল আগে লিখিয়াছিলেন—

'তোমার বাবাকে মনে পড়ে ; কেন জানি না, তাঁহার প্রতি আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা চিরদিন আছে, অথচ তাঁহাকে আমি কতটুকু দেখিয়াছি! সেকালের সেই সব বাঙালী—সেই চরিত্র, সেই বলিষ্ঠ প্রাণ ও সুন্দর হৃদয়—সে আর দেখিব না। যাঁহারা "Unknown" হইয়া এই সমাজে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই বাঙালী জীবনের আদর্শ কতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, আমি এমন কত ব্যক্তিকে জানিতাম।'

আমি এবং আমার সমবয়সীরা তাঁহাদেরই সন্তান, তাঁহাদের ধর্মেই দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইতে আশি বৎসর বয়স বয়স্ক পর্যন্ত কয়জন বাঙালিকে তাঁহাদের সন্তান বলিয়া চিনিতে পারিব? আমার সমবয়সী বন্ধু বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা হয় রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমুর কথায় বলি—

'আর আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চির-নবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা-উপার্জনের পশ্চাতে সংসার-মরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ-সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা করিয়াছিলাম—তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল, তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই ; অবশেষে আজ আমি তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# সৃষ্টিশক্তির ক্ষয়

বাঙালির অর্থপরায়ণতা বর্তমানে কি রূপ ধরিয়াছে ও উহার জন্য সমগ্র বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিবার আগে এই ধরনের ক্ষুদ্র ও নীচ অর্থপরায়ণতা কেন দেখা দিল তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তবে কারণ আবিষ্কারের জন্য বেশি গবেষণার আবশ্যক নাই। সমসাময়িক জগতের ইতিহাসেই উহার সূত্র মিলিবে।

॥ ১ ॥

সকলেই জানেন, ব্যক্তিগত জীবনে যখন বড় কাজ করিবার শক্তি ও আগ্রহ কমিতে থাকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হইয়া আসে, জীবনীশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন লোকে কৃপণ হইয়া পয়সা গুনিতে থাকে। জাতীয় জীবনেও এই ব্যাপারটা দেখা যায়। এমন কি কোনও জাতির জীবনীশক্তি ক্ষয়িত না হইয়াও যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অকাজে প্রতিহত হয়, তাহা হইলেও এক ধরনের অর্থপরায়ণতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয় ধরনের জাতীয় অর্থপরায়ণতার পরিচয় আমরা আজকাল জার্মেনী ও জাপানে পাইতেছি। জার্মেনী ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া অভ্যন্তরীণ অবস্থার অসাধারণ উন্নতি করিয়া ইউরোপে বা জগতে জার্মান প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য দুইবার যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু দুইবারই হারিয়াছে। সেজন্য জার্মান জাতি আজ জাতিগত উদ্যমে কেবলমাত্র জাতি হিসাবে ধনী হইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। জাপানও একবার যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া তাহাই করিতেছে। কিন্তু এই দুইটি জাতির আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়াইবার চেষ্টা তাহাদেরই সামরিক দিগ্বিজয়ের ইচ্ছার অনুবর্তন মাত্র। সামরিক ক্ষেত্রে বীরের মতো হাসিয়া বীরের মতো অর্থোপার্জনের উদ্যম করিতেছে।

ইংজের জাতিও আজ একমাত্র অর্থের সন্ধানেই ব্যাপৃত। তাহাদের জাতীয় জীবনে টাকা, টাকা, হায় টাকা! ছাড়া কোনও কথা আর শোনা যায় না। কিন্তু উহা জার্মেনী বা জাপানের অর্থোদ্যম নয়, ইহা জাতীয় জীবনে অবসাদের ফল, ঋণগ্রস্ত জমিদারের শেষ অবস্থায় আরও ঋণগ্রস্ত হইবার মতো। ইহার মধ্যে কোনও গৌরব নাই। ইংরেজের সাম্রাজ্য গিয়াছে, সংস্কৃতি সৃষ্টি শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শেষ জীবনে একটু সচ্ছলভাবে থাকিবার জন্য পয়সার সন্ধান করিতেছে। এ বিষয়ে আমার মতামত আমি ছাপার অক্ষরে ইংলন্ডেই প্রকাশ করিয়াছি।

আমি ১৯৭০ সনে যখন চতুর্থবার এই দেশে আসি, তাহার অল্পদিন পরেই এখানকার সুপরিচিত সংবাদপত্র 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' আমাকে ইংরেজ জাতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতে বলে। প্রবন্ধটি ১৯৭০ সনের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক নিম্নলিখিত শিরোনামায় উহার পরিচয় দেন—

'Nirad C. Chaudhuri sees us engaged in a ferocious pursuit of private interest, with nobody regarding public welfare.'

আমিও বলি—

'The only thing which could restrain this ferocious pursuit of private interest was a sense of national interest based on the consciousness of a national mission; the British people have got immured in private life.'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজের আর জাতীয় কৃত্যের কোনও অনুভূতি নাই, তাই ব্রিটেনের বর্তমান অর্থপরায়ণতাকে জার্মেনী বা জাপানের অর্থপরায়ণতার সহিত তুলনা করা যায় না। উহা জাতীয় অবসাদের ফল।

আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। অবশ্য বাঙালির অর্থপরায়ণতা আরও ক্ষুদ্র-পরিসর, আরও দুর্বল, আরও নিম্নস্তরের। ইহার পিছনেও রহিয়াছে national mission-এর অভাব। আমাদের আর কোনও জাতীয় কৃত্য নাই। আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বর্তমান ভারতের নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনকেও উন্নীত করিয়াছিলাম। বাঙালির এই জাতীয় প্রচেষ্টা সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি এই সকল ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছিল। ১৯০৫-১৯১১ সনের স্বদেশী আন্দোলন জাতি হিসাবে বাঙালির শেষ উদ্যম, ভারতবর্ষকে শেষ দান।

ইহার পরই বাঙালির জাতীয় জীবনে অবসাদ দেখা দিল—তবে উহার পূর্ণ প্রকাশ প্রতিভাত হইতে আরও প্রায় দশ বৎসর সময় লাগিল। এই কয় বৎসরে বাঙালির জীবনীশক্তির শেষ দ্যুতির মতো একটু চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। বাঙালি উদারনৈতিকদের দিক হইতে উহার প্রকাশ হয় 'সবুজপত্রে' ও বাঙালি রক্ষণশীলদের দিক হইতে 'নারায়ণে'। তাহার পরই আলো নিভিয়া যায়।

ইহার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৭ সনের প্রথম দিকে বাঙালিকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই কথাগুলি বলেন—

'ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্য ভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষার ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপনার গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা আজকে অক্ষমের চিত্ত-বিনোদন, তাহাতে আমাদের কাজ নাই।'

ইহা তো যেন আজিকার বাঙালির মানসিক অবস্থারই বর্ণনা। যখন কোনও জাতি বড় কাজ ছাড়িয়া তুচ্ছতায় মগ্ন হয় তখন উহার জীবনে এক ক্ষুদ্র অর্থপূজা ছাড়া সান্ত্বনার অবলম্বন আর কি থাকিতে পারে ? কিন্তু এই অবস্থাই হইল কেন ? উহার কারণ নির্ণয় করা দরকার।

॥ ২ ॥

বাঙালির দ্বারা ভারতবর্ষের নূতন সংস্কৃতি গড়িবার চেষ্টা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু উহার স্পষ্ট প্রকাশ ১৮৫০-এর পূর্বে দেখা যায় নাই। তারপর যদি ১৯২০ সনের মধ্যেই উহা ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙালির সৃষ্টিশক্তির মেয়াদ মাত্র সত্তর বৎসর। কোনও জাতি এই অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃতির ব্যাপারে জরাগ্রস্ত হয় না, বাঙালি হইল কেন ?

আমি একটু আগে বলিয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনই বাঙালির শেষ উদ্যম। ইহার পরেই যদি অবসাদ দেখা দিয়া থাকে, তবে কি বাঙালি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজের শক্তির অতিরিক্ত চেষ্টা করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মাস্টার মহাশয় মোহিতলাল মজুমদার তাহাই বিশ্বাস করিতেন। আমার আগের প্রবন্ধে তাঁহার কাছে লেখা আমার একটি চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। উহার উত্তরে ১৯৫১ সনের ৪ মে তারিখে তিনি আমাকে অন্য বহু কথার মধ্যে ইহাও লেখেন—

'বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র যুগের সন্তান আমি। আমার যুগে আমি বাঙালী চরিত্র, বাঙালী প্রতিভা ও বাঙালী দেহ—এই তিনেরই মহত্ত্ব চোখে দেখিয়াছি। ১৯০০-১৯১০ এই দশ বৎসর বাঙালী বাংলাকে ভুলিয়া ভারতের যজ্ঞবেদীতে নিজের দেহপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। এই উন্মাদ আত্মহত্যার পরে তাহার আর গতি হয় নাই—প্রেত হইয়া আজ পর্যন্ত প্রেত জীবনযাপন করিয়াছে—অতঃপর হিন্দুস্থানীরা গয়ায় পিণ্ড দিয়া এই প্রেতলীলা সমাপ্ত করিয়া দিবে।'

ইহা সত্য যে, জাতীয় স্বাধীনতা পাইবার উন্মাদনায় বাঙালি তাহার অন্য সৃষ্টি প্রায় বন্ধ করিয়া আনিল। বাঙালি জাতির মানসিক শক্তির এত প্রাচুর্য ছিল না যে তাহারা পাঁচটা কাজ সমানভাবে চালাইতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বাঙালি অন্য জাতীয় কৃত্য অবহেলা করিল, অথচ ঠিক এই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেই তাহার প্রচারিত ধারা চলিল না। ইহাতে বাঙালি দুই কূলই হারাইয়া নিঃস্ব হইল।

কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতিগত কার্যকলাপের মধ্যে আগে হইতেই দুর্বলতা না থাকিলে শুধু রাজনৈতিক প্রচেষ্টার চাপে বাঙালি বন্ধ্যাত্বে আসিয়া পৌঁছিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির কীর্তি যতই বড় হউক না কেন, তাহার মধ্যে কোথাও অভাব নিশ্চয়ই ছিল, বাঙালির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার মতো কোথাও একটা অভাব ছিল, তাহা না হইলে এত শীঘ্র বাঙালির সৃষ্টিশক্তি লোপ পাইত না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, এই ভার আমাদের অতীতের। 'সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহন বাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাত সূর্যকে ম্লান করিল, নব নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন ধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল।'

কিন্তু ইহাই বা ঘটিল কেন? যে কোনও জাতির সম্মুখের দিকে যাত্রার পিছনে পশ্চাতের একটা টান সর্বদাই থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে টানাটানি সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়। স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা দুই-ই স্বাভাবিক, এ-দুয়ের মধ্যে যখন গতির আধিক্য হয়, তখন সৃষ্টি দেখা দেয়, আবার কিছুদিন গতিরোধ না হইলে সৃষ্টি স্থায়ী হয় না। বাঙালির বেলাতে এ দুই-এর মধ্যে আবর্তন না হইয়া স্থিতিশীলতার জয় হইল কেন? একমাত্র কারণ গতিশীলতার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি ছিল না, সৃষ্টির পিছনে যথেষ্ট প্রাণ ছিল না।

বাঙালির সংস্কৃতি কেন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে দুর্বল ও প্রাণহীন হইয়া আসিল তাহার হেতুবিচার ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে (১০ মাঘ, ১৩৪৩ সন) আমি পাটনাতে একটা বক্তৃতায় করি। উহা পরে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার এক জায়গায় আমি বলিয়াছিলাম—

'বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির (অর্থাৎ বাঙালির সৃষ্ট সিনিস্টার) এই সকল দৌর্বল্য, অপূর্ণতা, সঙ্কট ও সমস্যার কথা বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়াছি, যে উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমারা একটা নূতন ও জীবন্ত সভ্যতা সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহা আজ যে অবসাদগ্রস্ত সে ক্লেশও মনে মনে অনুভব করিতেছি। কিন্তু


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পরে একদিন মনে হইল ইহার কারণ আর কিছুই নহে আমাদের গোড়াকার হিসেবেরই একটা মস্ত ভুল।'

॥৩॥

এই ভুলটাই বড় ভুল, ইহার জন্যই আমাদের সমস্ত সংস্কৃতিগত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। অবশ্য যেটুকু আমরা করিয়াছিলাম তাহা খুবই উচ্চস্তরের হইয়াছিল। কিন্তু উহার ধারা চলে নাই। যাহা আমরা পাইয়াছিলাম উহা পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পত্তির মতো হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই ভুল ছাড়া আমাদের সংস্কৃতিগত জীবনে কতকগুলি দুর্বলতাও ছিল, উহাও ব্যর্থতার কারণ। আমি ১৯৩৭ সনে তিনটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

প্রথম দুর্বলতা এই যে, ১৯১০-২০ হইতে ক্রমশ আমাদের সমস্ত সৃষ্টি বিচারহীন অনুকরণে পর্যবসিত হইল। আমি লিখিলাম, 'আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে উহাকে বাংলা ভাষাভাষীর জন্য বর্তমান যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাষান্তরকরণ ভিন্ন কি বলিতে পারি?' তারপর আরও বলি, 'এই কৃত্রিমতা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।'

দ্বিতীয় দুর্বলতা, যাহাদের জন্য 'কালচার' সৃষ্ট হইতেছিল, তাহাদের সংখ্যা হ্রাস। আমি লিখিয়াছিলাম, 'বিগত যুগে বাঙালি ভদ্রলোক সাহিত্য, ধর্ম, জ্ঞানান্বেষণ, ও রাজনীতিতে আগ্রহ না দেখাইলে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু কালক্রমে সেই সামাজিক চাপ কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের ভদ্রসমাজ যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অর্থহীন হইলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা পদে পদে, কিন্তু 'কালচার'হীন হইলে কোনই আশঙ্কা নাই।'

তৃতীয় দুর্বলতা, আন্তরিকতার অভাব। আমি লিখি, 'কালচারের সার্থকতা কালচারের নিজের তৃপ্তিতে, আত্মার আনন্দে। যখনই এই উদ্দেশ্য ভিন্ন কালচারের সাহায্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিবে তখনই বুঝিতে হইবে আমাদের তপস্যার মধ্যে প্রবঞ্চনা আসিয়া দেখা দিয়াছে।' বাঙালির মধ্যে একটা চালাকির ঝোঁক আছে, তাহার জন্য সে অনেক ব্যাপারে মেকি হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতার কথা আমাদের নবযুগ-প্রবর্তকগণ জানিতেন। তাই বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না।' কিন্তু আজ চালাকিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সব দুর্বলতা কম অনিষ্টকর নয়। কিন্তু আমি যে গোড়াকার ভুলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আরও অনেক বেশি গুরুতর। আসল কথা এই যে, সমগ্র সমাজ যে অবস্থায় পৌঁছিলে, তাহার আর্থিক ও লৌকিক ভিত্তি যতটা বিস্তৃত ও সবল হইলে কালচার সৃষ্টি সম্ভব, আমাদের সেই অবস্থা একেবারেই হয় নাই।

এ বিষয়ে একটা বড় ভুল আমরা করিয়া থাকি। আমরা মনে করি, ইংরেজশাসনের পূর্বে আমরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অনুবর্তী ছিলাম। এই ধারণার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা বহু শতাব্দী আগেই ইতিহাসের ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। উহার বৈদগ্ধ্য, সৌন্দর্য ও বল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে ছিল না। এই জীবনে একদিকে ছিল পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রাণহীন গোঁড়ামি, অন্যদিকে ছিল সাধারণ ভদ্রলোকের সহজ সরল গ্রাম্যতা।

এই গ্রাম্যতা হইতে অবশ্য একটা নূতন পূর্ণবিকশিত জীবন উঠিতে পারিত, যেমন নাকি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরল শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আগে প্রয়োজন ছিল সমস্ত সমাজকে শিক্ষায় ও আর্থিক অবস্থায় আরও উন্নীত করা। বুনিয়াদ পাকা না হইলে বাড়ি টেঁকে না। উহা সকলেই জানে। আমরা নূতন বাঙালি সংস্কৃতির বুনিয়াদের কথা না ভাবিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। উহা মুষ্টিমেয় লোকের উপভোগ্য ছিল, আরও মুষ্টিমেয় লোকের সৃষ্ট ছিল। এই কথাটাই মূল কথা। সেজন্য আমি ১৯৩৭ সনে বলি—

'আসল কথা এই, আমাদের সমগ্র সমাজ জীবনযাত্রার যে স্তরে উঠিলে উহাতে সংস্কৃতি সৃষ্টি সম্ভব সেই স্তরে আমরা এখনও পৌঁছি নাই তাই আমাদের একশত বৎসরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

'আমাদের নবযুগ-প্রবর্তকগণ ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া একেবারে প্রথমেই সেই পুষ্পচয়নের কামনা করিয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে উহার জন্ম সম্ভব হইবে, যে বৃক্ষে উহা ফুটিবে তাহার কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। আজ আমাদিগকে সেই ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে, আকাশে কুসুম ফুটাইবার বৃথা স্বপ্ন না দেখিয়া হলকর্ষণে নিযুক্ত হইতে হইবে।'

আজও আমরা তাহা করি নাই। আমাদের সমাজে শুধু আর এক রকমের অল্পসংখ্যক নূতন বড়লোক সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই নূতন বড়লোক শ্রেণী এই ধরনের বড়লোকের মতো অতিশয় ছোটলোকের মতো আচরণ করিতেছে। ইহার পরিচয় দেওয়া দরকার।

## ভদ্রসমাজে অর্থগত গৃহবিরোধ

বাঙালি ভদ্র সম্প্রদায়ের নূতন অর্থপরায়ণতা হইতে একটা সম্পূর্ণ নূতন গৃহবিরোধের উদ্ভব হইয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে উহার আবির্ভাব সুস্পষ্ট। ভদ্রসমাজের যে অংশ সম্পন্ন সেটি আর্থিক ও শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ছিল, এখনও (যতদূর মনে হয়) গোপন ভাবে রহিয়াছে। তেমনই যে অংশ ধনহীন তাহারা বরাবরই কম্যুনিস্টদের পক্ষে ছিল, গত ইলেকশনেও সেই দিকেই ভোট দিয়াছে। এই অর্থগত রাজনৈতিক আড়াআড়ির মধ্যে ভোটাভুটি ছাড়া তীব্র বিদ্বেষও আছে। উহা অতীতে মারামারি এবং খুনোখুনিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু ইহার চেয়েও আশঙ্কাজনক ও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, বিরোধটা সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিতেছে। ইহার ফলে বাংলার ভদ্রসমাজ আর সেই পুরাতন সমাজ থাকিবে না। হয়তো বা উহার অস্তিত্বও লোপ পাইবে। এই ব্যাপারটা আলোচনা করিয়া আমি ধর্মত্যাগী বাঙালির কাহিনী আপাতত শেষ করিব।

॥ ১ ॥

সামাজিক জীবনে এই বিরোধের চূড়ান্ত ফল কি হইতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করিবার আগে উহাতে যে নীচতা ও বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। যাঁহারা শুধু এই কয়টি দৃষ্টান্তই পড়িবেন তাঁহারা যেন মনে না করেন শুধু এগুলির উপরই আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক সমৃদ্ধি প্রসূত নীচতা ও আর্থিক অভাব প্রসূত বিদ্বেষ বাঙালির মধ্যে হালের ব্যাপার, আমাদের দেশ স্বাধীন হইবার পর বিস্তার পাইয়াছে। ইহার আগে বেশি বাঙালি ভদ্রলোক উচ্চপদে উচ্চবেতন পাইত না। বেশি টাকা জমিদার ও পুরাতন ব্যবসায়ী ছাড়া একমাত্র উকিল-ব্যারিস্টারের ছিল। তাহাদের আচরণ অন্য রকমের ছিল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থিক দম্ভ ও অভদ্রতা আজকাল মোটা মাহিনার বাঙালির মধ্যেই বেশি দেখা যায় সুতরাং স্বাধীনতার আগে ব্যাপকভাবে চোখে পড়িত না।

এই সব বড়লোকের ছোটলোকপনার জন্য ভদ্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার লোকের সামাজিক মেলামেশা কমিয়া আসিতেছে, এমন কি লোপ পাইয়াছে বলা চলে। এখন আর ধনী গৃহস্থ মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র আত্মীয়কে স্বীকার পর্যন্ত করিতে চায় না। বিবাহে নিমন্ত্রণের কথা বলি। আমি ১৯৩৮ সনে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার এক জ্ঞাতি দাদা আলিপুরে মোক্তারি করিতেন। শরৎবাবু যে-ভাবে তাঁহাকে 'চারুদাদা চারুদাদা' বলিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহাতে মনে হইয়াছিল যেন চারুবাবুই বরকর্তা। ইহাই পুরাতন বাঙালির পুরাতন ভদ্রতা ছিল।

এখন কলিকাতার নূতন বড়লোকের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে দিই। ধনী কন্যাকর্তা দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। কন্যাকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কে আসতে বলেছে? কর্তার ভাই, যতদূর স্মরণ হয়, বলিলেন যে, তিনি ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কারণ ভদ্রলোক ধনী পরিবারের খুবই নিকট আত্মীয়। তখন ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। আমার খুবই স্নেহভাজন নাতিস্থানীয় যুবক বিদেশে ভাল কাজ করে। সে কলিকাতায় আসিয়া বিদেশে সহকর্মী ছিল কিন্তু তখন কলিকাতায় বিলাতি কোম্পানিতে কাজ করে এরূপ বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যায়। সে সেখানে বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর যে-ব্যবহার দেখিল তাহাতে আশ্চর্য হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এরূপ হইল কেন বাড়ির কর্তা বা গৃহিণী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও বলেন নাই। আমি বলিতে পারিলাম না যে, এই ব্যক্তি বিলাতি কোম্পানির চাকুরে হইয়া বিলাতি কোম্পানির টাকায় কলিকাতার বড়লোক পাড়ায় বাড়ি পাইয়াছে, আর আমার নাতি তাহার বাবার মধ্যবিত্ত পাড়ার বাড়িতে উঠিয়াছে। এই দুই পাড়ার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত। দিল্লিতে আমার পরিচিত একজন বাঙালি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের চাকুরি পাইয়া নূতন দিল্লিতে বড় কর্মচারীরা যে-পাড়ায় থাকেন সে-পাড়ায় বাড়ি পান। তাঁহার স্ত্রী নিকটে আর একটি বাঙালি পরিবার থাকেন জানিয়া দেখা করিতে যান কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার পান। উঁহারা জয়েন্ট কি ডেপুটি সেক্রেটারি স্থানীয়। অথচ এরূপ শিক্ষিত, মার্জিত চিত্তাকর্ষককারিণী বাঙালি মহিলা আমি বেশি দেখি নাই।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা পাইবার অল্পদিন পরেই কলিকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারের শিক্ষিত যুবক অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আমার সহকর্মী হইয়া আসেন। তাঁদের পিতামাতা ও মাতামহের স্থান বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অল্প বেতনে কাজ পাইয়াছিলেন। অথচ কোনও সূত্রে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান কোটা হাউসে জায়গা পান। তিনি আমাকে বলিলেন প্রথম দুই এক দিন এক বাঙালি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত আসিয়া আলাপ করিলেন কিন্তু পরে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কারণ হিসাবে বলিলেন—সম্ভবত খোঁজ নিয়ে জেনেছেন আমার মাহিনা কি।

॥ ২ ॥

আপত্তি উঠিতে পারে, এইরূপ ইতরতা ব্যক্তিবিশেষের, সমগ্র ধনী শ্রেণীর নয়। আজ ইহাই আমি মানিব না। বর্তমানে অভদ্রতাই ব্যাপক, ভদ্রতাই ব্যক্তিবিশেষের। প্রতি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকে, বাঙালি নূতন ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ইহাতে এই সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত ধর্মের ইতরবিশেষ হয় নাই।

মোটের উপর বলা চলে, এই সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ সাধারণ অবস্থার আত্মীয়কে আমল দেন না এবং এড়াইয়া চলেন। ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি, কারণ দিল্লিতে বাস করিয়া এইরূপ ব্যবহার আমি পাঞ্জাবীদের মধ্যে দেখি নাই, অথচ আমরা পাঞ্জাবীদের অর্থপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করি। বাঙালি পদস্থ পুরুষের অন্য পদের পুরুষের প্রতি ব্যবহার অনেক সময়ে হাস্যকর রূপে দেখা দেয়। যেমন, একজন মধ্যপদস্থ রাজকর্মচারী সমান পদের বন্ধুর বাড়ি গিয়া দেখিলেন, সেখানে একজন উচ্চতর পদের ও আর একজন নিম্নতর পদের বাঙালি আছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইবার পর বিদায় লইবার সময়ে তিনি উচ্চতর পদধারীর দিকে তাকাইয়া বলেন, 'স্যার, একদিন আসব', কিন্তু নিম্নতরের দিকে তাকাইয়া বলেন, 'একদিন আসবেন।' ইঁহাদের শিষ্টতা সূক্ষ্ম ব্যারোমিটারের মতো, হাই-প্রেসার ও লো-প্রেসারে উহার কাঁটা অতি দ্রুত ঘুরিয়া যায়।

এই সব লক্ষণ ও এই ধরনের আচরণ দেখিয়া সাধারণ বাঙালি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ পোষণ করিবে তাহা আশ্চর্যের কথা নয়। প্রথমত তাহারা দেখে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যোগ্যতার জন্য পদ না পাইয়া সামাজিক যোগাযোগের জন্য পাইয়াছে, ধনী চুরি-জুয়াচুরি করিয়া টাকা করিয়াছে।

তাহা ছাড়া ইহাও দেখা যায়, এই সমাজে কোনও বড় আদর্শে আস্থা বা পরার্থপরতা মোটেই নাই। বিষয়াসক্তি উহাদের যুবক সন্তানদের মধ্যেও সংক্রামিত হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি একদিন দিল্লির ছাত্রদের কাছে বলিতেছিলাম যে, স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত আমাদের সকল আদর্শপরায়ণতা ইহারই প্রচেষ্টায় আবদ্ধ হইবার ফলে স্বাধীনতা পাওয়া মাত্র আমাদের নৈতিক জীবনে একটা শূন্যতা দেখা দিল, সেই কারণে আবার চেষ্টা করিয়া বিশ্বাস ও আদর্শপরায়ণতা ফিরাইয়া আনা দরকার।

AMARBOI.COM

এই প্রসঙ্গে পরে বাঙালির মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার অভাবের কথা একটি পাঞ্জাবী অধ্যাপকের কাছে উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে আশ্চর্য হন। কিন্তু তখনই একটি বাঙালি যুবক এম. এ. বা এম. এস-সি. ক্লাসের ছাত্র আমার কাছে আসিয়া ইংরেজিতে বলিল—'I dont care for faith or ideals. I shall be satisfied if I get highly paid job.'

আমি পাঞ্জাবী অধ্যাপকটিকে বলিলাম, 'শুনিলেন তো?' এইরূপ কথা আমাকে দিল্লিতে শুনিতে হইল, তাহাই আক্ষেপের বিষয়।

এই সব কারণে বাঙালি সমাজে সম্পন্ন বা ধনীর সহিত সাধারণ অবস্থার বাঙালিরই বিরোধ ও মনোমালিন্য যে দেখা দিয়াছে তাহাই নয়, নূতন অর্থপরায়ণতার জন্য মধ্যবিত্ত সমাজেও একটা অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে। উহা বিবাহের ব্যাপারেই বেশি প্রকাশ পাইতেছে। বর্তমান বিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই শুধু সম্পত্তি বা টাকা পাওয়ার মতো বৈষয়িক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুক ভদ্রলোক মেয়ের খুব ভাল বিবাহ দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে জামাতার কিংবা জামাতার পিতার মাহিনার খবর পাই। তখন বলি, 'ও! মাইনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন।' ইহাতে মধ্যবিত্ত সমাজের গুণবান যুবকদের দুঃখ ও রাগ হইবারই কথা। বয়সী ও গুণবতী মেয়েরা প্রায়ই তাহাদের অনায়ত্ত হইয়া পড়িতেছে।

অপর পক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদেরও ক্ষোভ কম নয়। এই সমাজের যুবকেরা যদি বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার জন্য বড় চাকরি পায় তখনই উচ্চপদস্থ বা ধনী ব্যক্তিদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাঘ্রীতুল্যা গৃহিণীরা উহাদের ঘাড় ভাঙিয়া উহাদের মাংস কন্যাদের পরিবেশন করেন। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত ঘরে অনেক গুণবতী মেয়েকে অনূঢ়া জীবন যাপন করিতে হয়।

এই অর্থপরায়ণতা ঘুণের মতো 'লাভ ম্যারেজ'ও প্রবেশ করিতেছে। প্রেমে পড়া সম্বন্ধে ভদ্রলোক ও ছোটলোকের মধ্যে একটা বড় প্রভেদ আছে। ভদ্র যুবক প্রেমে পড়িবার আগে বুদ্ধিমানের মতো বিবেচনা করে। কিন্তু প্রেমে পড়িবার পর আহাম্মকের আচরণ করিয়া থাকে। ছোটলোকের ব্যবহার ইহার উল্টা—উহারা প্রবৃত্তির বসে প্রেমে পড়ে এবং প্রেমে পড়িয়া হিসাব করিতে থাকে, শ্বশুরের কাছ হইতে মোটর গাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি সেট, টেপ-রেকর্ডার, রান্নাঘরের ইলেকট্রিক উনুন অথবা মিক্সার পাইবে কিনা, কিংবা শ্বশুরের দৌলতে সন্ধ্যাবেলা বসিবার ঘরে সস্তাদরের ড্রেসিং গাউন পরিয়া অভ্যাগতদের মধ্যে আলাপ করিতে পারিবে কিনা, রাত্রিতে ডোরাকাটা পাজামা পরিয়া ঘুমাইতে পারিবে কিনা। উহারা হয় এই সব জিনিস আদায় করে কিংবা না পাইবার সম্ভাবনা দেখিলে 'চুটিয়ে পীরিত করে' লম্বা দেয়। এইরূপ ব্যাপার জানা না থাকিলে উহার উল্লেখ করিতাম না।

সুতরাং বাঙালি ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিরোধ যে বাড়িবে অথবা বিদ্বেষ যে তীব্র হইয়া উঠিবে তাহা আশ্চর্য নয়। ইহার ফল এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন দরিদ্র সম্প্রদায় শুধু সম্পন্ন শ্রেণীর সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেছে না। কম্যুনিজমের জোরে তাহারা প্রতি-আক্রমণ করিতেছে। উহারা কার্যগতিকে কিংবা দৈবগতিকে সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে আসিলে গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা প্রকাশ করে, দেখাইতে চায় ধনী ব্যক্তির বাহ্যিক আড়ম্বরে সে কিছুমাত্র ভীত নয়। এই প্রতিশোধ যদি বিলাতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ধনী সম্প্রদায়ের উপর প্রতিশোধের মতো হইত তাহা হইলেও একটা কথা ছিল—কারণ বিলাতে শ্রমজীবীরাই জিতিয়াছে। বর্তমান জগতে একমাত্র ব্রিটেনেই 'ডিক্টেটরশিপ অফ্ দি প্রোলেটারিয়েট' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আমি এই কথা সব সময়েই বলিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ধনী-নির্ধনের বিরোধ অতি ছ্যাঁচড়া। এখন নির্ধনের বেয়াদবি দেখিয়া অনেক ভদ্র ধনী ব্যক্তিও একটা পুরাতন বাংলা প্রবাদের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া উহার ফল দেখিয়া তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 'কুকুরকে নাই দিলেই ঘাড়ে চড়ে।' বাঙালি সমাজে ধনী-নির্ধনের বিরোধ কত নীচ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

অর্থগত বিরোধের জন্য পুরাতন বাঙালি ভদ্রসমাজ যে ভাঙিয়া যাইবে এবং উহার ধ্বংসাবশেষ হইতে যে দুইটা পরস্পর-বিরোধী অন্তঃসারশূন্য সমাজ দেখা দিবে, তাহা আমার বহুদিন আগেই মনে হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পর্যবেক্ষণের ফলে এখন সে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, বাঙালি ভদ্রসমাজের মধ্যবিত্ত অংশও পূর্বাপেক্ষা অনেক ধনী হইয়া যাইবে, আর এক অংশ পূর্বাপেক্ষাও অসচ্ছল হইয়া পড়িবে। উহা যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জিনিসটা অবশেষে দেখা দিয়াছে তাহা পুরাপুরি মনে উদয় হয় নাই। সেটা দুই অংশের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ও বিরোধিতা। উহা আগে ছিল না। যতদিন ধরিয়া বাঙালি ভদ্রসমাজের ইতিহাস জানা আছে ততদিন ধরিয়া উহার ঐক্যও দেখা দিয়াছে। বাঙালি ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও সমাজগত প্রতিষ্ঠা অর্থের জন্য হয় নাই, হইয়াছিল কুল ও শীলের জন্য। অর্থের গুরুতর অসাম্য সত্ত্বেও এই সমাজে ঐক্য কিরূপ ছিল তাহার কথা আমার 'বাঙালি জীবনে রমণী' বই-এ লিখিয়াছি। খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গ্রামে যে দারিদ্র্য ছিল না তাহা নয়। সেখানে ধনী বা সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র গৃহস্থ পর্যন্ত সকল রকমের লোকই ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পয়সার জন্য ছুটাছুটি তো দেখা যাইত না, এমন কি অর্থের তারতম্য ঘটিত কোন উগ্রতা ব্যবহারেও প্রকাশ পাইত না। অর্থের অপেক্ষা না রাখিয়া সামাজিক মেলামেশা অব্যাহত থাকিত। সকল ধরনের পরিবারেই একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ও বাঁধা ছন্দ ছিল। তাই বিভিন্ন অবস্থার লোকের একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে বাধা থাকা দূরে থাকুক, বিবাহ হইবার পথেও বাধা হইত না।'

বিবাহের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের কথা স্মরণ করাইতেছি। আমার নিজের বিবাহের কথাও বলিতে পারি। আমি পুরাতন বনিয়াদি ভদ্রবংশের সন্তান, বাল্যেও সচ্ছল অবস্থার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলাম তবু সংসারে প্রবেশ করিবার পর কখনই সম্পন্ন হইতে পারি নাই। বিবাহের সময় আমার মাহিনা খুবই কম ছিল। আমার ভাবী শ্বশুর সম্পন্ন অবস্থার ছিলেন। তাই আমার ভাবী পত্নীর শুভাকাঙ্ক্ষী কোনও যুবক আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে গিয়া, আমার সেই মাহিনা হইতে কুড়ি টাকা কমাইয়া বলিল, এই দরিদ্র যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ কেন দিতেছেন। সেকালের বাঙালি ভদ্রলোকের মতো আমার শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমি ছেলে দেখে বিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমার মেয়ের অদৃষ্টে টাকা থাকলে হবে।' এ ধরনের উত্তর যে সে-যুগে প্রায় সকল কন্যার পিতার মুখেই শোনা যাইত তাহা বলার আবশ্যক রাখে না।

সেই সমাজ ভাঙিয়া গিয়া আজ যে অবস্থা দেখা দিতেছে তাহার পরিণাম ভাল হইতে পারে না। বাঙালির সর্বোচ্চ শক্তি মানসিক জীবনে। উহাতে স্থৈর্য শান্তি ও সুখ না থাকিলে সৃষ্টিকার্য চলিতে পারে না। অথচ এই সুখ লুপ্ত হইয়া আজ একদিকে সামান্য অর্থের অহমিকা ও অন্যদিকে দারিদ্র্যপ্রসূত বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। দুই-এরই মধ্যেই একটা তামসিক অশুচিতা আছে। এই অশুচিতায় বাঙালির জীবন আচ্ছন্ন।

অনেকে বলিবেন যে আর্থিক অবস্থা হইতে এই সামাজিক পরিণতি হইতেছে, উহা বর্তমান জগতে শিল্পগত ও অর্থগত পরিবর্তনের ফল। এইটাই আমি মানি না। আমি বলিব, 'টেকনোলজি'র সহিত কোনও বিশেষ সামাজিক ও মানসিক অবস্থার সত্যকার যোগাযোগ নাই। পাশ্চাত্ত্যে উহার ফলে জীবনযাত্রা আমেরিকায় এক রকম হইয়াছে রাশিয়ায় অন্য রকম হইয়াছে। বাঙালির জীবন এই দুইটার একটারও অনুযায়ী হইবার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আমাদের জীবনের বিশিষ্ট ধর্ম ও রূপ আমাদিগকেই দিতে হইবে। অন্যের কাছ হইতে ধার করা ধর্ম ও রূপ হইতে আমাদের কোনও উপকার হইবে না।

কিন্তু ইহার জন্য চরিত্রের সবলতা প্রয়োজন। আমি জীবনের অপরাহ্ণে এই পুরাতন সত্যই সর্বোচ্চ সত্য বলিয়া জানিয়াছি—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' আমাদের অন্তর হইতে যদি সেই বল না আসে, যদি আমরা বাহির হইতে বল পাইবার আশায় থাকি, তাহা হইলে আমাদের দুঃখও অনিবার্য। অবস্থাচক্রে দারিদ্র্য ভোগ করা এক কথা, কিন্তু দারিদ্র্যের দুঃখপঙ্কে ডুবিয়া বিদ্বেষ পোষণ করা আর এক কথা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ আগস্ট ১৯৭৭ (নূতন পয়সা-পূজা), ১২ আগস্ট ১৯৭৭ (সৃষ্টিশক্তির ক্ষয়) ও ১৭ আগস্ট ১৯৭৭ (ভদ্রসমাজে অর্থগত গৃহবিরোধ)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"
## পঞ্চাশ বৎসর আগে ও পঞ্চাশ বৎসর পরে

বহুকাল পূর্বে, ১৯১০ সনে কি ১৯১১ সনে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" এই নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে উহা তাঁহার কোনও বক্তৃতার বা প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

আমি তখন স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়ি। প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্যটা আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা মোটা কথায় এই—বাঙালিকে আইন বা দর্শনের কচ্‌কচি ছাড়িয়া, চাকুরি বা দাসত্বের মোহ কাটাইয়া, সাহিত্য ও ধর্মের বিলাস বর্জন করিয়া শিল্প-বাণিজ্য, অর্থাৎ 'ইকনমিক' কার্যকলাপের দিকে মন দিতে হইবে।

পুরাতনপন্থীরা প্রফুল্লচন্দ্রের এই লেখাটাকে "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার মস্তিষ্কের অপব্যবহার" এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য বাঙালির উহা ভালই লাগিয়াছিল, লাগিবারও কথা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তখন বাঙালির মন শিল্প-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। আজিকার দিনে অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালির শিল্পপ্রচেষ্টা ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার সূত্রপাত স্বদেশী আন্দোলনের জন্যই হয়। আজ যাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া এম-আই-টি'র অনুকরণের মতো হইয়াছে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল বৈদান্তিক ও থিওসফিস্ট হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে, একেবারে নির্ভাঁজ স্বদেশীর প্রভাবে।

বালক হইলেও আমার উপরেও এই চিন্তার ধাক্কা আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন আমরা শুধু অভিনেত্রীর মুখচন্দ্রমা ধ্যান না করিয়া, ভারতমাতার মলিন মুখচন্দ্রমা স্মরণ করিয়া গান গাহিয়া কাঁদিতে পারিতাম। যে পথের নির্দেশ প্রফুল্লচন্দ্র দিয়াছিলেন, ভাল লাগিলেও নিজের জীবনে যে উহা ধরি নাই তাহা অন্য কারণে, তখন উহাকে অক্ষমতাই বলিতাম।

শিল্প-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক উন্নতির প্রতি এই উন্মুখতার পিছনে আর একজন মহান্ বাঙালি ছিলেন। যিনি বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনকর্তা তিনিই আবার বাহ্যিক জ্ঞান ও কর্মের থিওরিরও প্রবর্তনকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে আমি ভাবিতেছি তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ইংরেজই মুসলমানের জায়গায় আবার ভারতবর্ষের রাজা হইবে এই কথা শুনিয়া সত্যানন্দ কাঁদিয়া বলিলেন,

> "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

তখন তাঁহার গুরু "চিকিৎসক" তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যানন্দ, কাতর হইও না... প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান সে-ই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের যুক্তি ও উপদেশ এই চিন্তাধারারই অনুবর্তন, বঙ্কিমচন্দ্রের থিওরিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের নির্দেশ।

এই উপদেশ তখনকার বাঙালি বহুল অংশেই মানিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বাঙালির চিন্তা ও কর্মের ধারায় একটা বৃহৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। উহা আজ [illegible] পর্যবসিত হইয়া বাঙালির আধুনিক জীবনযাত্রার মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বাঙালিকে আজ আর অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবার আবশ্যক নাই, উল্টা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে; এই বিপ্লবটা বাঙালির ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের পক্ষে সব দিকেই কল্যাণকর হইয়াছে কি না তাহাই এখন বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার মনে এই সন্দেহ ও প্রশ্ন ১৯২৫-২৬ সন হইতে জাগিতে আরম্ভ করে, ও দশ বৎসরের মধ্যে একটা উত্তরও পরিষ্কার হইয়া যায়। তাই আমাদের 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র অর্থপরায়ণতা সম্বন্ধে আমি ১৩৪৪ সনের আষাঢ় সংখ্যা (১৯৩৭ জুলাই) 'শনিবারের চিঠি'তে একটি প্রবন্ধ লিখি। উহা আরম্ভ করি একটা প্রশ্ন করিয়া,

"আমরা সুপ্রাচীন কাল হইতে আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া খ্যাত। ঐহিক সম্পদ আমাদের নিকট তুচ্ছ। নির্বেদ আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া আছে বলিয়াই সকলে বলে।... আমাদের জীবনে অর্থের স্থান কতটুকু ? অর্থ ও পরমার্থের যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্বের উপর হিন্দুর ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত আজও কি তাহা বর্তমান ? না, আমরা অর্থকেই সমস্ত মানবীয় চিন্তা ও কর্মের চরম নিয়ন্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ?"

ত্রিশ বৎসর আগেও এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে আমি ইতস্তত করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙালি ধর্ম, নীতি, বিদ্যা, সাহিত্য, কলা সব ছাড়িয়া একটা অর্থপরায়ণ জীবনবাদের চাপে শুধু টাকার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহা ছাড়া আমি আরও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এই অর্থপরায়ণতা পার্থিব বা লৌকিক ঐশ্বর্যের দিক হইতেও বড় কোনও ব্যাপার নয়। আমার এই কথাগুলিও উদ্ধৃত করিতেছি,

"বাঙালির অর্থপরায়ণতা আমেরিকান অর্থপরায়ণতা নয়; এমন কি মাড়োয়ারীর অর্থপরায়ণতাও নয়; উহার প্রাণ অনেক ক্ষুদ্র, পরিধি অনেক সঙ্কীর্ণ। আজিকার দিনে [১৯৩৭ সনে] বাঙালি ভদ্রসমাজের অর্থপরায়ণতাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইটি রূপ চোখে পড়ে। ইহাদের একটি সরকারি চাকুরিজীবীর মধ্যেই বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সরকারি 'টাইপ' বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য ; অপরটি নব্য বাঙালি ব্যবসায়ীর মধ্যে বেশি দেখা যায়, সেজন্য ব্যবসায়ী 'টাইপ' বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।"

তার পর আমি দুইটি 'টাইপে'র একটু বর্ণনা দিয়াছিলাম। প্রথম বর্ণনা সরকারি 'টাইপে'র, উহা এইরূপ,

"সরকারি অর্থপরায়ণতার বিবেকবুদ্ধি আছে, কিন্তু উহা উদারতা পর্যন্ত পৌঁছে নাই। তাই সঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া যক্ষের মতো আগলাইয়া থাকিবার কল্পনাই এই শ্রেণীর অর্থসাধকের একমাত্র স্বপ্ন। কাহাকেও এই ধনের অংশ না দিয়া, নিষ্প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া কিভাবে অর্থকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে এই ধ্যান করিতে করিতে ইঁহাদের মনে এমন একটা স্থানের ছবি জাগিয়া উঠে যেখানে দস্যু-তস্করের ভয় নাই, লোকাবাস আছে, অথচ সামাজিক কর্তব্য নাই, অর্থব্যয় করিবার দায়িত্ব নাই।" (তখন আমি নতুন বালিগঞ্জের কথা ভাবিয়াছিলাম, এখন আরও সব মহল্লা হইয়াছে।)

ব্যবসায়ী 'টাইপে'র বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,

"ব্যবসায়ী 'টাইপে'র প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহার উদারতা আছে, কিন্তু বিবেকবুদ্ধি নাই। তাই এই শ্রেণীর অর্থসাধক একটি পয়সাকে একটি রক্তবিন্দুর মতো জ্ঞান করেন না, তেমনই আবার একটি পয়সার জন্য কাহারও গলায় ছুরি দিয়া এক বিন্দুর বেশি রক্তপাত করিতেও খুব বেশি সঙ্কোচ বোধ করেন না।"

এই দুই 'টাইপে'র আর একটি পার্থক্যের কথাও তখন উল্লেখ করিয়াছিলাম,

"সরকারি 'টাইপে'র অর্থসাধকগণ সাধু প্রকৃতির হইলেও অপরের সততা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দেহপরায়ণ। ব্যবসায়ী 'টাইপে'র সাধকের এই অবিশ্বাসপ্রবণতা নাই। তাঁহারা গোপনে পরস্পরকে চোর নামে অভিহিত করিলেও সম্মুখে কখনও ভদ্রতার ত্রুটি করেন না।"

সর্বশেষে ১৯৩৭ সনেও আমি বাঙালিসমাজে যাহা দেখিতাম, তাহার একটা আভাস দিয়াছিলাম,

"ইঁহারা দুই দলে মিলিয়া বাঙালি ভদ্রসমাজের প্রায় সবটুকু ব্যাপিয়া আছেন। এই সমাজের যেখানেই গিয়াছি, তা সে সভা-সমিতিতেই হউক কিংবা মাঠে-ময়দানেই হউক, আপিসে ও কর্মস্থলেই হউক আর রাস্তায় ও বাজারেই হউক—সর্বত্রই হয় ইঁহাদের একটি শ্রেণীর গম্ভীর ও আত্মতৃপ্ত মুখ, নয় আর একটি শ্রেণীর সহাস্য ও আত্মতৃপ্ত মুখ দেখিতে পাইয়াছি। দেখিতে দেখিতে আমাদের সমাজের পরিণতি সম্বন্ধে বহু কথা মনে হইয়াছে ; আমাদের সংস্কৃতির কথাও ভাবিয়াছি।"

এই কথাগুলি লিখিয়াছিলাম ১৯৩৭ সনে, এখন ১৯৬৭ সন—ত্রিশ বৎসর পরে আর ভাবিবার অপেক্ষা নাই, সবই প্রকট হইয়া গিয়াছে। বাঙালির অর্থপরায়ণতা আজ নিম্নতম তামসিক মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। আমি সাত্ত্বিক গুণের বড়াই করি না, সাত্ত্বিকতাই একমাত্র কাম্য তাহাও বলি না, রাজসিকতা আমার শ্রদ্ধা ও কামনার বস্তু। রাজসিকতার প্রতি এই আসক্তির জন্যই আরও উচ্চকণ্ঠে বলিব, বর্তমান যুগের বাঙালির এই অর্থপরায়ণতা অতি ঘৃণ্য, তামসিক ব্যাপার। উহার মধ্যে কোথাও অর্থের গৌরব দূরে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকুক, অর্থের অহঙ্কার পর্যন্ত নাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশের কি ফল দাঁড়াইয়াছে তাহার একটু হিসাব লওয়া যাক্। আজকাল যদি কোনও সুপুষ্ট, হাস্যোজ্জ্বলমুখ বাঙালি দেখা যায়, তাহা পরিচয় না লইয়াও অনুমান করা যায় যে, তিনি হয় সাক্ষাৎভাবে ব্যবসা বা কারখানার মালিক, অথবা—মোটা মাহিনার টেক্‌নলজিস্ট অর্থাৎ উচ্চস্তরের মিস্ত্রি, অথবা তেমনই মোটা মাহিনার কভেনান্টেড অফিসার অর্থাৎ বিদেশী সওদাগরের উচ্চস্তরের কেরানী। যদি হাসি ছাড়া শুধু সুপুষ্ট মুখ দেখা যায় তাহা হইলে তিনি উচ্চবেতনের সরকারি কর্মচারী না হইয়া যান না—শুষ্ক কাগজের উপর সই করিতে করিতে ইঁহাদের হাসির ক্ষমতাও তাঁহাদের কলমের কালির মতোই ঝরিয়া পড়িয়াছে।

পক্ষান্তরে, শুষ্ক মুখ অথচ উগ্র মূর্তি কাহাকেও যদি লোলুপ বা ভীত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে অনুমান করা যায় যে, তিনি 'ইন্টেলেক্‌চুয়েল' অর্থাৎ অর্থের অভাবে বামপন্থী বা লেফ্‌টিস্ট।

রাজনৈতিক নেতাদের চেহারা, কংগ্রেসদলীয় হইলে ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবীর মতো হয়, আর অপোজিশ্যনের হইলে ইন্টেলেক্‌চুয়েলের মতো হয়। অধ্যাপকদের চেহারাও তেমনই দুই ধরনের। রীডার ও প্রোফেসাররা এক রকম, লেকচারাররা অন্য রকম। এক কথায় বলা যাইতে পারে, সমগ্র বাঙালিসমাজে সকলের মুখেই বিত্ত বা বিত্তহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট, অন্য কোনও ধ্যান-ধারণার চিহ্নও দেখা যায় না।

এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, বাঙালি কি অর্থপরায়ণ হইয়া মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করিতেছে, না অপব্যবহার করিতেছে? নৈয়ায়িক না হইয়া এবং দোকানদার হইয়া কি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, না স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে? আমার মনে এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। কিছুদিন হইল একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে বলিতেছিলাম যে, টাকার পিছনে ছুটিয়া আমার অতিপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই অন্তত পঁচিশ জন নিজেদের প্রতিভাকে বলি দিয়াছেন। একজনের নামও এই প্রসঙ্গে করিয়াছিলাম। তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন,

"যাই বলুন, মশায়, পয়সা করেছে!"

তিনি যেন ইঙ্গিত করিলেন যে, বিত্তহীন হওয়াতে আমি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া এই ধরনের কথা বলিতেছি। তাই আমি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না,

ন-চ। "কত পয়সা?"

ভদ্রলোক। "অনেক পয়সা।"

ন-চ। "এক কোটি টাকা?"

ভ। "আরে, না না!"

ন-চ। "পঞ্চাশ লক্ষ?"

ভ। "আরে, না না!"

ন-চ। "দশ লক্ষ?"

ভ। "তাও নয়।"

ন-চ। "পাঁচ লক্ষ?"

ভ। "না, বোধ হয়।"

তখন আমি না বলিয়া পারিলাম না,

"দেখুন, এক লাখ বা ৭৫ হাজার টাকা ক'রে শহরতলিতে একটা বাড়ি তুলে অর্ধেক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়া দিয়ে থাকাকে আমি টাকা করা বলি নে।”

ব্যক্তিগত ব্যাপারে তো টাকা করার দৌড় এই পর্যন্ত। জাতিগত ব্যাপারে টাকার পিছনে ছুটিয়া আবার এক ম্লেচ্ছ জাতির দাস হইতে চলিয়াছি, বহির্বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করিয়া লাভ বিশেষ হয় নাই। সত্যানন্দ আজও কাঁদিতেন, চিকিৎসক তাঁহাকে কোনও প্রবোধ দিতে পারিতেন না।

এখন স্পষ্ট কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। বেশির ভাগ লোক সাংসারিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পন্নতার দিকে ঝুঁকিবে এ-কথা বলার আবশ্যক রাখে না। আমি একমাত্র তাঁহাদের কথাই বলিতেছি যাঁহাদের ভিতরে কিছু পদার্থ আছে। তাঁহারা যেন বাঙালির সত্যকার ধর্ম কি মনে রাখেন। আমি আজ পঁচিশ বৎসর দিল্লিপ্রবাসী। এ অঞ্চলের লোকের টাকা উপার্জনের ক্ষমতা দেখিয়াছি। সামান্য পাঞ্জাবী দোকানদার, যে উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়াছে, তাহারও সচ্ছলতা ফিরাইয়া আনিবার কি ক্ষমতা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং রোজ দেখিতেছি। যে-সব অর্থবান পাঞ্জাবী দিল্লি আসিয়াছিল, তাহারা অর্থের ক্ষেত্রে কি করিতে পারে তাহাও দেখিয়াছি। অন্য সম্প্রদায়ের অর্থোপার্জনের ক্ষমতারও কিছু খবর রাখি।

আমি বলিব পাঞ্জাবী অড়োড়া বা ক্ষত্রি, গুজরাটি, বা কাঠিয়াবাড়ি বা মাড়োয়ারী, ও হিন্দুস্থানের বানিয়ার মতো অর্থসাধনা করিবার ক্ষমতা বাঙালি ভদ্রলোকের কখনও হইবে না। বাংলাদেশেও অর্থোপার্জনের ‘স্পেস্যালিস্ট’ ছিল—নবশাখ, সোনার বেনে, অথবা সাহা সম্প্রদায়। অর্থোপার্জনে ইহাদের তৎপরতা ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট। কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা নাই।

“স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ”।—এই উক্তি স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া নিধনের কোনও প্রশ্নই নাই। প্রবাসে থাকিয়া আমি একদিকে যেমনই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাঙালির অর্থোপার্জনের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ—অসৎপথে গেলেও অন্যের তুলনায় সীমাবদ্ধ—তেমনই ইহাও দেখিয়াছি যে, আর একটা ক্ষেত্র বা জগৎ আছে যাহাতে বাঙালিকে ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের অন্য কাহারও অগ্রসর হইয়া যাওয়া সহজ এমন কি সম্ভবও নয়। সেটা মানস জগৎ।

শুধু পরিশ্রমবিমুখতা, ও স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া তুচ্ছ পয়সার লোভে ছুটিবার জন্য আমরা আমাদের যথার্থ কীর্তি ও কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেছি। বাঙালি সাহিত্যিক যদি ছোটরকমের বড়লোক হইবার লোভে নিজের সত্যকার কাজ না ছাড়েন, বাঙালি অধ্যাপক যদি যে-মাহিনাকে তাঁহারা ছাড়া আর কেহ মোটা মাহিনা বলিবে না সেই বেতনের লোভে অধ্যয়ন ত্যাগ না করেন, বাঙালি বৈজ্ঞানিক যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া মিস্ত্রি হইবার প্রলোভন ত্যাগ না করেন, তাহা হইতে বাঙালি এখনও শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা জগতের যেখানেই মানসধর্মের কোনও ক্ষমতা বা মূল্য আছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের জীবনের ও জাতীয় জীবনের সার্থকতা অবিচল রাখিতে পারেন। আজ জীবনের শেষে বাঙালি হিসাবে এই কথা বলিতে আমি কোনও দ্বিধা বোধ করিতেছি না।

সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৯৬৭


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি

॥ ১ ॥

অবশ্য বর্তমান বাঙালি সমাজ ও বাঙালির আজিকার সংস্কৃতির কথাই বলিতে যাইতেছি। বাগ্‌বিস্তার একটু হইবে বৈ কি, তবে মোটা কথা একেবারে গোড়াতেই বলিয়া ফেলিতে আপত্তি নাই, কারণ কথাটা, শেষ মতটা, খুবই মোটা—সমাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে (পড়িতেছে নয়) ; আর সংস্কৃতি একেবারে না গেলেও যাইতে বসিয়াছে।

অবজ্ঞার তর্ক এখনও কানে আসিতেছে। এক জাতীয় বাঙালি মনের একটা মূঢ় গোঁড়ামি এবং গোঁয়ার্তুমি আছে, যাহার জন্য সে নিজের সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় সত্য শুনিতে চায় না। ইহা শক্তির লক্ষণ নয়, কাপুরুষতা ও দৌর্বল্যের লক্ষণ। যে-জাতির জীবনীশক্তি আছে, তাহার আত্মপ্রত্যয় শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সে নিজের দোষ ধরিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, ভাবী বিপদের সম্ভাবনায় বিচলিত হয় না, প্রতিকারের হিসাব করিতে ভয় পায় না। দুর্বল জাতি নিজের শক্তিতে এত অবিশ্বাসী হয় যে, বিপদের কথাতেই আতঙ্কিত হইয়া উঠে। সে মনে করে, দোষ অস্বীকার করিলেই উহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে, সর্বনাশের সম্ভাবনাকে আমল না দিলেই আর সর্বনাশ হইবে না।

বাঙালির এই কাপুরুষোচিত গোঁয়ার্তুমি বছর পঞ্চাশ ধরিয়া দেখিতেছি, আগে ছিল না। বাঙালি উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বড় হইয়াছিল, যখন ভারতবর্ষে নতুন জীবন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন সে নিজের নির্মম সমালোচকও ছিল। "আবার তোরা মানুষ হ" বলিয়াই তাহারা মানুষ হইয়াছিল ; "অতিশয় উচ্চস্তরের মানুষ তো আছি-ই", এই কথা বলিয়া অন্ধ আত্মম্ভরিতা দেখাইয়া দুর্দশাগ্রস্ত থাকে নাই। আজ তাহার উল্টা। শুধু ইহাই আমাদের অবনতি ও দুর্দশার সূচক।

অথচ একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা হইতে এমন একটি চিঠি পাই না যাহা নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। প্রতিটি চিঠিতে নিরাশা ছাড়া, ঘ্যান-ঘ্যান ছাড়া, তিক্ততা বা অভিযোগ ছাড়া কিছু থাকে না। কোথাও আশা, উদ্যম ও প্রাণের পরিচয় পাই না। অন্ধ আত্মপ্রীতি ও ক্লৈব্যগ্রস্ত অসহিষ্ণুতার এই সমন্বয় আমার কাছে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে কোনও জিনিস অবাঞ্ছনীয় মনে হইলে আমি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছি এবং সৌভাগ্যক্রমে প্রতিটি ব্যাপারেই প্রতিকার করিতেও পারিয়াছি। জাতীয় জীবনে যে-সব জিনিস অবাঞ্ছনীয় তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকার ব্যক্তিবিশেষের একক চেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সেক্ষেত্রে কাজে সহ্য করিতে হইলেও লেখায় আমি বিদ্রোহ করি। অন্যায় অভাবকে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্বলের মতো মানিয়া লইয়া অন্যায়কে বা মিথ্যাকে যাহারা আক্রমণ করে তাহাদের নিন্দা করা, আমার কাছে অসংলগ্ন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং আমার কথায় কর্ণপাত না করিলেও আমি যাহা বলিয়া যাইবার তাহা বলিয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইবই। আমার একটা আশ্বাসের কথা এই যে, অতীতে আমার যে-সব কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই, সেইসব কথা বহুক্ষেত্রেই ফলিতেছে। আমি যখন কোনও উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে কিছু বলি, তখন দশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কি ফল হইতে পারে তাহার কথা বলি। সুতরাং আমার হিসাবের সত্যাসত্য তখনই নিরূপণ করা যায় না—আমি নিজেও কিছু বলিতে পারি না, অন্যেরাও উড়াইয়াই দেয়।

তাই বহুকাল পরে আমার কোনও উক্তি যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে প্রথমত নিজে ভবিষ্যতের কথা আরও বলিতে ভরসা পাই, পাঠকগণ আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, আর অনুমান করি—ভরসা করিতে পারি না—সমালোচক এবং নিন্দুকগণও একটু জব্দ হন। ইহা ছাড়া বর্তমানে বহু বাঙালি আমার কথা শুনিয়া খুশি হইতেছেন, ইহার পরিচয় পাইয়া আমি উৎসাহিত বোধ করিতেছি।

॥ ২ ॥

'সাপ্তাহিক বসুমতী'-তে আমি ইতিপূর্বে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে ১৯৩৭ সনে লেখা আমার একটা প্রবন্ধ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়াছিলাম যে, বর্তমানে বাঙালির যে স্বধর্মবিরুদ্ধ অর্থগৃধ্নুতা এবং বাঙালি ভদ্রসমাজে যে অর্থোপাসনা দেখা দিয়াছে, তাহা আমি ত্রিশ বৎসর আগেই ধরিতে পারিয়াছিলাম। আমি আজ বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিতে যাইতেছি, তাহার পিছনে একটু জোর দিবার জন্য আবার নিজের কতকগুলি পুরাতন কথা উদ্ধৃত করিব। আমার এই আত্মম্ভরিতা ও অহমিকাটুকু পাঠকদের মানিয়া লইতে হইবে।

সেই কথাগুলি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে। তখন সেগুলিও উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৩৪৩ সনের শ্রাবণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'-তে "হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, পারিবারিক জীবনে যেমন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য পিতাপুত্র পৃথগন্ন হয়, ভাইরা পৃথগন্ন হয়, তেমনই মানুষের সমষ্টিগত অস্তিত্বেও একটি ভাগ আর এক ভাগ হইতে পৃথক হইয়া যাইতে চায়—যদি এই ভাগের স্বাতন্ত্র্যবোধ না থাকে বা জাগে। এখন পুরাতন কথা উদ্ধৃত করিব,

> "ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলেও আছে এই স্বাতন্ত্র্যভোগের ইচ্ছা। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, এই স্বাতন্ত্র্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, দুইটি বিরাট সম্প্রদায়ের। আজ জাতীয় জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই ধরি না কেন, তাহাতে সব চেয়ে বড় যে জিনিসটা পাই তাহা হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় রাখিবার ইচ্ছা। হিন্দুরা অবশ্য এ-কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে আদর্শ ধরিয়াছেন উহা জাতীয় আদর্শ, মুসলমানরা বিদেশ হইতে গৃহীত আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়াই ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই কথা বলিলেই বিবাদ মিটিবে না। যে রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানরা ধরিয়া আছেন, বিদেশী-ই হউক কিংবা স্বদেশী-ই হউক, তাহাকে তাঁহারা নিজস্ব বলিয়া মনে করেন। সহস্র যুক্তিতেও তাঁহারা এই আদর্শকে ছাড়িয়া অন্য আদর্শ অবলম্বন করিবেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুরাও নিজেদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা বজায়


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখিতে বদ্ধপরিকর। ইহাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একেবারে গোড়ার কথা।"

আমি এইভাবে প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম,

"সুতরাং এক্ষেত্রে কাহার দিকে কতটুকু ন্যায়, কাহার দিকে কতটুকু অন্যায় সে বিচার সম্পূর্ণ অবান্তর। স্বীকার করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ দ্বিকেন্দ্র হইয়াছে; বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান ভাই হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইয়া আপনার পথ ধরিতে চাহিতেছে।"

১৩৪৩ সনে প্রকাশিত এই ধরনের অভিমতের প্রতি একটু মনোযোগও যদি করা হইত, তবে বাংলাদেশ বিভক্ত হইত না; আর বিভক্ত হইলেও হয়তো বিভাগের ফল এত শোচনীয় হইত না। কিন্তু প্রচলিত ও প্রীতিকর মত নয় বলিয়া ইহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

॥ ৩ ॥

বাঙালি সমাজ ও বাঙালির সংস্কৃতি যে ধ্বসিয়া পড়িতেছে, উহার অনুভূতি ১৯২০ সন হইতে আমার মনে আসে। এই অনুভূতির কথা আমার আত্মজীবনীর ৩৯৯ পৃষ্ঠায় আছে। দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি,

"Certain qualities and things, dominant in the old order in which I was born and brought up, had disappeared or were disappearing. Certain other things, previously absent, were entering or holding the field. There was no aspect of our existence in which the voids and the intrusions were not crying aloud for notice. Yet the inexplicable thing was that nobody seemed to be aware of them."

AMARBOI.COM

ইহার পর "Vanishing Landmark" শীর্ষক অধ্যায়ে পুরাতন ধারার কি কি যাইতে বসিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিয়াছি। প্রধানত দুইটি পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়াছিলাম—প্রথম, বিবেকবুদ্ধির মৃত্যু; ও দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমন্বয়ের ধারণার অবসান।

যত বৎসর কাটিতে লাগিল ততই বাঙালি জীবনের শক্তি কমিতেছে, এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। ১৯৩৭ সনে পাটনায় বাঙালির সংস্কৃতির কেন অবনতি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। অবশেষে বাঙালির ভরসা একেবারে হারাইয়া দিল্লি চলিয়া আসিলাম, গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একবারও কলিকাতা যাই নাই—কারণ যাহাকে ভালবাসিতাম তাহার পক্ষাঘাত ও মৃতপ্রায় জীবন দেখিতে ইচ্ছা হয় না। শেষে বাংলা লেখাও ছাড়িয়া দিলাম। মনে হইল, যে জাতি নিজের বুদ্ধির দোষে মরিতে বসিয়াছে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? শুধু প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির জন্য আমি লিখি না। আজ যে আবার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। সে কৈফিয়ৎ এখানে দিব না। প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

॥ ৪ ॥

বাঙালি সমাজের অবনতি বা ভাঙনের কথা বলিতে গিয়া আমি অবশ্য বাঙালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোকের কথাই ধরিতেছি। ইহা প্রধানত তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত ছিল—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। বৈদ্যেরা দ্বিজ বলিয়া দাবি করেন, সেজন্য আমি কায়স্থ হইয়াও ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাদের নাম আগে উল্লেখ করিলাম। নহিলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বলাই প্রচলিত বাক্যরীতি।

এই ভদ্রসমাজে বর্ণগত ভেদ, এক বিবাহ ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন ছিল না। সামাজিক জীবন ও আদর্শের দিক হইতে, এমন কি জীবিকানির্বাহের ধারা এবং অর্থের দিক হইতে এই তিন বর্ণের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। এই তিনটি মিলিয়াই একটা একীভূত 'ভদ্রলোক' সমাজ বাংলাদেশ জুড়িয়া ছিল।

প্রথমে এই ভদ্রসমাজের বৈষয়িক ভিত্তির কথা বলিতে হয়। এ-বিষয়ে একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, বাঙালি ভদ্রসমাজ ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ভূস্বামী শ্রেণী সম্বন্ধে এই ধারণাটা অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দুইটি ধারণার কোনটাই সত্য নয়। আমি ভদ্র ও ভূস্বামী বংশ সম্ভূত। আমাদের বংশের চৌধুরী উপাধি ও ভূসম্পত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় আশি বৎসর পূর্ব হইতে। আমাদের কালীবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তিও তখন হইতে।

বাংলাদেশের প্রায় সব বড় জমিদার বংশের বেলাতেও তাই দেখা যায়। বর্ধমানের রাজারা আকবরের সময় হইতে, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দী হইতে, নাটোরের রাজবংশ অন্ততপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা এবং অন্যান্য জায়গার জমিদাররাও সেই সময়ের।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শুধু জমিদারীর স্বত্ব সাময়িক স্বত্বাধিকারীর জন্য আইনত কায়েমী হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরও অমিতব্যয় বা অকর্মণ্যতার জন্য বহু জমিদারী ক্রমাগত হস্তান্তর হইত। বিশেষ করিয়া প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে বহু সম্পত্তি পুরাতন জমিদারদের হাত হইতে নূতন জমিদারদের হাতে যায়। সুতরাং পুরাতন জমিদারদের পতন ও নূতন জমিদারদের উত্থান চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও ক্রমাগতই হইত। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, স্বত্বের কায়েমিত্ব থাকিলেও আর্থিক অবস্থার স্থায়িত্ব প্রায় বেশি ক্ষেত্রেই দেখা যায় নাই। আগে যেমন অবস্থা ভাল হইত ও পড়িত, তেমনই চলিতে লাগিল। ইহার জন্য যে-কোনও পরিবার সম্বন্ধে 'বোল্-বোলা' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত ছিল। ইহার অর্থ 'সমৃদ্ধ'। "ওরা যখন বোল্-বোলা ছিল", এই কথাটা যে-পরিবার দরিদ্র হইয়া গিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

ইহার জন্য বলা যাইতে পারে যে, ভদ্রসমাজে কখনই 'ইকনমিক মবিলিটি'-র বদলে 'ইকনমিক স্ট্যাটিসিটি' দেখা যায় নাই। কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বা আর্থিক অসাম্যের জন্য ভদ্রসমাজে অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও সামাজিক বিভেদও কখনও দেখা দেয় নাই। সকল ভদ্রলোকই মনোভাবে, সামাজিক আচরণে, ব্যক্তিগত ব্যবহারে এক ছিল।

তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ ভদ্রসমাজের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যাইত না। কোনও ধনী ব্যক্তি ভদ্রবংশের দরিদ্র ব্যক্তিকে হীন বলিয়া মনে করিত না। ধনী এবং মধ্যবিত্ত, এমন কি ধনী এবং দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও বিবাহে বাধা জন্মিত না—মেয়ে রূপবতী বা গুণবতী হইলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের স্থানীয় নায়েবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার গল্প 'শুভদৃষ্টি'তে জমিদার কান্তিচন্দ্রের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরিদ্র গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করার কাহিনীর সূচনাও তিনি সম্ভবত নিজের জীবন এবং অন্য অভিজ্ঞতা হইতে পাইয়াছিলেন।

॥ ৫ ॥

কিন্তু ১৯২৫-২৬ সন হইতেই আমি অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম যে, বাঙালি 'ভদ্রলোক' বলিয়া যে সমাজটা ছিল, তাহা ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে— ফলে উহার সামাজিক ও মানস ধর্মের ঐক্য লোপ হইতেছে এবং অখণ্ড ভদ্রসমাজ একেবারে বিভিন্ন চেহারা ও ধর্মের দুইটা ভাগে পরিণত হইতেছে। এই দুইটা ভাগকে দুইটা সমাজ বলিলেও ভুল হইত না। তখন আমি বলিতাম,—বাঙালি ভদ্রসমাজ একটি সমাজ হিসাবে আর বেশিদিন টিকিবে না, উহা একদিকে নূতন বড়লোকের একটা আন-কালচারড শ্রেণী ও অন্যদিকে দরিদ্র গৃহস্থের একটা ছ্যাঁচড়া শ্রেণীতে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ভদ্রসমাজ ভাগ হইয়া যাইবে এবং পুরাতন মানসিক ধর্ম ও জন্মগত ভদ্রস্থতার মধ্যে যে ঐক্য ছিল তাহার বদলে উহাতে একটা অর্থগত অলঙ্ঘনীয় দ্বিত্ব দেখা দিবে।

আমার এই আশঙ্কা যে পরবর্তী চল্লিশ বৎসরে যথার্থ বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে, তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাঙালি সমাজে আগের তুলনায় ধনী বা সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা আজ অনেক বেশি। আগে যাঁহারা একশত বা দুইশত টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এক হাজার হইতে দুই হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থের মূল্য হ্রাসের কথা হিসাব করিলেও ইহা রীতিমত আর্থিক উন্নতি। অর্থ আজ বাঙালি সমাজে আগের তুলনায় পরিমাণে বেশি হইয়াছে ও বেশি লোকের আছে।

অন্যপক্ষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, যাহাদের সংসার সম্পন্নভাবে না চলিলেও স্বচ্ছলভাবে চলিত, তাহারা আগের চেয়ে বেশি দরিদ্র হইয়াছে। ইহাদেরও সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে।

এর চেয়েও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ব্যবহারে একাত্মতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। ধনী শ্রেণী আজকাল দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সহিত সামাজিক আচরণও বজায় রাখে না, এমন কি ভদ্র ব্যবহারও করে না। অবশ্য বাঙালি সমাজে অতিশয় ধনী ব্যক্তি আগেও অহঙ্কৃত ও অভদ্র হইত। কিন্তু আজকাল তাহাদের অপেক্ষা কম ধনী অনেক বেশি অভদ্রতা দেখাইয়া থাকে।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া তফাতটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ধনী হইলেও পূর্বযুগের বাঙালি ভদ্রলোক মানুষ হইলে মধ্যবিত্ত অবস্থার আত্মীয়কে অপমান করা দূরে থাকুক, সামাজিক ব্যাপারে সম্মানই দেখাইত। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময়ে আমি উহা নিজের চক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার একটি জ্ঞাতি দাদা মোক্তার ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বৌভাতের নিমন্ত্রণে আসিলেন তখন শরৎবাবু অমুক দাদা বলিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

ইহার সহিত একটি আধুনিক এক বড়লোকের আচরণ তুলনা করুন। ইঁহার বাড়িতেও বিবাহ। গৃহস্বামী ভোজের প্যাণ্ডেলের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট-সম্পর্কিত এক দরিদ্র আত্মীয়কে ঢুকিতে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কেন এসেছেন? আপনাকে কে নিমন্ত্রণ করেছে?" পরে প্রকাশ হইল গৃহস্বামীরই ভদ্র ছোটভাই এই আত্মীয়টিকে খাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবেন, ইহা ব্যক্তিবিশেষের অভদ্র আচরণ। কিন্তু আমার সংবাদ যেরূপ, তাহাতে মনে হয় আচরণটা ব্যাপক হইতে চলিয়াছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহার ফল শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটা সকলেই অনুভব করেন যে, বাঙালি সমাজে আজ অর্থের প্রাচুর্য ও অভাব হইতে জাত শ্রেণীগত দ্বেষ অত্যন্ত উগ্র। বিত্তবানেরা রাগ দেখান না, কারণ বিত্তহীনের উপর রাগ ঝাড়িবার কোনও কারণই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা শুধু অবজ্ঞা, এমন কি ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিত্তহীনেরা বিত্তবানের নাম শুনিলেই যেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বাংলাদেশে কম্যুনিজমের যে প্রতিপত্তি দেখা যায় তাহা এই অর্থগত দ্বেষের জন্যই। সমাজে সকলের জন্য ন্যায় ও সুবিচার স্থাপনের ইচ্ছা এই কম্যুনিজমের মূল প্রেরণা নয়; উহার মূল প্রেরণা স্বার্থগত—আমি যে বিত্ত হইতে বঞ্চিত তাহার প্রতিকার আমার চেষ্টায় হইবে না, কম্যুনিজম হইতে হইবে, এই বিশ্বাসই সত্যকার প্রেরণা।

এই কারণে দুই শ্রেণীর চেহারা এবং মুখের ভাবেও একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গটা ক্লেশকর। তবু ইহার আলোচনা না করিয়া উপায় নাই। কেহ যেন মনে না করেন, যেহেতু আমি এই পার্থক্যের উগ্রতম রূপ বর্ণনা করিতে যাইতেছি সেইজন্য সকলকেই এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করা আমার অভিপ্রায়। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দুই শ্রেণীর মধ্যেই আছে। আমি শুধু ব্যাপক রূপের কথাই বলিতে যাইতেছি।

বিত্তবানেরা হৃষ্টপুষ্ট, সুবেশ, হাসি হাসি মুখ, চিন্তাভাবনাবিহীন—নিজেদের জীবনে দুশ্চিন্তার কারণ নাই বলিয়া পরের দুঃখেও চিন্তিত হন না। কিন্তু মুখশ্রীতে দৈহিক কুশ্রীতা না থাকিলেও মানসিক জড়তা প্রসূত যে কুশ্রীতা দেখা যায় তাহা পীড়াদায়ক। মুখের পিছনে মন নাই বলিয়া উহাদের অনিবার হি-হি হাসি, ফাজলামি ও তুচ্ছ জিনিস লইয়া মাতামাতি একেবারে অসহনীয় মনে হয়। ইহাদের সন্তানেরা আরও হৃষ্টপুষ্ট, আরও সুবেশ, আরও হাসি হাসি, আরও করুণাবিহীন, যৌবনের দৈহিক লাবণ্য সত্ত্বেও মনের দিক হইতে করুণা বা বিষাদবিহীন বলিয়া ইহাদের চেহারা আরও অপ্রীতিকর। দেশে এত দুঃখ, ইহার অনুভূতিও ইহাদের মুখে দেখা যায় না।

অন্যদিকে দরিদ্রের মুখ দেখিলে মনে শুধু কষ্ট নয়, ভয়ও আসে। হয় তাহারা নিজেদের দুঃখদারিদ্র্যে এত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত যে মুখে একটা আর্তভাব ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না, অথবা যখন প্রাণ অবশিষ্ট থাকে তখন সমাজের উপর একটা হিংস্র বিদ্বেষ মুখে চোখে জ্বলিতে থাকে। শুষ্ক মুখের এই ভাব ভয়ঙ্কর।

পিতামাতা মনোযোগ দিয়া শিক্ষা দিতে পারে না বলিয়া এই শ্রেণীর বালক ও যুবকেরা একেবারে কিপলিং-এর "বান্দর লোগ্" বনিয়া যাইতেছে। ইহাদের কুশ্রী সার্ট ও কুশ্রীতর প্যান্ট পরা শীর্ণ অথচ ছ্যাবলা মূর্তি দেখিলে চোখ বুজিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। সুযোগ পাইলেই ইহারা ভদ্রলোকের উপর ইতররকমের দুর্ব্যবহার করে, আরও সুযোগ পাইলে গুণ্ডামি করে; কিন্তু শাসনের ভয় থাকিলে অন্যের উপর উপদ্রব না করিয়া শুধু রঙ-বিহীন, উৎসববিহীন, আনন্দবিহীন হোলির হে-লে-লে-লে করিয়া বেড়ায়। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে পাড়ায় পাড়ায় এই জাতীয় বালক ও যুবক যে দলে দলে ফেরে তাহা সকলেরই দেখা আছে।

॥ ৬ ॥

ইহার পর সামাজিক পরিবর্তনের আর একটা ফলের কথা বলিব। ইহাতে বাঙালি সমাজের নেতৃত্ব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বযুগে সমাজের মাথা ছিলেন জমিদার, বড় ব্যারিস্টার ও উকিল, বড় চাকুরে। ব্যবসায়ী অতি ধনী হইলেও শুধু অর্থের জোরে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের নেতৃত্ব করিতে পারিতেন না, করিতে হইলে ইঁহাদিগকেও জমিদার হইতে হইত। এক সময়ে কলিকাতার ঠাকুর বংশ ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু পরে জমিদার বলিয়াই ইহার সত্যকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে লাহা বংশ ও ভাগ্যকুলের রায়-বংশেরও উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহারা আংশিকভাবে ব্যবসা বজায় রাখিলেও জমিদার হিসাবেই সামাজিক মর্যাদা পাইতেন।

বাঙালি জীবনে সেই যুগে আইনজীবীর প্রাধান্য লইয়া অনেক ইংরেজ বিদ্রূপ করিতেন। যতদূর মনে পড়ে, লর্ড কার্জনই যেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ও সিন্ডিকেটে উকিল-ব্যারিস্টারের প্রাধান্য ও শিক্ষকের অভাব দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার একটা গুরুতর কারণ ছিল। ইংরেজ শাসন যতদিন সত্যকার ব্রিটিশ ছিল ততদিন উচ্চশিক্ষিত বাঙালি আইন ব্যবসায়ে ভিন্ন অন্যত্র নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আইনের দিকেই যাইতেন। ইহাতে তাঁহারা যে টাকা উপার্জন করিতেন তাহা সরকারি চাকুরির বহু গুণ সব সময়েই হইত। মহকুমার সদরেও উকিল-মোক্তার হাকিমের চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিতেন। ইঁহাদের পর ছিলেন চিকিৎসক। ইঁহাদের সকলেরই শিক্ষা ও বুদ্ধি অন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সব জীবনে ইঁহারাই নেতৃত্ব করিতেন।

কিন্তু এখন বাঙালি সমাজের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন নূতন বাঙালি ব্যবসায়ী এবং বড় ব্যবসায়ী কোম্পানিতে (বিশেষত অবাঙালি ও বিলাতি কোম্পানিতে) নিযুক্ত কভেনান্টেড অফিসার অর্থাৎ স্ফীত কেরানী। ইঁহাদের তুলনায় অন্যেরা দ্বিতীয় স্তরের।

॥ ৭ ॥

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ভদ্র বাঙালির পারিবারিক জীবনে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার কথা বলিয়া সমাজের প্রসঙ্গ শেষ করিব।

পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে, একেবারে না ভাঙিলেও এত শিথিল হইয়া পড়িতেছে যে, পরিবার হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, এমন কি সংস্কৃতি রক্ষাও আর হইতেছে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরিবারের ভাঙন যেমন দরিদ্রের গৃহে অবস্থার বিপর্যয়ে দেখা দিতেছে, তেমনই ধনীর গৃহেও সম্পন্নতার জন্যই দেখা যাইতেছে।

ধনীর গৃহে পরিবার শিথিল হইবার কারণ নব্যা মেয়েদের আলস্য, লঘুতা ও আমোদপ্রিয়তা। সাজিয়া-গুজিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া তাঁহারা আর কিছু করিতেই চান না। তাঁহাদের মন সম্পূর্ণ বহির্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। বাড়িতে থাকিতে হইলেও তাঁহাদের মন বান্ধবীর বাড়িতে, কখনও বা বন্ধুর বাড়িতে, সিনেমায়, রেস্টরান্টে, খেলার মাঠে, দোকানে-বাজারে, এমন কি রাস্তায় পড়িয়া থাকে। বাড়িতে অন্যকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেও নির্ভর সম্পূর্ণ চাকর-বাকরের উপর। সুতরাং, এই সব বাড়িতে খাইতে গেলে আড়ম্বর যতই হউক খাওয়ার সৌষ্ঠব এবং আন্তরিকতা পাওয়া যায় না।

অপরপক্ষে প্রত্যেকটি মধ্যবিত্তের ঘরেই প্রায় হয় স্ত্রীকে, নয় বোনকে, নয় কন্যাকে চাকুরি করিতে হইতেছে। কোমরে শাড়ি-বাঁধা, ব্যাগ-ঝোলান যুবতী রাস্তায় পিপীলিকার সারির মতো যাইতে দেখিলে আমার বাল্যকালের কেরানি-পিপীলিকার সার অপেক্ষাও কুদৃশ্য মনে হয়। অথচ উপায় নাই। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অর্থের ধান্দায় ফেরাই সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোকের জীবনের 'রুটিন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরিশ্রমের পর আর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহারও সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক জীবনযাপন করিবার দম থাকে না।

এই ধারা ক্রমশ প্রবলতর হইতেছে। ইহার ফলে বিবাহের ব্যাপারেও একটা বিপ্লব দেখা দিতেছে। আগে কন্যার পিতার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল কন্যাকে বিবাহ দেওয়া। এখন সেই চিন্তা কমিয়া গিয়াছে। সম্পন্ন ঘরে ভিন্ন অন্যত্র মেয়ের বিবাহের চেষ্টাও দেখা যায় না—হইলে হইবে, না হইলে চাকুরি করিবে বা করিতেছে, এই হিসাবই যথেষ্ট। কিছু টাকা থাকিলেও উহা এখন মেয়ের বিবাহের পরিবর্তে একটা অতি বাজে বাড়ি তৈরিতে খরচ হয়।

ইহার মানসিক ও সামাজিক ফল যে খারাপ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সমাজে কোনও চিন্তাই নাই। বহুকাল আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।" এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে।

বরঞ্চ উল্টা একটা চিন্তাধারা, যাহা একটা অলীক সাফাই মাত্র, উহা দেখা দেওয়াতে পারিবারিক জীবন আরও ভাঙিতে বসিয়াছে। উহা এই—মেয়েদের অর্থোপার্জন ও চাকুরি উন্নতির লক্ষণ। বিপদে পড়িলে মেয়েরা অর্থোপার্জন করিয়া স্বাবলম্বী হইবে না, ইহা কেহ বলিবে না। কিন্তু যতক্ষণ মেয়েদের বিবাহ হওয়া সম্ভব ততক্ষণ বিবাহই যে স্বাভাবিক সামাজিক ধর্ম, এমন কি জৈব ধর্ম, ইহা বুঝিতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তবু আর্থিক অভাবের চাপে এই ব্যাপারটা সাদা চোখে কেহ দেখিবার চেষ্টাও করে না।

॥ ৮ ॥

AMARBOI.COM

এইবার সমাজ ছাড়িয়া বর্তমান যুগের সংস্কৃতির দিকে মুখ ফিরাইব। এখানেও বহু পরিবর্তন চোখে পড়ে—যাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। যে-সব সামাজিক পরিবর্তনের কথা এতক্ষণ পর্যন্ত বলা হইল, সংস্কৃতিগত পরিবর্তন তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহার কারণ এই যে, সমাজের ধর্ম সর্বদাই সংস্কৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। আমগাছে যেমন আমড়া হয় না, আমড়া গাছে যেমন আম হয় না, তেমনই এক ধরনের সমাজে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সংস্কৃতি দেখা দিতে পারে না। 'যেমন মা, তেমন ছা', বলিয়া একটা জনপ্রবাদ আছে, সেটা সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধের বেলাতে পুরাপুরি খাটে। সেজন্য বলিতে পারি—যেমন সমাজ তেমনই সংস্কৃতি।

অবশ্য সমাজের সবটুকুই যে সংস্কৃতির স্রষ্টা হয় না, এমন কি সংস্কৃতির অবলম্বনও হয় না তাহা সর্ববিদিত। সমাজে যাহারা সংস্কৃতির ভার বহন করে, তাহারা সমগ্র সমাজের একটা অংশ, একটা বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্ত। ইহাকে অধ্যাপক টয়েনবীর কথায় 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' বলিব। ইহারাই যুগে যুগে দেশে দেশে সংস্কৃতিকে সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির অবলম্বন হিসাবেই এই 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র প্রয়োজন।

গ্রিক সভ্যতার পূর্ণবিকশিত যুগে এথেন্সবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে দায়িত্ববোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে থুকুদিদেস হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিব।

> "আমরা সৌন্দর্যের উপাসক, কিন্তু রুচিতে আড়ম্বরবর্জিত। আমরা মানসিক শক্তির অনুশীলন করি, কিন্তু শরীরের শক্তি হারাই না। অর্থ আমরা ব্যবহার করি—আলোচনা বা আত্মম্ভরিতার জন্য নয়, যথার্থ প্রয়োজনের জন্য। নিজেকে দরিদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের কোনও লজ্জা নাই। কিন্তু দারিদ্র্যমোচন করার জন্য উদ্যমহীন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়াকে আমরা নিন্দনীয় মনে করি। এথেন্সবাসীরা নিজেদের সংসারের তত্ত্বাবধান করে বলিয়া রাষ্ট্রের প্রতি উদাসীন নয় ; এমন কি যাহারা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত তাহাদেরও রাজনীতি সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান আছে। যে ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় কর্মে কোনও আগ্রহ নাই তাহাকে আমরা শুধু নিরীহ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিয়াই ক্ষান্ত হই না, অকর্মণ্য বলিয়াও গণ্য করি। আমাদের মধ্যে নূতন পন্থার প্রবর্তনকারীর সংখ্যা স্বল্প হইলেও সকলেরই রাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতি বিচার করিবার যোগ্যতা আছে।"

এই সম্পর্কে বর্তমান ইউরোপ হইতে শুধু ইংরেজ 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র দৃষ্টান্ত দিব। এই 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'ভুক্ত বহু ইংরেজের সহিত আমার পরিচয় আছে। তাঁহাদের ব্যবহার ও ধারা যে ইংরেজ জাতির সংস্কৃতির উচ্চতম ধারা তাহা আমি বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছি। ইংরেজ জাতির সংস্কৃতির বিশিষ্ট অবলম্বন 'ইংলিশ জেন্টল্ম্যান'। এই আদর্শ গড়িয়া উঠে রিনেসেন্সের সময়ে, পরে পূর্ণবিকশিত হয়। আজও তাহা গ্রাহ্য ও প্রচলিত।

ধর্ম, নীতি, জ্ঞানচর্চা ও সৌন্দর্যপরায়ণতা মিলিয়া ইংরেজ 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র যে আদর্শ সর্বজনগ্রাহ্য, তাহার প্রধান ধর্ম জীবন ও অনুভূতির গভীরতা ও গাম্ভীর্য। বহুকাল ধরিয়া অনুসৃত হইবার ফলে বিলাতের ভদ্রসমাজে এই আদর্শ এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, সামাজিক জীবনের বিপর্যয় এবং দুইটি যুদ্ধের সংঘাতও উহাকে 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র মধ্যে বিচলিত করিতে পারে নাই। এ জিনিসটা আমি সেদিনও দেখিয়া আসিয়াছি।

ইহা ছাড়া ফরাসি, জার্মান ও ইটালিয়ান 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'ভুক্ত যাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় আছে, তাঁহাদের মধ্যেও নিজস্ব সংস্কৃতিগত আদর্শের অবনতি দেখি নাই। ইঁহাদের সহিত কথাবার্তা একটা মানসিক আনন্দের ব্যাপার।

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

বাঙালি সমাজেও যে একটা 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' ছিল, ভদ্র ও অ-ভদ্রের মধ্যে চিরপ্রচলিত ও সর্বস্বীকৃত প্রভেদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে আসিবার আগেও পুরাতন 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' সংস্কৃতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করিত। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি গুণকে কৌলীন্যের লক্ষণ বলিয়া যে গণ্য করা হইত তাহা হইতেই গুণের আদর প্রতীয়মান হয়। কি গ্রাম্য ভদ্রলোক, কি ধনী ভূস্বামী, সকলের মধ্যেই সংস্কৃতির প্রতি কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইত। কেহই বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবনের চাপে এই কর্তব্যে একেবারে অবহেলা করা সঙ্গত মনে করিত না।

পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাব আসিবার পর এই কর্তব্যবোধ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালি ভদ্রসমাজের সংস্কৃতিগত জীবন পুরুষানুক্রমে সহজ সরল পথে ধীর গতিতে চলিবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হঠাৎ যেন উচ্ছল হইয়া উঠিল। ইহার কারণ আর কিছু নয়, পাশ্চাত্যের প্রভাব। এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের চক্ষুর সম্মুখে এমন একটা নূতন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যাহার কল্পনাও সে ইতিপূর্বে করিতে পারে নাই। তাই উহার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া সে এই নূতন ধারাকে নিজের জীবনে বরণ করিয়া লইল।

এই নতুন পথের পথিক হইয়া যাঁহারা নব্য বাংলার সংস্কৃতির আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রথম রামমোহন রায়, দ্বিতীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইঁহাদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ইউরোপীয় দার্শনিক 'হিউম্যানিজমে'র পুরোধা হইয়া ও অপরজন ইউরোপীয় সাহিত্যিক 'হিউম্যানিজমে'র প্রবর্তক হইয়া দুই দিক হইতে আমাদিগকে পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত নব্য বাঙালির শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সে-যুগের জীবন্ত বাঙালিকে এতদূর অনুপ্রাণিত করিয়াছিল যে, তাহারা বিনা বিচারে নূতন পথ ধরিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। তখন তাহারা তাহাদের নূতন সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, গ্রহণ করিবার আগ্রহে ও উৎসাহে এইভাবে বিচার করিবার অবকাশ বা আগ্রহ কিছুই ছিল না।

কিন্তু আজ আমরা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারিয়াছি, উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের শিক্ষিত 'হুইগ্' ইংরেজের আদর্শ। উহা ইটন, হ্যারো, রাগবী, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে শিক্ষার ফল ; গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাসি, ইটালিয়ান সাহিত্যের বিভায় উহা রঞ্জিত। উহার যুক্তিবাদ বেকন-লক্-হিউমের দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংলন্ডের বিশিষ্ট প্রোটেস্টান্টিজমের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধর্ম উহার প্রেরণা জোগাইয়াছে।

সুতরাং চরম হুইগ্ মেকলে যে বাংলাদেশে নূতন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, সব দিক হইতেই তাহার একটা যাথার্থ্য ছিল। বস্তুত সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া শিক্ষিত বাঙালি সংস্কৃতির যে আদর্শকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাহা মেকলের সমধর্মী লিবারেলের আদর্শ। রামমোহন বা মাইকেল, ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী সংস্কারকগণ, সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন বাঙালি ভদ্রলোকের চরিত্র যে সেই ইংরেজি আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ হিসাবে শুধু 'রজনী' উপন্যাসে অমরনাথের কথাবার্তা পড়িতে বলিব।

এমন কি বাঙালি দ্বেষী কিপ্‌লিং পর্যন্ত সিমলাতে লুর্গান সাহেবের দোকানে গ্রাহকদের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

> "There were occasional gatherings of long-coated theatrical natives who discussed metaphysics in English and Bengali, to Mr. Lurgan's great edification. He was always interested in religion."

ইঁহারা অবশ্য চায়না-কোট-পরিহিত সিম্‌লা-কলিকাতায় যাতায়াতকারী ভারত গভর্নমেন্টের কেরানি বাঙালি।

আমি নিজেও বছর চল্লিশ আগে কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে ভড়ং-বিহীন সাহিত্যানুরাগী বাঙালি দেখিয়াছি। একদিন উত্তরপাড়ায় গিয়া মুখোপাধ্যায় বংশসম্ভূত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে শেক্‌সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া জেম্‌স্ জয়স পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের যে পরিমাণ বই দেখিয়াছিলাম, তাহা অনেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে থাকে না। অথচ ভদ্রলোকটি চায়না-কোট ও বার্নিশ করা জুতাপরা, ছোট করিয়া চুলছাঁটা, গোলগাল অমায়িক, স্বল্পভাষী ও চাল বর্জিত ভদ্রলোক। নিজের সম্পত্তি এবং বই দুই-ই তাঁহার সমান ধাতস্থ হইয়া গিয়াছিল।

॥ ১০ ॥

নূতন বাঙালি 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র সামাজিক ও ব্যক্তিগত ধর্মের কথা আগে বলিয়াছি। ইঁহাদের কাছ হইতে সংস্কৃতির ব্যাপারে কি প্রত্যাশা করা যায় ? অবশ্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও বহু ব্যতিক্রম আছে, তাই মনে রাখিবেন আমি শুধু সামান্যধর্মের কথা বলিতেছি। নতুন 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র বেশির ভাগ এক ধরন বা অন্য ধরনের 'টেক্‌নিশ্যান', অথবা সওদাগরী অফিসের স্ফীত কেরানি। একদিন এক আমেরিকান মেমসাহেবের কাছে আমি এই জাতীয় ভদ্রলোককে 'মিস্ত্রি' বলিয়া উল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন, আমেরিকায় তিনি ইহাদের plumber বলিয়া থাকেন। কথাটা বিভিন্ন, কিন্তু অর্থ একই।

এই 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' বড় চাকুরি করেন, এই চাকুরির অহঙ্কার তাঁহাদের মনে সর্বদাই এত জাগরূক যে, চাকুরি করাকেই দেশের উন্নতি মনে করেন ও অবসর সময়ে চাকুরির ধ্যান করাকেই তাঁহারা 'কালচার' বলিয়া মনে করেন। বাকি সময়টুকুর জন্য ইহাদের যথেষ্ট কৃত্য আছে—যেমন, ক্লাবে যাওয়া, মদ্যপান, খেলা দেখা, জলো ফ্লার্টেশ্যান এবং এত-জলো-নয় দুশ্চরিত্রতা। এই সমস্ত কাজ করিবার পর পুরাতন ধরনের সংস্কৃতির চর্চা করিবার সময় বা উদ্যম তাঁহাদের থাকে না।

তবে আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'ভুক্ত পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য, এক কথায় 'কালচার', বেশি। অনেক সময়ে যে-আলোচনা উচ্চপদস্থ বাঙালি পুরুষের সহিত করা যায় না, তাঁহাদের স্ত্রীর সহিত করা যায়।

তবে যুগধর্মে তাঁহাদিগকে অন্য ব্যাপারে সব সময়েই যোগ দিতে হয়। তাহার উপর অনেকের স্বাভাবিক চাপল্য আছে, যাহার জন্য তাঁহারা কোনও জিনিসই গভীরভাবে অনুভব করিতে পারেন না।

ইঁহারও উপরে নূতন 'স্ট্যান্ডার্ড অফ্ লিভিং' তাঁহাদিগকে যেভাবে 'বস্তুতন্ত্র' অর্থাৎ বস্তুর উপাসক করিতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। তাঁহারা যদি শুধু বস্তুর ব্যবহার সম্বন্ধেই আগ্রহশীল হইতেন, বস্তুর সৌন্দর্যের অনুরাগী হইতেন, তাহা হইলে এই বস্তুতান্ত্রিকতাকে নিশ্চয়ই কালচার বা কালচারের প্রথম সোপান বলিতাম। কিন্তু ইঁহাদের বাড়িতে সুন্দর ও দামী জিনিস রাখা এবং ঘর-দুয়ার সাজাইয়া রাখা প্রধানত সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত আকর্ষণের জন্য নয়, এইরূপ গৃহসজ্জার সামাজিক মর্যাদার জন্য। জাপানী ধরনে ফুল সাজাইবার যে একটা ফ্যাশন হইয়াছে, উহা আমাদের স্বাভাবিক নয়, কারণ জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ ও হিন্দুর সৌন্দর্যবোধ এক ধরনের নয়। ইহা একেবারেই কৃত্রিম ফ্যাশন।

মোটর গাড়ি সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন ভাবও এই মনোভাবেরই প্রকাশ। এখন বিদেশী গাড়ি না আসাতে বিদেশে তৈরি গাড়ি সম্বন্ধে যে লোলুপতা দেখা যায় তাহা মোটর-কার রাখিবার মধ্যে যতটুকু সত্যকার কালচার আছে তাহারও বিরোধী। আমি দিল্লিতে একদিন একটি মার্সেডেস্-বেনৎস্ গাড়িতে চাণক্যপুরীর মতো পল্লীর ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। (দোহাই, আমার নিজের গাড়ি বলিয়া মনে করিবেন না!) হঠাৎ দেখিলাম, গাড়িটা দূর হইতে চোখে পড়িবামাত্র দুইটি ভদ্রমহিলা (যুবতী) দোতলার বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, দেখিবার জন্য উহার আরোহী কোন্ ব্যক্তি।

ইহার অপেক্ষাও একটা তামাশার ব্যাপার আমার ছেলেরা একদিন কলিকাতায় দেখিয়াছিল। একটি ভদ্রমহিলা এক বাড়িতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বারবার তিনতলার জানালাতে যাওয়াতে আমার এক ছেলে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তর দিলেন, "আমার মার্সেডেস্-বেনৎস্ এসেছে কি না দেখছি।"

কলিকাতায় কি এখনও যুবতী পত্নীরা স্বামী গৃহে ফিরিতেছেন কি না দেখিবার জন্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকেন ? যদি থাকেন এবং তাঁহারা যদি 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'ভুক্ত হন, তাহা হইলে কেহ জানালার কাছে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো বলিবেন, "আমার আন্ডার-সেক্রেটারি, কভেনান্টেড অফিসার, কাপ্তানসাহেব আসিতেছেন কি না দেখিতেছি।"

॥ ১১ ॥

তবে সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা যে একেবারে না হয় তাহা নয়। কিন্তু উহা হইয়া থাকে 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে—অর্থাৎ অধ্যাপক, লেখক ও এই ধরনের বুদ্ধিজীবী মহলে। ইঁহাদের আলোচনার কিন্তু একটা ভদ্রতা ও বৈদগ্ধ্য বিরোধী দিক আছে। ইহারা সামাজিক আলাপে অতি সহজেই তর্ক ও কচ্‌কচি জুড়িয়া দেন এবং পরে অশোভন ঝগড়াও শুরু হয়। আমার সহিত মতের মিল নাই, এই কথা আমি বাঙালি-অবাঙালির মুখে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তখনই আমি বলি, "একমত হইবেন কেন ? আমি তো তাহা প্রত্যাশা করি না। আমার কথাটা যদি পড়িয়া আপাতত একটু প্রণিধান করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট।" অথচ ছাপার অক্ষরে বা কথাবার্তায় আমার বইগুলির যথার্থ আলোচনা কোথাও পাই না।

কলিকাতার একটি ভদ্রমহিলা দিল্লিতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন লিখিয়া পাঠান। তিনি আমার লেখার অনুরাগিণীও বটেন, কিছু আপত্তিকারিণীও বটেন। তাই তাঁহাকে আমি লিখিলাম, "আমার বাড়িতে আসিলে আপনি লেখক নীরদ চৌধুরীকে পাইবেন না, পাইবেন বাঙালি ভদ্রলোক নীরদ চৌধুরীকে।" আমাদের সমাজে যাঁহাদের সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে আগ্রহ আছে, তাঁহারা লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিতে আসিলে ভুলিয়া যান যে, লেখক ও মানুষটা এক নয়। আমি লেখায় খুব উগ্র মত প্রকাশ করি বলিয়া অনেকে ভাবেন, আমার বাড়ি আসিলেও আমি তাঁহাদিগকে সেই সুরে লেক্‌চার ঝাড়িব। তাহা হইলে কোনও কর্নেল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে প্রস্তুত হইয়া যাইতে হয়, তিনি অতিথিকে গুলি করিয়া মারিবেন। তর্ক না করিয়াও যে সংস্কৃতিমূলক আচরণ করা যায়, ইহা শিখিতে আমাদের এখনও বাকি।

এই প্রবন্ধে সংস্কৃতি সৃষ্টির দিক আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আজ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সৃষ্টি কিভাবে হইতেছে, তাহার মূল্য কতটুকু সে-বিষয়ে আমি কিছুই বলিব না। তবে 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'ও সৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রসর হইলে কি করিতে পারেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। লেখক বিদ্বান ও বিদগ্ধ এবং তাঁহার সহিত আমার চল্লিশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহাকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করিয়াছি, তাই বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য হইতে অবসর লইবার পর বাঙালির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন 'অবদানে'র পরিচয় পাইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছি। তিনি 'লোপামুদ্রা' নামে একটি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত রূপ বিজ্ঞাপন দেখিলাম,

**লোপামুদ্রা**
**নির্মলচন্দ্র মৈত্র**

**কুলু উপত্যকার মানালি পাহাড়ে সাহিত্যের অদ্বিতীয় অধ্যাপক ডক্টর অরিন্দম মৈত্র বঙ্গ সাহিত্যের অজানা জ্যোতিষ্ক কবি লোপামুদ্রা দেবীকে আবিষ্কার করতে এলেন। প্রথম রাত্রেই 'পর্বত-বন্দনা' উৎসবে লোপামুদ্রা দেবীর জীবনীলেখক শিরীণ দস্তুর অদৃশ্য**


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আততায়ীর হাতে নিহত হন। তারপর থেকেই একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলে।

উত্তর কাশীতে বেদান্ত, বিষ্ণুকাঞ্চিতে হিন্দু দর্শন আর বিলেতে এজরা পাউন্ডের নির্দেশে চাইনিজ 'প্রোসেডি'তে হাত পাকান, স্ত্রীর এলোপমেন্টের সৌভাগ্যের পর সম্ভোগ্যাদের শ্রোণিপয়োধরে আকৃষ্ট বিদগ্ধ পণ্ডিত ও জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাহত ফাল্গুনী রায় ; 'ইনটিগ্র্যাল যোগ' বিশারদ মহারাজা, স্যার টমাস মোর-এর 'ইউটোপিয়া' না পড়ার অপরাধে কনস্টেবুলারীর চীফের যিনি চাকরি খেয়েছেন ; মেয়েদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ডক্টর মৈত্রের ভ্যান-দ্যা-ভেলদির 'আইডিয়াল ম্যারেজ' অবলম্বন করে লাস্যময়ী সুন্দরী সন্দুপলার গৃহে চোরাই প্রেমের সওদা সারা ; বিলেত, প্যারী ও দিল্লির ম্যাসাজ হোমের মালিক সিন্ধি যুবা আল্‌হা আর উদাল ; সাতচল্লিশটি এয়ারকনডিশন্ড বেডরুমওয়ালা কারাগারের সুখেতের বেগম-সাহেবা ; মহাপট্টনায়িকা লালিমা সারাভাই একে একে এসে হাজির হন। এই সময় সুন্দরম খুন হল। কবি লোপামুদ্রা দেবীর অফিসিয়াল বায়োগ্রাফার অরিন্দম মৈত্র নার্স উর্মিলা চ্যাটার্জিকে আবিষ্কার করলেন। গভীর ষড়যন্ত্রের অন্যতমা চরিত্র মিসেস প্রধান শেষ পর্যন্ত নিজের জালেই জড়িয়ে পড়েন।

রহস্যময়ী মানালি। জৌলুস, নগ্নতা, রিক্ততা, আভিজাত্য, বিলাসিতা ও বহুবিধ প্রমত্ততায় অস্থির। বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সার্থক সৃষ্টি ॥

এখনও বুঝিতে পারি না, এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য কি। যদি মানিয়াই লই, এই ধরনের বিজ্ঞাপনে লেখকের হাত নাই, তবু বলিব কেহ যদি আমার বই-এর এইরূপ বিজ্ঞাপন দিত তাহা হইলে আমি মানহানির মোকদ্দমা করিয়া বই তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতাম। অবশ্য বিজ্ঞাপনের বর্ণনা ও বই-এর প্রকৃত তাৎপর্য এক হইলে তাহা পারিতাম না। ধরিয়া লইতেছি বই ও বিজ্ঞাপনে খুব বেশি পার্থক্য নাই। তবে এই বই লেখা কেন ? ইহা কি সংস্কৃতি-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নূতন 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'র আত্মপ্রকাশ ?

অথচ আমার মতামতের বিরুদ্ধে যাঁহারা অভদ্র চেঁচামেচি করেন, তাঁহাদের কাহাকেও ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে দেখিতেছি না। এই ধরনের বই আগে বটতলা হইতে আসিত, এখন 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' হইতে আসিতেছে। ইহা কি যুগধর্মের সূচক ? যদি তাই হয়, তবে, বর্তমান যুগের সংস্কৃতির সহিত আমার কোনও একাত্মতা নাই।

শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পূর্ববঙ্গের সমস্যা

॥ এক ॥

## প্রকৃতির বিধান

লক্ষ্য করিবেন, পূর্ব পাকিস্তানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানের যে বিরোধ চলিয়াছে, উহাকে আমি 'পূর্ববঙ্গের সমস্যা' বলিতেছি। এই সংজ্ঞা ইচ্ছাকৃত। আমি পূর্ব পাকিস্তানকে আজও পূর্ববঙ্গ বলিয়াই মনে করি, শুধু দেশটা আর এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়াই উহার সত্তা লোপ পাইয়াছে, ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

ইহাও মনে রাখিবেন, আমাদের গভর্নমেন্টও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে ভিন্নমত নন। অবশ্য আসল কথাটা পেটে রাখিতেছেন, কিন্তু সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। তাঁহারা ভারতবর্ষে 'বাংলা' দেশ বলিয়া কিছু আছে স্বীকার করেন না ; আমার কাছে যেমন, তেমনই তাঁহাদেরও কাছে 'বাংলা' অতীতের বস্তু। বর্তমানে যাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত উহাকে তাঁহারা 'পশ্চিমবঙ্গ' বলেন, 'বঙ্গ' নয়। পাঞ্জাবের বেলাতে ইহার স্পষ্ট ব্যতিক্রম হইয়াছে। স্বাধীনতার পর কিছুদিন আজকালকার ভারতবর্ষভুক্ত পাঞ্জাবকে 'পূর্ব পাঞ্জাব' বলা হইত। তারপর এই নাম সম্পূর্ণ অর্থহীন—কেননা ভারতবর্ষে তো আর দ্বিতীয় কোনও পাঞ্জাব নাই, এই যুক্তি দেখাইয়া 'পূর্ব পাঞ্জাব'কে শুধু 'পাঞ্জাব' করা হইল। বাংলার বেলাতে ইহার ব্যতিক্রম হইল কেন, একই যাত্রায় দুই ফল দেখিতেছি কেন ?

উত্তর সহজ। পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ প্রাকৃতিক ভারতবর্ষের অংশ নয় ইহা মানিয়া লইয়া উহার মোকররী স্বত্ব ইসলামী পশ্চিম এশিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হইয়াছে। বাংলার বেলাতে তাহা করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ মনে মনে বাংলাই আছে, কার্যত রাজনৈতিক দোটানায় পড়িয়া বীলার ধূমকেতুর মতো ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবে সেই ধূমকেতু ১৮৪৬ সনে বিচ্ছিন্ন হইবার পর ১৮৫২ সন হইতে আর দেখাই যায় নাই। বাংলাকে এখনও অদৃশ্য করা যায় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বাংলাকে 'পশ্চিমবঙ্গ' বলা হইতেছে। উহার পাল্টা দিকে একটি 'পূর্ববঙ্গ' উহ্য আছে। এ-ব্যাপারটা কোনও বড় সম্পত্তি ভাগ হওয়ার পর 'বড় তরফ', 'ছোট তরফ' বলিয়া বর্ণিত হইবার মতো।

কিন্তু আমাদের মনোভাব যাহাই হউক, তাহার সহিত বর্তমান পশ্চিম-পূর্ব পাকিস্তান বিরোধের সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই। জানা আবশ্যক পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনোভাব কি, সেটাই আসল কথা। আমাদের ইচ্ছায় বা কথায় পূর্ব পাকিস্তানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের ইতরবিশেষ হইবে না। (দিল্লি হইতে পূর্ব পাকিস্তানের শিরে যে আশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া একটি পুরাতন বাংলা প্রবাদ আমার মনে পড়ে—শকুনের শাপে গরু মরে না।) যদি কিছু হইবারই হয়, হইবে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণের ইচ্ছায় ও চেষ্টায়। এ-বিষয়ে তাহাদের মত কি ? কোনও সন্দেহই নাই যে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারা নিজেদেরকে বাঙালি ও দেশকে পূর্ববঙ্গ বলিয়াই মনে করে। সেজন্যই আমি তাহাদের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটকে 'পূর্ববঙ্গের সমস্যা' বলিব।

তবে উহা আজ পূর্ববঙ্গের সমস্যা হইলেও মূলত সমগ্র বাংলার সমস্যা। আবার উহা কেবলমাত্র আজিকার সমস্যা নয়, সমসাময়িক ব্যাপার মাত্র নয়। সমস্যাটা বহু শতাব্দীর, পূর্ববঙ্গে শুধু উহার নূতনতম রূপ দেখা যাইতেছে। যে বাংলাদেশকে প্রকৃতিসৃষ্ট বাংলা বলা চলে, তাহার সহিত উত্তরাপথের সম্পর্কের একটা বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস আছে। আজিকার যে-বিরোধ তাহা সেই ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। অন্তত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাংলার সহিত উত্তরাপথের স্থায়ী বা অপরিবর্তিত রূপ দেখা যায় নাই। পালাক্রমে সম্পর্কটা একবার দৃঢ় হইয়াছে, আর একবার শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কখন কি রূপ ধরিবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাষ্ট্রের শক্তির পরিমাপে। সেই সম্পর্ক বিবর্তন আজও চলিয়াছে।

এই সম্পর্ক বিবর্তনের আজ দুইটি রূপ দেখিতে পাইতেছি। উহার একটি পশ্চিমবঙ্গে, একটি পূর্ববঙ্গে, একটি তন্দ্রাগ্রস্ত, একটি জাগ্রত। কিন্তু দীর্ঘযুগব্যাপী এই যে সমস্যা তাহার প্রকৃত রূপ আজ পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে বেশি প্রকট। ইহার যথাযথ কারণ আছে। পাকিস্তানের মূল ধর্ম ও রূপ একটা কারণ বটে, উহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এইখানে যাহা বলা দরকার তাহা এই, আমার মতে আজ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি বাঙালি ধর্মী, এবং বাংলাদেশ হিসাবে শক্তিও বেশি রাখে।

আগে শক্তির কথাই বলা যাক। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে পোলিওগ্রস্ত শিশুর মতো, তাহার ভারত গভর্নমেন্ট প্রদত্ত লোহার শলা ও খোঁড়ার-লাঠি ভিন্ন দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। স্বাবলম্বী হইবার শক্তি প্রধানত নির্ভর করে আয়তন ও লোক সংখ্যার উপর। এই দুই দিক হইতেই পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা অনেক দুর্বল। পুরাতন বাংলার পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে অখণ্ডিত অবস্থায় একমাত্র বর্ধমান ডিভিশনই পশ্চিমবঙ্গে আছে। উহার জেলাগুলির মধ্যে হুগলি ও হাওড়াকে এখন বৃহত্তর কলিকাতার অংশই বলা চলে। এই দুইটি জেলার স্বতন্ত্র আর্থিক ভিত্তি বা নিজস্ব জীবন নাই। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের যেটুকু আমাদের তাহা বেশি নয়। রাজশাহী ডিভিশনের ভাগ আরও কম এবং তুচ্ছ। উহার যেটুকু আমাদের তাহাকে আমরা স্বাধীনতার আগে খাঁটি বাঙালির বাসভূমি বলিয়া মনে করিতাম না—কারণ এ-অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীর বেশির ভাগই ছিল আধা-হিন্দুস্তানী-বা-মৈথিলী, আধা-সাঁওতাল, যাহে, কোচ, রাজবংশী ও লেপচা।

অপরপক্ষে বাংলাদেশের দুটি সমৃদ্ধ ও উর্বর ডিভিশন—অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম, পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তানে, প্রেসিডেন্সি ডিভিশন ও রাজশাহী ডিভিশনের ভাল অংশও সেখানে। তাহার উপর শ্রীহট্ট জেলা আসিয়া পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মোটের উপর জাতিত্বের হিসাব লইলে খাঁটি বাঙালির বাস এখন যে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গে বেশি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পাল্লার সেদিক অনেক ভারী।

অবশ্য কলিকাতা এখনও পশ্চিমবঙ্গে। কিংবা এখনও বলা যায় যে, কলিকাতাই আসলে পশ্চিমবঙ্গ, বাকীটুকু নগণ্য। ইহাতে বাংলাদেশের চেহারা বাল্যকালে দেখা একটি ব্যঙ্গচিত্রের মতো হইয়া গিয়াছে। এই ছবিতে বাংলাদেশের যে মনুষ্যরূপী মূর্তি দেখান হইয়াছিল, তাহাতে শুধু প্রকাণ্ড মাথার নীচে দুটি সরু-সরু পা দেওয়া হইয়াছিল, বুক পিঠ পেট কোমর ইত্যাদি হাঁটুর উপরের কোনও অঙ্গ ছিল না। এই মূর্তিকে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবর্জিত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নবশাখ দিয়া গঠিত বাঙালি সমাজের প্রতীক বলিয়া ধরা হইয়াছিল। আজ মাথা যে শুধু আরও অনেক বড় হইয়াছে তাহাই নয়, উহার পিছনে একটি লম্বা হিন্দুস্তানী টিকিও জুটিয়াছে ; আর পা-দুটি আরও ক্ষীণ হইয়াছে।

সুতরাং এক সময়ে যে কলিকাতা বাঙালির নূতন জীবন ও নূতন সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, সে কলিকাতা আর নাই। বাঙালির জীবনের কেন্দ্র হিসাবে এখনও কলিকাতা যতটুকু বর্তমান, উহা ক্ষয়িষ্ণু বনিয়াদিবংশের জীর্ণ অট্টালিকার মতো। এখানে বাস করিয়া আজিকার বাঙালি শুধু পুরাতন কৃতিত্বের অনুবর্তন ও পুরাতন ধারাকে বাঁচাইয়া রাখাই চরম কৃতিত্ব মনে করে। নতুন সৃষ্টির উৎসাহ তো সেখানে দেখিই না, এমন কি কেহ যে ভবিষ্যতের খুব ভরসা রাখে, তাহারও লক্ষণ কমই দেখা যায়।

এই পুরাতন জমিদার বাড়িতে পাওনাদারের অভাব নাই, এমন কি দেওয়ানজীর নতুন জমিদাররূপই উগ্রমূর্তিতে দেখা যাইতেছে। কলিকাতা আজ ভারতবর্ষের সম্পত্তি, শুধু বাঙালির নয়। উহার থেকে সংখ্যাও বোধহয় অর্ধেকের কাছাকাছি হিন্দুস্তানী ও অবাঙালি। ইহার চেয়েও বড় কথা কলিকাতায় আর্থিক প্রাধান্য অবাঙালির। বেশির ভাগ বাঙালিই ইহাদের বেতনভোগী কর্মচারী। সর্বতোভাবে দেখিলে উহাকে অখিল ভারতীয় মহানগরী বলা উচিত। এখনও হয়তো বাঙালি নিজ বাসভূমে একেবারে পরবাসী হয় নাই। কিন্তু বর্তমান স্রোত যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই যে তাহাও হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার তুলনায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের প্রাণশক্তি বেশি। আজ সে যতই বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত বা নিপীড়িত হউক না কেন, সে সংখ্যার জোরে, মনের জোরে ও ভরসায় বাঙালিই আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অস্তমান, তাহারা উদীয়মান। পূর্ববঙ্গের মুসলমানের স্বাভাবিক বাঙালিত্ব বেশি। সেইজন্যই বলিতেছি যে, বাংলাদেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্কের যে-সমস্যা যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, তাহার প্রকাশ আজ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে বেশি। পূর্ববঙ্গের সমস্যা আসলে সমগ্র বাংলার সমস্যারই প্রকাশিত রূপ।

AMARBOI.COM

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হইতেই বাংলার রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রভাবের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। আমি যাহাকে 'প্রাকৃতিক বাংলা' বলিয়াছি, উহা ভূগোলের বাংলা, রাজনীতির নয়। ভূগোলের বাংলা ও রাজনীতির বাংলা কি করিয়া বিভিন্ন হইল, তাহার কথা পরে বলা যাইবে। আগে ভূগোলের বাংলা বর্ণনা করিতে হয়।

এই বাংলার সীমা যেরূপ সুনির্দিষ্ট, দ্বীপ না হইলে কম দেশেরই এইরূপ হইয়া থাকে। এই সীমার মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব দুইটি বঙ্গই আছে, উহাদের মধ্যে কোনও স্বাভাবিক সীমানা টানিয়া দুটিকে পৃথক করিবার উপায় নাই। এই বাংলা পলিমাটি দিয়া গড়া একটা অখণ্ড ও-অখণ্ডিতব্য সমতলভূমি। এই দেশ নদীমাতৃক। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, মিশর নীল নদের দান, তেমনই বাংলাদেশ বাংলার নদনদীর দান। ইহাদের মধ্যে তিনটি বিরাট নদী—গঙ্গা, স্থানীয় নাম পদ্মা ; ব্রহ্মপুত্র, স্থানীয় নাম যমুনা ; মেঘনা, সুরমা ও বরাক নদীর সম্মিলনে উদ্ভূত। উহাদের আবার অগণিত, ছোট-বড় শাখানদী ও উপনদী আছে। এই সব জলপ্রবাহ যেন জলের জালের মতো। কিন্তু বাংলাদেশের স্থলভূমিকে উহারা কখনও কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করে নাই। বরঞ্চ নদীর দ্বারা বাংলা বেশি ঐক্যই পাইয়াছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের শরীরে পেশীর সহিত ধমনীর যে সম্বন্ধ, বাংলাদেশের নদী ও স্থলের মধ্যে ঠিক সেই সম্পর্ক।

বর্ষার বৃষ্টিও বাংলাদেশের ঐক্যকে আরও নিবিড় করিয়াছে। পৃথিবীতে যে জায়গায় বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি হয়, পূর্ববঙ্গ তাহারই গায়ে ঘেঁষা। আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের উত্তর-পূর্ব কোণে, বাল্যকালও সেখানেই কাটিয়াছে। সুতরাং বৃষ্টির জল পূর্ববঙ্গকে কি রূপ দিতে পারে, তাহা আমার সুপরিচিত। বর্ষাকালে সমস্ত দেশটা নদী, খাল, বিল, পুকুর ও ডাঙা জমির একটা জটিল আঁকাবাঁকা ছক হইয়া দাঁড়ায়। উহাতে মানুষের উভচর হওয়া ভিন্ন গতি থাকে না। পূর্ববঙ্গের তিন-চার বছরের শিশুকে আমি সাঁতার দিতে দেখিয়াছি। পরজীবনে ভোঁদড়ের সাঁতার দেখিয়া উহাদের কথা মনে হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ এইভাবে জলপ্লাবিত হইবার কারণ সকলেরই জানা থাকিবার কথা। তবু সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। বঙ্গোপসাগর হইতে যে-মেঘ ওঠে, তাহা বায়ুবেগে উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে আসিয়া বাংলাদেশের তিন দিকের পাহাড়-পর্বতে ঠেকিয়া যায়, একেবারে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। এই সব পাহাড় পশ্চিমে ছোটনাগপুরে বিন্ধ্য ও কাইমুরের প্রসার, উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আসাম অঞ্চলের পার্বত্য দেশ—অর্থাৎ গারো, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া, কাছাড়, লুসাই ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পাহাড়। এই পর্বত-পরিধির মধ্যে বাংলার সমভূমি মেঘের বর্ষণক্ষেত্র—ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া'। ঘোরধারায় বারিবর্ষণের ফলে যে প্লাবন হয়, তাহাতে পূর্ববঙ্গে মানুষ একদিকে যেমন ঘরে বন্ধ হয়, আর একদিকে বন্ধনমুক্ত হইয়া সচলও হয়।

ছোট নদী ও খালে তখনই নৌকা চলাচল করিতে পারে। তাই পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালই রেল হইবার আগে আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি বেড়াইতে যাইবার সময় ছিল—বিশেষত মেয়েদের পক্ষে ; যাঁহাদের হাঁটা বা হাতি-ঘোড়া চড়া সম্ভব ছিল না, এবং পাল্কি চড়া ব্যয়সাধ্য ছিল। বধূরা তখনই বাপের বাড়ি যাইত ও পূজার সময় শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিত। আমাদের অঞ্চলে এই ভ্রাম্যমাণা নারীদের আমরা "নায়রী" বলিতাম। কথাটার ব্যুৎপত্তি কি জানি না, সম্ভবত 'নাও' বা নৌকা হইতে। কার্যত তাঁহারা যে নৌকাবাহিনী হইতেন সে বিষয়ে অন্তত সন্দেহ নাই। জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকিলে সেকালে পূর্ববঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ রাখাই কঠিন হইত।

এই তো গেল ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ ঐক্যের দিক। এর পর সেই অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতার কথা ধরা যাক। বাংলার সমভূমি তিন দিকে প্রায় সম্পূর্ণ পাহাড়-পর্বত-বেষ্টিত। সে-সব পাহাড় কি কি তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সব পার্বত্য বাধা অতিক্রম করিয়া পুরাতনকালে বাঙালির পক্ষে বহির্মুখীন হওয়া দুরূহ ছিল। উত্তরাপথের সঙ্গে বাংলার যোগের একমাত্র পথ তাই ছিল মিথিলা ও ত্রিহুতের ভিতর দিয়া। উহা চওড়ায় খুব বেশি হইলে পঁচাত্তর মাইল। কিন্তু সে-সময়ে এক গঙ্গা ভিন্ন ইহার ভিতর দিয়াও বেশিসংখ্যক লোকের যাতায়াতের আর কোনও পথ ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতার দরুন বাঙালির পক্ষে জাতীয়ভাবে 'কুণো' ও 'স্বার্থপর'—অন্তত্পক্ষে আত্মসমাহিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

তাহার উপর বিচ্ছিন্নভাব আরও দৃঢ় করিবার জন্য জাতিগত একটা কারণ জুটিয়াছিল। ইহার জন্যও বাঙালিকে উত্তরাপথের দিকে সম্মুখীন না হইয়া দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইতে হইয়াছিল। বাংলার তিনদিকে যে-সব জাতি বাস করিত, তাহাদের কেহই বাঙালি নয়, এমন কি হিন্দু বা হিন্দুসভ্যতার অংশীদারও নয়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উহারা সকলেই অস্ট্রালয়েড বা মঙ্গোলয়েড আদিম জাতি—যেমন—ওঁরাও, কোল, সাঁওতাল, লেপচা, ভুটিয়া, তিব্বতী, গারো, হাচাং, খাসিয়া, সিন্তেং, কুকি, চাকমা ইত্যাদি। উহাদের সহিত বাঙালির কোনও মানসিক বা সামাজিক সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য এই সকল জাতির দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলকে বাংলার পিছন দিক, বা ভৌগোলিকরা যাহাকে 'হিন্টারল্যান্ড' বলেন, তাহা বলা যাইতে পারে।

স্থলের দিক হইতে মুখ ফিরাইবার ফলে বাঙালির হিমালয় সম্বন্ধে, হিমাদ্রির অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য কোনও আগ্রহ দেখা যায় নাই। তাহারা তুষারাবৃত গিরি ও গিরিশিখর নিশ্চয়ই দেখিয়াছিল, কিন্তু কোনও বাঙালি কবি কখনও বলে নাই যে, হিমালয়ের বরফ 'রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।' বাংলার উত্তরের একটি হিমালয় শিখরেরও নাম সংস্কৃতমূলক নয়, সবই তিব্বতী। পক্ষান্তরে, পূর্ব নেপালে গৌরীশঙ্কর হইতে গাঢ়বালে শ্রীকান্ত পর্যন্ত সব নামই সংস্কৃত বা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। উত্তরাপথবাসীর কাছে হিমালয় ছিল স্বর্গের পথ, সাধনার আশ্রয়, মোক্ষের আলয়—'দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাঙালি ও উত্তরাপথবাসী পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়া বিপরীতমুখী হইয়াছিল।

বায়ুপ্রবাহ ও জলের স্রোতও বাঙালির মনকে তেমনই দক্ষিণাভিমুখী করিয়াছিল। বাংলাদেশে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম হইতে যে বায়ু বহে, উহা প্রখর শীতের শুষ্ক বায়ু। সুখের মন্দানিল দক্ষিণ-সমুদ্র হইতেই আসে। তাই দক্ষিণমুখী না হইলে কোনও বাঙালি বাড়িকে ভাল বলা হয় না।

তেমনই বড়-ছোট সব নদীর জলপ্রবাহও ছুটিয়া বা নাচিয়া দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে গিয় বাঙালিকে দক্ষিণাভিমুখী করে। কোন্ মন উজানে জীবনের নৌকা টানিতে চায়! আমি নিজের চক্ষে এই জলপ্রবাহের সমুদ্রযাত্রা কত দেখিয়াছি। বর্ষায় পদ্মার উপর দিয়া যাইবার সময় মনে হইয়াছে স্বয়ং উমার বাংলা নদীরূপ ধরিয়া যোগিনী পার্বতীর মতো সিন্ধুমাতা মেনকার দিকে হাত বাড়াইয়া চলিয়াছেন।

সুতরাং প্রাচীন বাঙালি যে দক্ষিণযাত্রী, নৌকাবাহী, সমুদ্রগামী হইবে তাহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাহারা বাণিজ্যসূত্রে সুদূর জাভা পর্যন্ত যাইত। বাংলা ভাষায় প্রাচীন গল্প ছাড়া একটি অন্তত আধুনিক বই এই বিষয়ে আছে—সেটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেণের মেয়ে'। অবশ্য বাঙালি উত্তরাপথেও যাইত। কিন্তু তাহা ধর্ম ও হিন্দুসভ্যতার প্রতি কর্তব্যবোধ হইতে। বাংলার সমাজ ও সভ্যতা হিন্দু সভ্যতারই একটা স্থানীয় রূপ, সুতরাং আদিবাস ও আদিজীবনের সহিত যোগ রাখিতে হইলে তাহাকে আর্যাবর্তেও যাইতে হইত—বিশেষ করিয়া ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের। ইহা ছাড়া মুসলমানী আমলে যাইত বৈষয়িক উন্নতির আশায়। কিন্তু দিল্লিতে 'রাজাই করিতে' গিয়া অনেককে খিলাপও করিতে হইত 'দুধে-ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কে বা দিল...' ইত্যাদি।

## ॥ দুই ॥

## জাতিত্ব, জীবনযাত্রা, ইতিহাস

ভৌগোলিক ব্যাপারের পর বাংলার নৃতত্ত্বের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির জাতিত্বের সন্ধান লওয়া দরকার। বাঙালি কি আর্য, না অনার্য? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভদ্র বাঙালি অতিরিক্ত আর্যামির বড়াই করিত। এই সব বাঙালি হিন্দু গোঁড়া এবং


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষণশীল ছিল। তাই ব্রাহ্মপন্থী ও উদারনৈতিক বাঙালি অনার্যত্বের বড়াই করিতে আরম্ভ করিল। এই আর্যত্ব-অনার্যত্বের তর্ক বাংলার আধুনিক বিবর্তনের ঝগড়া, ঐতিহাসিক আলোচনা নয়। আজ অনার্যত্বের ধুয়া ধরা তাও নয়, একটা ঢং মাত্র।

সব বাঙালিকে জড়াইয়া দেখিলে বাঙালি যতটুকু অনার্য তার চেয়ে কম আর্য নয়। ইহা কোন্ বাঙালি সমাজের কোন্ স্তরে আছে তাহার উপর নির্ভর করে। আমি ভদ্র ও উচ্চবর্ণের বাঙালিকে আর্যেতর, বা আর্যেতর জাতির সংমিশ্রণে দোআঁসলা বলিয়া মোটেই স্বীকার করি না। অল্প জাতিসঙ্কর যে নাই তাহা বলিব না, কিন্তু না জাতিত্বে, না সংস্কৃতিতে উহার গুরুত্ব কিছুই নাই। তবে বাংলাদেশের জনসমষ্টির গঠন উত্তরাপথের জনসমষ্টির গঠন হইতে বিভিন্ন। সেখানে যাহা নাই, এখানে তাহা আছে—অর্থাৎ বাংলাদেশের ভদ্রলোক ও ভদ্রেতর লোকের মধ্যে বরাবরই একটা অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল। এই বৈষম্যের মূলে কি আছে দেখা দরকার।

উত্তরাপথের অর্থাৎ আধুনিক হিন্দুস্থানের প্রাচীন নাম আর্যাবর্ত। ইহা হইতে মনে করা সঙ্গত যে, উহা বিশেষভাবে আর্যের দেশ, অর্থাৎ এই অঞ্চলে আর্য অনার্যের বেশি সংমিশ্রণ হয় নাই। বরঞ্চ সংমিশ্রণ দূরে থাকুক, আর্যাবর্তে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তর, ভূস্বামী ও কৃষক, উপস্বত্বভোগী ও শ্রমজীবী, যোদ্ধা ও বণিক, এ-সবের মধ্যে কোনও জাতিগত ভেদ ছিল বলিয়াও মনে হয় না। শূদ্রকে ভারতবর্ষের আদিম অনার্যের সন্তান বলিয়া মনে করার মতো ভুল খুব কমই আছে।

কিন্তু বাংলাদেশে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। উহা পুরাপুরি আর্য উপনিবেশ হইবার অবকাশ কখনও পায় নাই। যতদূর অনুমান করা যায়, এখানে আর্যেরা বসতি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা জাতিগত গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। সম্ভবত বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশের ডাঙ্গা অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে আগত কোনও আদিম অধিবাসী ছিল। পূর্ববঙ্গের বাঙালি কৃষকের চেহারার সহিত মালয় দেশের লোকের চেহারায় বেশ একটা আদল আছে। সুতরাং তাহারা মধ্য-ভারতের অস্ট্রালয়েড জাতি হইতে উদ্ভূত তাহা বলা চলে না। আমার মনে হয়, পীতকায় মঙ্গোলয়েডদের প্রসার হইবার আগে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়িয়া কোনও কৃষ্ণকায় মঙ্গোলিয়ান ছাঁচের জাতি ছিল। এই প্রোটো-মঙ্গোলয়েডরাই বাংলার আদিম অধিবাসী।

বিজয়ী ও ঔপনিবেশিক আর্যেরা বাংলাদেশে ইহাদেরই উপর আধিপত্য করিত। তাহাদের উচ্চতর জীবন এই অনার্য জনসমষ্টির শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সামাজিক ও বৈষয়িক ধারা বিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্তও পরিবর্তিত হয় নাই। বাংলার জনসমষ্টিকে এইজন্য দুই স্তরে বিভক্ত করা যাইত—এক, উপনিবেশস্থাপনকারী ভদ্রসম্প্রদায় ; আর এক, পুরাতন অধিবাসীর দাস সম্প্রদায়।

এই দিক হইতে দেখিলে উত্তরাপথ ও বাংলাদেশের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিগত পার্থক্যের মতো। যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টি ইউরোপীয়, প্রধানত ইংরেজ। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীরা ত্রিধাবিভক্ত—প্রথমত, ইউরোপীয় স্প্যানিশ বা পর্তুগীজ ; দ্বিতীয়ত, বর্ণসঙ্কর বা মেস্তিৎসো ; তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ আদিম বা ইন্ডিয়ান। তেমনই উত্তরাপথের সমাজ ছিল মোটের উপর বিশুদ্ধ আর্য। কিন্তু বাংলার সমাজ তিন স্তরের—বিশুদ্ধ আর্য, বর্ণসঙ্কর ও বিশুদ্ধ অনার্য।

মুসলমানরা বাংলা জয় করিয়া রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে এই ত্রিধা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের কোনও ইতরবিশেষ হয় নাই। কারণ বাংলাদেশের নিম্নাবস্থার সব মুসলমানই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিল, মুসলমান আসার পর বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে তাদের পুরাতন বাঙালিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আফগান ও পাঠান মুসলমান ঔপনিবেশিকের সংখ্যা দেশী মুসলমানের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। সেজন্য উহারা নিজেরাই বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে মিশিয়া গেল। এমন কি বিদেশী যোদ্ধা ও ভূস্বামী মুসলমানও আচার-ব্যবহারে বিশেষ কোনও প্রভেদ রাখিতে পারিল না। তাহারা যে অবাঙালি তাহার পরিচয় রহিল শুধু তাহাদের আর্থিক অবস্থায় ও সামাজিক মর্যাদায়। উহাদের সকলেই প্রায় জমিদার বা তালুকদার হইয়া রহিল। কিন্তু ভাষায় ইহাদের সহিত সাধারণ বাঙালি মুসলমানের কোনও পার্থক্য রহিল না।

এই মুসলমান জমিদাররা যে-ভাষায় কথা বলিতেন, তাহা মুসলমান কৃষকের ভাষা, ভদ্রস্থানীয় হিন্দুর স্থানীয় উপভাষাও নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিব। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার জঙ্গলবাড়ি গ্রামের জমিদার বংশ ঈশা খাঁর সন্তান। ইঁহারা এবং নিকটবর্তী হয়বৎনগরের জমিদাররা 'সেদিন' বলিতে 'হে দুঙ্গা' বলিতেন, ময়মনসিংহবাসী আমার স্বহিন্দু বাঙ্গালদের উচ্চারণে 'হেইদিন'ও বলিতেন না। অবশ্য বক্তৃতা বা উচ্চাঙ্গের আলোচনা করিতে হইলে তাঁহারাও সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা ব্যবহার করিতেন। হয়বৎনগরের দেওয়ান আলিমদাদ খাঁ (ইনি জঙ্গলবাড়ির বংশসম্ভূত, হয়বৎনগরের আয়েষা খাতুনের স্বামী হিসাবে দুলাহা সাহেব বলিয়া খ্যাত ছিলেন) একদিন বক্তৃতা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "গুরুপ্রসাদ বাবু যাহা বলিলেন, তাহা অতিশয় হৃদয়ঙ্গম ও চিন্তাশীলতা।" ইহাতে সমবেত হিন্দু উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-শিক্ষক ও ছাত্রেরা একটু কৌতুক অনুভব করিয়াছিল। ইহা আমার বাল্যকালের কথা। কয়েক বৎসর পর আমি দুলাহা সাহেবের রচিত কবিতাও দেখি। কাব্য হিসাবে যাহাই হউক উহার বাংলা একেবারে বিশুদ্ধ ছিল।

AMARBOI.COM

হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রার মূলগত প্রভেদ আছে। সে-প্রভেদ এত বড় ও এত সুপ্রাচীন যে, দুই পক্ষের মিলন বা সমন্বয়ের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রকৃতি ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে, "পৃথক করেছি যারে আমার বলে, তোমরা ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?" ছলই বটে।

পূর্ববঙ্গের মানবজীবন ভাত ও বাঁশের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আমরা ভাত খাই, এবং বাঁশ-চাটাই-খড়ের ঘরে বাস করি। হিন্দুস্থানের ও পাঞ্জাবের জীবনযাত্রা গমের রুটি ও মাটির অর্থাৎ কাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-অঞ্চলের বাড়ি ছিটে বেড়া ও কাদা দিয়া তৈরি, গ্রাম ঘনসন্নিবিষ্ট বস্তি। এ-সব বাড়ি ও গ্রাম ভারতবর্ষে আসিয়াছে পশ্চিম এশিয়া হইতে, এগুলি বৃষ্টিবহুল মরশুমী দেশের বাড়ি নয়। যদি কেহ পশ্চিম এশিয়ার পুরাতত্ত্ব পড়িয়া থাকেন, তিনি স্বীকার করিবেন এই সব জিনিস সেই অঞ্চলের নূতন প্রস্তরযুগ বা প্রথম তাম্রযুগের দান। এগুলির উৎপত্তি কৃষির উৎপত্তির সঙ্গে হইয়াছিল। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া বা পারস্যে যে-সব প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ঠিক হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের গ্রামের মতো।

পূর্ববঙ্গের গ্রাম গঠনে ও চেহারায় একেবারে অন্যরকম। উহাতে বাড়ি ও বাস্তুভিটা ছাড়া-ছাড়া, প্রতিটি বাড়ি দরমার বেড়া বা টাট্টি দিয়া ঘেরা। কিশোরগঞ্জ শহরে ও পৈতৃক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম বনগ্রামে আমাদের বাড়িও ঠিক এই ধরনের ছিল। এই সব বাড়ির চারিদিকে বাঁশের ঝাড় থাকিত। দূর হইতে গ্রামগুলিকে জঙ্গল বলিয়াই মনে হইত, গ্রাম বর্ধিষ্ণু ও ভদ্রগৃহস্থবহুল না হইলে গাছপালার ভিতর দিয়া চাল বা ছাত দেখাই যাইত না। এই সব বাড়ি ও গ্রাম আসিয়াছিল বিষুবরেখায় নিকটবর্তী বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে।

তেমনই পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাবের কৃষকের চেহারার মধ্যেও আমূল ও অবিসম্বাদিত পার্থক্য। যে কেহ ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় বাহিনীর পাঞ্জাবী মুসলমান (আবন্ ইত্যাদি) ও পাঠান (খাটাক ইত্যাদি) সৈন্যের চেহারা দেখিয়াছে, তাহার কাছে ইহাদের ও পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষকের রূপ এক জাতীয়, এমন কি নিকট জ্ঞাতি মানুষেরও মনে হইবে না। ১৯১৪ সনে কিশোরগঞ্জে এক কোম্পানি ৯৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মুসলমান সৈন্য ছিল। তাহাদের পাশে আমাদের মুসলমানদের রোজই দেখিতে পাইতাম। চোখ বুজিয়া থাকিলেও পায়ের শব্দেই উহাদের প্রভেদ বোঝা যাইত। আমি ইউনিফর্ম বুট ইত্যাদি পরিয়া থাকার কথা বলিতেছি না। তাহারা যখন মুফ্‌তি অর্থাৎ সালওয়ার কামিজ চপ্পল পরিয়া থাকিত তাহার কথাই বলিতেছি। তারপর তুব্‌রাওয়ালা পাগড়ি পরিলে তো কথাই ছিল না। সেদৃশ্য আমার এখনও চোখে ভাসে। এই দীর্ঘকায়, দণ্ডায়মান, বলিষ্ঠ কৃষকের গায়ের পরিচ্ছদও হইত (এখনও হয়) সুপ্রচুর।

পূর্ববঙ্গের কৃষক কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মক্ষম হইলেও সাধারণত পাতলা ও পাকানো হইত। তাহার বস্ত্রসম্ভার কিছুই থাকিত না। মাঠের মধ্যে প্লাবনের মধ্যে কাজ করিবার সময়ে তাহার পরিধানে অনেক সময়ে নেংটি ভিন্ন কিছুই থাকিত না, মাথায় থাকিত পাগড়ির বদলে বাঁশের টোকা—আমরা বাঙ্গালরা যাহাকে 'পাৎলা' বলিতাম। উহারা বসিয়া বসিয়া ক্ষেতের কাজ করিত। এই মূর্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলীর বা মঙ্গোলীয় ধরনের কৃষকের মূর্তি।

এই পার্থক্য বাংলার ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। উহার ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। আমার বংশ বহুশত বৎসর ধরিয়া সমৃদ্ধ না হইলেও সচ্ছল ভূস্বামীর বংশ। তবু আমাদের জীবনের পুরুষানুক্রমিক যে বৈষয়িক ভিত্তি ছিল, তাহা উত্তরাপথের নয়, আর্যের নয়, উহা বাংলার বা আদিবাস দেখিতে হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষকের জীবন হইতে আসিয়াছিল। এই যে পার্থক্য, উহা এত মূলগত যে, উহাকে বাদ দিয়া বাংলার সহিত ভারতবর্ষের, পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা আলোচনাই করা যায় না।

বাংলাদেশের নানাদিকে এত স্পষ্ট ও উগ্র স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করিবে না, ইহা মনে করাই অসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে সত্যকার বাঙালিত্ব প্রকট হইবার বহু আগেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়াছিল। যেদিন মাৎস্যন্যায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বাংলার লোক গোপালকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আরম্ভ। তখনও বাংলা ভাষা জন্মায় নাই, বাংলার বিশিষ্ট সংস্কৃতিও বিকশিত হয় নাই। তবু বাংলা উত্তরাপথের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে নাই। ইহার পর গুর্জর-প্রতীহার সম্রাটদের সহিত বাংলার রাজার যুদ্ধও হইয়াছে। পালবংশের অনুবর্তনকারী সেনদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙালি সমাজের বিশিষ্ট রূপের হিসাব তখন হইতেই আমরা ধরি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানরা যখন বাংলা জয় করিল তখন এই স্বাতন্ত্র্যের লোপ হইল বটে, কিন্তু উহা সাময়িক। বাংলাদেশে মুসলমানের প্রাধান্য তখনও দিল্লির সুলতানের শক্তির উপর নির্ভর করে, শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না। তবু বাংলার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যের জোর এমনই ছিল যে, মুসলমান প্রাদেশিক সুবাদাররাও দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। ইহার জন্য লক্ষ্মণাবতীর নাম পড়িয়াছিল "বালঘাক্-পুরী"—অথবা বিদ্রোহের পুরী।

এই সকল বিদ্রোহের মধ্যে সুলতান বলবনের রাজত্বকালে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহই অতি গুরুতর হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপ ও চণ্ডস্বভাব বলবন এই বিদ্রোহ দমন করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে দুই মাইল জুড়িয়া শূল সারি দিয়া পুতিয়া তুঘ্রিলের অনুচরদের শূলে চড়াইয়াছিলেন। পরে নিজের পুত্রকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বলবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাহ্মুদ, তুমি দেখিয়াছ?"

যুবরাজ ভয়ে নীরব রহিলেন।

আবার বলবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় রাজারে আমি কি শাস্তি দিয়াছি, তাহা দেখিয়াছ?"

পুত্র কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, দেখিয়াছি।"

বলবন—"বেশ? তাহা হইলে যতদিন লক্ষ্মণাবতীতে থাকিবে, মনে রাখিও বাংলা দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পার পাইবে না।"

তবু ইহার সত্তর বৎসর পরেই বাংলা স্বাধীন হইয়া গেল। এই স্বাধীনতা আকবর ১৫৭০ সন নাগাদ বাংলা আবার জয় না-করা পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু ১৭৯৫ সনে আবার বাংলা কার্যত স্বতন্ত্র হইয়া গেল। ইংরেজ বাংলায় আধিপত্য পাইবার পরও এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইহার কারণ ইংরেজ শাসনের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা যে-ভাবে হইয়াছিল তাহার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। বাংলাদেশে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই উহার বিস্তার হয়। সুতরাং যখন ইংরেজের শক্তি পশ্চিমে প্রসারলাভ করিল, তাহাকে বাংলার প্রাধান্যের প্রসারই বলা চলে। বাঙালি ইংরেজের সহায়করূপে সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথে গিয়া শাসকের সহায়ক ও অনুচরের মর্যাদা পাইয়াছিল। বাংলার এই প্রাধান্য ১৯১১ সনে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লি স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ছিল। এমন কি লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লিতে লইয়া যাইবার একটি কারণ দেখাইয়াছিলেন যে, কলিকাতা থাকার ফলে ভারতীয় রাজনীতির উপর বাংলার প্রভাব অতিরিক্ত আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং ব্রিটিশ শাসন হিন্দুস্থানে জনপ্রিয় হয় নাই।

কিন্তু রাজধানী দিল্লি চলিয়া গেলেও বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জীবনের খুব ইতরবিশেষ হয় নাই এই কারণে যে, বাংলাদেশকে একজন গভর্নরের অধীন করিয়া অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহাকে প্রায় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই দেওয়া হইয়াছিল। ভুলিলে চলিবে না যে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে দেশাত্মবোধে এক করিবার কোনও স্বার্থ ইংরেজের ছিল না। তাহাদের দিক হইতে ভারতবর্ষে অধিকার রাখিবার জন্য ব্রিটিশ সেনা ও ব্রিটিশ-শাসকদের ঐক্যই যথেষ্ট ছিল, এই উদ্দেশ্যে বাঙালি ও হিন্দুস্থানীকে এক করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং যতদিন ইংরেজ ছিল, ততদিন বাঙালি এক জাতীয় আন্দোলন ছাড়া অন্য সব বিষয়েই নিজেকে লইয়া বেশ সন্তুষ্ট ছিল। এমন কি জাতীয় আন্দোলনেও কায়মনোবাক্যে অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের নীতিতে সায় দেয়


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই।

এই স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসের একটা মোটা হিসাব লওয়া যাক। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে স্বাধীন মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ৭৪১ বৎসর। ইহার মধ্যে বাঙালি স্বাধীন বা কার্যত স্বতন্ত্র ছিল ৪২৬ বৎসর, আর ৩১৫ বৎসর ছিল উত্তর ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীন, তা সে দিল্লিতেই হউক বা আগ্রাতেই হউক। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে অপ্রতিহত ও অনিবর্তিত না হইলে কেহই বাংলাদেশকে উত্তরাপথের সহিত যুক্ত রাখিতে পারে নাই। এই অত্যন্ত স্থূল ব্যাপারটা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান।

এই নানামুখীন স্বাতন্ত্র্য অবশেষে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণতা লাভ করিল। এই বৈশিষ্ট্য এত গভীর ও স্থায়ী হইল যে, ভারতবর্ষের সহিত রাজনৈতিক যোগ বা বিচ্ছেদের সঙ্গে উহার আর কোনও যোগ রহিল না। রাজনীতিতে যাহাই হউক, বাংলাদেশ সংস্কৃতিতে চিরতরে বাঙালি হইয়া গেল। কিন্তু এই বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদ্ভব রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হইতেই হইয়াছিল। কারণ উহা প্রকাশ পাইয়াছিল বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজাদের কালে। এই মুসলমান শাসনকর্তারা বাংলার সংস্কৃতির পোষণ করিতেন। তাই বাংলার যাহা বিশিষ্ট সংস্কৃতি, তাহাকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু উহার দুইটা দিক ছিল—একটা হিন্দু ও আর একটা মুসলমানী। এই দুই দিক দুই সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল—অর্থাৎ হিন্দু দিকটাকে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার তদ্ভব রূপ বলা যাইতে পারে, তেমনই মুসলমান দিকটা ছিল হিন্দুস্থানের মুসলমান সভ্যতারই অংশ ও শাখা। তবে বাংলাদেশে উত্তরাপথের হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি একটা স্থানীয় রূপ ধরিয়াছিল, এবং এই স্থানীয় রূপের ভিত্তি, কি হিন্দু কি মুসলমান, দুই-এর বেলাতেই ছিল বাংলা ভাষা।

মুসলমান রাজারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা করিতেন। এইজন্য হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বাংলা ভাষাতে বাঙালিমাত্রেরই গভীর শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। ভাষার আদর প্রথমে অজ্ঞাতসারে মনে মনেই ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে উহা সজাগ ও সক্রিয় হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন ও সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সমন্বয় হয় নাই। সমন্বয় যাহা হইয়াছিল, তাহা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের, এমন কি উন্নততম স্তরে অতি অল্প বলিলেই চলে। ধর্ম ও ধর্মাধিকৃত সামাজিক আচারে বরঞ্চ বিরোধই ছিল। এই ক্ষেত্রে হিন্দুর জীবন ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাই ইহার রক্ষক ছিলেন। তেমনই মুসলমানের দিকে জীবনের এইদিক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর উহার রক্ষক ছিলেন মৌলবী ও উলেমা। সুতরাং এখানে একদিকে শাস্ত্র ও ধর্ম, অন্যদিকে শরিয়া ও তৌহিদ। দু-পক্ষের রক্ষিগণই সমান গোঁড়া ছিলেন।

কিন্তু উহার বাহিরে সমন্বয়ের ব্যাঘাত হয় নাই, শুধু কম-বেশি হইয়াছিল। লৌকিক সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ছিল। ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য পরিমাণ খুব বেশি নয়—কিছু পোষাক-পরিচ্ছদে, কিছু খাওয়া-দাওয়ায় অর্থাৎ পাক-প্রণালীতে। সাহিত্যে বরঞ্চ এর চেয়ে বেশি সহযোগিতাই ছিল। কিন্তু সত্যকার সমন্বয় দেখা গিয়াছিল সাধারণ লোকের মধ্যে। ইহাদের জীবনযাত্রায়, আমোদ-প্রমোদে, এমন কি ধর্মানুষ্ঠানেও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমানের সহযোগ ছিল। হিন্দুর উৎসব বা পূজা দেখিতে মুসলমানের বাধিত না, মুসলমানের উৎসব দেখিতে বা দরগায় যাইতে হিন্দুর বাধিত না। আমাদের বাড়ির পূজায় মুসলমানরা বলির পাঁঠা দিয়া যাইত। আবার তাজিয়া লইয়াও তাহারা আমাদের বাড়িতে আসিত। হিন্দু-মুসলমান একই গান গাহিত, একই যাত্রা দেখিত। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান একই কাপড় পরিত। বাঙালি মুসলমান মেয়েরা বিশেষ করিয়া কখনই সালওয়ার-কামিজ পরে নাই, শাড়িই পরিত। আজও দিল্লিতে আমি বাঙালি হিন্দু মেয়েদের সালওয়ার পরিতে দেখি, কিন্তু বাঙালি মুসলমান যে কয়জন দেখি তাহার শাড়ি ভিন্ন অন্য কিছু পরে না।

এই যে ঐক্য, যাহাকে ধর্ম ভিন্ন অন্য ব্যাপারে বেশ নিবিড়ই বলা চলে, উহার ভিতরের খোঁজ লইলে একটা কারণ চোখে পড়ে। উহা বাঙালি কাহার দ্বারা ও কিভাবে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহার সহিত যুক্ত। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার বিজেতা আফগান, পাঠান বা তুর্কেরা করে নাই, করিয়াছিল সমুদ্রপথে আসিয়া আরব প্রচারকেরা। এই আরব প্রচারকেরা যাহা প্রচার করিত সেটা ইসলামের আরব দিক—অর্থাৎ ধর্ম ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের রীতি ও নিয়ম। মুসলমান সভ্যতার পার্থিব দিকের প্রতি তাহাদের তেমন মনোযোগ ছিল না, কারণ যে-যুগে ভারতবর্ষ মুসলমানের অধীন হয় সেই সময়ে ইসলামের সংস্কৃতি—অর্থাৎ সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য ইত্যাদি লইয়া যে সংস্কৃতি তাহা তুর্ক ও পারসিক মুসলমানদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল।

তাই আরব প্রচারকের হাতে মুসলমান হওয়ার ফলে বাঙালি মুসলমানের লৌকিক দিক হইতে বাঙালি থাকিবার স্বাধীনতা মোটামুটি অব্যাহত রহিল। ধর্মে যাহাই হউক, আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-প্রমোদে তাহাদের বাঙালি থাকার পথে বাধা জন্মায় নাই। এক্ষেত্রে তাহারা হিন্দুর সঙ্গে সংস্কৃতির এক ক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইতে পারিত। এই সূত্রে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙালি মুসলমানের নামের আগে সাধারণত 'শেখ' এই উপাধি থাকিত। উহা আরবি উপাধি। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সাধারণত মুসলমান বলিতে 'শেখ' বলিত, অবশ্য একটু তুচ্ছার্থে। খাঁ উপাধি এবং সৈয়দ উপাধি দেখা যাইত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মধ্যে। বিশেষ করিয়া খাঁ উপাধি আফগান বা তুর্ক বংশজাত মুসলমান জমিদারদেরই থাকিত।

## ॥ তিন ॥

## "দুই বাংলার ঐক্যসাধন আজ বাঙালির হাতে নাই—"

উত্তরাপথ হইতে বাংলাদেশ কোন্ কোন্ ব্যাপারে স্বতন্ত্র তাহার আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য এগুলির মধ্যে যেগুলি বেশি গুরুতর ও প্রধান শুধু তাহারই উল্লেখ করিতে পারিয়াছি। এখন এই স্বাতন্ত্র্য ও বাংলাদেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা যাক্। যে-সব ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার অস্তিত্ব দেখা গেল, সেগুলি বাংলা ও বাঙালির ঐতিহাসিক বিবর্তনের একেবারে গোড়ার জিনিস। ভবিষ্যতের কোনও হিসাবে এগুলিকে বাদ দেওয়ার উপায় নাই। কথায় আমরা যতই অবহেলা করি না কেন, কার্যত এগুলির প্রভাব চিরস্থায়ী ও অনিবার্য হইয়া থাকিবে। বিভক্ত আর অবিভক্ত যাহাই হউক বাংলাদেশ যতদিন বাংলাদেশ থাকিবে ততদিন এগুলির ভার এবং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিও বর্তমান থাকিবে। পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের বিরোধের মূলগত কারণ এইগুলিই। পশ্চিমবঙ্গেরও এগুলিকে ভুলিবার উপায় নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীণ সংহতি ও বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনের দুই শত বৎসরের মধ্যে; একমাত্র ১৯১১ সন হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ছত্রিশ বৎসর ছাড়িয়া দিলে, বাংলাদেশ কখনও বাঙালির একক রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে তিনবার বাংলার রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ফলে আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি চারিটি বাংলা দেখিয়াছি, হয়তো কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আরও দেখিতে পারি।

এই চারিটি বাংলার প্রথম বাংলা ১৯০৫ সনের পূর্বেকার বাংলা। অর্থাৎ একজন লেফটেনান্ট-গভর্নরের শাসিত সংযুক্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। উহা মোগল সুবা বা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যারই ইংরেজি সংস্করণ। মনে রাখিতে হইবে মোগল-সম্রাট তিনটি সুবাকে মিলাইয়া এক শাহজাদার শাসনে রাখিতেন। ফরুকশিয়ারের পর মুর্শিদকুলি খাঁ এই পদ পাইয়া তিন সুবাকে দিল্লি হইতে কার্যত স্বাধীন করিয়া ফেলেন।

দ্বিতীয় বাংলা (প্রথম দ্বিখণ্ডিত বাংলা) দেখা দিল লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের ফলে। তিনি ১৯০৫ সনে বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন ও পশ্চিমবঙ্গকে (অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান ডিভিশনকে) আগেকার মতো বিহার-উড়িষ্যার সহিতই মিলিত রাখেন।

লর্ড কার্জন এই বিভাগের প্রকাশ্য কারণ এই দিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া যে বিরাট প্রদেশ তাহা ভাল করিয়া শাসন একজন লেফটেনান্ট-গর্ভনরের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিভাগকে অস্বাভাবিক ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। বাঙালি সন্দেহ করিয়াছিল ইহার পিছনে একটা গোপন ও অসৎ অভিসন্ধি আছে—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু হইতে পৃথক করিয়া বাঙালি জাতির মধ্যে গৃহবিরোধ সৃষ্টি করিয়া উহাকে দুর্বল করা, বিশেষত বাঙালি হিন্দুর শক্তিহরণ।

## প্রবল বিদ্রোহ

সেইজন্যই হিন্দু বাঙালি এই বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করিল। ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম প্রকাশ্য জাতীয় আন্দোলন, যাহার নাম পড়িয়া গেল "স্বদেশী আন্দোলন"। এই আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া গেল এবং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলাইয়া একটি নূতন বাংলা সৃষ্ট হইল। বাংলাভাষাভাষী সমস্ত বাঙালির ইহাই প্রথম স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা। শুধু শ্রীহট্টবাসী বাঙালি ইহার বাহিরে রহিল। ইহা সত্ত্বেও এই বাংলাই বর্তমানকালে প্রথম বাঙালির বাংলা।

ইহার পর ১৯৪৭ সনে আবার বাংলা বিভক্ত হইল। এই ব্যাপারটার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। ব্রিটিশ শাসনের কালে নানা পরিবর্তনের পর ১৯১২ সনে যে-বাংলার গঠন হইয়াছিল, যদি ব্রিটিশ আধিপত্যের কখনও অবসান হয়, তাহা হইলে সেই বাংলাই আরও পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য পাইবে, ইহা মনে করাই সকলের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বাংলার যে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বহু যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও তাহার অনুরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুরুতর সাময়িক কারণে তাহা ঘটিল না। বরঞ্চ যাহা ঘটিল তাহা ঠিক উল্টা ব্যাপার।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গুরুতর কারণ অবশ্য হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। এই বিরোধ বাংলার স্বাভাবিক ঐক্যকে নষ্ট করিয়া একটা অস্বাভাবিক অনৈক্যের সৃষ্টি করিল। বাঙালি উহাতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহারই সপক্ষে উদ্যোগী হইল। তাহা সাময়িক উত্তেজনা ও মতিভ্রমের বশে। এই উত্তেজনার কারণ ছিল না, তাহা কখনই বলিব না। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে যদি উত্তেজনার তাড়নায় বিবেচনা একেবারে হারানো যায়, তাহার ফল কখনই শুভ হয় না। আমাদের ক্ষেত্রেও হয় নাই। ব্রিটিশ শাসন চলিয়া গেলে বাঙালির সমক্ষে যে দুইটি বড় প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহার কথা আমরা আগেই ভুলিয়াছিলাম, উত্তেজনাতে আরও ভুলিয়া গেলাম। এই দুটি প্রশ্ন সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিতে না পারায় একটি হইতে বাংলার আজও ক্ষতি হইতেছে, অপরটি হইতে সর্বনাশ হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নটি বাংলাদেশের সহিত ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া উত্তরাপথের সম্পর্কের ; দ্বিতীয় প্রশ্নটি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের।

ভারতবর্ষের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা স্বাধীনতার পূর্বে বাঙালি একেবারেই চিন্তা করে নাই বলা চলে। এখনও যে করিতেছে তাহা বলা যায় না। কোনও একটা ব্যাপার লইয়া খিটিমিটি করা আর চিন্তা করা এক জিনিস নয়। অথচ যখনই বাঙালির জাতীয় আন্দোলন ও সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা বৈষম্য দেখা দিল, সেদিন হইতেই যথেষ্ট খিটিমিটিও আরম্ভ হইয়াছিল। এই খিটিমিটির মূলে ছিল দুইটি ব্যাপার—প্রথম, ব্রিটিশ শাসনের যুগে বাঙালির উগ্র প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট পথ ধরিল, তাহার জন্য সেই আন্দোলনে বাঙালির প্রাধান্য আর রহিল না, তাহাতে খিটিমিটি আরও বাড়িয়া গেল। বাঙালি বিপ্লববাদীরা, এমন কি কংগ্রেসপন্থী বাঙালি নেতারাও, গান্ধী-চালিত কংগ্রেসকে খুব আপনার মনে করে নাই। সুতরাং স্বাধীন ভারতে উত্তরাপথই যখন প্রাধান্য লাভ করিবে তখন বাঙালির সহিত হিন্দুস্থানীর কি সম্পর্ক হইবে, সেই প্রশ্নটা চাপাই রহিল।

সেই সময় যদি বাঙালি অল্প কিছু ছাড়িয়া হিন্দুস্থানীর সহিত সহযোগিতা করিবার পথ খুঁজিত তাহা হইলে আজ উত্তরাপথের সহিত যে মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে তাহা হয়তো বিকশিত হইবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু এই সহযোগিতার পথ খোঁজা দূরে থাকুক, হিন্দুস্থানীর সহিত বাঙালির ঐক্য স্থাপনের আলোচনা করাও বাঙালি প্রীতিকর মনে করে নাই। আমি ১৯২৯ সনে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া বাঙালির উদগ্র প্রাদেশিকতার সমালোচনা করিয়াছিলাম। উহাতে গালিই খাইয়াছিলাম। আমি তখন 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হইবার পর আর আলোচনা করিতে উৎসাহ দেন নাই। তাই বৎসর কয়েক পরে আবার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'বাঙালীত্বের স্বরূপ' এই নাম দিয়া আর একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। বলাই বাহুল্য ইহার কোনও ফল হয় নাই। উত্তরাপথের সহিত বাঙালির মনোমালিন্য অজ্ঞাতসারে শুধু ঝোঁকের বশে বাড়িয়া চলিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের যথাযথ আলোচনা না হওয়াতে ফল যে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তো আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। আমি সেই সময়েও এ বিষয়ে বহু লিখিতাম। ধরন-ধারণ দেখিয়া ১৯৩৯ সনে প্রকাশিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও সম্ভাবনা নাই। আমার তখনই মনে হইয়াছিল যে, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।

যে ধারণার বশে আমরা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই, এমন কি বিশেষ দুশ্চিন্তাও অনুভব করি নাই, তাহা একটি গুরুতর ভ্রম—এমন কি উহাকে মতিচ্ছন্নতাই বলা যাইতে পারে। আমাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নাই, উহা ইংরেজের সৃষ্ট কৃত্রিম ঝগড়া মাত্র। উহারাই নিজেদের শাসন স্থায়ী করিবার জন্য ভ্রাতৃবিরোধ বাধাইয়াছে। এই ধারণা কিরূপ অলীক তাহা বুঝিবার মতোও মানসিক চেতনা বাঙালি হিন্দুর ছিল না।

দুঃখের বিষয়, আজও এমন সব বাঙালি আছে যাহারা মনে করে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সমাজ নয়, এমন কি হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোনও সমাজই নাই, আছে শুধু ভারতীয় সমাজ। মূঢ়তার শেষ এখনও হয় নাই। হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমান, এই কথাটা সরল মনে, সহজভাবে স্বীকার না করার ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের রূপ বাস্তবক্ষেত্রে এমনই দাঁড়াইল যে তখন ছাড়াছাড়ি ভিন্ন আর কোনও পথ দেখা গেল না।

## হিন্দু-মুসলমান বিরোধ

এই প্রবন্ধে আমি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আলোচনা করিতে পারিব না। এ বিষয়ে যাঁহারা আমার মত জানিতে চান তাঁহারা আমার বক্তব্য আমার নূতন বই 'দি কন্টিনেন্ট অফ্ সার্সি'র দ্বাদশ অধ্যায়ে পাইবেন। এখানে শুধু উহার ফল সম্বন্ধে দুটি কথা বলিব।

প্রথমত ১৯৪৬ সনে বাংলাদেশে, বিশেষত কলিকাতায়, যে বীভৎস অত্যাচার ও নরহত্যা হইল তাহার পর আর বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের একদেশে একত্র বাস সম্ভব রহিল না। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার কথা বিবেচনা করিবার অবকাশ বা ইচ্ছা দু'পক্ষের কোনও পক্ষেরই হইল না। সকলেই প্রথমে আড়াআড়ি করিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়াই সমীচীন মনে করিল।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমাধান হিসাবে ভারতবর্ষ ভাগ, বাংলা ভাগ, ও পাঞ্জাব ভাগের মতো অস্বাভাবিক ব্যাপার কল্পনা করা যায় না। কাহারও মনে এই কথা জাগিল না যে, এই বিভাগের ফলে কি অশান্তি ও ঝগড়া ভবিষ্যতে হইতে পারে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে ইহা বলা প্রয়োজন যে, না পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি, না পূর্ববঙ্গের মুসলমান বাঙালি কেহই ভাবিয়া দেখিল না যে, উহারা দুই ভাগ হইয়া যে দুইটি নূতন দেশের সহিত যুক্ত হইতে যাইতেছে, তাহাদের সহিত দুই-এরই অমিল ও মনান্তর হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা কম অসহনীয় মনে হইল, তাহাই দু'পক্ষ করিয়া বসিল।

ফলে আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা অতিশয় শোচনীয়। বাংলার স্বাভাবিক ঐক্য সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থিক ব্যাপার, জাতিত্ব, বা ভাষা যাহাই ধরা যাক না কেন, সবগুলি ও প্রতিটি দিক হইতেই বাংলাদেশ অবিভাজ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই অবিভাজ্য বাংলা যে শুধু একটা অতিকৃত্রিম সীমানা ধরিয়া বিভক্ত হইয়াছে তাহাই নয়, দুইটি ভাগ দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যোগ হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে দুই বাংলার ঐক্যসাধন আজ জার্মেনীর ঐক্যসাধনের অপেক্ষাও দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা এখন আর বাঙালির হাতে নাই, এমন কি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-দুই-এর হাতেও নাই। উহা এখন আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর সবগুলি বড় বড় দেশের রাজনীতির জালে পড়িয়াছে। এই কূটনীতির নাগপাশ হইতে বাঙালি ও বাংলার মুক্তি নাই।

॥ চার ॥

## দুই বাংলার তুলনা

বঙ্গবিভাগ যে একটা বড়রকমের ভুল তাহা বুঝিতে দুই বাংলার লোকেরই বেশি দেরি হইল না। কিন্তু এই উপলব্ধির প্রকাশ দুই দেশে দুই রকমের হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির শোচনা বা অনুশোচনা আগে দেখা দিলেও কার্যত ভুলটা সংশোধনের জন্য আজ পর্যন্ত তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই, পারিবে কিনা তাহাও অত্যন্ত সন্দেহস্থল। পূর্ববঙ্গের বাঙালি, মুসলমান হিসাবে এই প্রথম প্রাধান্য পাওয়ার ফলে ভ্রমটা গোড়াতে ধরিতে পারে নাই, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্য আন্দোলন করিতেছে। তবে দুই বাংলারই অবস্থা মূলত এক—দুজনেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা যে-যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের গুরুতর অভিযোগ আছে।

উত্তরাপথ অথবা দিল্লির সার্বভৌমত্বের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের নালিশ কি তাহারই প্রথম আলোচনা করা যাক। উহা বিদ্রোহ, এমন কি ঝগড়াতেও দাঁড়ায় নাই। এ দুয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব পারিবারিক জীবনে যাহাকে গোঁসাঘরে বসা বলে অনেকটা তাহার মতো। ইহার ফলে ক্রমাগত নালিশ ও ঘ্যান-ঘ্যানি শোনা যাইতেছে। কয়েকটা নালিশের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেমন, এই তর্ক যে বঙ্গবিভাগের জন্য বাঙালি দায়ী নয়, বাঙালির ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কংগ্রেস উহা বাঙালির উপর চাপাইয়াছে ; পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত হিন্দুর জন্য ভারত গভর্নমেন্ট যাহা করিয়াছেন তাহা পাঞ্জাবের বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য যাহা করা হইয়াছে তার তুলনায় অতি কম ; বর্তমানেও সব জড়াইয়া দেখিলে ভারত গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ ও কলিকাতা সম্বন্ধে উদাসীন, বাংলার উন্নতির জন্য কিছুই করিতেছেন না। ইহার উপর ঐতিহাসিক ব্যাপারে মতদ্বৈধ ও নালিশ আছে—বাঙালি বলে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালির চেষ্টা ও ত্যাগকে হিন্দুস্থানী ও কংগ্রেসপন্থী ইতিহাস লেখকরা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, এবং এ বিষয়ে ডঃ তারাচাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ উগ্র। আবার গান্ধীপন্থী কংগ্রেস বিশেষ কিছু নয়, এমন কি মহাত্মা গান্ধী এবং জবাহরলাল নেহরুকে যত বড় করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তত বড় নয়, এই বিশ্বাসও বহু বাঙালির অতি দৃঢ়। এই সব নালিশ থাকার জন্যই বাংলাদেশে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক মতের প্রাবল্য দেখা দিতেছে।

এই সব অভিযোগ কতদূর সত্য বা অসত্য, তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, উত্তরাপথ ও ভারত গভর্নমেন্টের সহিত বাংলাদেশ ও বাঙালির সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হইলে এই সব অভিযোগ খুব গুরুতর হইত না। কিন্তু এখানে গোড়াতেই গলদ আছে, তাই যে নালিশ তলাইয়া দেখিলে এমন কিছু নয়, তাহাও তিক্ততার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মনে রাখা দরকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অনেকটা দাম্পত্য সম্পর্কের মতো। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল থাকে, তাহা হইলে সাময়িক ঝগড়া যতই হউক, দুপক্ষই তাহা ভুলিয়া যায় এবং বহু দোষত্রুটি সহ্য করে। কিন্তু প্রীতি না থাকিলে স্ত্রী যে ক্রমাগত জোর করিয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নালিশ সৃষ্টি করিতে থাকে তাহা স্ত্রীর প্রেম-বঞ্চিত স্বামীমাত্রেই জানে। তখন বরঞ্চ স্বামী অপরাধ না করিয়া ভাল ব্যবহার করিলেই স্ত্রীর রাগ আরও বাড়িয়া যায় এবং ভাল ব্যবহারের জন্যও স্বামীকে অতিশয় কূটবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবঞ্চক বলিয়া মনে করে। ভারত গভর্নমেন্ট যদি আজ হঠাৎ বাংলা ও বাঙালির প্রতি দরদ দেখাইতে আরম্ভ করেন, তবে বাঙালি যে আরও অসন্তুষ্ট হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ খোলামনে স্বীকার করিতে হইবে তাহা এই—ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ উহা প্রীতি বা সহযোগিতার নয়, তা দোষ যে-পক্ষেরই বেশি হউক বা কম হউক। তবে উহার বর্তমান রূপ কি তাহা একটা উপমা দিয়া বুঝাইব—যে দেশে ডিভোর্সের আইন নাই, অথচ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রেম নাই, সে-দেশের এই দাম্পত্য জীবনের মতো।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাঙালির অভিযোগ আরও অনেক গুরুতর। এই ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যে সম্বন্ধ তাহার সহিত পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের যে সম্পর্ক তাহার তুলনা করিতে হইবে। সংক্ষেপে এই তুলনা করিতেছি।

প্রথমত, জাতিত্ব, সামাজিক গঠন ও আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, মানসিক ধর্ম, এমন কি চেহারাতেও পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী হইতে যতটা বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু উত্তরাপথের হিন্দুস্থানী হিন্দু হইতে মোটেই ততটা বিভিন্ন নয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও উহার অধিবাসী, হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানী হইতেও একেবারে বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান যে-সব অঞ্চল লইয়া গঠিত উহাকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার প্রসার বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ ইহাকে হয়তো অনধিকার প্রবেশই বলিবেন। সেজন্য ইতিহাসে পাঞ্জাবকে পালাক্রমে দ্বিধামুখীন, অর্থাৎ একবার পশ্চিম এশিয়ার সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে যুক্ত আর একবার ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত দেখা যায়। আজিকার পশ্চিম পাকিস্তান ইসলামী পশ্চিম এশিয়ার পূর্বতন অংশ মাত্র। সুতরাং পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান আরব অথবা পারসীকের চেয়ে কম বিদেশী নয়।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের সহিত উত্তরাপথের পার্থক্য বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমান নয়, ক্রমপ্রকাশমান। অর্থাৎ পূর্বে অল্প পার্থক্য, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে গিয়া অতি স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্থক্যটা এইভাবে ক্রমিক হওয়াতে অনুভূত হইবামাত্র ধাক্কার মতো লাগে না। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের 'শক্-অ্যাব্‌সবার' বা 'বাফার' নাই। এ দুইয়ের বৈষম্য মোটেই ক্রমবিবর্ধমান নয়, প্রথমেই একেবারে গুরুতর ধাক্কা, অর্থাৎ মোটরের বা ট্রেনের 'কলিশ্যনে'র মতো লাগে। উহা একেবারে প্রথম হইতেই সংঘর্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য বৈষম্যের এই তীব্র অনুভূতির জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানও দায়ী। একে দুইটির মধ্যে দূরত্ব হাজার মাইলের উপরে, তারপর সাক্ষাৎ যোগাযোগ বা চলাচলের উপায় নাই। ইহাতে পার্থক্যের সংঘাত আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দুই পাকিস্তানের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগাযোগের অভাবই যে নূতন দেশটির রাষ্ট্রীয় গঠনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার পূর্ণ আধিপত্য আছে। হিন্দু বাঙালির উপর উত্তরাপথের ভাষা চাপাইবার কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। পূর্ববঙ্গের উপর উর্দু চাপান হইয়াছে। এটা গুরুতর কথা। ভারতবর্ষের যে-কোনও অঞ্চলের লোকই এই বিষয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহিষ্ণু। নিজেদের ভাষা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য ভাষা চাপাইবার চেষ্টা করিলেই তাহারা বিরক্ত হয়। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাকে সমান অধিকার দিতেও তারা প্রস্তুত নয়। এর উপর আবার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিরই মাতৃভাষার অনুরাগ বেশি এবং অন্য ভাষার প্রতি বিরাগও বেশি। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই নিজের ভাষা সম্বন্ধে গর্ব রাখে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানের কাছে উর্দু বিদেশী ভাষা, উহার মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়া যে-টুকু হিন্দী আছে তাহাও শুধু বিদেশীই নয়, হিন্দী বলিয়া আরও অগ্রাহ্য। আরবি-ফারসি শব্দ তবু আংশিকভাবে মুসলমানী বাংলার মধ্যে আছে, কিন্তু হিন্দীর উহাতে সম্পূর্ণ অনধিকার প্রবেশ।

চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। রাজনৈতিক ব্যাপারই হউক বা শাসনযন্ত্র চালানোই হউক, দুইটি কাজই মোটের উপর বাঙালির হাতে। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক জীবন নাই, তাহার পর পূর্ববঙ্গের শাসনযন্ত্র প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের হাতে। ইহাকে বিদেশী শাসন বলা চলে। বস্তুত পুরাতন ব্রিটিশ শাসনে পূর্ববঙ্গের বাঙালির যে-স্থান ছিল, আজ পাকিস্তানের শাসনে তাহাদের প্রায় সেই অবস্থাই আছে। পূর্ববঙ্গ তেহেরান বা বাগদাদ হইতে শাসিত হইলেও ইহার খুব ইতরবিশেষ হইত না।

শেষ কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির মধ্যে যাহাদের বাঙালিত্বের চেতনা বেশি, বাংলার প্রতি আসক্তি প্রবল, প্রাদেশিক সংস্কৃতির গর্ব অটল, তাহাদের সকলেরই চাকুরির প্রতি টানও কম নয়, এবং ইহাদের অনেকেই শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র নানারকমের উচ্চবেতনের চাকুরি পাইতেছে, তা তিনটি সেনাবাহিনীতেই হউক, শাসনযন্ত্রেই হউক, বা শিল্পবাণিজ্যেই হউক। সুতরাং অর্থপ্রীতি ও বাংলাপ্রীতির দোটানায় পড়িয়া কার্যত উহারা যাহা করিতেছে তাহাকে গুণটানা নৌকার উজানে এবং হাওয়ায় উল্টাদিকে চলার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাদের অসন্তোষ মুখেই বেশি, কার্যত দুর্বল। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের এই সব সুযোগ-সুবিধা সমগ্র পাকিস্তানে এত কম যে, ইহার দ্বারা তাহাদের বিক্ষোভ কাটিয়া যাইবার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের মুলসমানের রাষ্ট্রীয় বিমাতার মতো।

এই সব কারণেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানের অসন্তোষ প্রবলতর—শুধু যে উহার পরিমাণই বেশি তাহাই নয়, উহার পিছনে আবেগের তাড়নাও বেশি। তাহাদের বিক্ষোভ মৌখিক না থাকিয়া কাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার উপর আর একটা কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, নিজেদের অসন্তোষ কার্যে পরিণত করিবার যে শক্তি ও সুযোগ পূর্ববঙ্গের মুসলমানের আছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর তাহা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের উপর এতটা নির্ভরশীল, একা এত দুর্বল ও অসহায় যে, স্বাধীনতা চাওয়া দূরে থাকুক, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য চাওয়াও উহার পক্ষে প্রায় উন্মাদের কাজ হইবে। পূর্ববঙ্গে লোকবল ও আর্থিক সম্বল এতটুকু আছে যে, উহা স্বাধীন হইলে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতের ভয়ে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানের বর্তমান সন্তোষ মনে-মনে রাখিয়া শুধু গুমরাইবার বা গজরাইবার কারণ নাই। কাজেও কিছু করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। এরপর দেখিতে হইবে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পাইবার আন্দোলন কতটুকু সফল হইবার সম্ভাবনা আছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ পাঁচ ॥

## পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলন হবে কি

এখনই বা অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নয়। তবে হিসাবটা ভাল করিয়া করা দরকার। পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের যে বিবাদ চলিতেছে সে-সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে। প্রথম, দুই বঙ্গের মিলন হওয়া সম্ভব কিনা, দ্বিতীয় পূর্ববঙ্গের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা। দ্বিতীয়টি না হইলে প্রথমটি হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তবু প্রথম প্রশ্নের উত্তরই আগে দিবার চেষ্টা করিব।

ধরিয়াই লওয়া যাক যে, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এতটুকু আছে যে, উহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব। (কার্যত নাই, তবে প্রথম প্রশ্নের বিচারের জন্য উহা ধরিয়া লইতেছি।) যদি স্বাধীন হয়ই, তাহা হইলে স্বাধীন বাঙালি মুসলমান কি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সহিত যুক্ত হইবে? বর্তমান অবস্থায় যুক্ত হওয়ার অর্থ শুধু পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়া নয়, ভারতবর্ষেরও অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ইহার স্পষ্ট উত্তর, কখনও নয়। পাকিস্তানের সহিত বিমুক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত ভারতবর্ষভুক্ত হইবার কোনও আগ্রহ পূর্ববঙ্গের মুসলমানের নাই, এবং হইতে পারে না। তাহা হইলে যে-উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া পূর্বপাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যাহার জন্য পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

এই উদ্দেশ্য বাঙালি মুসলমানের বিশিষ্ট জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিয়া উহার বিকাশসাধন। এই উদ্দেশ্যের পথে পাকিস্তান হইতে পূর্ববঙ্গের যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি বিপদের আশঙ্কা ভারতবর্ষ হইতে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমানের স্থান যতই অসন্তোষজনক হউক না কেন, উহা ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের স্থানের অপেক্ষা খারাপ হইবার কথা নয়। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমানের নিজস্ব জীবন অন্য রকম করিবার কোনও আগ্রহ ইংরেজের ছিল না। তেমনই পূর্ববঙ্গের মুসলমানত্ব, মুসলমানী জীবনযাত্রা, ও মুসলমান-প্রাধান্যের ক্ষতি করিবার কোনও ইচ্ছা পাকিস্তানের থাকিতে পারে না, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানও মুসলমানের দেশ, ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঐক্য সম্বন্ধে, বিশেষত মানসিক ধর্মের একীকরণ সম্বন্ধে, ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব ও কথাবার্তা যে-ধরনের তাহাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইলে পূর্ববঙ্গে ইসলামের স্থান কি থাকিবে ও মুসলমান-প্রাধান্যের কি হইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ হওয়া সেই দেশের মুসলমানের পক্ষে স্বাভাবিক। মুসলমানের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার বেলাতে হিন্দুস্থানী-প্রধান ভারতবর্ষ কি মূর্তি ধারণ করিবে তাহা মুসলমানের পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয়। গোহত্যা, আমিষ ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুস্থানী হিন্দুর গোঁড়ামি বাড়িয়া চলিয়াছে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তাহা ছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানের এটুকু বুঝিতে কোনও অসুবিধাই নাই যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে তাহাদের প্রতি যে সমবেদনা দেখাইতেছে, উহা আসলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের প্রতি করুণা, ভালবাসা বা সহযোগিতা নয়। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের যে প্রাধান্য আছে তাহা ভারতবর্ষে আসিয়া উহারা হারাইবে কেন?

ভারতবর্ষ হইতে ভয় ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর মনোভাব সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের মুসলমান নিশ্চিত নয়। স্বীকার করিতেই হইবে দুই বাংলার মধ্যে এখন যথেষ্ট বিরুদ্ধভাব বর্তমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষের কোনও পক্ষই এখন পর্যন্ত পূর্বেকার ও বঙ্গবিভাগপ্রসূত অভিযোগ ভুলে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে যে-সকল মধ্যবিত্ত হিন্দু বিতাড়িত হইয়াছে তাহাদের ঘরবাড়ি, ধনসম্পত্তি হারাইবার শোক ও ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। এত শীঘ্র হইবারও নয়। অপরপক্ষে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষক বহুকাল ধরিয়া হিন্দু মহাজন জমিদারের শোষণ হইতে দুঃখকষ্ট পাইয়াছে, তাহার স্মৃতিও লোপ হয় নাই। সুতরাং দুই পক্ষের কোনও 'ক্ষই অতীত ভুলিয়া ভাই ভাই হইবার মতো মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া পায় নাই।

ইহা· উপর আরও একটা কথা আছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান এতটা অন্ধ নয় যে, ভারতবর্ষের সহিত বাংলার আজ যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে এবং বাঙালির সহিত হিন্দুস্থানীর কি সম্পর্ক তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পায় না। বাঙালির কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর কোনও জোর থাকা দূরে থাকুক, বাংলাদেশেও পূর্ণ প্রভুত্ব নাই। ভারতবর্ষের সহিত বাংলার যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক তাহাকে সহযোগিতা না বলিয়া অধীনতার মতোই বলা চলে। এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের মুসলমান যদি আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা পাকিস্তানের অধীনতার চেয়ে বেশি ছাড়া কম অবাঞ্ছনীয় হইবে না ইহা মনে করাই পূর্ববঙ্গের পক্ষে স্বাভাবিক।

এখনও ভারতবর্ষ হইতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের ভীতির কারণ আছে। এই ধারণার বশেই ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে নিজেদেরকে অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় দেখিয়া উহারা এত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সঙ্কটে সামরিক ব্যবস্থা উপযুক্ত করা হয় নাই বলিয়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা অভিযোগ করিয়াছিল। যদিও এই আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না বলিয়াই আমার বিশ্বাস, তবু তাহাদের মনে যে ভয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেজন্যই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্যে স্বতন্ত্র সামরিক ব্যবস্থারও দাবি করিতেছে।

মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানের পাকিস্তানের প্রতি অসন্তোষ এখনও ভারতবর্ষ ভীতির অপেক্ষা প্রবল হয় নাই। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির মিলনের সময় এখনও আসে নাই। পূর্ববঙ্গের পক্ষে পাকিস্তান হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সেই দেশের সামরিক শক্তির আশ্রয় ত্যাগ করা মোটেই নিরাপদ নয়।

## প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও উহার সম্ভাবনা

প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা আছে। সেটি এই—পাকিস্তানের আধিপত্য মানিয়া ও উহার রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক শক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া যতটুকু স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা। ইহাকে একপ্রকার 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' বলা চলে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে লোকসংখ্যার যে অনুপাত, তাহাতে এই স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সঙ্গত বলা চলে। অভ্যন্তরীণ শাসনে উহার পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানের অধীন থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের দাবি কি কখনও পূর্ণ হইবে ?—এইটাই আসল প্রশ্ন। এখনও উহার নিশ্চিত কোনও উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে অবস্থাটা যে কি তাহার একটু সন্ধান লওয়া যাইতে পারে। একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে ইহার একটা ঐতিহাসিক নজীর ব্রিটিশ শাসনের শেষ যুগে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের সহিত পাকিস্তানের যে-বিরোধ আজ দেখা যাইতেছে, উহার সহিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহের একটা সাদৃশ্য আছে। সেই সংঘর্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তি ছিল একদিকে, আবেগের শক্তি ছিল অন্যদিকে। শাসক সর্বদাই তাহার শক্তি দিয়া শাসিতদের আন্দোলন দমন করিত। এই ব্যাপার আমি তিনবার দেখিয়াছি। কিন্তু কখনই এই দমনের ফলে আন্দোলনের অবসান হয় নাই।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে-অবস্থা আজ দেখা যাইতেছে, তাহাও ঠিক এই ধরনের। পশ্চিম পাকিস্তানের এমন শক্তি আছে যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানের আন্দোলন দমন করিতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের মূল ইহাতে নষ্ট হইবে না। সুতরাং কার্যত বিদ্রোহ থাকুক আর নাই থাকুক, বিদ্রোহপরায়ণতা সর্বদাই থাকিবে।

পাকিস্তানের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ও পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীদের শক্তি কখনই এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইবে না, কারণ একটির ক্ষেত্র হইবে রাষ্ট্র, অপরটির মন। ইহার জন্যই আবার কোন্‌ওটিই অপরটির বিশেষ নাগাল পাইবে না, বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহার ফলে চরম হারজিত দেখা যাইবে না।

অবশ্য আমি ইহাও মনে করি যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের দাবি অংশত মিটাইবে বা মিটাইতে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ কিছু কিছু মানিয়া আপসের চেষ্টা করিবে। এই ব্যাপারেও ব্রিটিশ নজীর আছে। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এক ধুয়া ধরিয়াছিলেন—"রিপ্রেশ্যন্‌" অর্থাৎ দমন, এবং 'রিফর্ম' বা শাসনতন্ত্রের সংস্কার। ইহার অর্থ এই যে, আন্দোলনের কাছে হার মানা হইবে না, কিন্তু অনুগ্রহের মতো কিছু কিছু দেওয়া হইবে।

কিন্তু ইহাতে শেষ পর্যন্ত কোনও সাফল্যই দেখা যায় নাই। দমনও পুরা হয় নাই, সন্তোষ-বিধানও পুরা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বরাবরই আবার নিজেদের একটি ধুয়া ধরিতেন—"টু লিট্‌ল্‌ অ্যান্ড টু লেট"—অত্যন্ত কম, এবং অত্যন্ত দেরিতে। যে-সময়ে যাহা দিলে লোক সন্তুষ্ট হইত, তাহা কখনই দেওয়া হয় নাই, যখন আসিয়াছে তখন লোকের দাবি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইল না।

আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানও পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্বন্ধে এই পন্থাই অবলম্বন করিবে। ফলও একই হইবে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তানের বিবাদ পুরাতন ও অনারোগ্য ব্যাধির মতো হইয়া থাকিবে—যাহাতে লোক মরেও না, সুস্থও হয় না। অবশেষে যাহা ঘটিবার ঘটিবে।

আর একটা জিনিস বিবেচনা করিলেও এই অনুমান সঙ্গত মনে হইবে। উহা পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মানসিক ধর্ম। ইহার সহিত রাজনৈতিক ব্যাপারের যোগ সর্বত্র ও সর্বকালে দেখা গিয়াছে। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ইংরেজ মন ও চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফ্রান্স, জার্মেনী, জাপান ইত্যাদি সব দেশের দৃষ্টান্তই এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, মানসিক ধর্মকে বাদ দিয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল বিচার করা যায় না।

বর্তমান প্রসঙ্গে যাহাদের মানসিক ধর্মের খোঁজ লইতে হইবে তাহারা পূর্ববঙ্গের সেই শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সম্প্রদায় যাহারা স্বাতন্ত্র্যের জন্য আন্দোলন চালাইতেছে। এই মুসলমানদের সহিত বাংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে ভদ্রসন্তানরা জাতীয় আন্দোলন চালাইয়াছিল উহাদের বিশেষ মিল আছে। এই মিল থাকা স্বাভাবিক।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই কথাটা বুঝাইতে হইলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের আধুনিক সামাজিক বিবর্তনের একটু পরিচয় দিতে হয়।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে (ইহাদের মধ্যে জমিদারদের ধরা হইতেছে না) ব্রিটিশ শাসনের যুগ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট সামাজিক ভেদাভেদ ছিল না, ইহাদের সকলেই একশ্রেণীভুক্ত ছিল—সে শ্রেণী মূলত কৃষক। ইহাদের মধ্যে কেউ বা সচ্ছল, কেউ বা দরিদ্র, কিন্তু ভদ্র বা ভদ্রেতর শ্রেণী বলিয়া উহাদের মধ্যে কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজের চাকুরির ফলে একটা চাকুরিজীবী মুসলমান ভদ্রশ্রেণী গড়িতে আরম্ভ হইল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ও ১৯০৫ সনে বাংলা বিভক্ত হওয়ার ফলে এই পরিবর্তনের গতি বাড়িয়া গেল, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন ও বাংলা বিভক্ত হইবার পর হঠাৎ এই ধাক্কাটা একেবারে জোরালো হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারটাও স্বাভাবিক। কারণ হিন্দু ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসার পর সমাজের এই স্তরে যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হইল, তাহা মুসলমানই পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গে একটা মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অতি দ্রুততালে সৃষ্টি হইতেছে।

শুধু তাই নয়, এই নূতন মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মানসিক ধর্মে হিন্দু ভদ্রসম্প্রদায়ের মতো হইতেছে। ইহারও কারণ আছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে অভিজাত ছিল, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। সুতরাং মুসলমান মধ্যবিত্ত যখন দেখা দিল, তখন তাহার আচার-ব্যবহার, ধরন-ধারন হিন্দু ভদ্রলোকের মানসিক ধর্মের ছাঁচেই ঢালা হইতে লাগিল। ইহার প্রথম কারণ এই যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও ভাষাগত পার্থক্য ছিল না, দ্বিতীয় কারণ দুই-ই স্কুলে কলেজে একত্র এক শিক্ষা পাইয়াছিল। সুতরাং নূতন মুসলমান মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আদর্শ ও মনোবৃত্তি অনেক দিকে গ্রহণ করিল। অবশ্য এ ব্যাপারটা জ্ঞাতসারে হয় নাই, হইয়াছে স্বাভাবিক ধারায় ও অবস্থাচক্রে।

AMARBOI.COM

কিন্তু যেভাবেই হউক না কেন, উহার ফলে আজিকার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মানসিক ধর্ম শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মানসিক ধর্মেরই মতো। অর্থাৎ উহাতে বাঙালি হিন্দুর আদর্শপরায়ণতা, আবেগপ্রবণতা, ভালবাসা ও ঘৃণার ক্ষমতা, হিসাব না করিয়া বৈষয়িক ফলাফল বিবেচনা না করিয়া ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস আছে। ইহাতে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য আন্দোলন ও আত্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের যে উন্মাদনা এক সময়ে বাঙালি হিন্দুর মধ্যে ছিল তাহাই নূতন রূপ ধরিয়া বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

আমার এ-বিষয়ে একটা নিজস্ব মত আছে। আমি মনে করি যে, আজ বাঙালির জাতীয় চরিত্র, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের মুসলমান বাঙালির মধ্যে বেশি প্রস্ফুট। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ভদ্রলোক একটা তুচ্ছ ইংরেজিপনাতে নিজের ধর্ম হারাইতেছে ; দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে অর্থলিপ্সা ও অর্থাভাব দুই-এরই প্রাবল্যে আদর্শপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এই দোষগুলি এখনও বেশি দেখা যায় না। তাহারা অনেক স্বাভাবিক, সরল, ও সহজ বাঙালি রহিয়াছে। বাঙালির দুর্বলতা ও শক্তি, দোষ ও গুণ দুই-ই তাই আজিকার দিনে পূর্ববঙ্গে বেশি প্রকট। সুতরাং মুসলমান বাঙালি যে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়।

কিন্তু উহাদের প্রতিপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান। উহাদেরও কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে। উহারা শরীরে বলিষ্ঠ, মনে দৃঢ়, তাহার উপর সাংসারিক বুদ্ধি ও ধীরভাবে হিসাব করিবার ক্ষমতা অনেক বেশি রাখে। একদিকে উচ্ছ্বাস ও আবেগ, আর একদিকে স্থির বুদ্ধি। সুতরাং এ-দুই-এর মধ্যে দ্বন্দ্বে সহজে কাহারও জিত হইবার নয়। আমার বিশ্বাস, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পর বিরোধ করিয়া কোনও বিশেষ হারজিত দেখাইতে পারিবে না, সুতরাং পূর্ববঙ্গের সমস্যার সমাধান এই দুইটির কার্যকলাপের দ্বারা হইবে না। শেষ পর্যন্ত কি হইবে তাহা নির্ভর করিবে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে রাজনৈতিক বিবর্তন ও অবস্থার উপর। ইহার বেশি সঠিক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে না।

AMARBOI.COM

প্রবন্ধের পাঁচটি অংশ যথাক্রমে ১১ ভাদ্র ১৩৭৩, ২৮ আগস্ট ১৯৬৬ ; ১৩ ভাদ্র ১৩৭৩, ৩০ আগস্ট ১৯৬৬ ; ১৫ ভাদ্র ১৩৭৩, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ; ১৮ ভাদ্র ১৩৭৩, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ; এবং ২০ ভাদ্র ১৩৭৩, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# "ভোট-মঙ্গল"

## সেকালের বাঙালির চোখে ইলেকশন

আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি চলিবে না, এই কথা বলিলে সেদিন পর্যন্তও আধুনিক বাঙালিরা ক্ষেপিয়া মারিতে আসিতেন। তাঁহাদের ভাবটা এই ছিল, যেন বিলাতি ডেমক্রেসির প্রতি নিষ্ঠা ভারতমাতার পক্ষে সতীত্বের মতো ব্যাপার, উহা না থাকিলে তিনি অসচ্চরিত্রা বলিয়া কুখ্যাতি লাভ করিবেন। ইউ-এফ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে ১৯৬৭ সনে তাঁহাদের শাসনকালে অন্তত একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। এই মোহ খানিকটা কাটাইয়া দিয়াছেন। এখন একমাত্র যাঁহারা ইলেকশন হইতে নিজেরা নিজেদের বৈষয়িক লাভের আশা রাখেন, ডেমক্রেসি ভাঙাইয়া করিয়া খাইতে চান, তাঁহারা ছাড়া আর বিশেষ কেহই ইলেকশনের জন্য উৎসাহী নন। আমার মনে হয়, এই বিতৃষ্ণা বাড়িবে বই কমিবে না।

এই মত পরিবর্তনকে খানিকটা বাঙালির পুরাতন মনোভাবে ফিরিয়া যাওয়া বলা যাইতে পারে। লর্ড রিপন যখন মিউনিসিপালিটি বা "স্থানীয় আত্ম-শাসন" (কথাটা "লোক্যাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট"-এর বিদ্রূপাত্মক অনুবাদ) প্রবর্তন করিলেন তখন একদল বাঙালি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা নব্যপন্থী, ইঁহারা লর্ড রিপনের স্তুতি-বন্দনায় একেবারে দেশকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আর একদল বাঙালি উচ্ছ্বসিত না হইলেও মনে মনে খুবই খুশি হইলেন। ইঁহারা বাঙালি সমাজের ঝানু দলপতির দল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এই নূতন বিলাতি হুজুগে তাঁহাদের লাভ বই ক্ষতি হইবে না, যে কাজে তাঁহারা বহু যুগ ধরিয়া অভ্যস্ত, যাহাতে হাত পাকাইয়া তাঁহারা ওস্তাদ হইয়াছেন, সেই দলাদলি, চক্রান্ত ও দাঁও মারিবার নূতন পথ খুলিল। তৃতীয় আর একদল বাঙালি অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, ভোট ও ইলেকশনের সত্যকার রূপ বাংলাদেশে কি হইবে। সুতরাং "স্থানীয় আত্ম-শাসন" লইয়া ব্যঙ্গাত্মক রচনাও আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্যে"ও এ-বিষয়ে একটু শ্লেষ আছে।

আমি সেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এ-বিষয়ে সে-যুগে প্রকাশিত একটি বাংলা নাটক বা প্রহসন পড়িলাম। বইটার টাইটেল পেজের ছবি এই সঙ্গে প্রকাশিত করিতেছি। তাহা হইতে বইটার নাম ইত্যাদি পাঠক জানিতে পারিবেন। বইটার তারিখ নাই, তবে মনে হয়, ১৮৯০ সনের আগেই ছাপা হইয়াছিল। এই লেখক তৃতীয় দলের মুখপাত্র হিসাবে ইলেকশনের দুই নিদান আবিষ্কার করিয়াছেন—১। উহা পুরাতন বাংলার দলাদলি, রেষারেষি ও ঘোট-মঙ্গলেরই নূতন রূপ; ২। উহা ইংরেজ শাসনের প্রতি রাজভক্তি শিখাইবার একটা গুপ্ত প্রয়াস। গীতা হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা লেখকের মনোভাবের বিশেষ পরিচায়ক। তিনি ভোট ইত্যাদিকে সনাতন ধর্মের বিরোধী বলিয়াও ধরিয়াছেন। তাই নিজেকে ম্লেচ্ছ বিনাশকারী কল্কির চেলা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলেকশন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর বাঙালির মতামতের পরিচয় হিসাবে এই প্রবন্ধে বই-এর অনেক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। গল্পটা তুচ্ছ, তাই উহার চুম্বক আর দিলাম না, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

## ইলেকশনের উপক্রমণিকা

ইংরেজের উদারতা ও উদ্যোগে বাংলাদেশ সবেমাত্র মিউনিসিপালিটির প্রবর্তন হইয়াছে, উহার ফলে বাংলার সব দিকে উন্নতি হইতেছে অথচ স্বর্গরাজ্য পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং দেবাসুরেরা তাহাদের পুরাতন ঝগড়ায় লিপ্ত থাকিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, এই সব দেখিয়া স্বর্গরাজ ইন্দ্র মর্মাহিত হইয়া দৈত্যরাজ বকাসুরকে এই পত্র লিখিলেন—

"মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বকাসুর-হাবল-মিত্রবর করকমলেষু। দৈত্যরাজ!

"একাল পর্যন্ত পরস্পর-অধিকৃত মিউনিসিপালিটির সর্বত্র বিজয়ী যশোরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বলোকে একাধিপত্য করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ একটি সুসমৃদ্ধিশীল স্বর্গরাজ্য মধ্যে সভ্যতা, বিদ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মহৎ মহৎ আবশ্যকীয় পদার্থের পূর্ণ উন্নতি হইল না। এতদ্ব্যতীত মহামহিম সর্বভুক্ বিরাট রাজ্যের[১] অধীনস্থ রাজাগণের মধ্যে রাজভক্তি ও রাজবিদ্যা শিক্ষা একটি মহৎ কার্য। এ সম্বন্ধে সর্বভুক্ সম্রাটের অধীন ব্যাঙ্গদেশ একটি প্রধান উদাহরণস্থল। তদ্দেশবাসী ব্যাঙাচীরা রাজভক্তিগুণে এক্ষণে যেরূপ রাজ-অনুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, বোধ হয় অতি সত্বরই তাঁহারা গললগ্নকৃত-শৃঙ্খল হইয়া, তাঁহাদের ভক্তিগুণের পরিচয় প্রদানে ত্রুটি স্বীকার করিবেন না। কারণ, ইতিমধ্যেই তাঁহারা রাজদ্বারে আবদ্ধ থাকিয়া, ভক্তিরসপূর্ণ ভেউ ভেউ ধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আমরা এতাদৃশ সুবিশাল স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইয়াও রাজভক্তি ও রাজ-অনুকরণ এতদুভয়ের কোনটিরও যোগ্য পাত্র হইলাম না। এই সমস্ত মহাবিঘ্নকর বিষয়ের অভাব দূর করিবার জন্য একটি মহৎ উপায় স্থির করিয়া মহাশয়কে জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদিগের স্বর্গরাজ্যে যেরূপ সভ্যতা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অতি সত্বরই এ সম্বন্ধে একটি পাকা বন্দোবস্তের আবশ্যক। আর তিন মাস পরে স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ত্রৈবার্ষিক ইলেকশন হইবে। আমার ইচ্ছা, দেবাসুরের বৈরভাবের পরিবর্তে একতা ও রাজ্যোন্নতি বিষয়ে পরস্পর একটি চিরশান্তি স্থাপন হয়।"

দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রস্তাব দৈত্যরাজ গ্রহণ করিলেন এবং স্থির হইল, বারোয়ারি পূজা করিয়া এই মিউনিসিপাল নব্যধারা স্বর্গে প্রবর্তন করা হইবে। কিন্তু বারোয়ারি পূজা বাঙালি সমাজেই হউক বা দেবাসুর সমাজেই হউক, বারোয়ারি পূজার ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইলেকশনও সেই ধর্ম অবলম্বন করিবে। নারদমুনি ইহা আগেই বুঝিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই দেবরাজের নিমন্ত্রণ দৈত্যরাজের কাছে আনিয়াছিলেন, এবং ইহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া চিঠি দিবার আগেই এই স্বগত উক্তি করিয়াছিলেন—

"মন! স্বকার্য সাধন তোমার মৌরশী কার্য। অসুররাজ দেবতাদের গালে চড় মেরে, ফাঁকি দিয়ে যে মিউনিসিপালিটি কেড়ে নেবে, তা তো তুমি আভাসেই জেনেছ; এখন ফাঁকে ফাঁকে থেকে রগড় বাঁধিয়ে মজা দেখ। এখন ত দেবতাদের সুসভ্যতার ফেরে পড়ে গোঁপ-দাড়িতে কলপ দিলেম, চোনেট করা কাপড় চাদর আর বিলাতী জুতাও পরলেম,

১. ইংরেজ শাসনের এই সংজ্ঞা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সব খায়, সেই জন্য 'সর্বভুক্', আবার দেশের সকল সম্পদ গ্রাস করিতেছে সেজন্যও 'সর্বভুক্'।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজীও কিছু কিছু শিখতে হয়েছে, এখন যেনতেন প্রকারেণ বিবাদেন মহাফলং। হে নারায়ণ! যেন আমার চিরকেলে নামটা লোপ হয় না। দুরন্ত অসুর-মক্ষিকে চেয়ারম্যানরূপ মধুর কলসী দেখিয়ে কলে ফেলে পেষণ দিতে হবে; এখন ছলেকলে বিবাদটা গুরুপাকে দাঁড় করাতে পারলেই মজা হয়।"

নারদঋষির মনোবাসনা একেবারে বারোয়ারি পূজা হইতে, অর্থাৎ ইলেকশনের উপক্রমণিকা হইতেই পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। পুরোহিত কে হইবে, দেবরাজের সভায় এই প্রশ্ন ওঠাতে কেউ কেউ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নাম করিল। শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—

"বটেই তো, বটেই তো, সেটা কে? সেই অসুরদের পুরুত শুক্রাচার্য—সেটা ভণ্ড, গণ্ড, বেল্লিক, পতিত, তাকে ভাগ দেব, না তো দেব কাকে? বেটা বামন হয়ে গাড়োয়ানী করেছে, বেটা আবার পুরুতি করবে।"

নারদ স্বভাববশে কথাগুলি দৈত্যরাজসভায় শুক্রাচার্যকে বলিয়া দিলেন। আর যায় কোথায়! শুক্রাচার্য রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

"কি, ব্যাটার এত বড় আস্পর্ধা! আমার উপর বড় কথা? বলি, ও নারদঠাকুর, সেটার বুঝি একঘরে হবার ভয় নেই? তার ঘরের কুচ্ছ বার কল্লে ঘাড়টা হেট করে 'বাপ বাপ' করে দৌড় মারতে হবে। জানে না, ব্যাটা হরমণি ব্যাওয়ার বাড়িতে ফলার করে চার আনা দক্ষিণা এনেছে, আর ব্যাটা হাটেবাজারে একটা পয়সার জন্যে মেছুনী মাগীর ঝাঁটা খায়, ব্যাটা আবার গাড়োয়ান নাড়া নাড়তে আসে। (মহারাজের প্রতি)—ব্যাটাকে আনন্দবাজার থেকে ঘাড় ধরে বার করে দিন।"

যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়াই পূজা আরম্ভ হইল। এই ব্রাহ্মণ দেবপক্ষের। সে 'ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু' বলিয়া পূজা আরম্ভ করিল—

"ওঁ অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কাশ্যপ গোত্রস্য শ্রীসহস্রলোচন-দেবশর্মণঃ সপরিবারস্য সদেবস্য শুভকর্মার্থায় শুভ মিউনিসিপালিটি কার্যনিষ্পন্নার্থায় বারোয়ারী পূজাং করিষ্যামি।"

চীৎকার করিয়া বাজনদারদের বলিলেন, "ওরে বাজাদারেরা, বাজা, বাজা!"

এমন সময় দৈত্যপক্ষের যুবরাজ হুতুমের দারোয়ানরা পূজা নষ্ট করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। প্রথম দারোয়ান ডলন্ড সিং বলিল,

"আরে নচমী সিং, পাকড়ো শালেকো, যুবরাজ হুতুম মহারাজকা বাত মানতা নেহি।"

নাচমী সিং।—"আরে সবুর ভাই! ও লোক ব্রাহ্মণ হ্যায়, ওস্কো ক্যা দোষ হ্যায়? (পুরোহিতের প্রতি) এ ঠাকুরজী, আরে জলদি উঠো। যুবরাজ হুতুম কা হুকুম হ্যায়, তোমকো নেহি পূজা করনে দেগা।"

পুরোহিত। (সকম্পনে)—"কেন বাবা, হামকো কি দোষ আছে, বাবা? কোথা যাব, বাবা? দেবরাজ ইন্দ্র বাবা, তোদের বাবা, পায়ে পড়ি বাবা, বামনী বাবা, একা ঘরে বাবা।"

জব্বর সিং।—"ক্যা শালে, তোম্ গালি দেতা হ্যায়? তোম্ বাবা হ্যায়? শালে আদমী জানতা নেহি, শনি মহারাজ, অসুররাজ, গজোদরবাবু আউর কলিরাজ আকে ওনকো সেলাম দেতা হ্যায়?"

কিন্তু আবার দেবপক্ষ হইতে সবেগে সদলবলে শশধরবাবুর (অর্থাৎ চন্দ্রের—দেবতারা সকলেই বাবু হইয়াছেন) প্রবেশ। তিনি বলিলেন,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

" কে আছিস রে। ধর শালাদের, খুঁটিতে বেঁধে পঁচিশ পঁচিশ জুতো হাক্‌রা ও ব্যাটাদের। হুতমো ব্যাটার কথায় পূজো বন্ধ! ব্যাটার তো গুণের অবধি নাই। ধর ব্যাটাদের ধর, এক ব্যাটাকে ছেড়ো না!" সঙ্গে সঙ্গে হুতুম যুবরাজের দারোয়ানরা পলায়ন করিল। শশধরবাবু বলিলেন,

"পুরুত মশাই! আপনি পূজো করুন। কোন শালা কি করে দেখি।"

ইহার পর ইলেকশন-পর্ব আরম্ভ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিব যে, আমি অল্পবয়সে কলিকাতার উপকণ্ঠে বারোয়ারি পূজা এইভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। একদল পূজা করিতেছে, এমন সময় পরাজিত দলের এক যুবক দৌড়িয়া আসিয়া অভিসম্পাত করিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিজয়ী দলের নেতা যুবককে ধরিয়া হাড়িকাঠের দিকে টানিতে টানিতে বলিলেন, "শালাকে মায়ের কাছে বলি দেব!"

## ইলেকশন অভিযান

নারদঋষি ইলেকশনের নোটিস পড়িয়া শুনাইলেন—

"এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখে হেভেন মিউনিসিপালিটির ইলেকশন হইবেক। স্ব স্ব ওয়ার্ডের ভোটদাতাগণ উপস্থিত থাকিয়া কমিশনার নির্বাচন সম্বন্ধে ভোটপ্রদান করিবেন। সর্বভুক্ গভর্নমেন্ট হইতে ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া ইলেকশন কার্য সম্পন্ন করিবেন।"

তাহার পর ভোট যোগাড়ের পালা আরম্ভ হইল। প্রথমে ঘরে পরামর্শ, কাহাকে দেওয়া এবং কিসের জন্য দেওয়া বা না-দেওয়া। শনি নিজের বাড়িতে দুই পুত্র বৃশ্চিক ও কর্কটের উপরোধ ও ধমকের ফেরে পড়িয়াছেন। বৃশ্চিক বলিতেছে—

"না বাবা, তোমার মত হলেই গজোদরবাবুর জয় হয়। তোমার এইটি করতেই হবে।"

কিন্তু গজোদর সম্বন্ধে শনির ঘোরতর ব্যক্তিগত আপত্তি। তাই তিনি বলিলেন—

"দেখ বৃশ্চিক, সেবারকার দায়রা সপ্‌রোদ্দের মোকদ্দমার কথা বুঝি মনে নেই? সরকারী উসুল ছাট টাকাকড়ি যা কিছু আমার সম্বল ছিল, ঐ গজোদর হতেই তো আমার সব গেছে। ঐ তো চৌগোঁপ্পা গেঁজেলকে সাহায্য ক'রে আমাদের চোখের জলে নাকের জলে করেছে। না বাবা, আমি সে সব পারব না। আর দেবতাদের সর্বনাশ করি আর যাই করি, দেবতারা আমার অপর নয়।"

পিতার এই অমত শুনিয়া অন্য পুত্র কর্কট একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার ব্যক্তিগত শত্রুতা ইন্দ্রের উপর, সুতরাং তাহার পক্ষপাতিত্ব দৈত্যকুলের ক্যান্ডিডেটের দিকে। সে বাপকে ধমক দিল—

"আপনি অতি stupid-এর মত কথা বলেছেন। Past event-এর সূচনা করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় নয়। সেদিন চিরবৈরী ইন্দ্র পুকুর-কাটা কথা নিয়ে রাজসভা মধ্যে আমাকে কি অপমানটাই না কল্লে! Revenge! Revenge! প্রতিহিংসাই এর প্রধান মুষ্টিযোগ! চিরকালটাই যে একভাবে থাকতে হবে, তার মানে কি? গজোদরবাবু একজন সামান্য লোক ন'ন। আর এদিকে দেবতারাও তো তোমাকে একরকম একপেশে করেছে। পূজোর ভাগ গ্রহণ করে না, তুমি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর তার ত্রিসীমানায় থাকে না। আবার আমাকে দাদাকে দেখে ঠাট্টা করা হয়। এ সব দেখে শুনেও বুঝি জ্ঞান জন্মায় না? Fie fie।"


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতাপুত্রের ঘোরতর ঝগড়া বাধিয়া উঠিল।

অন্য দিকে ভোটপ্রার্থীরা ভাল করিয়াই জানেন যে, শুধু বড় লোকের ভোট যোগাড় করিয়া জেতা যাইবে না, "ছোটলোকেরা" বেশি সংখ্যক, সুতরাং তাহাদের ভোটের মূল্য বেশি। তাই দৈত্যপক্ষের ক্যান্ডিডেট গজোদরবাবু মুসলমান পাড়ায় গিয়া নেমকহারাম গাজী মিঞাকে হাত করিবার চেষ্টা করিলেন, সঙ্গে তাঁহার দালালরাও আছে। গজোদর বলিলেন,

"আচ্ছা, গাজী সাহেব! তুমি যত টাকা নেও দেবো, আমাদের পক্ষে ভোট দিতে হবেই ; নয়ত তোমার এইখানকার[২] দ্বারদেশে পড়ে রইলুম। বুকে পা তুলে মেরে দেনা : জয় জগদীশ্বর ! যা কর বাবা গাজী সাহেব। আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।"

গাজী—"আরে শালার ভাই শালারা বড় ভগরে [ফক্করে] ভেন্‌নেক [ফেললেক] যে! সুমুন্দির ভাই নড়ে না যে! যেন পাষাণ হোই দেখ্‌, আত্তির দুপুরের বেলায় যেন একটা অগড় [রগড়] পেয়েচে। ডাকবো নাকি লোকগর, ছেড়ে দেনা।"

ব্যাপার দেখিয়া গজোদরবাবুর দালাল অকালকুষ্মাণ্ড ক্যানভাস করিবার ভার নিল,

"বাবা গাজী! তোর পায়ে পৈতে ছিড়বো।" (পৈতা জড়াইয়া গাজীর পদতলে পতন।)

গাজী—"আরে শালা বামোন কল্লাক্ কি! হুঁ হুঁ, আমার ছাবাল পোলাগার মোল্লি হোবাক যে, খেন্তো দে, খেন্তো দে।"

অকালকুষ্মাণ্ড—"বল্ বাবা, কালপেঁচোবাবুর দুটো ভোট? তুই যত টাকা চাস দেবো!"

গাজী (ক্ষণেক চিন্তার পর)—"আচ্ছা, বল শালা বামোন, ২৫ টাকা দিবি? হ্যা, ঝানলুম যে এক ঘা দায় অক্যে গেলা! দে ২৫ টাকা, দেবো তোমায় দুটো ভোট।"

## ইলেকশন সম্বন্ধে নারীগণের আলোচনা

আজকাল মেয়েরা রাজনীতি ও ইলেকশনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহাদের যে উৎসাহ, তাহা সংবাদ ও ছবি এই দুইটার সহযোগে খবরের কাগজে জাহির করা হয়। ভোটের নেশা তাঁহাদেরও ধরিয়াছে, সুতরাং সেই পুরাতন নিরপেক্ষ দৃষ্টি তাঁহাদের আর নাই। সে যুগে মেয়েরা এই হুজুগের বাহিরে ছিলেন, সুতরাং ব্যাপারটাকে অনেকটা সাদা চোখে দেখিতে পারিতেন। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ইলেকশনের হাঙ্গামা যখন চলিতেছে, তখন নানাবয়সের কয়েকটি স্বর্গবাসিনী মানস সরোবরে জল নিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন বৃদ্ধা ক্ষ্যামা দিদি (কলসী কক্ষে একটি বালিকা সহ), এবং সর্বমঙ্গলা, মধুমতী প্রভৃতি স্বর্গের ঋষিবালারা। ক্ষ্যামাদিদি বলিলেন,

"হ্যাঁ লো মধুমতী, তোর ভাতার নাকি টোলে পড়া ছেড়ে দিয়ে দেবতাদের ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজী পড়া আরম্ভ করেছে? ওমা, যাব কোথায়! আমরা বামন-পণ্ডিতের ঝি বৌ, শাচতোর নেচতোর মানবো বলে বড় বড় ভট্টাচার্য দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। তা ভাই, আজকাল কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছি।

২. 'খানকা' অর্থ মুসলমান ফকির-দরবেশদের থাকিবার জায়গা ; পরে সাধারণ সরাই অর্থে ব্যবহৃত হইত ; ইহা হইতেই 'খানকী' কথাটা আসিয়াছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে কালে দেখব কত,
দেখে শুনে বুদ্ধিহত।"

সর্বমঙ্গলা বলিলেন,

"তা ক্ষেমীদিদি, শুধু ওর ভাতার কেন, দেবতারা পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমরা স্বর্গের ঋষিবালা, অধর্ম কাকে বলে তার নামটি পর্যন্ত জানতেম না ; তা এখন তেমনই ধর্মকর্ম লোপ হয়েছে ; দেবরাজ ইন্দ্রি, (নাকে হাত দিয়া) ওমা, তাকে আর দেবরাজ ইন্দ্রি বলবার যো নাই। তিনি এখন ইন্দিরবাবু হয়েছেন। আর সেই বুড়ো শশধর আর অগ্নি অবতার মিলে স্বগ্যে যে মিছরিপালী এনেছেন, ইন্দিরবাবুও তাতে যোগ দিয়েছেন। ওপরওয়ালারা তাঁদের নাকি বড় ভালবেসেছেন। তাই স্বগ্যের চার্দিকে পাকা রাস্তা, বাঁধা ঘাট, ইসকুল-কলেজ, এই কুছিস্টি করে একেবারে স্বগ্যসুদ্ধ খিস্‌টান করে তোলবার উয্যোগ তুলেচেন।"

মধুমতী (ইনি ঋষিবালাদের মধ্যে আধুনিকতার পক্ষে) বলিলেন, "ও ঠান্‌ দিদি! বলি তোমরা কি আমাদের সভ্যভব্য হতে দেবে না ? চিরকালটাই তোমাদের মুখে সেই মনসার ভাসান, আর দাতা কর্ণের পর্ব শুনব ? এখন দেখ দেখি, আমরা কত নতুন নতুন বই পড়চি, কত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কত রাজারাজড়ার গল্প পড়চি। ইংরেজ সাত সুমুদ্দুর তের নদীর পারে কোথায় কি কচ্চে, আমরা স্বর্গরাজ্যে বসে তার সমস্ত খবর পড়চি, দেখ দিদি, কত সুবিধা।"

ক্ষেমা—"মর ছুঁড়ী, একেবারে গোল্লায় গিচিস্। আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই ইংরেজী-পড়া মেয়ে, মিছরিপালীর খবর-টবর কিছু জানিস ? বলি, নারুদে অলপ্পেয়ে যে, দিন নেই রাত্তির নেই কেবল 'ভোঁট' 'ভোঁট' করে ঢোল পিটে বেড়াচ্চে, এর মানেটা কি ?"

মধুমতী। (স্বগত) "ভাল বুড়ীর হাতে পড়েছি, লেখাপড়া না জানলে এই দশা হয়।" (প্রকাশ্যে)—"ওগো, মিছরিপালী নয়, মিউনিসিপালিটি, আর ভোঁট নয়, ভোট ; শশধরবাবু আর অন্য অন্য দেবতারা মিলে যে মিউনিসিপালিটি এনেচেন, তারিরই তিন বচ্ছর অন্তর একটা করে ইলেকশন হয়।"

ক্ষেমা। "আ মলো! এ-লো-কা-শু-ন-দি আবার কি ?"

মধুমতী। "তোমার মাথা! এলোকাশুন্দী নয়, ইলেকশন, অর্থাৎ একটা নূতন বন্দোবস্ত হয়ে, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তা বাছা হবে, স্বর্গের সব লোক মিলে যারে পছন্দ করে, সে ওই কর্ত্তাপদটি পায়, তাই এত ভোটের গোলমাল হয়েছে।"

ক্ষেমা।—"কে জানে ভাই! তোদের ও ইংরেজী-ফারসী কিছুই বুঝি নে।"

সর্বমঙ্গলা। "বলি, ও দিদি, এত দিন বোঝ নি, এখন বুঝতে হবে। সেদিন আমার কত্তাকে নিয়ে হুলস্থূল বেঁধে গেছলো। ইন্দিরবাবু বলেন, 'দুটো ভোঁট আমারে দিও', হুতুমবাবু বলেন্, 'তা হবে না, আমাকেই দুটো দিতে হবে।' শেষে দাঙ্গার উয্যুগ আর কি। তার পর হুতুমবাবু রাত্রে কত্তাকে ডাকিয়ে নিয়ে এক থান বনাত, ২৫টে টাকা নগত, আর আমাদের হাঁসচাঁদকে একখানা খেঁশ না ঢোঁশা কি বলে, আর এক জোড়া সিমলের জুতো দিয়ে ভোট দেবার জন্যে কত্তাকে কবুল করে নেচেন।"

নেপথ্যে ঢোলের শব্দ শোনা গেল। ক্ষেমা-ঠাকুরানীর সঙ্গের বালিকা সক্রন্দনে ভীতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওই ভোট আসচে গো!"

ক্ষেমা।—"ও মেয়েরা পালা রে, পালা! ওই সেই ভোঁট। ওরে দেবতাদের ভিটেয়


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুঘু চরে আবুর [আব্রু] সম্ভ্রম সব গেল রে ! ওরে পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয় !”

এই তো গেল ঘাটের বিচার। এর পর ঘরের বিচার। বকাসুর স্বর্গ-মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। ভোট যোগাড়ের হিড়িকে অন্তঃপুরেও আসিতে পারেন নাই। আজ প্রাসাদের ভিতরে নিজ শয়নগৃহে শয্যায় শায়িত, পাশে রানী আমোদিনী। আমোদিনী বলিলেন,

“না, প্রাণনাথ ! আজ আমি তোমাকে কখন যেতে দেব না। আজ ১৫ দিনের পর তোমাকে দেখা পেয়েছি। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটু মায়া দয়া নাই ? মাগ্ ছেলে, বিষয় আশয় ফেলে কেবল ‘ভোট’ ‘ভোট’ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! ছি ভাই, তুমি বড় বে-রসিক। আজ আর আমি তোমাকে কখনও যেতে দেব না। আজ তোমাকে হারমোনিয়ামের সেই ‘সাদের তরণী আমার’ ভাঙ্গা গৎখানি সেখাতে হবে। আর সেই অলপ্পেয়ে ডেক্‌রা ঘোষ মন্ত্রী এলে তারে ঝ্যাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবো।”

আমোদিনীর অতঃপর হারমোনিয়াম আনয়ন। ভয় পাইয়া বকাসুর অনুনয় করিতে লাগিলেন—

“ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে ! প্রায় ঘেঁশে এনেছি, আর দু'-দুটো দিন মেহোন্বত কল্লে দেবতাদের গালে চড় মেরে চেয়ারম্যানি নেবো। তোমার পায়ে পড়চি, ভাই ! এ-সময় বাধা দিও না।” আমোদিনী না মানিয়া বলিয়া উঠিলেন,

“ভাল আর রসিকচূড়ামণি, তুমি যা' হোক। কি এক অলক্ষণে ভোট রোগ ধরে আমার এমন রসময়ের সোনার অঙ্গটী কালী করে দিলে !”

আরও অনেক কথা বলিয়া আমোদিনী হারমোনিয়াম সহযোগে গান ধরিলেন—

(রাগিণী সিন্ধু তাল মধ্যমান)
“যেওনা, যেওনা, প্রাণনাথ, আমার মাথা খাও।
মিছে ভোটের আশে কেন (ও নাথ !) দিবা নিশি দুঃখ পাও।
বার জনার কুমন্ত্রণা,
ও প্রাণনাথ, আর শুনোনা,
ভোটেতে সে সুখ হবেনা,
(ও নাথ) যে সুখ সংসারে পাও॥”

কিন্তু বকাসুর ভোটের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন।

শাশুড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “ও বউ, আমার সোনার চাঁদ ছেলে বেরিয়ে গেল, আর এই কি তোমার গান গাইবার সময় !” দুই দুঃখিনী নারী কথাবার্তা বলিয়া যুগধর্মের কাছে নিবেদন করা ছাড়া আর কোনও পথ দেখিল না। তাই আমোদিনী প্রার্থনা করিলেন—

“হে বাবা কলি ! তোমার মতন অঘটন ঘটাতে আর দু'টি নাই। তোমার কৃপায় উপযুক্ত ছেলে বুড়ো বাপ-মার গলায় দড়ি দিয়ে স্ত্রী কাঁধে বহন করে ; ভিখারী দ্বারে আসিলে ভিক্ষার পরিবর্তে প্রহার পেয়ে থাকে, তোমার কৃপায় হিঁদু হিঁদুয়ানী ছেড়ে তোমারই অনুগত হয় ; আর ওর মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত মাতার মুখাগ্নি না করে বিপরীত স্থানে আগুন দিয়ে থাকে ; তুমি যে মূর্তিতে হুতুমের সহায় হয়ে গুপ্ত কার্যে উৎসাহ দান করে থাক, আর তাকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীসুখে বঞ্চিত করে অট্টালিকা থাকতেও কোটরবাসী করিয়েছ, সেই মহাগুণপ্রভাবে আমার স্বামীকে চেয়ারম্যান করে দাও, যেন দেশের সব


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

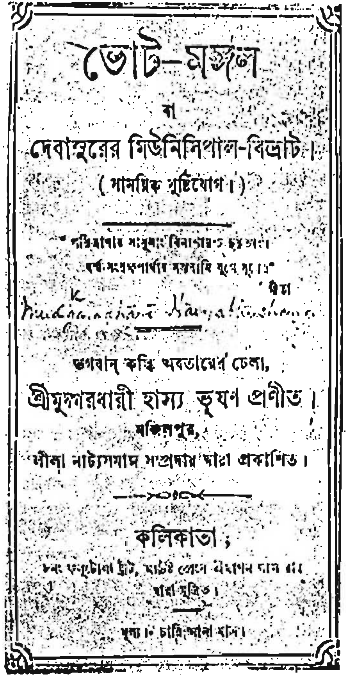

ভোট-মঙ্গল
বা
দেবাসুরের মিউনিসিপাল-বিভ্রাট।
(সাময়িক প্রহসন।)

ভগবান কল্কি অবতারের চেলা,
শ্রীমুদ্গরধারী হাস্য ভূষণ প্রণীত।
মজিলপুর,
লীলা নাট্যসমাজ সম্প্রদায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

নাটকের টাইটেল-পেজ
(ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে রক্ষিত বই)

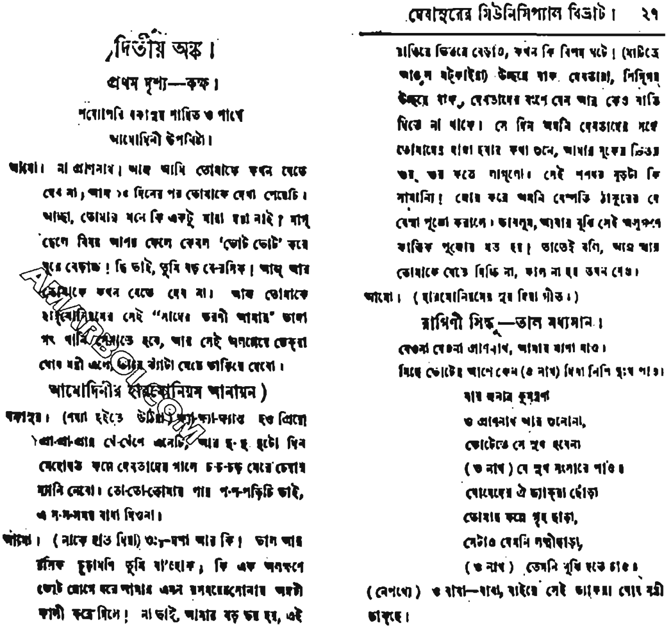

দ্বিতীয় অঙ্ক।
প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।
পর্য্যোপরি বকাসুর শায়িত ও পার্শ্বে আমোদিনী উপবিষ্টা।

আমো। না প্রাণনাথ! আর আমি তোমাকে কখন যেতে দেব না, আজ ১৫ দিনের পর তোমাকে দেখা পেয়েছি। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটু মায়া দয়া নাই? বাপ্ ছেলে বিয়ে আবার কেনে কেবল 'ভোট ভোট' করে ঘুরে বেড়াচ্ছ! ছি ভাই, তুমি বড় বেরসিক! আর্ আর তোমাকে কখন যেতে দেব না। আর তোমাকে হারমোনিয়মের সেই "নাথের তরণী আমার" তাল লয় বাজিয়ে শুনাতে হবে, আর সেই অপরাধে তেহাই ঘোর মন্ত্রী এলে, ভিতর দরজাটা বেড়ে তাড়িয়ে দেবো।

আমোদিনীর হারমোনিয়ম আনয়ন)

বকাসুর। (শয্যা হইতে উঠিয়া) ক্যা-ক্যা-ক্যাও হও প্রিয়ে! আ-আ-আর সে-সেদিন ঘুরেছি, আর দু-দু ছুটো দিন দেবো নাও বসে দেবতাদের পানে চ-চ-চড় দেবে ঠোঁটে মানি নেবো। তো-তো-তোমার পায় প-প-পড়িছি ভাই, এ স-স-সময় বাধা দিওনা।

আমো। (নাকে হাত দিয়া) ওঃ—কথা আর কি! চাদ আর রসিক চূড়ামণি তুমি যা'হোক, কি এক অলক্ষণে ভোট রোগে ধরে আমার এমন রসময়কেলোনার অসরী কাশী করে দিলে! না ভাই, আমার বড় ভয় হয়, এই

মেবাসুরের মিউনিসিপাল বিভ্রাট। ২৭

মাঝিরে ভিতরে যেতাও, কখন কি বিপদ ঘটে! (মাটিতে আছাড় খাইয়া) উড়ে যাক দেবতারা, পিপিয়া উড়ে যাক, দেবতাদের মধ্যে যেন আর কেও বাড়ি ফিরে না যাবে। সে দিন অমনি দেবতাদের সঙ্গে তোমাদের হাতা হাতি কথা শুনে, আমার বুকের ভিতর ভয়ে ভয় করতে লাগলো। সেই অবধি কতটা কি মানিনি! ঘোর করে অমনি দেবপতি ঠাকুরের যে বেশ পূজো করালে। ভাবলুম, আবার বুঝি সেই অনুরূপ বাতিক পূজোর মত হয়! তাতেই বলি, আর আর তোমাকে যেতে দিচ্ছি না, কাজ না হয় তবন দেও।

আমো। (হারমোনিয়মের সুর দিয়া গীত।)

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কেনো বেচনা প্রাণনাথ, আমার মাথা খাও।
মিছে ভোটের আশে কেন (ও নাথ) দিবা নিশি দুঃখ পাও।
যার জন্য দুঃখ
ও প্রাণনাথ আর চাবোনা,
ভোটেতে সে সুখ হবেনা
(ও নাথ) সে সুখ সংসারে পাও।
লোকেদের ঐ ভ্যাক্যা ধোঁকা
তোমার কমে খুব ছাকা,
সেটাও যেমনি লক্ষীছাড়া,
(ও নাথ) তেমনি বুঝি হতে চাও।

(নেপথ্যে) ও বাবা—বাবু, বাইরে সেই ভ্যাক্যা ঘোর মন্ত্রী ডাকছে।

নাটকের দুইটি পৃষ্ঠা
আমোদিনী ও বকাসুরের কথাবার্তা। ইহার খানিকটা প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।
পাঠক লক্ষ্য করিবেন, নাটকে বকাসুরকে তোৎলা করা হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক আমার স্বামীকে ভোট দেয়! আমি উপবাসী থেকে তোমার নামে এক পালা ভোটমঙ্গল গান দিব।"

* * *

ইলেকশনের প্রতি সে-যুগের বাঙালির এই অভুক্তি দেখিয়া কেহ কেহ যে এখনও উহাকে সেকেলে সংস্কার বা কুসংস্কার বলিবেন, তাহা আমি সম্ভব মনে করি। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য শুধু এই, পুরাতনের প্রতি অবিচল আসক্তি যেমন সংস্কার, নূতন মাত্রেরই প্রতি চঞ্চল ভক্তিও তেমনই সংস্কার—দুইটা একই জিনিসেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সে যাহাই হউক, অনেকে যে ইহা হইতে আমোদ অনুভব করিবেন, তাহা সুনিশ্চিত। আমি করিয়াছি। ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া বাঙালির পুরাতন রসবোধের এই প্রমাণ যে পাইব, তাহা আশা করি নাই। সর্বোপরি আনন্দ পাইয়াছি, আজকালকার বিলাত-ফেরত বাংলার বদলে একেবারে নেটিভ বাংলা ভাষা পড়িয়া।

**রচনা :** ২৮ জুলাই, ১৯৬৮

**প্রকাশ :** দেশ, ১৮ আশ্বিন ১৩৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮-১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাপ্পান্ন বৎসরের জীবনকে বাঙালির জাতীয় নবজীবনের প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন বলা চলে। এই নূতন জীবনের পূর্ণ বিকাশও তাঁহার দ্বারাই হইয়াছে ইহা স্বীকৃত। ইহার উপরেও একটা কথা বলিবার আছে। এই যুগে বাঙালি যাহা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙালির গৌরব সত্যপরায়ণ ঐতিহাসিকের দ্বারা স্বীকৃত হইবে। বাঙালি বলিয়া বাঙালির অস্তিত্বের প্রমাণ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে প্রায় নাই বলিলেই চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল অশোককেও বাঙালি বলিয়া প্রচার করিলেও ভারতবর্ষের এই একচ্ছত্র সম্রাট ইংরেজের 'বেঙ্গল আর্মি'র মতোই বাঙালি ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অজন্তার চিত্রাবলী, অঙ্কোর-ভাটের মন্দির এবং বোরোবুদরের স্তূপ বাঙালি স্থপতির কীর্তি বলিলেও এই বড়াইকে ইংরেজ শাসনের যুগে ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে বাঙালির যে প্রাধান্য হইয়াছিল তাহার অহমিকার প্রকাশ বলা যাইতে পারে। বাঙালির ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা প্রথম চৈতন্যদেবের দ্বারা হয়। উহার চেয়েও বড় প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের দ্বারা হইয়াছিল সেই বাঙালিদের মধ্যে বঙ্কিমকে প্রধান বলা যাইতে পারে। অথচ আজ, তাঁহার জন্মের দেড়শত বৎসর পরে ও মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে, তিনি এ-যুগের দুই প্রকার বাঙালির কাছে দুই অদ্ভুত অবতারে পরিণত হইয়াছেন। বর্তমান যুগের সেকেলেরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'ঋষি বঙ্কিম' ও একেলেরা নাম দিয়াছেন 'বুর্জোয়া বঙ্কিম'। কিন্তু তামাশার কথা এই যে, যাঁহারা বঙ্কিমকে 'ঋষি বঙ্কিম' বলেন তাঁহাদের কন্যারাও বিলাতপ্রবাসিনী হইয়া 'জীনস্' পরিতেছেন, ও যাঁহারা 'বুর্জোয়া' বঙ্কিম বলেন খোদ তাঁহারা জবাহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর অধমতম বুর্জোয়ার বেতনভোগী দাস হইয়াছেন। আসলে বঙ্কিম 'ঋষি'ও নন, 'বুর্জোয়া'ও নন। তিনি জীবিতকালেও খাঁটি এবং মহান বাঙালি ছিলেন, ইতিহাসেও তাহাই থাকিবেন। এই বিশ্বাসের বশেই এই প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

## 'মহাপুরুষ' বঙ্কিম

আমি বঙ্কিমকে মহাপুরুষ বলিলাম আধুনিক অর্থে। ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'গ্রেট ম্যান'। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংরেজি শিক্ষার ফলে সংস্কৃত 'মহাপুরুষ' পদটি ইংরেজি অর্থে প্রয়োগ করিবার রেওয়াজ হইল। প্রাচীন বাংলায় এই পদটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইত—সে অর্থ ছিল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। বঙ্কিমের সময়েও এই পুরাতন অর্থ জানা ছিল। যেমন, তিনি নিজেই কাপালিক সম্বন্ধে অধিকারীর মুখে এই কথা দিলেন—'আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যেই ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত।'

আসলে পাশ্চাত্য জগতে 'গ্রেট ম্যান' শব্দটার মধ্যে মানুষ সম্বন্ধে যে-ধারণা আছে, মানুষকে সেই চক্ষে দেখিবার ধারাই আমাদের মধ্যে ছিল না। সোজা কথায় 'বড়লোক' বলিলে আমরা অর্থবান লোক বুঝিতাম। লোকের শ্রেণী বা মর্যাদার ভেদ করা হইত হয় ঐহিক শক্তি ও ধন দিয়া অথবা অলৌকিক শক্তি দিয়া। এই দুই প্রকার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, আর এই দুই প্রকার মানুষ সম্বন্ধেই ভয়ও ছিল। চরিত্র, প্রতিভা, বা ওই ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে, যাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিতে পারে কিন্তু যাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই তাহার সাধারণ কোনও নাম ছিল না। ওই ধরনের ব্যক্তিকে বিদ্বান হইলে পণ্ডিত বলা হইত, লেখক হইলে কবি বলা হইত, ধার্মিক হইলে সাধুব্যক্তি বলা হইত। সব জড়াইয়া মানুষের মহত্ত্বের ধারণা আমাদের কাছে প্রথম আসিল ইংরেজি শিক্ষা হইতে। তখন হইতেই অসাধারণ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা মহাপুরুষ বলিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমকে আমি এই অর্থেই মহাপুরুষ বলিতেছি।

তবে তিনি একটি বাঙালি মহাপুরুষ—অর্থাৎ একটি অসাধারণ বাঙালি, বাঙালি জাতির সমগ্র ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালির একজন। এই সূত্রে প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া যে-সব বাঙালিকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি তাঁহাদের নাম করিতেছি। বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে বাঙালি হিসাবে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার অপেক্ষা বড় বাঙালি জন্মে নাই, জন্মিবেও না। রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বমানব' বলিয়া প্রচার করিবার মতো মূঢ়তা আর নাই। যাহা হউক, এ-বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া বলিব যে, তাঁহার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে বাদ দিয়া গুণানুক্রমে আরও চারজন বাঙালির নাম আমি করিব। ইঁহারা কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসু। আর সকলেই ইঁহাদের পরে। এই হিসাবের মধ্যে আমি রামমোহনকে বাদ দিতেছি দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য হইবেন। আমার মত এই যে, রামমোহন জন্মে বাঙালি হইলেও পরজীবনে বাঙালি থাকেন নাই, এক তর্কপ্রবণতা ছাড়া। তাঁহাকে বাঙালি হিসাবে স্মার্ত রঘুনন্দন, ও নৈয়ায়িক রঘুনাথের সমকক্ষ বলিয়া আমি স্বীকার করিব। তাঁহারাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে কম ছিলেন না।

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন বুদ্ধির স্ফূর্তিতে, তেমনই হৃদয়ের স্ফূর্তিতে। বুদ্ধি তাঁহাকে হৃদয়হীন করে নাই, হৃদয় তাঁহাকে বুদ্ধিহীন করে নাই। সাধারণত এই দুইটি জিনিসকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করা হয়, ইহাদের সম্পর্ক অহি-নকুলের সম্পর্ক না বানাইলেও লক্ষ্মী-সরস্বতীর সম্পর্কের মতো মনে করা হয়। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই তাঁহার মনীষা যেমন শক্তিমান, হৃদয়াবেগও তেমনই দুর্বার। এই যোগাযোগ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। চিন্তার শক্তি ও পাণ্ডিত্যে তিনি সমস্ত বাঙালি লেখকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সর্ববিষয়ে কৌতূহল ও জ্ঞান দেখিয়া আমি সব সময়েই অবাক হই। প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারতীয় ও বর্তমান ইউরোপীয়, সব বিখ্যাত লেখকের সহিতই তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সময়ে যাঁহারা ইউরোপে লেখক বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল বা হারবার্ট স্পেনসারের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহা ধরিয়া নেওয়া সহবৎ। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদ স্যর এডোয়ার্ড টাইলারের (১৮৩২-১৯১৭) ও সমসাময়িক ঔপন্যাসিক এমিল জোলার (১৮৪০-১৯০২) সহিত তেমনই পরিচিত হইবেন তাহা মনে করা মোটেই সহজ নয়। জোলার সহিত পরিচয় তিনি, তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙালির


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিতে এখন যাহাকে 'ডবল স্ট্যান্ডার্ডের' পন্থী হওয়া বলে, সেই পন্থা অনুসরণের সমালোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছিলেন। উল্লেখটা তামাশার বলিয়াই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, বিলাতি রুচির বশে অনেক শিক্ষিত বাঙালিই কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নিন্দা করিয়া থাকেন। তারপরেই মন্তব্য করিলেন—'যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা, শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল !' এ-ক্ষেত্রে কিন্তু ফরাসি ভাষা না জানাতে বঙ্কিম একটা ভুল করিয়াছিলেন। জোলার উপন্যাস যখন ফ্রান্সে 'ন্যাচারেলাস্টিক' গল্প বলিয়া গৃহীত, এমন কি আদৃত হইতেছিল, তখনই তাঁহার 'লা তেয়ার' উপন্যাসের কঠিন সমালোচনা আনাতোল ফ্রাঁস ও অন্য দুই-তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে ব্যাপারটা বিস্ময়কর সেটা বঙ্কিমের ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব নয়, উহার প্রসার।

বঙ্কিমের চরিত্রের সর্বোপরি বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সহিত হৃদয়বৃত্তির মিলন। আমি অল্পবয়সে বুদ্ধিবৃত্তিতেই বেশি আস্থাবান ছিলাম। কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই বিখ্যাত ফরাসি লেখক ভোভ্‌নার্গস-এর উক্তি পড়ি—'সর্বোচ্চ চিন্তা হৃদয় হইতে আসে' (great thoughts come from the heart), ইহার যাথার্থ্য আমি সারা জীবন ধরিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। বঙ্কিমের সম্বন্ধে এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁহার করুণা অপরিসীম, কিন্তু কোনও দিকে বিচারবুদ্ধিবর্জিত নয়, তাঁহার প্রেমের বর্ণনা একই সঙ্গে বৃষ্টিধারা ও অগ্নিশিখার মতো, তবু ধর্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধি ও সহৃদয়তার এই সংমিশ্রণের জন্যই তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব দেখা যায়।

এ-প্রসঙ্গে তাঁহার একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিব। সেটি এই—

> 'রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ; —রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?'

অবশ্যই বলা যায়, ইহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অন্ততপক্ষে অর্ধেক আত্মপ্রবঞ্চনা। কিন্তু এই আত্মপ্রবঞ্চনা না থাকিলে মানুষের পক্ষে জীবনে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, জীবনধারণও সম্ভব হইত না। আমি অল্প বয়সে (১৯২৮ সনে) লিখিয়াছিলাম—'মানুষ সত্যকে জানিতে চায়, মানুষের জীবনযাত্রার জন্য সত্যের কোনও প্রয়োজন আছে, এই দুইটি কথার একটি কথায়ও আমার আস্থা নাই। সত্যান্বেষী হওয়া আর আত্মঘাতী হওয়া একই জিনিস।' এ-কথা আমি অবশ্য ইংরেজিতে যাহাকে 'রিয়্যালিজম্' বলে সে-জিনিসটাকে মনে করিয়াই বলিয়াছিলাম, ইংরেজিতে যাহাকে 'ট্রুথ' বলে তাহার বিচার করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও এইভাবে কল্পনাপ্রবণ হইয়া বাঙালির জীবনকে শুষ্কতা ও ঊষরতা হইতে উদ্ধার করিয়া উহাতে প্রাণের স্রোত বহাইয়াছিলেন।

## ঔপন্যাসিক বঙ্কিম

আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা বলিয়াই মনে করি না, আজ পর্যন্ত যত বাংলা ঔপন্যাসিক দেখা দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের সহিত তুলনা করিয়া বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া বিশ্বাস করি। ইহা শুধু ব্যক্তিগত রুচির জন্য যে বলিতেছি, তাহা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, স্থিরভাবে বহুদিন ধরিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও বলিতেছি। গবেষকরা অবশ্য বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বঙ্কিমের আগেকার গল্প উপন্যাসেরও নাম করেন। সেগুলিকে উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বলা চলে না। বেশির ভাগই নীতিকথা। একটা কথা বলিয়া রাখি, দৈবক্রমে বাংলা উপন্যাস ভাবিয়া যে-বইটি আমি প্রথম পড়ি উহার নাম 'সুশীলার উপাখ্যান'। আমার মাতার এই বইটি ছিল। তাঁহার নাম সুশীলা ছিল বলিয়া হয়তো কোনও গুরুজন তাঁহাকে বইটি দিয়াছিলেন। এ-রকম নীতিকথা যে গল্পে থাকিতে পারে তাহা সে-যুগেও কল্পনা করিতে পারিতাম না। হিন্দু-ব্রাহ্ম নির্বিশেষে সকল নীতি-প্রচারক আমাদের বলিতেন যে, উপন্যাসের মতো নীতিবিরোধী লেখা কখনও হয় নাই। কিন্তু 'সুশীলার উপাখ্যান' পড়িবার পর উপন্যাস-বিরোধিতার কোনও কারণ দেখিতে পাই নাই।

বাংলা উপন্যাস প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে। উহার তারিখ ১৮৬৫। ইহার পর ক্রমান্বয়ে দুই তিন বৎসরের মধ্যে এক একখানি করিয়া উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিম উপন্যাসের ধারাকে গঙ্গাবতরণের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিলেন। নীতির প্রচারক ঐরাবত হইলেও উহার মুখে ভাসিয়া যাইতেন কিন্তু যাঁহারা এই স্রোত রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই ছাগল-ভেড়ার অপেক্ষা শক্তিমান ছিলেন না। যুক্তি শুনিয়া মনে হইত ছাগল-ভেড়ার মতোই বুদ্ধিমানও ছিলেন। তাঁহাদের বাধা টিকিল না, বঙ্কিমই জয়ী হইলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসকে তাঁহার মৃত্যু হইবার পর হইতেই হিন্দুতত্ত্বের প্রচারকেরা ও জাতীয় আন্দোলনের নেতারা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ফলে তাঁহার উপন্যাসের আলোচনা উচ্চস্তরে কচ্‌কচি ও নিম্নস্তরে প্রলাপবাক্য হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাই নয়, কতকগুলি উপন্যাসকে বাদ দিয়া অন্য কতকগুলি উপন্যাসকে লইয়াই মাতামাতি আরম্ভ হইল। যে-উপন্যাসগুলির জন্য বঙ্কিম ঋষি হইলেন সেগুলি এই তিনটি—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। এইগুলির ভিতর দিয়া বঙ্কিম তত্ত্ব প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা সত্য, কিন্তু সে তত্ত্ব বঙ্কিম-সমালোচকদের তত্ত্বাবিষ্কারের মতো অসার নয়। এই তিনটি উপন্যাস তত্ত্ব সত্ত্বেও উচ্চ স্তরের উপন্যাস, মানুষের জীবন সম্বন্ধে সত্যকার সাহিত্যিক উপলব্ধি। কিন্তু যে-ভাবে উপন্যাসগুলির আলোচনা হইল তাহাতে সেগুলি প্রায় হিং-টিং-ছটের স্তরে নামিয়া গেল। যেমন 'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিলেন,

> 'ব্রজেশ্বর যেন "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" পুরুষ হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ন-বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন...' ইত্যাদি

ইহার জুড়ি দার্শনিক ব্যাখ্যা এইরূপ—

> 'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
> শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
> বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
> জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
> আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি।
> আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।

* * *


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্ ।'

বালক ও স্ত্রী জাতীয় মনুষ্য ছাড়া উপন্যাসের দার্শনিক যত পাঠক বাংলাদেশে ছিল, তাহারা এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কি করিল ?

"সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে, "পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার ।
দুর্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল ।"

এই সমালোচকেরা কাহারা ? ইঁহারা

'অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা ।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে ।'

এখনও অবশ্য যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলারা গৌড় দেশে আছেন, কিন্তু ইঁহারা যবন মার্কসের চেলা—নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই, ধেড়ে হইলেও 'জীনস্' পরেন বলিয়া কাছা-কোঁচা খসিয়া পড়ে না ।

বঙ্কিমের নিজের তত্ত্বকথা অনেক উপরে, তবে তিনটি উপন্যাসের মূলে দার্শনিক তত্ত্ব আছে বলিয়া, উপন্যাস হিসাবে এগুলিকে আমি মনোরম ও গভীর মনে করিলেও বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া মানি না । এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয়োক্তি মনে করিলেও আমি উদ্ধৃত করিব । তিনি ১৯৩১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

> 'বছর-কয়েক পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্যসভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম । দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা, —বঙ্কিম "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞে প্রথম পুরোহিত । সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা "আনন্দমঠে"র পরে । "দেবী চৌধুরাণী', "কৃষ্ণচরিত্রের" উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু নাম করলেন না "বিষবৃক্ষের", কেউ স্মরণ করলেন না একবার "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে । ঐ দুটো বই যেন পূর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত ।'

তাহার পর শরৎচন্দ্র নিজের মত প্রকাশ করিলেন,

> 'বঙ্কিমের ন্যায় অত বড় প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাংলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দু'টি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে আবার "আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী", "সীতারাম" লিখতে গেলেন ?'

কেন গেলেন, এই প্রশ্নের উত্তর শরৎচন্দ্র নিজেকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন—যিনি 'বিরাজ বৌ' লিখিলেন তিনি কেন 'পথের দাবী' লিখিতে গেলেন ? অথচ তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমের তিনটি উপন্যাস 'পথের দাবী'র অনেক উপরে । উপন্যাসে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বকে বাদ না দিলে যদি অন্যায় হয় তবে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' লিখিয়া অন্যায় করিয়াছেন, টলস্টয় 'ওয়র অ্যান্ড পীস' লিখিয়া অন্যায় করিয়াছেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

এই সূত্রে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা না বলিয়া পারিলাম না। আমি ১৯২৪-২৫ সনে কয়েকবার শরৎবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার কাছে শিবপুরের বাড়িতে যাই। তখন একদিন তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অত্যন্ত কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলেন, এমন কি, আমি নিজের কানে শুনিলাম বলিলেন, 'বইটা এখন থার্ড-ক্লাসের ছেলেও পড়তে পারবে না।' কথাটা কেন বলিয়াছিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। এখন অবশ্য শরৎবাবুরই একটি লেখা হইতে বুঝিয়াছি কেন বলিয়াছিলেন। শরৎবাবুর পক্ষে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করা স্বাভাবিক। আমিও এই দুইটি অতি উচ্চাঙ্গের গল্প বলিয়া মনে করি। তবু সারা জীবন—২৫ বৎসর হইতে ৯০ বৎসর পর্যন্ত—বার বার পড়া ও প্রণিধান করিবার পর আমি বলিব বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এই তিনটি— 'কপালকুণ্ডলা', 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'। কেন এই কথা বলি তাহার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে এই মত আমি ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব হইতেই পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আজ পর্যন্ত উহা বদলাইবার কারণ আমি দেখি নাই। এই তিনটি উপন্যাসের প্রকৃত গৌরব বাঙালি কেন বুঝেন নাই, তাহার কারণ স্মৃতি ও ন্যায়—বাঙালির বুদ্ধিভ্রংশ এই দুইটি জিনিস হইতে হইয়াছে। কোনও আম যেমন হাড়ে টক হয়, বাঙালিও তেমনই হাড়ে স্মার্ত ও নৈয়ায়িক। বর্তমানে তফাৎ এইটুকু হইয়াছে সে আগে হিন্দু স্মার্ত ও নৈয়ায়িক ছিল এখন ইউরোপীয়, এমন কি আমেরিকান স্মার্ত ও নৈয়ায়িকে পরিণত হইয়াছে।

AMARBOI.COM

## 'কপালকুণ্ডলা ও আনন্দমঠ'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার নাই, এই প্রবন্ধে সম্ভবও নয়। সুতরাং তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা খেয়ালের বশে উক্তি বলিয়া ধরিলে আমিও উত্তরপক্ষ ধরিব না। তবে যে-দুইটি উপন্যাসের নাম এই অংশের শিরোভাগে দিলাম, এগুলির সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রকৃত রূপ কি ছিল, তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। এই দুইটি গল্পকে নিলাম এই জন্য যে এগুলি বিপরীতধর্মী—একটিতে শুধু মানুষের মন আছে, আর একটিতে মনের সহিত জড়িত তত্ত্ব আছে।

'কপালকুণ্ডলা' আমার বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। সেজন্য উপন্যাসটি সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহার সবই পড়িয়াছিলাম। তখনই, অর্থাৎ কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইবার আগেই আমার মনে হইয়াছিল যে, ওই ধরনের বাজে-বকা আমি জীবনে শুনি নাই। কপালকুণ্ডলা 'প্রকৃতি-দুহিতা', সেজন্যই তাহার আচরণ সেই ধরনের হইয়াছিল, এই মত প্রায় সকলেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-দুহিতার মতো কিছু করা দূরে থাকুক, তরুণী নারী স্বভাবত যাহা করে তাহার কিছুই করে নাই। সেজন্যই আমি বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' কেন লিখিলেন (মনে রাখিতে হইবে যখন বইখানা প্রকাশিত হয় তখন তাঁহার বয়স মাত্র ঊনত্রিশ) সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আমি বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া 'কপালকুণ্ডলার জন্মকথা' এই নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিবার সঙ্কল্প করিলাম। অবশ্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা আর হয় নাই। তবুও কি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলাম তাহা বলি।

প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রণীত জীবনী পড়িয়া একটি সত্য ঘটনা হইতে যে উপন্যাসটির ধারণা বঙ্কিমের মনে আসিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। একদিন গভীর রাত্রিতে কে তাঁহার দরজায় ঘা দিল। তিনি দরজা খুলিয়া দেখিলেন যে, একজন কাপালিক দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল, "বঙ্কিমচন্দ্র, আমার সঙ্গে এসো।" বঙ্কিম যান নাই। কিন্তু তিনি কাপালিকের সাধনার সহিত সাধারণ মানুষের যোগাযোগ কিরূপ হইতে পারে তাহার চিন্তা তখনই যে করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই বয়সে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করিলে তিনি কাপালিককে কোনও তরুণী নারীর সহিত যুক্ত করিবেন তাহাও স্বাভাবিক। ইহারও পরিচয় বঙ্কিমজীবনীতে আছে। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—একটি মেয়ে যদি শিশুকাল হইতেই কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহার চরিত্র ও আচরণ সমাজে ফিরিয়া আসিলে কি হইবে। তখন তাঁহার বড় ভাই সঞ্জীবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন, তিনি রসিক ছিলেন—উত্তর দিলেন, 'আর কি হবে, ছেলেপিলে হয়ে ঘরণী গৃহিণী হয়ে থাকবে।' বঙ্কিমের কাছে এই উত্তর সঙ্গত মনে হয় নাই। তিনি যাহা মনে করিলেন, উহা 'কপালকুণ্ডলা'তে উপস্থাপিত করিলেন। আটাশ-উনত্রিশ বৎসরের যুবক ইহা করিল উহা একদিকে স্বাভাবিক হইলেও বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি তাঁহার ধারণা গল্পে প্রকাশ করিলেও 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণে চতুর্থ খণ্ডের প্রথম দিকে একটি পরিচ্ছেদে দার্শনিক তথ্য হিসাবে দেন। পরে সাহিত্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া উহা বাদ দেন। এই সংস্করণের 'কপালকুণ্ডলা' আমার মাতার ছিল। তাহাতেই আমি অধ্যায়টি পড়ি। সাহিত্যের দিক হইতে অধ্যায়টি বাদ দিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন বলিব কিন্তু উপন্যাসটি বুঝিবার পথেও তিনি বাধার সৃষ্টি করিলেন। এই অধ্যায়টি থাকিলে 'কপালকুণ্ডলা'র এত অপব্যাখ্যা হইত না, তাহাকে 'প্রকৃতি-দুহিতা' বলা হইত না। সে আসলে প্রকৃতি-দুহিতা হইলে সঞ্জীব যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইত। সঞ্জীবের শ্বশুর দামোদর মুখোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা'র 'সিকোয়েল' লিখিয়া সেই পরিণামই দেখাইয়াছিলেন। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র পরের সংস্করণে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা দু'জনকেই গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেন।

এখন 'কপালকুণ্ডলা'র আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা ত্যক্ত পরিচ্ছেদটি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকার উপর পুরাপুরি বুঝিবার ভার ছাড়িয়া দিব। ব্যাপারটা ধাঁধামতো করিব। বয়সে ত্রিশ বৎসরের নীচের (অর্থাৎ 'কপালকুণ্ডলা' লিখিবার সময়ে বঙ্কিমের যে বয়স ছিল সেই বয়সের) পাঠক-পাঠিকারা যদি এই বিষয়ে ছোট (চার পৃষ্ঠার বেশি নয়) প্রবন্ধ লিখিয়া এই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠান তাহা হইলে আমি বিচার করিবার ভার নিতে পারি। ধাঁধাটি এই।—

পরিত্যক্ত অধ্যায়ের প্রথমেই বঙ্কিম জন স্টুয়ার্ট মিল হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিলেন,

'Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the fatalism of Oedipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character.'

ইহার নৈসর্গিক উপমা দিয়া বঙ্কিম লিখিলেন,

> 'রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া, মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে ; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না ; কেহ মেঘ মনে করে না ; শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল। আমরা এতদিন তিল তিল করিয়া তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।
>
> * * *
>
> কোনও কোনও পাঠক এ গ্রন্থকোষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, "এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না, গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।" ইহার উত্তর, "অদৃষ্টের গতি।" অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে ? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।
>
> এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে, গ্রন্থি বন্ধন করি।'

সমস্ত পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা আছে। উহার সমস্তটা পড়িবার পর যদি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অর্থ সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ থাকে তাঁহাকে পুরাতন তাত্ত্বিক বাঙালি সমালোচক বলা যাইবে।

এইবার 'আনন্দমঠে'র কথা কিছু বলি। এই বইটি সম্বন্ধে আলোচনা ১৯১০ সনে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণেও পাঠ্যাবস্থাতেই পড়িয়াছিলাম। উহাতে 'বন্দেমাতরমে'র মা বাংলাদেশ না কালী, উহার আলোচনা ছিল। যে ইংরেজ বাংলা-ভাষাবিদ এই আলোচনা করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা'রও অর্থ ধরিতে পারেন নাই। অবশ্য উহাতে দুর্গা এবং কালীর মূর্তিরও উল্লেখ আছে, তবুও গানটা দেশ সম্বন্ধে, শ্যামাবিষয় নয়। উহা বুঝিতে এই সমালোচকদের কষ্ট হইয়াছিল। তবে বাঙালির দিক হইতেও 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে ভুল কম গুরুতর নয়। এখনও অনেকে মনে করেন, 'আনন্দমঠ' ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই গাঙ্গুলী, উল্লাসকর দত্ত, বারীনদা, উপীনদা'র জন্মদাতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে আনন্দমঠের তাৎপর্য সম্বন্ধে ভুল করিবার কোনও ছিদ্র রাখেন নাই। তিনি প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই লেখেন,

> 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজ বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।'

দ্বিতীয় সংস্করণে এই কৈফিয়তেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসাবে বঙ্কিম একজন 'বিজ্ঞ সমালোচকের' উক্তি ইংরেজিতে উদ্ধৃত করিলেন। ইহার পর 'আনন্দমঠে'র মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ভুল করিবার অবকাশ রহিল না বটে, কিন্তু বঙ্কিমের কৈফিয়তটাকেই একটা বাঙালিসুলভ উপরচালাকির দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার ধারা দেখা দিল। আমি নিজেও এই কথাগুলি যাঁহাদের দেখাইয়াছি তাঁহাদের সকলের মুখেই এই একই যুক্তি শুনিয়াছি। সকলেই বলিয়াছেন যে, এই কথাগুলি লিখিয়া বঙ্কিম ইংরেজের সুনজরে থাকিয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেপুটিগিরি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজ-বিদ্বেষে এই সব বাঙালির বিচারবুদ্ধি এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাহারা নিজের জাতির মহাপুরুষদের মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, কাপুরুষ, অর্থগৃধ্নু বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, তাহারা ইংরেজের প্রাপ্য ইংরেজকে ন্যায়বুদ্ধির বশে ও সত্যের খাতিরে দিতে চাহিবেন উহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। আমাদের জাতীয়তা বোধের মধ্যে যে অধর্ম ও তামসিকতা ছিল তাহা আমি সারাজীবন অনুভব করিয়াছি।

'আনন্দমঠে'র মূল ব্যাপার সম্বন্ধে সত্য কথা বঙ্কিম উপন্যাসটির শেষ অধ্যায়েই বলিয়াছিলেন, সত্যানন্দের প্রতি চিকিৎসকের উক্তিতে। চিকিৎসক বলিলেন,

> 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।'

এই কথা একেবারে ছল, সত্যানন্দের প্রচেষ্টাই কাম্য এবং শ্রেষ্ঠ এ-কথা জাতীয়তার ভুল ধারণা হইতে বলা সম্ভব ছিল। কিন্তু সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এ-সম্বন্ধে ভুল হয় নাই। আমার মাতা ঘরে বাংলা লেখাপড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশেই আমি ও আমার বড় ভাই বিপ্লবীদলে জুটিয়া যাই নাই, কিন্তু আমার ছোট এক ভাই গিয়াছিল। মা সর্বদাই বলিতেন, হত্যা পাপ কাজ, উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, উহা পাপ কাজ থাকিবে। তাঁহার এই কথা আমি মানিয়া লইয়াছিলাম।

'আনন্দমঠ' লেখার পিছনে আর একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার যে থাকিতে পারিত, এবং কার্যত যে ছিল, তাহার কথা আমার মনে জাগিয়াছে। উহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া মূল কথাটাই শুধু বলিব। আমার মনে হয় বঙ্কিম সিপাহী-বিদ্রোহের কথা মনে রাখিয়া উহাকে রূপান্তরিত করিয়া ওই প্রকার যুদ্ধ হইতে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কি শিখিবার আছে, তাহা বলিবার জন্যই উপন্যাসটি লেখেন। সিপাহীদের যুদ্ধের সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র যে একটা যোগ থাকিতে পারে, উহা কাহারও মনে কেন জাগে নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সিপাহীযুদ্ধ অতীতমুখীন ছিল, 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম উহাকে ভবিষ্যৎমুখীন করিলেন। যখন উহা শেষ হয় তখন বঙ্কিমের বয়স কুড়ি, সে-সময়ে তিনি ডেপুটি পদ গ্রহণ করেন। এ-বিষয়ে একটা কথা আছে যে, ইংরেজ উপরওয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন সকলেই মনে করছে, আমাদের শাসন শেষ হতে চলেছে, তুমি এ-সময়ে আমাদের চাকরি নিচ্ছ কেন ?' বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'তা বিশ্বাস করলে আমি চাকরি নিতাম না।' তিনি চিকিৎসককে দিয়াও বলাইয়াছিলেন, 'ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।' এই সবই মিথ্যা, 'আনন্দমঠে'র দস্যুবৃত্তি ও যুদ্ধই সত্য, বঙ্কিম সম্বন্ধে এইরূপ কথা একমাত্র জাতীয়তাবোধের বিকৃতি হইতে বলা সম্ভব।

## সত্যপরায়ণ বঙ্কিম

'আনন্দমঠে' বঙ্কিম যে সত্যপরায়ণতা দেখাইয়াছেন, সেই সত্যপরায়ণতা তাঁহার সমস্ত লেখায় প্রস্ফুট। তাঁহার চিন্তা ও মানসিক প্রবৃত্তি সকলই সত্যের বশ ছিল। সেজন্যই রাজনীতির ব্যাপারেই হউক, কিংবা বাঙালির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারেই হউক, তিনি কখনও ধর্ম ও সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। উহারই পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিব।

মনে রাখিবেন উহার পুরাপুরি আলোচনা সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিব। প্রথমটি বঙ্কিমের হিন্দুত্ব প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট। বঙ্কিম বাঙালির নব্য-হিন্দুত্বের স্রষ্টা ও বিবেকানন্দ তাঁহারই সৃষ্ট পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা জানা কথা। তবে বঙ্কিম প্রধানত গীতোক্ত ভক্তির উপর তাঁহার ধর্মতত্ত্বকে বসাইয়াছিলেন, বিবেকানন্দ করেন প্রধানত দর্শনের উপর বিশেষ করিয়া বেদান্তের উপর। গীতোক্ত ভক্তিবাদ প্রচলিত বৈষ্ণববাদে ছিল না, বঙ্কিম উহাকে আবার চালাইবার চেষ্টা করেন। 'গীতা'র প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। তবু 'গীতা'র সব কথাই সত্য তিনি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। একটা উদাহরণ দিতেছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকে আছে,

> 'তুমি হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।'

বঙ্কিম লিখিলেন,

> '৩৪/৩৫/৩৬/৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক 'গীতা'র অযোগ্য। 'গীতা'য় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব। ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। উহা ঘোর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

তেমনই 'গীতা'র ব্যাখ্যাতেও তিনি সকল সময়ে প্রাচীন টীকাকারদের বিশেষ করিয়া শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়েরই ৪৬-তম শ্লোকে পরিষ্কার বেদনিন্দা আছে। উহাতে বলা হইয়াছে 'সর্বত্র জলে প্লাবিত হইলে কূপ দীর্ঘিকা ইত্যাদির যেমন সার্থকতা, তেমনই সার্থকতা জ্ঞানী ব্রাহ্মণের কাছে সকল বেদের।' বঙ্কিম ব্যাকরণসম্মত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, শ্লোকটার এই সহজ অর্থ ছাড়া অন্য কোনও অর্থ সম্ভব নয়। অথচ শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত টীকাকার উহার অন্য অর্থ করিয়াছেন। উহার কারণ বঙ্কিম এইভাবে দেখাইয়াছেন— 'এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন ? বেদ স্বয়ম্ভূব, অপৌরুষেয়, নিত্য সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন।'

শেষে বঙ্কিম বলিলেন যে, সহজ অর্থের জন্য মূলে কোনও পরিবর্তন করিতে হয় না, কিন্তু আচার্যদের ব্যাখ্যায় 'গীতা'র শ্লোকে একটা বা একাধিক শব্দ উহ্য বলিয়া মানিয়া অর্থনির্ণয় করিতে হয়। বঙ্কিম বলিলেন, 'আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই...দুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন।'

বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মানিলেও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, কোনও সামাজিক প্রথা রাখা উচিত কি অনুচিত উহা শাস্ত্রীয় বিধান হইতে স্থির করা উচিত নয়, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী বিধান বহু আছে। এই কথা তিনি বিশেষ করিয়া বলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসন্ধান করা সম্বন্ধে। তিনি বলেন, ধর্মশাস্ত্রে আছে যে, কোনও কোনও অবস্থায় এক পত্নী সত্ত্বেও স্বামী আরও বিবাহ করিতে পারে। এইরূপ কয়েকটি অবস্থার মধ্যে বঙ্কিম একটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। উহা এই—'ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে।' এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিলেন,

'স্ত্রীলোক স্বভাবতই মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন ; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালী মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদের অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণী শ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে মুখ-ঝামটা না খাইতে হয়...যাঁহারই স্ত্রী ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যার তার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না" ; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন...' ইত্যাদি।

সুতরাং বঙ্কিম বলিলেন, 'আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখে চাহিবার আবশ্যক নাই।'

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তিনি যে সত্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার আভাস আনন্দমঠের আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়াছি। এই বিষয়টি লইয়াই একটা পুরা প্রবন্ধ লেখা যায়। কিন্তু আমি বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া শুধু ইংরেজ শাসনের সময়ে ইংরেজের ভারতীয়-বিদ্বেষ ও ভারতীয়ের ইংরেজ-বিদ্বেষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারই কিছু পরিচয় দিব। যে প্রবন্ধে উহা লেখেন তাহার নাম 'জাতিবৈর'। উহা 'সাধারণী' পত্রিকায় ১৮৭৩ সনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করেন এইভাবে—

'ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সম্বাদপত্র (ইংরেজি সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা সম্পাদিত সম্বাদপত্র) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছু গালি—কিছু অন্যায় নিন্দা আছে। আবার যে-কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়ি না কেন, সন্ধান করিলে উহার কোন অংশে না কোন অংশে ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ—ইংরেজের নিন্দা অবশ্য দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরেজি পত্র মাত্রেই দেশী লোকের অন্যায় নিন্দা থাকে। বহুকাল হইতে এইরূপ হইতেছে—নূতন কথা নহে।'

ইহার পর বঙ্কিম বলিলেন, 'সম্বাদপত্রে যে-রূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেই রূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল।' কিন্তু এই জাতিবৈর সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন তাহা বিস্ময়কর। সেইটুকুই আমি উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিলেন,

'আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি।...উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের প্রশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর হইয়াছে।'

সাধারণ ভারতবাসীর ক্ষেত্রে জাতিবৈর-প্রসূত প্রতিযোগিতা আজও আছে। যাঁহারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান কালে অক্‌সফোর্ড কেম্‌ব্রিজে আসিয়া ইংরেজের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজবিদ্বেষ দাউ দাউ করিয়া আজও জ্বলিতেছে।

ইহা বঙ্কিমের সত্যপরায়ণতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। এমনই আর একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দিব। তিনি বর্তমানযুগের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা। বাংলা ভাষাকে বাঙালি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এই পত্রিকা প্রকাশের ফল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল ; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ-সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।' বাংলা সাহিত্য যে নিষ্ফল হইল না তাহার মূলে তিনিই।

তবু তিনি বাংলা সাহিত্য লইয়া তামাশা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন,

'আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান ?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে ?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পঙ্খাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।'

ইহাতেও যে বঙ্কিমের সত্যপরায়ণতা দেখা গেল তাহা বলাই বাহুল্য। সকলের শেষে সত্য ও অসত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আরও বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম স্থানাভাবে তাহা হইল না।

এই বিষয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪ সনে 'প্রচারে' একটি প্রবন্ধ লেখেন তাহা হইতেই বিতর্কের বিবরণ দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ, বঙ্কিমের ছেচল্লিশ। বঙ্কিম এইভাবে আরম্ভ করিলেন,

'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের "ভারতীতে" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম "একটি পুরাতন কথা"। বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।'

বঙ্কিম বলিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে তিনি এ পর্যন্ত কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু এইবারে উত্তর না দিলে অনিষ্ট ঘটিবে। তাহার পর লিখিলেন,

'সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন ও প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে একটা প্রবন্ধ কেন লিখিতেছেন ইহার কৈফিয়ৎ হিসাবে তিনি বলিলেন, 'এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।' এই ছায়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের। এই সমাজের পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আক্রমণও তীব্র। তিনি লিখিলেন,

> 'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।... আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন ?'

অভিযোগ গুরুতর। বঙ্কিম ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা হইতে দেখা যায় ভুল বুঝিবার অবকাশ আসিয়াছে সংস্কৃত 'সত্য' কথাটা দুইজনে দুই অর্থে ব্যবহার করিবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন ইংরেজি 'truth', বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন সত্যপালন অথবা প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা। সুতরাং মূলত ঝগড়া বাধিবার কারণ ছিল না। কিন্তু উত্তর শেষ করিয়া বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে যাহা বলিলেন তাহা অপূর্ব। তিনি লিখিলেন,

> 'উপসংহারে, রবীন্দ্রবাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে।... মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধহয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তনে করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এইজন্য বলিলাম। তিনি এত অল্পবয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু সংবাদপত্রের পক্ষে এই প্রবন্ধই অতি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া বঙ্কিমের পূর্ণপরিচয় দিবার উদ্দেশ্যও আমার নাই। আমি শুধু তাঁহার জন্মের দেড়শত বৎসর পরে তাঁহার সম্বন্ধে বর্তমান যুগের বাঙালির মধ্যে আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করিলাম। বঙ্কিম ইতিহাসভুক্ত হইয়া থাকিবেন, ইহা ঘটিলে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। আর কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য পাঠ্য হইয়া থাকিলে আরও পরিতাপের বিষয় হইবে। আজ বাঙালির প্রয়োজন তাহার সমস্ত ইতিহাস ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা। এই চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই প্রবন্ধটি লিখিলাম।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ আষাঢ় ১৩৯৫, ৩ জুলাই ১৯৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ 

# শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে ?

## প্রশ্নের উৎপত্তি

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছিলাম ; উহা ১৯৮৮ সনের ৩রা জুলাই 'রবিবাসরীয়' আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে আমি ছয়জন বাঙালিকে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বলিয়া উল্লেখ করিয়া, উঁহাদের নাম শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী পরপর এইভাবে দিয়াছিলাম— রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসু। আমার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি,

'বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে বাঙালি হিসাবে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার অপেক্ষা বড় বাঙালি জন্মে নাই, জন্মিবেও না। ...তাঁহার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে বাদ দিয়া গুণানুক্রমে আরও চারজন বাঙালির নাম আমি করিব। ইঁহারা কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসু। আর সকলেই ইঁহাদের পরে।'

তখনই শিক্ষিত বাঙালিরা সবিস্ময়ে একটা প্রশ্ন তুলিলেন—আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রথম ছয়জনের মধ্যে স্থান দিলাম না কেন ? ছয় বৎসর ধরিয়া এই জিজ্ঞাসার জের চলিতেছে, এবং প্রথম দিকের বিস্ময় ক্রমাগতই ক্রোধে পরিণত হইতেছে। সম্প্রতি একজন বাঙালি অধ্যাপক, সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, আমার ভক্ত ও শিষ্যস্থানীয় হইয়াও আমাকে একটি কড়া চিঠি লিখিয়াছেন, উহাকে গুরুমারা চেলার কাজ বলিতে পারি। আমি আরও অনেক আভাস পাইয়াছি যে, আমার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই মনে এই আপত্তি জন্মিয়াছে।

আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা আছে ; উহার জন্য মতান্তর অনেক সময়েই মনান্তরে পরিণত হয়। ইহা আমি বুঝিতে পারি না। বিচারের শক্তি যাঁহাদের আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যই নিয়ম, মতের ঐক্য ব্যতিক্রম। ইহা ইতিহাসে প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশেই দেখা গিয়াছে। ল্যাটিন ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপ—'মানুষ যত জন, মতও ততগুলি' ; সংস্কৃতেও আছে—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' তবে মতবিরোধ সম্বন্ধে এত প্রবল আপত্তি কেন ?

যে-বিষয়ে মতবিরোধ হইতে পারে ইহাই কেহ ধারণা করিতে পারে না, উহার সম্বন্ধেও মতবিরোধ কিরূপ উৎকট হইয়াছে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। উহা শেক্‌সপীয়রের সাহিত্যিক কীর্তি সম্বন্ধে। যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাও সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি—

১। ডাঃ জনসন। তিনি লিখিলেন,

'He (Shakespeare) is so much more careful to please than to instruct,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

that he seems to write without any moral purpose...This fault the barbarity of his age cannot extenuate, For it is always a writer's duty to make the world better.'

কাব্যগুণ বিচার করিয়াও ডাঃ জনসন শেক্‌সপীয়রের প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

'Shakespeare never had six lines together without a fault.'

২। চার্লস ডারউইন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,

'I have tried lately to read Shakespeare, and found it so intolerably dull that it nauseated me.'

৩। বার্নার্ড শ'। তিনি লিখিয়াছেন,

'With the single exception of Homer, there is no eminent writer, not even Sir Walter Scott, whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure my mind against his.'

কিন্তু এই ধরনের অভিমতের জন্য এই তিনজনের বিরুদ্ধে কোনও ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই, বরঞ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খামখেয়ালি হইবার অধিকার আছে, এই কথা স্বীকার করিয়া আমোদই পাইয়াছে। বাঙালিরা তবে কেন 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে' এই উক্তি করিয়া আমাকে তুচ্ছ করেন না ?

## শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের পদ্ধতি

ঈশ্বরচন্দ্রের নাম করি নাই বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করিতেছেন তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, আমি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম করি নাই। উঁহাদের মধ্যে শুধু চারজনের কথা বলিব—রামমোহন, মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামকৃষ্ণ। বাঙালি হিসাবে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কি ?

তবে আপত্তিকারীরা হয়তো বলিবেন, ঈশ্বরচন্দ্রের নাম ছয়জনের মধ্যেই করা উচিত ছিল। করিতে হইলে আমি যে ছয়জনের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের একজনকে বাদ দিতে হইত, কাহাকে বাদ দিতাম ?

আপত্তিকারীরা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, আমি একটা বিশেষ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ছয়জনের নাম করিয়াছি। কিন্তু উহা কেহই উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব যে নানা ধরনের হইতে পারে, অথবা সকল শ্রেষ্ঠত্ব যে সমতুল্য নয় ইহা যেন আপত্তিকারীরা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সুতরাং আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কয়েকটা মূলগত কথা বলিতে হইবে। সর্বাগ্রে বলিব শ্রেষ্ঠত্বের যে পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে তাহাকে ইংরেজিতে general ও particular বলে। এই দুইটি শব্দের একটির একেবারে ঠিক প্রতিশব্দ সংস্কৃতে ও বাংলায় আছে—উহা 'বিশিষ্ট'। কিন্তু অপরটির প্রতিশব্দ হিসাবে কোনও একটা সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ প্রচলিত নয়। তবে প্রাচীন সংস্কৃতে তিনটি শব্দ আছে যাহা 'general অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে—এগুলি 'সার্বাত্রিক', 'সার্বজনিক' ও 'সর্বমুখ'। আধুনিক সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে এই তিনটি শব্দেরই অর্থ ইংরেজিতে 'general', 'universal', 'applicable to all



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

circumstances' বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই দুই ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। 'সর্বমুখ' শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাপ্ত, বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। প্রথমে বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দিব।

## বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব

আজিকার দিনে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার অতীতের তুলনায় অকল্পনীয় প্রসার লাভ করিয়াছে, যেমন—শ্রেষ্ঠ জকি, শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়, শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়নী, শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী—নাট্যশালায় বা ফিল্‌মে, শ্রেষ্ঠ ফিল্‌ম-কারক, শ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকা, শ্রেষ্ঠ পপ্‌-সিঙ্গার, ইত্যাদি।

এইরূপ বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দুইটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, এই শ্রেষ্ঠত্ব যাঁহাদের তাঁহারা নিজের বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন না ; দ্বিতীয়ত, এই সবগুলি শ্রেষ্ঠত্ব এক শ্রেণীর নয়, সমতুল্যও নয়। আর একটা কথাও বলা প্রয়োজন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ফুটবল খেলোয়াড় বা 'পপ্‌-সিঙ্গারে'র তুল্য সম্মানিত, সমাদৃত ও সুপরিচিত হইবার সাধ্য কোনও শ্রেষ্ঠ কবি বা বৈজ্ঞানিকেরও নাই।

## সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব

পক্ষান্তরে যাঁহাদের সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাঁহাদের কৃত্য ও চরিত্রের অভিঘাত সব দিকে দেখা যায়, উহা সীমাবদ্ধ নয়। এই দুইটির জন্য দেশবাসী, এমন কি সমগ্র মনুষ্যসমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় হয়। সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা আশ্চর্যজনক দিকও আছে ; এই শ্রেষ্ঠত্ব যাঁহাদের আছে তাঁহারা বিশিষ্ট ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। ডাঃ জনসন বলিয়াছিলেন,

'The true genius is a mind of large general powers, accidentally determined to some particular direction.'

এই উক্তি সম্বন্ধে আমি শুধু এই আপত্তি করিব যে, বিশেষ দিকে যাওয়া accidentally determined হয় না, উহাও সর্বমুখীন প্রতিভার মধ্যে অন্তর্নিহিত হওয়ার জন্য অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত আমি দিব ছয়জন বাঙালির সর্বমুখীন কৃতিত্বের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট কৃতিত্বের কথা প্রথমে বলিয়া। যেমন—

১। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, পৃথিবীর যে-কোনও দেশের, যে-কোনও কালের শ্রেষ্ঠ কবির সমকক্ষ।

২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, তাঁহারাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সমতুল্য ;

৩। কেশবচন্দ্র সেন ও বিবেকানন্দ শক্তিমান ধর্মপ্রচারক, মার্টিন লুথার ও ইগ্‌ন্যাসিয়াসলয়োনার সহিত তুলনীয়।

৪। সুভাষচন্দ্রের বিশিষ্টতা অন্য ধরনের। তিনি বিশ্বাসের বশে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, হিন্দুদের সমগ্র ইতিহাসেও বিশ্বাসের জন্য আত্মবলিদানের আর একটিও দৃষ্টান্ত নাই।

ইহার পর এই ছয়টি বাঙালির সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিব। প্রথম লক্ষণই এইটা যে, তাঁহারা সকলেই চরিত্রধর্মে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, দোষে-গুণে আজীবন খাঁটি বাঙালি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন, কখনও বাঙালিত্ব ছাড়িতে পারেন নাই।

ইহার উপরে আরও বড় কথা আছে। নব্য বাঙালির চরিত্র, তাহার মনোবৃত্তি ও আচরণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া নব্যা বাঙালি নারীর। নব্য বাঙালির ধর্মবিশ্বাস (religion অর্থে) ও নীতিপরায়ণতা আসিয়াছিল কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের শিক্ষা হইতে। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি 'লিবারেলিজমে'র স্রষ্টা ও প্রচারক, অন্য দুইজন বাঙালি 'কনসারভেটিজমে'র।

শরৎচন্দ্রের সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব অন্য রকমের—একদিকে তিনি নব্য বাঙালির চরম দৃষ্টান্ত, 'চরিত্রহীন'তায়ও ; অপর দিকে তিনি নব্য বাঙালির সাধারণ রূপের প্রচারক ; তাঁহার রচনাতেই নব্য বাঙালি নিজের সত্য পরিচয় পাইল, এমন কি তাহার চরিত্রের দুর্বলতারও সাফাই পাইল।

সুভাষচন্দ্রের সার্বত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব আবার ইহা হইতেও বিভিন্ন। তিনি দোষে-গুণে খাঁটি 'কনসারভেটিভ' নব্য বাঙালি—পূর্ণতার কথা বিবেচনা করিলে, তাঁহার অপেক্ষা পূর্ণতর 'কনসারভেটিভ' বাঙালি পাওয়া যাইবে না। তাঁহার বাঙালিত্বের অকাট্য প্রমাণ এই যে, তিনি নিজের বাঙালিত্বকে গান্ধীবাদের দ্বারা ভেজাল করেন নাই। চিত্তরঞ্জন দাশও ইহা এড়াইতে পারেন নাই। গান্ধীবাদ বাঙালি চরিত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া শক্তিহীন ও প্রায় অকর্মণ্য করিয়াছে। ইহার জন্য বাঙালি দুই কূলই হারাইয়াছে। চিত্তরঞ্জন বিপ্লববাদীদের হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণা করিতেন ও উহার দ্বারা বাঙালির অনিষ্ট হইবে মনে করিতেন, তবুও তিনি গোপীনাথ সাহার জয়গান করিলেন। এই দ্বিত্ব অনিরসনীয়।

## ঈশ্বরচন্দ্রের মাহাত্ম্য

আমি যে-সব চরিত্রধর্মের ও কৃত্যের বিচার করিয়া ছয়জন বাঙালিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, সেই বিচারে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিছুতেই সেই শ্রেণীর বা category-র অন্তর্ভুক্ত করা যাইত না। তিনি মহান্ ব্যক্তি ছিলেন, তবে অন্য ধরনে, তাঁহার মহত্ত্বও ছিল অন্য রকমের, তাঁহার বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বও ছিল অন্য ধরনের। তাঁহার বিশিষ্টতা যে আমার নির্বাচিত ছয়জন বাঙালির বিশিষ্টতা নয় তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়, যেমন—১। তিনি মহাকবি হন নাই ; ২। তিনি ঔপন্যাসিক হন নাই ; ৩। তিনি ধর্মপ্রচার করেন নাই ; ৪। তিনি বিশ্বাসের বশে দেশের জন্য আত্মবলিদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিশিষ্টতা একান্তই নিজস্ব ছিল। উহার পরিচয় দিব।

১। তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা গতানুগতিক হইলেও তিনি চিরপরিচিত বাঙালি টোলের পণ্ডিত হন নাই। একটি দৈহিক ধর্মেই উহার পরিচয় পাওয়া যাইত—সারা জীবনেও তাঁহার ভুঁড়ি হয় নাই, অথচ ভুঁড়িবিহীন সংস্কৃত পণ্ডিত অকল্পনীয়, এইরূপ পণ্ডিতের লৌকিক আখ্যাই ছিল, "ভুঁড়ে ভট্‌চাজ"। এই দৈহিক বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের পত্নীদের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল ; বুঝ লোক যে জানো সন্ধান। তিনি সংস্কৃত পুস্তকের সম্পাদনাও নিজস্ব ধরনে করিতেন।

২। তিনি নূতন ধরনের বাংলা গদ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন সত্য, তবে তিনি উহার অগ্রদূত মাত্র। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইবার অব্যবহিত পরে উহা উৎকটভাবে সংস্কৃত গদ্যের অনুকারী হইয়াছিল, অথচ সংস্কৃত গদ্যের সৌন্দর্য উহাতে দেখা দেয় নাই। সংস্কৃত ধারা বর্জন করিয়া স্বাভাবিক বাংলা গদ্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা অন্যেরাও করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টার

দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি বই-এর উল্লেখ করিব—'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' ও 'আলালের ঘরের দুলাল'। কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টাকে পথ সন্ধান মাত্র বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন 'হুতোমি' ও 'আলালি' বাংলা গ্রহণীয় নয়। বাংলা গদ্য নিজের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। কিন্তু বঙ্কিমের সমগ্র বাংলা গদ্যও এক 'স্টাইলে'র নয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'ইন্দিরা'র শেষ সংস্করণ পর্যন্ত পড়িলে বাংলা গদ্যের বিকাশের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

৩। 'শিক্ষাদাতা' হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালির গোড়াকার শিক্ষায় নূতনত্বের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণমালার বইগুলিতে। উহা প্রাচীন 'শিশুবোধকের' ধারাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য হইতে মানসিক শিক্ষা বর্ণমালার বই হইতে হয় নাই, বরঞ্চ 'সুবোধ' গোপাল হাস্যাস্পদই হইয়াছিল। যে-সব প্রাথমিক পুস্তক হইতে বাঙালির মানসিক শিক্ষা সে-যুগে আরম্ভ হইত উহা অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', নানা ভাগে। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কথামালা' সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শিক্ষার পুস্তক, ইহা মৌলিক রচনা নয়।

৪। তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা বলিতে হইলে কেবলমাত্র 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'র উল্লেখ করিতে হয়। এ-দুটির প্রথমটি ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র বাংলা রূপান্তর ; 'শকুন্তলা' কালিদাসের নাটকের।

এই দুইটি বই বাঙালি বালকেরা ও মেয়েরা পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়িত সত্য, তবে কেহই সীতা বা শকুন্তলা হইতে চাহিত না, বরঞ্চ তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ তরুণ বাঙালি মনে বহু স্বপ্ন জাগাইত।

৫। শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রথম সংস্কৃত শিখিবার ব্যাকরণও ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, উহার প্রথমটি 'উপক্রমণিকা' যাহা রবীন্দ্রনাথ যেমন পড়িয়াছিলেন, আমিও পড়িয়াছিলাম, পরে তাঁহারই রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী'ও পড়িয়াছিলাম, অন্যেরাও পড়িত। তবে এই ব্যাকরণ পুস্তকগুলি বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, উহা বাঙালির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আমরা স্কুল হইতে বাহির হইয়াই পাণিনির ধারা ধরিলাম, কিছু কিছু মূল সূত্রও পড়িলাম ; সংস্কৃত ভাল করিয়া শিখিবার জন্য পড়িতে আরম্ভ করিলাম আপ্‌টের রচনাপুস্তক ও কানের ব্যাকরণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই সব বিশিষ্টতার বিচার করিয়া বলা যায় না যে, উহা বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছিল। উহার মূল্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক মূল্য, পথপ্রদর্শকের কীর্তি, উহা চিরস্থায়ী হয় নাই।

পক্ষান্তরে তাঁহার সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বের চরম সোপানে উঠিয়াছিল, উহার জন্য তাঁহাকে মহান্‌ ব্যক্তি, ইংরেজিতে যাঁহাকে great man বলে, তাহা হইয়াছিলেন স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেই মহত্ত্ব বাঙালি-ধর্মী হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রকে আমি মহাপুরুষ নিশ্চয়ই বলিব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিতে পারিব না। এমন কি, হয়তো এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি নিজের জীবনে ক্রমে-ক্রমে বাঙালিত্ব বর্জিত হইয়াছিলেন। ইহার একটা কৌতুকজনক দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর ভিন্ন সারা জীবনে অবাঙালি পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াও মনে-প্রাণে বাঙালি ছিলেন ; ঈশ্বরচন্দ্র সারা জীবন ধুতি পরিয়া, শুধু গায়ে থাকিয়া, এবং চটিজুতা পরিয়াও মনে-প্রাণে ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিলেন। সেই রূপেই তাঁহার সত্যকার মহত্ত্ব। উহার কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

১। প্রথম মহত্ত্ব চরিত্রবলে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালির মধ্যে কয়েকটা নূতন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা দেখা দিয়াছিল, যেমন, আদর্শপরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নীতিপরায়ণতা—এই কথাগুলি প্রচলিত বাংলাতে ছিল না, আসিয়াছিল ইংরেজির অনুবাদে, নূতন শব্দসৃষ্টি হিসাবে। আদর্শ, কর্তব্য ও নীতি অনুসরণ করিয়া জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে চরিত্রের শক্তির প্রয়োজন ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অল্পবিস্তর সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে দেখা দিতেছিল বটে, কিন্তু উহা সর্বোচ্চরূপে দেখা গিয়াছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে। অসাধারণ চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে তিনি যে আর্থিক অবস্থায় জন্মিয়াছিলেন তাহাকে অতিক্রম করিয়া, অন্য শ্রেষ্ঠত্বের কথা দূর থাকুক, লৌকিক শ্রেষ্ঠতাও লাভ করিতেন না। বাঙালি অবস্থার বশীভূত নয়, উহা তিনিই প্রথমে দেখাইলেন। তাহার পর অর্থের জন্য, অথবা ভয়ে অথবা প্রলোভনে কখনও নিজের 'ধর্ম' বিসর্জন দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্যের পরিচয় একটি প্রবন্ধে দিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রবলের অন্যান্য দিকের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু একটা ব্যাপারের মাত্র উল্লেখ করিব। তিনি পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা হিন্দুর ধারা নয়; পুত্র সম্বন্ধে হিন্দুর মোহ ধৃতরাষ্ট্রীয়। উহার ব্যতিক্রম ভারতবর্ষে আধুনিককালেও দেখা যায় নাই।

২। ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় মহত্ত্ব দানপরায়ণতায়। হিন্দু সমাজে দানপরায়ণতা যে ছিল না তাহা নয়, তবে উহার একটা প্রথাগত দিক ছিল, যেমন, ধর্মের জন্য দান, ব্রাহ্মণের জন্য দান, ইত্যাদি। মানুষের দুঃখ বা অভাব দেখিয়া অর্থসাহায্য করা সচরাচর দেখা যাইত না। পার্থিব উন্নতির জন্য দান ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের নব্য নায়ক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও courtship. এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই।' অথচ বঙ্কিম নিজেও 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রকে এই চরিত্রের নায়কই চিত্রণ করিয়াছিলেন। এই আদর্শ বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা হইতে পাইয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।'

দীন বাঙালি ভিন্ন অন্য কেহ ঈশ্বরচন্দ্রকে দানের জন্য ভক্তি করিত না।

৩। ঈশ্বরচন্দ্রের অবাঙালি শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গে তাঁহার পুস্তক ক্রয় এবং পুস্তকসংগ্রহের কথাও বলিব। বাড়িতে পুস্তক রাখা বাঙালির লৌকিক জীবনে ছিল না। উহা ইংরেজ ভদ্রসমাজের মধ্যে অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাহারা পুরুষানুক্রমে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটি প্রাচীন বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি গঠন করিয়াছিল। ইহার উল্লেখ প্রতিটি জীবনী ও উপন্যাসেই পাওয়া যায়। জেন অস্টিনের 'প্রাইড্ অ্যান্ড প্রেজুডিস' উপন্যাসে এইরূপ কথাবার্তা আছে—

Miss Bingley: 'What a delightful library you have at Pemberley, Mr. Darcy!'

Mr. Darcy: 'It ought to be good, it has been the work of many generations.'

Miss Bingley: 'And then you have added so much to it yourself, you


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

are always buying books.'

Mr. Darcy: 'I cannot comprehend the neglect of a family library in such days as these.'

আমি বিলাতের যতগুলি বড় বড় প্রাচীন বাড়িতে গিয়াছি সবগুলিতেই বিরাট লাইব্রেরি দেখিয়াছি। একদিন এইরূপ গার্হস্থ্য পুস্তকাগারেও কিরূপ বই থাকে—তাহা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি ও আমার স্ত্রী একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, বাড়িটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত, হ্যাটফিল্ড হাউস ও ব্লিকনিঙ্গ হলের মতো। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দোতলায় লাইব্রেরিতে গিয়া বসিলাম। কথায় কথায় প্লেটোর প্রসঙ্গ উঠিল, গৃহস্বামী উঠিয়া গিয়া শেল্‌ফ হইতে তাঁহার প্লেটো-গ্রন্থাবলী নামাইয়া আনিলেন—উহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত আনড্রুস মাদুপিয়াসের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ, তারিখ ১৪৭২ সন। সেই সময় হইতে আধুনিক বই পর্যন্ত সবই ছিল।

এই সব সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকদের জীবিকার ভাবনা ছিল না, বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া অবসর সময়ে বই পড়িতেন চিত্তবিনোদন ও মানসিক জীবনের প্রসার বাড়াইবার জন্য। এই শ্রেণীর ইংরেজ মেয়েরা পড়িতেন মানসিক জীবনের জন্যই। তাঁহারা কি কি বই পড়া সর্বতোমুখী মানসিক জীবনের জন্য আবশ্যক তাহার তালিকা করিয়া পর পর পড়িতেন।

AMARBOI.COM

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাইব্রেরি করিবার ধারা কলিকাতার নব্য বড়লোকদের মধ্যে দেখা দিল। তবে প্রথমে উহা গৃহসজ্জা হিসাবে, বড়লোকপনা দেখাইবার জন্য, পড়িবার জন্য নয়। এই নূতন ধারার বিবরণ ১৮২৩ সনে প্রকাশিত 'কলিকাতা কমলালয়ে' আছে। একজন গ্রামবাসী কলিকাতায় আসিয়া এই সব লাইব্রেরি দেখিল, কিন্তু পড়িবার কোনও লক্ষণ দেখিল না বা আগ্রহের পরিচয় পাইল না। সে ব্যঙ্গ করিয়া কলিকাতাবাসীকে বলিল,

'বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি, ইংরাজী, আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারীর মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার জল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না। আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারে না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে। অন্য পরে হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদগর (বাইন্‌ডার) ভিন্ন বাবুও স্বয়ং হস্ত দেন নাই, এবং কোনো কালেও দিবেন এ মত কথাও শুনা যায় না।'

গ্রামবাসী ইহার পর এইভাবে পুস্তক ক্রয় ও সংগ্রহের সার্থকতা কি সেই প্রশ্ন তুলিল, বলিল,

'ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি।'

তবে নিজের বুদ্ধিতে গ্রামবাসী একটা কারণ নির্ধারণ করিল, বলিল,

"বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন, যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন। তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলিকাতাবাসী এই সব কথা শুনিয়া উত্তর করিল,

'অহে তুমি কি অবোধ, তোমার জ্বালায় আমি জ্বলিত হইলাম। এ মত প্রশ্ন কর যাহা অতি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও বুঝা যায়।'

কি বোঝা যায় ? কলিকাতাবাসীর উত্তর,

'পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই, ভাগ্যবান (ধনী) লোকের সংসারে তাবৎ দ্রব্যই থাকে, কিন্তু—সর্ব্বদা সকল দ্রব্য ব্যবহার হয় না।...তাঁহারা এমন কি দায়গ্রস্ত হইয়াছেন যে, ঐ কেতাবগুলীন অর্থব্যয় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার না করিলে দিন যাপন হয় না, এ মত নহে।'

অর্থাৎ জীবিকার জন্য পড়া আবশ্যক না হইলে বই কিনিলেও পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই। বাঙালি জীবনে বই কেনা এইভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। তবে ক্রমশ উহা পড়াও আরম্ভ হইল, এবং বাড়িতে লাইব্রেরি করা গ্রাম অঞ্চলেও প্রসার লাভ করিল। আমি এরূপ গ্রাম্য লাইব্রেরি অজ পাড়াগাঁয়ে দেখিয়াছি। ইংরেজ সমাজে যেমন, তেমনই বাঙালি সমাজেও মেয়েরাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই সব লাইব্রেরি ব্যবহার করিতেন। ইহার উপরেও বই সংগ্রহ করা সম্বন্ধে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একটা রোমান্টিক উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা হারানো প্রণয়ী ফিরিয়া আসিবে এই আশায় উহাদের জন্য লাইব্রেরি গঠন করিয়া রাখিত৭ একজন বাঙালি যুবক না জানিয়া এক বৃহৎ অট্টালিকায় গিয়া একটি ঘরে এই দৃশ্য দেখিলেন,—

'সে-ঘরের চারিদিকেই বড় বড় কাচের আলমারীতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি, আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মত তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।'

কিন্তু একটু পরেই এই যুবক বুঝিতে পারিলেন, ইহা কাহার বাড়ি—তাঁহার বালিকা-সখীর ; মুখ তুলিয়া দেখিলেন, নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা।

এই ধারা অনুসরণ করিয়া আমি ১৯২২ সনে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরও বই কিনিতে আরম্ভ করি। উহার জন্য আমি যতদিন কলিকাতা ছিলাম, ততদিনই নিন্দিত ও ভর্ৎসিত হইয়াছি। বিবাহের পর আত্মীয়ারা আসিয়া আমার পত্নীকে বই কিনিতে বাধা দিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। আমি বাঙালি মহিলার মুখে এইরূপ উক্তি বহু শুনিয়াছি : (১) 'ইচ্ছে করে (স্বামীর) বইগুলোকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দি' : (২) 'এমন সুন্দর একটা বাড়িতে গিয়াছিলাম, সেখানে একটাও বই নেই' ; (৩) 'কোনো বাড়িতে গেলে সেখানে বই দেখলে আমি থাকতে পারিনে।'

সুতরাং বোঝা যাইবে ঈশ্বরচন্দ্র বই সংগ্রহ করিয়া কিভাবে বাঙালি ধারার বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার অবাঙালিত্বের পরিচয় আরও দিতে পারিতাম। তবে আশা করি এই তিন দফাই যথেষ্ট হইবে।

ইহার পর আমি বাঙালির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের নিন্দা এবং পূজা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

## ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহার নিন্দা ও পূজা

জীবিতকালে (জন্ম ১৮২০ সন, মৃত্যু ২৯শে জুলাই, ১৮৯১ সন, বয়স ৭১) ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালির শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন—উহার কারণ তাঁহার পাণ্ডিত্য,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভীক আচরণ, ও পরার্থপরতা। আমাদের মধ্যে লৌকিক প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ সমাদর সর্বদাই দেখা গিয়াছে; উহার প্রকাশ সাধারণ লোকের আচরণে হয় 'দর্শনে'। এই চিরাচরিত শ্রদ্ধানিবেদনকে রবীন্দ্রনাথ 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' বলিয়াছেন। উহা ঈশ্বরচন্দ্রেরও ব্যাপকভাবেই জুটিয়াছিল। ইহার সহিত বিচারবুদ্ধির বিশেষ সংস্রব ছিল না।

কিন্তু বিচার করিয়া অনেক বাঙালিই পরে তাঁহার নিন্দা, এমন কি কুৎসা রটনাও আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার বাংলা লেখাকে 'বিদ্যাসাগরী' বাংলা বলা হইত। তাঁহার পরোপকারকেও সকলে সর্বতোভাবে প্রশংসা করিত না। দান প্রশংসনীয়, কিন্তু দান করিবার জন্য ঋণ করা উচিত নয়, ইহাই জনপ্রচলিত বিচার ছিল। উহাকে একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না। এ-বিষয়ে একটি পুরাতন বাংলা বই-এ এইরূপ উক্তি আছে—'যদি কোনো ব্যক্তি অধিক দান করেন তবে তাঁহাকে কহে, অমুক খয়াইয়া গেল ঞিয়ার কি বিষয় হইবেক, এ-প্রকার দান করিয়া কত লোক দরিদ্র হইয়াছে, তাহার সাক্ষী অমুক হালদার।' ইহা ছাড়া বই কেনা, বিশেষ ভাবে বইগুলিকে সুন্দর বাঁধানো করা, এ-দুয়ের জন্যও তিনি নিন্দিত হইতেন। এ-বিষয়ে একটি সুপরিচিত গল্পও আছে, যাহাতে ঘড়ি ঝুলাইবার সোনার চেনের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বই-বাঁধানোর তুলনা করিয়াছিলেন।

নানারূপ অমিতব্যয়িতার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যখন ঋণ রাখিয়া মৃত হইলেন, তখন কোনও ধনী বাঙালি, অন্ততপক্ষে, তাঁহার লাইব্রেরিটিকেও রিসিভারের হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন না। উহার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন হইত না। পাশ্চাত্য জগতে এইভাবে সাহায্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। লর্ড অ্যাক্টনের বিরাট লাইব্রেরি কার্নেগী কিনিয়া লর্ড মর্লিকে উপহার দেন, লর্ড মর্লি উহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

সর্বোপরি জীবিতকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল তাঁহার সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টার জন্য,—বিধবাবিবাহ আইন পাশ করার ব্যাপারে আন্দোলন করিবার জন্য ও পরে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। হিন্দুরা তখন বলিতে আরম্ভ করিল ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ধ্বংসের জন্য নূতন কালাপাহাড় হইয়াছেন। গল্প আছে যে, একজন বাঙালি চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকেই বলিয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর গোমাংস খায়। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বালবিধবার দুঃখ এবং অনেক সময়ে পতিতা হইবার অধঃপতন দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। একটা গল্প আছে যে, তিনি গুরুস্থানীয় পণ্ডিতের তরুণী পত্নী দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনের সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, এ-বিষয়ে 'তীব্র সমালোচনা করিতে আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই।' তবে তাঁহার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ছিল এই বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৯২ সনে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে 'তীব্র সমালোচনা' বাদ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতেও এই উক্তি তিনি রাখিয়াছিলেন, 'বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্ কুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে।'

এই দুই ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র সফলতা লাভ করেন নাই। বিধবা বিবাহ ১৮৫৬ সনে আইনসঙ্গত করা হইলেও উহা জনপ্রচলিত হয় নাই। বহুবিবাহ যে লোপ পাইয়াছে তাহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন,—'ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল।'

এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অতিশয় সত্য এবং বিচক্ষণ কথা। আমি সকলকেই তাঁহার বহুবিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়িতে বলিব। তাঁহার আপত্তি এইরূপ ছিল—সামাজিক আচারব্যবহার লোকমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; লোকমত বিরুদ্ধে থাকিলে কোনও সামাজিক আচার শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া বা আইন করিয়া গ্রাহ্য করা যায় না, তেমনই বন্ধও করা যায় না। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রে আছে অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করা ধর্ম্মসঙ্গত—তাই তিনি আরও লিখিলেন, 'বাঙ্গালী মেয়ের মুখ ভাল নহে,...এমন বাঙ্গালীই নাই যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে "মুখঝামটা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবিতকালেও ঈশ্বরচন্দ্র সকল বিষয়ে বিবেচক ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে বিরাজমান ছিলেন না। আমার অল্পবয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের গুণকীর্তন সাধারণত হইত ব্রাহ্মদের দ্বারা, হিন্দুদের দ্বারা নয়। আমি নিজেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হলে গিয়া মৃত্যুদিনের বক্তৃতা শুনিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের এই পক্ষপাত অবশ্য হইয়াছিল তাঁহার সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টার জন্য। অথচ এই ব্যাপারেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

বর্তমান কালে ইংরেজিতে যাহাকে debunking বলে ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাতে উহাও দেখা গিয়াছে। আমার বাল্যকালে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনীই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত, উহাকে প্রায় hagiography-র দৃষ্টান্তই বলা চলে। আধুনিক বাঙালি গবেষক উহার বহু ভ্রান্তি দেখাইয়াছেন, বিশেষ করিয়া রূপনারায়ণ নদ সাঁতার কাটিয়া পার হইবার বিখ্যাত কাহিনীটি একেবারেই অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার পরও কম্যুনিস্ট-ধর্মী বাঙালিরা ঈশ্বরচন্দ্রের বিরোধী হইয়াছে—শুনিয়াছি নকশালপন্থীরা নাকি গোলদীঘিতে তাঁহার মূর্তির মাথা কাটিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বা কাটিয়াই ফেলিয়াছিল।

তবে এখন আবার বিদ্যাসাগরপূজা নূতন করিয়া দেখা দিতেছে কেন? আমি দূর হইতে যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, ইহা দুইটি দিক আছে, দুই-ই অবশ্য বর্তমান বাঙালি জীবনের তুচ্ছতা ও কীর্তিহীনতার ফল। উহার একটি দিক ঘৃণ্য, অপরটি দুঃখজনক।

প্রথম দিকটাতে বাঙালিরা শবভুক্ পিশাচ,—আরবি ভাষায় যাহাদের 'ঘুল' (ghoul) বলে—সেই মূর্তিতে দেখা দিতেছে। এই আচরণ শুধু ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষেত্রেই যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা নয়; উহা রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের বেলাতেও একই মূর্তিতে দেখা যাইতেছে। এই জাতীয় বাঙালিরা তিনজন মহান্ বাঙালির—যাঁহাদের তাহারা জীবিতাবস্থায় উৎপীড়ন করিয়াছিল—তাঁহাদের শব ভক্ষণ করিয়া কীর্তির ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে।

অপর ঈশ্বরপূজকেরা এত পৈশাচিক হয় নাই। তাহাদের ঈশ্বরপূজা, রবীন্দ্রপূজা, ও সুভাষপূজা, সবই নিজেদের জীবনের পীড়াদায়ক তুচ্ছতা হইতে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাদের আচরণের পরিচয় দিব—'আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ন্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটি ভাঙার (ক্ষেত চাষ করার) কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লম্ফে-ঝম্পে আর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহ থাকে না।' তবে দৈনন্দিন জাবনা দৈনন্দিন ন্যাজমলা খাইবার বেদনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে না, তখন তাহারা যে আচরণ করে তাহা অতিশয় করুণ—পতিপুত্রহীনা বিধবার নাড়ুগোপাল বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা পাইবার মতো। শবে পর্যবসিত ঈশ্বরচন্দ্র, ও নাড়ুগোপালে রূপান্তরিত ঈশ্বরচন্দ্র—এই দুইরূপেই ঈশ্বরচন্দ্র আজ বাঙালির জীবনে বিদ্যমান। কেহ চরিত্রবলে বিদ্যাসাগরের অনুকারী হইতে চাহিতেছেন না।

## কেশবচন্দ্র ও তাঁহার কীর্তি

সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ উঠিয়াছে—আমি কেশবচন্দ্র সেনকে কেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিলাম, কেনই বা তাঁহাকে বিবেকানন্দের সমপর্যায়ে আনিবার স্পর্দ্ধা দেখাইলাম। ইহা হইতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আজিকার শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে ১৯৪৭ সনের আগেকার স্মৃতি লোপ পাইয়াছে।

এই আপত্তির উত্তর আমি সংক্ষেপেই দিতে পারি একটি মাত্র অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলিয়া—কেশবচন্দ্র পূর্ববর্তী না হইলে বিবেকানন্দ দেখা দিতেন না। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মধারার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রবর্তিত নব্য হিন্দুত্বের সম্বন্ধ লুথার প্রভৃতি সংস্কারকদের প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টীয় ধারার সহিত, অর্থাৎ রিফর্মেশ্যনের সহিত, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় 'কাউন্টার-রিফর্মেশ্যন'-এর সম্বন্ধের মতো। কেশবচন্দ্র যেন লুথার, বিবেকানন্দ যেন ইগ্‌ন্যাশিয়াম লয়োলা।

লুথার ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করেন ১৫১৭ সনে, উহা প্রধানত হইয়াছিল পুরাতন 'চার্চের' অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে। সেই 'চার্চ' ক্রুদ্ধ হইলেও এই আক্রমণ অমূলক তাহা বলিতে পারিল না। তখনই কাউন্সিল অফ্ ট্রেন্ট আহ্বান করা হইল—১৫২৫ হইতে ১৫৬৩ পর্যন্ত বিচার চালাইয়া এই কাউন্সিল বহু সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মকে নূতন রূপ দিল। কেশব কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের অভিঘাত দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ পুরাতন কুসংস্কার বর্জিত নব্য হিন্দুত্বের প্রচার করিলেন। এই দুইটি ঐতিহাসিক ব্যাপারের সাদৃশ্য সকলেরই স্বীকার্য।

কিন্তু ইহাও আমি সারাজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে শিখিয়াছি যে, কোনও অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করিয়া বাঙালি পণ্ডিতদের মতের পরিবর্তন করিতে পারা যায় না। তাঁহারা যাহা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন তাহাই বলিবেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের উল্লেখ করিয়া ১৯১৬ সনে লিখিয়াছিলেন,

> 'খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায় ;
> আর তো কিছুই নড়ে না রে
> ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
> ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
> চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
> ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
> অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।...'

দিল্লিতে যাইবার পর রীজের জঙ্গলে টিয়াদের লাফালাফি করিয়া যব গম ইত্যাদি খাইতে দেখিয়া আমার পূর্বপরিচিত বাঙালি মনুষ্যটিয়ার কথা মনে পড়িয়াছিল, তাই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জনগণমন অধিনায়ক' গানটার প্যারডি করিয়া একটা কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, উহার প্রথম অংশ এইরূপ,—

'দাঁড়ে বসি ছোলা খাও, টিয়া হে
কত দিন জঙ্গলে যাও না,
টিয়া, টিয়া, টিয়া হে...'
—ইত্যাদি।

কিন্তু কোনও ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দুইটি বাঙালি টিয়াপণ্ডিত দুই দাঁড়ে মুখামুখি হইয়া বসিয়া আছেন, একজন বলিতেছেন, 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ'! অপর জন বলিতেছেন, 'মার্কস-ফিদেল কাস্ত্রো'। ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। তাই বেপরোয়া হইয়া কেশবচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি।

প্রথম কথা, যাহা ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া খ্যাত ও যাহা খাঁটি ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রই এ-দুয়েরই স্রষ্টা, রামমোহন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন। রামমোহন অবশ্য নামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাকে debating society ভিন্ন কিছুই বলা যায় না; রামমোহন চরিত্রধর্মে সাধক বা ভক্ত ছিলেন না; তাঁহাকে তুলসীদাস, কবীর বা তুকারামের সহিত তুলনা করা যায় না। তাঁহার ঝোঁক ছিল দার্শনিক বিচারের দিকে, তাও তর্কাতর্কির মতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র যুবক সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৫ সনের ১৩ই মে তারিখে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'He failed to build up a positive system of religion.' প্রকৃতপ্রস্তাবে রামমোহন বিলাত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব লোপ পায় ও উহার অস্তিত্ব নামে মাত্র থাকে।

যুবা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। উপনিষদের একটি ছিন্ন পাতা কুড়াইয়া পাইয়া কি করিয়া তিনি একটা নূতন ধর্মানুভূতি পান, সে কাহিনী সর্ববিদিত। কিন্তু তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথও পিতা-প্রবর্তিত ব্রাহ্মত্বের স্পষ্ট পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, এই সব 'wild treatise' (অর্থাৎ উপনিষদ) হইতে কতকগুলি বচন সঙ্কলন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ পাইলেন। ইহাও সত্য যে, দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর উপনিষদের ব্রহ্ম নহেন, তাঁহার ঈশ্বর প্রকৃতপ্রস্তাবে 'গোরা' উপন্যাসে বর্ণিত পরেশের ঈশ্বর, তিনি ভক্তির ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর নহেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও সীমাবদ্ধ পরিধির বাহিরে যাইতে পারে নাই। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির উপর ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই। এই অসম্পূর্ণতা দেবেন্দ্রনাথের যুবক পুত্র সত্যেন্দ্রনাথই অনুভব করিয়াছিলেন (যিনি আই. সি. এস-এর প্রথম ভারতীয় কর্মচারী হইয়াছিলেন)। তখন বাঙালি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মানসিক জীবনের নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, উহা অসাধারণ মানসিক শক্তি না থাকিলে সম্ভব হইত না। সত্যেন্দ্রনাথের উহা ছিল তাই তিনি ১৮৬৫ সনেই লিখিলেন,

'Although something has been done to spread the doctrine of pure Theism in Bengal, yet much remains to be accomplished. Some of the leading Brahmos seem to forget that our religious education cannot go on isolated from our social and moral culture, that all the different parts of our inner life are intimately connected.'

ব্রাহ্মধর্মে এই সর্বমুখীনতা দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করিতে পারেন নাই, করিলেন

কেশবচন্দ্র। উহার জন্যই দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের মতান্তর হইল। ইহার ফলে ১৮৬১ সনে ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ পুরাতন ধারা বজায় রাখিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, কেশব সবদিকে নূতনত্ব আনিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উহার নূতনত্ব দেখা গেল তিনদিকে—প্রথম বেদ ও উপনিষদের ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ও খ্রিস্টধর্মের প্রভাব আনাতে ; ও দ্বিতীয়, জাতিভেদ না মানায় ; তৃতীয়ত, বাল্যবিবাহ দূর করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করাতে। দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কেশবচন্দ্র যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিলেন, উহাই সত্যকার ব্রাহ্মধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। উহাই একটা নূতন বাঙালি শিক্ষিত ও উদারনৈতিক সমাজের সৃষ্টি করিল। এই ব্রাহ্মধর্মের প্রসার সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার মতো, উহা দীক্ষিত ব্রাহ্ম ভিন্ন হিন্দুসমাজভুক্ত শিক্ষিত বাঙালির মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে ব্রাহ্মপন্থী বাঙালিরাই বাঙালি উদারনৈতিকদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি হইয়াছিল। কেশবের এই সাফল্য ভুলিলে বাঙালির মানসিক উন্নতির ইতিহাসই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

কেশবচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজন। তাঁহার ধর্ম মূলত খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হইলেও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম হয় নাই। এই কথা জীবিতকালে কেশবচন্দ্র বার বার বলিয়াছিলেন, এমন কি তিনি ইংরেজ জাতির খ্রিস্টধর্ম সত্যকার, অর্থাৎ যীশুর খ্রিস্টধর্মই নয় ইহার বিকার ইহাও বলিয়াছেন।

কেশবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আরও স্পষ্ট ভাষায় উহা বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ,

'Christ and His religion will have to be interpreted in India through Indian antecedents and the Indian medium of thought. I am suspected of trying to bend Christianity down to heathenism. So we must either renounce our national temperament, or renounce Christ, or reembody our faith and aspirations under a new name, and form, and spirit. We have taken this third course.'

ইহাও বলা প্রয়োজন যে, জীবনের শেষে, ১৮৮৩ সনে, কেশবচন্দ্র 'Asia's Message to Europe' নাম দিয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য পাদ্রীর ইউরোপীয়ধর্মী হওয়া উচিত নয়। শেষ জীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক দিকে চৈতন্যপন্থীও হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই তর্কের শেষ করিব,

'The forms of one nation are apt to be repulsive and even shocking to another. Our Oriental nature is our apology for the impassioned utterances, highflown language, etc. How can I, my friend, destroy my Asiatic nature, how can I discard the language of poetry and emotion and inspiration which is my life and nature ?'

ইহার সহিত বিবেকানন্দের উপদেশের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

ইদানীং আমার যে-সব উক্তি ও আমার সম্বন্ধে যাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমি অত্যন্ত আত্মম্ভরি, আত্মাভিমানে স্ফীত ;


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে অতি উন্নত বাঙালি মনে করিয়া আজিকার বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি।

আপাতবিচারে এই ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়, হয়তো বা অসঙ্গতও নয়। আমি সত্যই আজিকার বাঙালিদের নিন্দা করিতেছি। তবে একটু তলাইয়া দেখিলেই সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের সহিত তুলনা করিয়া এইরূপ করি না, করি বাঙালির কীর্তির ঐতিহাসিক হিসাবে ; বাঙালি যখন সকল ভারতবাসীর মানসিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত সেই যুগের বাঙালির সহিত তুলনা করিয়াই আধুনিক বাঙালির দোষ ধরি। ইহার কারণ নিজের অহমিকা নয়, বাঙালির জাতীয় গৌরবের অনুভূতি।

বস্তুত আত্মাভিমানী হইবার অবকাশ আমার সমসাময়িক বাঙালি কি আমাকে কখনও দিয়াছে ? আমি ১৯২৭ সন হইতে নিয়মিতভাবে বাংলা লিখিতে আরম্ভ করি। তখন হইতে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত ষাট বৎসর ধরিয়া বাঙালি পণ্ডিতেরা আমাকে মূর্খ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত 'ওঁচা' বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। ১৯৫১-য় আমার ইংরেজি আত্মজীবনী প্রকাশিত হইবার পর এই কুখ্যাতি ভারতব্যাপী হইল ; সকলেই আমাকে দেশদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন হইতে আমি নিন্দার ছাড়াও বিদ্বেষের পাত্র হইলাম। তবে কিসের জোরে আমি নিজেকে মহান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব ? গান্ধীজিকে মহাত্মা করিয়াছিল দেশবাসী।

কিন্তু ১৯৮৭ সন হইতে, যে-কোনও কারণেই হউক, আমার কপাল ফিরিয়াছে। আমি লেখক হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছি বা হইতেছি, অনেকে ব্যক্তিগত ভাবেও আমাকে প্রশংসার যোগ্য মনে করিতেছেন। কিন্তু পুরাতন বিদ্বেষ ও বিদ্বেষপ্রসূত নিন্দা একেবারে লোপ পায় নাই। আসলে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া আমার বিদ্বেষীরা তাঁহাদের সুর আরও চড়াইয়াছেন। তবে আমার নিন্দকদের মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সাতানব্বুই বৎসর বয়সে উপনীত হইয়া আমি ভুষণ্ডীর কাকের মতো গাছের ডালে বসিয়া কা-কা করিতেছি. আমার নিন্দকেরা অনেকেই গত হইয়াছেন। এখনও মুষ্টিমেয় যাঁহারা আছেন তাঁহারাও হয়তো আমার আগেই গত হইবেন। সুতরাং শেষ কথা বলিবার, অর্থাৎ শেষ মার দিবার সুযোগ আমিই পাইব।

তবু আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিয়া দাবি বা প্রচার করিব না। এমন কি নিজেকে বাঙালি বলিতেই পারিব কি না সে-বিষয়েও আমার মনে এখন সন্দেহ জাগিয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি কিভাবে থাকিবে, সে-সম্বন্ধে আমি কি ভরসা রাখি তাহা বিনয়ের ভান না করিয়া সরলভাবেই বলিব।

প্রথমত, বাংলা ভাষায় লেখক বলিয়া আমি বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে স্থান পাইব। তেমনি ইংরেজিতে লিখিয়াও আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত থাকিব। ইহা বড়াই করার মতো হইলেও এইটুকু আশা আমি পোষণ করি।

তবে ইহার জন্য কেহ আমাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বা শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বলিবে না। আমার অবর্তমানে ব্যক্তি হিসাবে কোনও বাঙালি আমাকে স্মরণ করিবে না। আমি অবশ্য এখনও বিদেশে নিজেকে 'বাঙালি হিন্দু' বা 'হিন্দু বাঙালি' বলিয়া পরিচয় দিই, কখনও নিজেকে 'ইন্ডিয়ান' বলি না। ইহার জন্য আমি বিদেশবাসী বাঙালিরও বিরাগভাজন হইয়াছি। কিন্তু নিজেকে বাঙালি বলিতে সঙ্কোচ করি নাই। তবু অন্য বাঙালির কাছে আমি কোনওদিকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিয়া গণ্য হইব না। আমার ব্যক্তিত্বের বা লেখার কোনও অভিঘাত বাঙালি জীবনের উপর পড়িবে না, আমার লেখার দ্বারা বাঙালি জীবনে কোনও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন দেখা দিবে না। তবে লেখক হিসাবে বাঙালির মনোরঞ্জনকারী—entertainer— হইয়া থাকিব, এই ভরসা রাখি। এই পর্যন্তই আমার আত্মপ্রত্যয়, ইহার বেশি নয়।

তবে আমি কিসে বাঙালি ? উহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙালিত্ব একটু জটিল ধরনের। উহা কলমকরা ফল বা ফুলের গাছের গোড়ার গাছটার মতো, তবে একটু প্রভেদ আছে—কলমের গাছের গোড়ায় গাছ হইতে ফল বা ফুল হইতে দেওয়া হয় না, কখনও সেখান হইতে ডাল দেখা দিলে কাটিয়া ফেলা হয়। আমি যে কলমের গাছ এখন হইয়াছি, তাহাতে কিন্তু কলম এবং গোড়া, দুই হইতেই ফুল ফুটিতেছে। এরকম ব্যাপার আমার একটা রোডোডেনড্রন গাছে হইয়া গিয়াছে—এখন ওই গাছটা হইতে দুই রকমের ফুল হয়, কলমের ফুল খুব গাঢ় রং-এর, গোড়ার ফুল একটু ফ্যাকাশে, একেবারে আমার ইংরেজি লেখা ও বাংলা লেখার সঙ্গে তুলনীয়।

আমি গোড়ার বাঙালি হিসাবেও কি জাতীয় তাহা বলি। আমি জন্মে ও বাল্যশিক্ষায় বাঙালি ভদ্রলোক, অর্থাৎ ভূস্বামীবংশীয় বাঙালি। উহার ধর্ম আমার মন, চরিত্র ও আচরণ হইতে কখনও লোপ পাইবে না।

কিন্তু আমি বারো বৎসর বয়সে সেই জীবনের অবস্থান, পূর্ববঙ্গ, ছাড়িয়া কলিকাতায় আসি, সেখানেই আমার মনের পূর্ণ পরিণতি হয়। তবু আমি কলিকাতার বাঙালি হইতে পারি নাই, বত্রিশ বৎসর বাস করা সত্ত্বেও হই নাই। কলিকাতা হইতে যে মানসিক ধর্ম পাইয়াছিলাম উহা ইউরোপীয়।

ইহার পর আমি আটাশ বৎসর দিল্লিতে বাস করি, কিন্তু কোনওদিকেই হিন্দুস্থানী হই নাই, কোনও কালে হিন্দী ভাষায় কথা বলি নাই। দিল্লিতে ইংরেজিতে কথা বলিয়াছি, বাহিরে ইংরেজি পরিচ্ছদও পরিয়াছি।

এখন চব্বিশ বৎসর ধরিয়া ইংলন্ডের অক্সফোর্ডে আছি, একবারের জন্যও দেশে ফিরিয়া যাই নাই। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার পুরাতন বাঙালিত্ব বিলাতে থাকিয়াই ফিরিয়া পাইয়াছি। মূলগত বাঙালি থাকিবার জন্য আমাকে বিলাত বাস করিতে হইয়াছে, এই বাঙালিত্ব আমি কলিকাতা থাকিলে কিছুতেই বজায় রাখিতে পারিতাম না।

তবে ইহাও সত্য যে, আমি অন্যদিকে অবাঙালিও হইয়া গিয়াছি। প্রথমত, ইংরেজি শিক্ষার জন্য অল্প বয়স হইতেই আমার মানসিক ধর্ম ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিল, বিলাতবাসের ফলে আচরণও অনেকটা ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছে।

ইহার উপরেও কথা আছে। আমি ঠিক বর্তমান যুগের ইউরোপীয়ও নই ; ইউরোপীয় হইয়াও সারা পৃথিবীর সকল সভ্য যুগের ও সকল সভ্য জাতির লোক। প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রিস, প্রাচীন রোমে থাকিলেও আমি নিজেকে প্রবাসী মনে করিতাম না, আপনার লোকের মধ্যে আছি বলিয়াই ভাবিতাম। এক কথায় বলিতে পারি এখন আমি মানবজাতির ইতিহাসে যাহারা সভ্য বলিয়া পরিগণিত, এই সব সভ্য দেশ ও সভ্য জাতির লোক। এই সর্বকালতা, সর্বদেশীয়তা, ও সর্বজাতীয়তার জন্য দেশে ফিরিয়া গেলে বাঙালিরা আমাকে স্বজাতীয় বলিয়া চিনিতে পারিবে কি না সন্দেহ। বিলাতে থাকিয়াও আমি বিলাতবাসী বাঙালির কাছে অপরিচিত হইয়া আছি। দেশে ফিরিলে আরও অপরিচিত হইব। আমি পূর্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই আবার উদ্ধৃত করিব। আমাকে দেখিলে আজিকার বাঙালি নিশ্চয়ই বলিবে,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে
ফিরেছ কি ফির নাই বুঝিব কেমনে ॥
গোধূলিগগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজও কি খোঁজার শেষে ফের নি আপন দেশে।
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে ॥'

"ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্যই মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন" এবং "আমিই বা কী"—এই দুই শিরোনামে প্রকাশিত ; রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ বৈশাখ ১৪০১, ১ মে ১৯৯৪ ও ২৪ বৈশাখ ১৪০১, ৮ মে ১৯৯৪।

১৯৯৪।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী*

## পেন্সিল-ড্রয়িং

*Seneca to Lazarus :*

You ought to weigh carefully whether your life will be the richer in pleasures if you depart with your sister to become a fanatic, in Gaul, or if you remain here in Rome, to indulge in irony and dilettantism with Nero.

Nero, my dear Lazarus, excuse my insisting on this point, is of an infinitely greater breadth of mind than your two excellent sisters, but he is, in his kind, the end of the world ; ideas enter into him as into a blind alley. Mary and Martha are two gates to the future.

The *sectarian* is assured of the esteem of humanity because he serves it. He is the channel down, which sends its message to future races, while *egotism* is only in enclosed field.

Maurice Barres
Le Jardin de Berenice.

AMARBOI.COM

আজ আমার রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়িতেছে। বছর পঞ্চাশেক আগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে ঘাড়ে ধরিয়া সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন তিনি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের হাত ধরিয়া আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এক বাঙালির ছেলে খ্রিস্টান ধর্ম ও নীতির বরফ-জল খাইয়া রায়গুণাকরের অপমান করিয়াছিল। আর এক বাঙালির ছেলে 'ফরাসী লাল মদ পান' করিয়া,— (কথাগুলি প্রমথবাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের), সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। কালের গতি কুটিলই বটে।

কিন্তু এত লেখক থাকিতে প্রমথবাবু বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রেরই অনুরাগী হইলেন কেন ? লোক বলে, মানুষ সাধারণত পরের মধ্যে নিজেকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রমথবাবুও কি ভারতচন্দ্রের মধ্যে নিজেরই ছায়া দেখিয়াছেন ? সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, 'প্রমথবাবু ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।—দুজনেই নাকি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ, দুজনেই নাকি সম্পন্ন ভূস্বামীর সন্তান, দুজনেই নাকি নানা-বিদ্যা-পারঙ্গম, ও দুজনেই নাকি যাবনী-মিশাল ভাষার পক্ষপাতী।' কথাগুলি সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। তবে একটি বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সমপন্থী হইতে না পারিয়া

* তাঁহার 'কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমথবাবু যে অতিশয় ক্ষুব্ধ, তাহা আমরা সকলেই জানি। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। যুগধর্মের ফলে প্রমথবাবুর সভাসদ হইবার স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া গেল। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। প্রমথবাবু আবার সাম্য ও বিপ্লববাদী সংবাদপত্র 'আত্মশক্তি'র একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁহার আর রাজা-উজীরের স্বপ্ন দেখিবারও অধিকার নাই। তবুও প্রমথবাবু নিজেকে আকবর বাদশাহের বিদূষক ও পারিষদ্‌রূপে কল্পনা করিয়া কল্পলোকে নিজের অপূর্ণ সাধ মিটাইতেছেন।

এই সব অতি তুচ্ছ বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। আমার বিশ্বাস প্রমথবাবুর মনের গোপন চেহারার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের মনের চেহারার একটা আদল আসে। আমিও ভারতচন্দ্রের একজন দীন ভক্ত। প্রমথবাবু দার্জিলিং-এ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছিল। সেইটুকু পড়িয়াই আমি ভারতচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতে শিখি। সে কবেকার কথা! তখনও বয়স ও বুদ্ধিতে বালক ছিলাম; তখনও শৈশবে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবলব্ধ সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই প্রমথবাবু ও ভারতচন্দ্র উভয়কেই একটু গুরুপাক মনে হইয়াছিল। এখন আর সেই বালসুলভ সরলতার বড়াই করিতে পারি না। পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসুন্দর প্রায় মুখস্থ হইয়া আসিয়াছে, চার-ইয়ারী কথাকেও আর একটা এড্‌গার অ্যালেন পো-গন্ধী দুর্বোধ্য প্রহেলিকা অথবা 'প্যারাডক্সের' ফুলঝুরি বলিয়া মনে হয় না। সোমনাথের সাধা গলায় সাধা আলাপ ও রিণীর খামখেয়ালি ঢং-এর আমেজও কাটিয়া গিয়াছে। আজ জানিয়াছি প্রমথবাবু ও ভারতচন্দ্র দুজনেই ছেঁদো কথার— persiflage-এর পসারী।

কথাটা আমি নির্ভয়ে বলিলাম। বাংলাদেশের অনেকেই হয়তো ইহাকে অমার্জনীয় অশিষ্টাচার বলিয়া গণ্য করিবেন। তা করুন। চেরাপুঞ্জী নিকটে বলিয়া আমাদের মনের আকাশেও অবিরাম বর্ষা লাগিয়া আছে। 'আত্মশক্তি', 'বাংলার কথা' ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার রোরুদ্যমান গর্জন ছাড়া আর কিছুই আমাদের মনে ধরে না। কিন্তু প্রমথবাবুকে রসিকতার ফিরিওয়ালা বলিলে তিনি রাগ করিবেন, এ-কথা মনে করিয়া তাঁহার বুদ্ধির অবমাননা করিব না। প্রমথবাবু রোদ ভালবাসেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

> "সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
> দিবানিশি যে নয়ন করে ছল্ ছল্...
> আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
> ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
> উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্ম্মম অনল
> দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি ॥"

সম্রাট নিরোর পারিষদ হইয়া রাজসভায় বসিয়া 'সরু-কাটিব', কি গল্-দেশে গিয়া মোটা গলায় ধর্ম প্রচার করিব,—মরিস্ বার্‌রেজের মতো প্রমথবাবুরও মনে যদি এই প্রশ্ন কোনও দিন জাগিয়া থাকে, তবে প্রমথবাবুর বিবেকবুদ্ধি কোন দিকে রায় দিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহেরও স্থান নাই। প্রমথবাবু বলেন, "পৃথিবীতে সব জিনিষকে আমরা দু' ভাগে বিভক্ত করি— এক বড় আর এক ছোট। বলা বাহুল্য যে, মানুষে যাকে বড় জিনিষ বলে ভক্তি করে তা নিয়ে রসিকতা করা চলে না।... এই কারণেই বড় জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অধিকার রসিকের নেই, কারণ রসিক কোন কিছুরই দোহাই দেয় না, এক মাত্র নিজের প্রকৃতির ছাড়া।" প্রমথবাবু রসিক। বড় কাজ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া স্বর্গ-লাভ করিবার দুরাশায়, বড় কাজকে উপহাস করিয়া হাতে হাতে একটু মজা লুটিয়া নিবার প্রলোভন সম্বরণ করাকে তিনি সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া মনে করেন না। তাই, 'বড় বিষয়ে কিছু লিখতে পারব না। কারণ সে অধিকারে আমি নিজের মুখের দোষেই বঞ্চিত হয়েছি',— এই স্বীকারোক্তি করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ নাই। প্রমথবাবু বুঝিতে পারিয়াছেন সাধারণ মানুষমাত্রেই ডন কুইক্‌সোট—বড় কাজ করিবার জন্য পাগল, 'উইন্‌ড্‌মিল'কে শত্রু বলিয়া ভ্রম করিয়া 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' বলিয়া হাস্যকর অভিনয়ে রত। এই বৃথা বাহ্বাস্ফোটে, এই বৃথা আস্ফালনে, এই বৃথা পরিশ্রমে গৌরব নাই, এই সার তত্ত্বটি জানিয়া প্রমথবাবু অগণিত তীর্থযাত্রীর বহু-বিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা চিরন্তন জীবনপথ ছাড়িয়া, পথিপার্শ্বের সরাইখানায় বসিয়া তাসখেলাই যথার্থ জ্ঞানীর কাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

জীবন একটা লটারি। এই লটারিতে অল্প দামের টিকিট কিনিলে লাভ অল্প বটে, কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনাও সেই অনুপাতেই সামান্য। বেশি দামের টিকিট কিনিলে এক দিনে লক্ষপতি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা যতটুকু, সর্বস্বান্ত হইবার ভয়ও তত বেশি। যাহার সাহস অপরিসীম, যাহার বিশ্বাস অবিচল, কেবল সে-ই সর্বস্ব-পণ করিয়া জীবনের জুয়াখেলায় যোগ দিতে পারে। মনুষ্যসমাজে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, দুঃসাহসী ও কাপুরুষের দ্বন্দ্ব কখনই মিটিবে না। তবে ছোট জিনিস লইয়াই যাঁহারা সুখে আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কথাটা বলিবার আছে যে, তুচ্ছ বস্তু আমাদিগকে কখনও নিরাশ করে না, কারণ আমরা তাহার কাছ হইতে যাহা প্রত্যাশা করি তাহাও অতি তুচ্ছ। প্রমথবাবু জীবনে কখনও নিরাশ হইবেন না। যশ, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি সকলেরই কাম্য বস্তু। প্রমথবাবু এ সকল জিনিস না পাইয়াও তাঁহার জীবনকে ব্যর্থ বিবেচনা করেন না। তাঁহার রচিত একটি সনেটে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— "(১) মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে, (২) হৃদয় ভাঙ্গেনি মোর কৈশোর পরশে, (৩) চাটু পটু বক্তা নহি বড় এজলাসে, (৪) উদ্ধার করিনি দেশ টানিয়া চরসে, (৫) পুত্র কন্যা হয় নাই বরষে বরষে, (৬) অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে, (৭) পয়সা করিনি আমি, (৮) পাইনি খেতাব, (৯) পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব, (১০) অন্যে কভু দিই নাই নীতি উপদেশ, (১১) চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে, (১২) বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।" তবুও— তবুও তাঁহার দুঃখ নাই, তবুও—তবুও তাঁহার সঙ্কল্প টলিবে না,—"তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।"

প্রমথবাবুর, শুধু প্রমথবাবুর কেন, সকলেরই জীবন-নাট্যে ইচ্ছামত ভূমিকা বাছিয়া লইবার অধিকার আছে। কিন্তু এই বৈদগ্ধ্যবর্জিত দেশ তাঁহার বিদূষক-ভূমিকার কদর বুঝিবে না। তিনি লিখিয়াছেন, "লেখক হিসেবে আমার নাম হয়েছে রসিক ; ফলে লেখবার বহু বিষয় আমার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।" সত্য কথা। শুধু বহু বিষয় নয়, বীরবল বলিয়া খ্যাত হওয়ার ফলে বহু পাঠকও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। নিছক রসিকতার ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক বলিয়াছেন সব জিনিসেই একটু রসিকতা থাকিলে উপভোগ্য হয় বটে, কিন্তু শুধু রসিকতা দিয়া কোন জিনিসই গড়া যায় না। প্যাস্কাল নিজে সুরসিক লেখক ছিলেন, কিন্তু রসিকতা-ব্যবসায়ীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন, "dealers in smart sayings : bad character." নেপোলিয়নেরও উপর প্রমথবাবুর একটা নিদারুণ বিদ্বেষ ছিল। নেপোলিয়ন ভদ্রতার ধার ধারিতেন না তাই তিনি এক দিন সর্বসমক্ষেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "I put


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

coquettes and intellectuals in the same class. You may mix with both. But you must not marry the one and make a minister of the other.'' কিন্তু নেপোলিয়নের রূঢ়তায় প্রমথবাবুর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না। প্যাস্কাল, নেপোলিয়ন, এ দেশের জনসাধারণ সকলেই ডন কুইক্‌সোট। তাহাদের মুখে এক বাঁধা বুলি—কাজ, আর কাজ, আর কাজ। প্রমথবাবু ইহাদের অর্থহীন লাফালাফির মূল্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, "পৃথিবীতে যে দলের লোককে man of action, ভাষান্তরে কর্ম্মী বলে তাদেরই মনে কোনও সন্দেহ নেই— আছে শুধু অটল বিশ্বাস— নিজের মতের উপর, কারণ তারা কিছু না জেনে, সব জানে...কিন্তু আমার মত অকর্ম্মণ্য লোকের মনে নানা রকম সন্দেহ কিলবিল করতে বাধ্য।" ভুলিয়াও জীবনের ফাঁদে পা দিও না, ইহাই প্রমথবাবুর বাণী। এ মন্ত্র ইতরসাধারণে বুঝিবে না। তাহাতে কি যায় আসে ? তাঁহাকে বুঝিবার জন্য লোকের যতটুকু বিদগ্ধ, কর্মবিমুখ, অবিশ্বাসী, নিরুদ্যম, আত্মপরায়ণ, চতুর, হৃদয়হীন, বিদ্বান, সুমার্জিত, বিদ্রূপ-বিলাসী, সুসভ্য হওয়া উচিত, এদেশের লোক এখনও ততটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই বলিয়া কি প্রমথবাবুর মূল্য কিছুমাত্র কমিয়া যাইবে ?

নিশ্চয়ই নয়। তবুও প্রমথবাবুর জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রমথবাবু 'পলিটিকস্, ইকনমিক্‌স্, শিক্ষা, সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম ইত্যাদি যে-কোন একটা অথবা সবকটা নিয়ে অতি গম্ভীর ও অতি রাগত ভাবে নানারূপ প্রভু-সম্মত বাণী ঘোষণা' করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি নয়। তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি ইহাই— যে এই বৈদগ্ধ্যবর্জিত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার অতি তুচ্ছ রসিকতাকেও লোকে একটা গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া ভুল করিয়া বসে। আমরা বিষবৃক্ষের ফলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বিষবৃক্ষে কি ফুল ফুটে না ? প্রমথবাবু বৈদগ্ধ্য-বিষবৃক্ষের ফুল। যে সমাজ তাঁহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিত সে সমাজ আর নাই। যে সমাজ কোনও অবস্থাতেই তাঁহাকে লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, যুগপ্রবর্তক বলিয়া ভ্রম করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিত না, সে সমাজ আজ কোথায় ? যে সমাজ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন-বিবৃত নাগরিকতার অনুরাগী প্রমথবাবু লিখিয়াছেন,

> "উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
> রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
> রণ-ক্ষত চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে,
> পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে ॥
> পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন।
> বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন ॥"

—সে সমাজ কোথায় ? বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর স্বধর্মী ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রজ্ঞ পাটলিপুত্রকদের ধূলি আজ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া দিকে দিকে উড়িতেছে। তাই যে বিদগ্ধচূড়ামণি, নগর ও উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বীর গৌরব ও মুকুটমণি হইতে পারিত, সে অদৃষ্টের ফেরে "ফিলিস্টিন"-শাসিত কলিকাতা-শহরে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্য বোঝা বহিতেছে।

আমি হিন্দুর ছেলে। অদৃষ্ট মানি। যদি নাও মানিতাম তবে আজ হইতে মানিব। মানুষের জীবন মানুষের আয়ত্তাধীন হইলে কি প্রমথবাবু এত দেখিয়া, এত শুনিয়া, এত বিশ্বাসহীন, এত জ্ঞানবৃদ্ধ, এত কর্ম-বিমুখ, এত উদাসীন হইয়াও, দেশে সবুজপত্রের উদ্ধত ধ্বজা তুলিয়া সবুজের, অবুঝের, কাঁচার, বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিতে যাইতেন ?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমথবাবুকে এই যুদ্ধে সেনাপতিপদে বৃত দেখিয়া আমরা যতটা আশ্চর্য হইয়াছি, সেন্ট্ পলের মৃত্যুর পর পেট্রোনিয়াস্কে খ্রিস্টধর্মপ্রচারের ভার গ্রহণ করিতে দেখিলেও ততটা আশ্চর্য হইতাম না। যে চক্ষুকর্ণঢাকা, পক্ক প্রবীণকে দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে দেখিয়া প্রমথবাবু তাহার দিকে সবুজপত্রের পুচ্ছ-নাচান বীরদিগকে লেলাইয়া দিয়াছিলেন, সে যে তাঁহারই আদর্শ, তাঁহারই মতো সংসারকে অসার জানিয়া উদাসীন। তবে বুঝি, কার্যসিদ্ধি করাইয়া লইবার জন্য নিয়তি তাঁহাকে ব্যর্গ্সঁ পড়াইয়াছিল। ব্যর্গ্সঁ-র আসল মত যাহাই হউক, ব্যর্গ্সঁপন্থীদের সকল জিনিস ভাঙ্গিবার ও অকারণে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইবার একটা নিরর্থক ঝোঁক আছে। তাই প্রমথবাবু সবুজ অভিযানের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান নাই। গত ১লা বৈশাখ তো তিনি তাঁহার কালি-কলমের পেশার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া লেখক হিসাবে পূর্ণবয়স্ক হইয়াছেন ; সেদিনও কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সবুজপত্রের সম্পাদক ও "আমি কেন নীরবে"র সংশয়-বিলাসী জ্ঞান-ভিক্ষু এক ব্যক্তি নয় ?

কিন্তু প্রমথবাবু জ্ঞান-ভিক্ষু, তাঁহার নামে এত বড় মিথ্যা কলঙ্ক কে রটাইল ? তিনি তো দার্শনিক ন'ন। তাঁহার "আমি কেন নীরব" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় দার্শনিকের একটি সংজ্ঞা আছে। প্রমথবাবু বলেন, কিন্তু তিনি কি বলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার আগে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিতে চাই— আমাদের মনে হয়, প্রমথবাবুর দিক হইতে এই জবাবদিহির কোনও প্রয়োজন ছিল না। লারোশ্ফুকো বলিয়াছেন, "Men never open their lips unless vanity prompts them to do so." প্রমথবাবুর ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি সভ্যতার প্রতি অনুরাগ সর্বজনবিদিত। এ কৈফিয়ৎ না দিলেও তিনি কেন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন এ সামান্য কথাটা বুঝিতে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। অবান্তর কথা থাকুক,— দার্শনিক (thinker) সম্বন্ধে প্রমথবাবু বলেন, "কাব্য কি হওয়া উচিত সে ভাবনা বৃথা ; কিন্তু কাব্য বস্তু কি এ প্রশ্ন অবশ্য জিজ্ঞাস্য। কিন্তু এই প্রশ্ন সেই জাতের লোকের মনে উদয় হয়—যাদের মনে পৃথিবীর সকল বিষয়েরই কি এবং কেন জানার প্রবৃত্তি আছে। এ শ্রেণীর লোককে আমরা ফিলজফার বলি।" বিশুদ্ধ কৌতূহল ও নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসাই যে প্রকৃত দার্শনিকের (thinker) লক্ষণ তাহা সকলেই জানে। এ-কথাটা প্যাস্কাল বলিয়াছেন, ম্যাথিউ আর্ণল্ড বলিয়াছেন, বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ ফরাসি লেখক মঁসিয় শার্ল মোর্‌রাও বলিয়াছেন। সেদিন আবার আর একজন নবীন ফরাসি সমালোচক মঁসিয় জুলিয়াঁ বাদা তাঁহার নব প্রকাশিত La Trahison des Clercs নামক গ্রন্থে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, দার্শনিকের পক্ষে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ; Absence de valeur pratique (absence of practical value)ই দার্শনিক চিন্তার বিশেষত্ব ; সুতরাং কিপ্‌লিং, উইলিয়ম জেমস্, ব্যর্গ্সঁ, মোর্‌রা, বাররেজ, দানুন্‌ৎজিও, পেগিউই প্রভৃতি সকলেই দর্শনের চক্ষে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম সকলের জন্য নয়। মোর্‌রা বলিয়াছিলেন, চিন্তাতেই মানুষের গৌরব ; যাহার চোখে এই গৌরবের শান্তরূপ ফুটিয়া উঠে নাই, সে-ই লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার স্বপ্নে বিভোর। প্রমথবাবু কি এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন ?

—না। তিনি বিশুদ্ধ কৌতূহল ও নিষ্কাম চিন্তাকে ভাল চক্ষে দেখেন না। তিনি বলেন,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধরণীকে চূর্ণ করি, জ্ঞানের বটিকা
গড়ে কিন্তু তিতো ক'রে দর্শনে বিজ্ঞানে,
সে গুলি মূর্খেতে গেলে, বুজে চোখ কানে—
জানেনা তাহার মূল্য নয় বরাটিকা।
বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া।"

একটি দৃষ্টান্ত হইতেই প্রমথবাবুর আসল ভঙ্গিটি ধরা পড়িবে। টলস্টয় সম্বন্ধে প্রমথবাবু বলেন, "তিনি একজন চরম আর্টিস্ট ; কিন্তু তিনি What is Art নামক যে বই লিখেছেন সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড রসিকতা। কারণ একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, উক্ত গ্রন্থের মতামতে তিনি বিশ্বাস করতেন।" এই তো প্রমথবাবুর প্রমথ-তম রূপ। তিনি বিচারে আলোর পক্ষপাতী, তাপ চান না। রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি রসকে তিনি অত্যন্ত স্থূল জিনিস বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু সেই প্রমথবাবু ধোঁয়া ও হাস্যরসকে সহ্য করেন কি করিয়া ? প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু রসবোধের উপরে। তাহার দৃষ্টি স্থির, অপলক, জ্বালাহীন। "I blame equally those who take sides for praising and those who are not blaming him, and those who amuse themselves with him : the only wise part is search for truth—search with many sighs."

জ্ঞানপিপাসার সার্থকতা জ্ঞানার্জনে। কিন্তু জ্ঞানার্থীরও একটা কর্মজীবন আছে। সেইখানে দশের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, একটা বোঝাপড়া করিয়া কাজ করিতে হইবে। তাই Pascal বিশ্বাসী, নাস্তিক Charles Maurras, I'Action Francaise-এর সম্পাদক ও নেতা, Anatole France সোশিয়ালিস্ট, তাই Berenice-এর উদ্যান ও Nero-র রাজসভার শোভা-মুগ্ধ Barres পরপদানত Alsace Lorraine-এর কবি ; তাই George Santayana ঘোর সংশয়বাদী হইয়াও animal faith-এ আস্থাবান। চিন্তাজগতে সংশয়-বিলাসী প্রমথবাবুর স্থান কোথায় ? তিনি কাজ চান না, তিনি জ্ঞান চান না,—তবে তিনি কি চান ? তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? তিনি চান epigram. রোমের সেনেটে তিন শত করিয়া সেনেটার থাকিত। শুনিয়াছি একবার সেনেটের বর্ণনা করিতে গিয়া, রুসো 'trois cent rois' এই কথাগুলির ধ্বনি তাঁহার কানে খারাপ শোনায় বলিয়া 'deux cent rois' লিখিয়াছিলেন। তিনশত-কে 'দুইশত' করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। প্রমথবাবুও রসিকতার খাতিরে অনেক ভেদাভেদ তুলিয়া দিতে পারেন। ছোট ও বড়র তফাৎ কি তাহা ইতরলোকের কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রমথবাবু হয়তো বলিবেন,—ছোট ও বড় ও দু' বস্তুর মধ্যে তফাৎ যথেষ্ট, কারণ ছোট ছোট, বড় বড়। কিন্তু Einstein-এর মতে সবই relative. Standard of reference ভেদে ছোট বড় দুয়েরই গুরুত্ব সমান হতে পারে ; যেমন ছোট্ ঠাকুর, বট্ ঠাকুর। —ওরে কথার ওস্তাদ্, ওরে শিশু, ওরে trifler ! বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।—

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে,
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা,
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে, যা' পাস্ তা'ই নিয়ে
হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য কথা বলিতে কি, প্রমথবাবু লেখক নহেন, প্রমথবাবু দার্শনিক নহেন, প্রমথবাবু পণ্ডিত নহেন, প্রমথবাবু সমালোচক নহেন, প্রমথবাবু যুগপ্রবর্তক নহেন,—প্রমথবাবু প্রমথবাবু। কিন্তু অরসিক দেশে পড়িয়া তাঁহার সেই সকল দুর্নাম হইয়াছে। মনোজগতে আমাদের দেশ ঘোরতর 'মেটেরিয়ালিস্ট', ভয়ানক 'প্র্যাক্‌টিক্যাল'। এদেশের লোক কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে প্রমথবাবুর বক্তব্য কিছুই নাই, ভঙ্গিই তাঁহার রচনার সর্বস্ব। বিষয়বস্তুর প্রতি প্রমথবাবুর লক্ষ্য নাই। অনেক সময়েই তাঁহার বক্তব্য কোন ইংরেজি, ফরাসি অথবা সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ বা টীকামাত্র। যে পুস্তকটির তর্জমা করিতেছেন, সেটি কোন্ শ্রেণীর সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ নজর নাই। "হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি সিরিজে" মিঃ স্ট্রেচির Landmarks of French Literature নামক পুস্তক হইতে ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে ও M. Seignobos প্রণীত Contemporary Civilisation নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক হইতে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ধারা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করার মধ্যে তাঁহার মতো পণ্ডিতের কোনও লজ্জার বিষয় আছে, এ-কথা তিনি স্বীকার করেন না। এদিকে প্রমথবাবুর মোটেই দৃষ্টি নাই। তবু যে তিনি এই সকল বিষয়ে কিছু বলিতে যান তাহার কারণ বাংলাদেশের লোকের মূর্খতা। ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে অতি কম জানিয়াও তিনি কেন বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এক শুভার্থী বন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমথবাবু বলিয়াছিলেন, "এই ভরসায়—যে আমার শ্রোতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।" ফরাসি সাহিত্য তো খুব বড় জিনিস্। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহার স্বদেশবাসীদের অজ্ঞতা দেখিয়া করুণাপরবশ প্রমথবাবু সবুজপত্রের পাঠকদের জন্য একখানি সরল শিশুপাঠ্য ভূগোল লিখিয়াছিলেন। সেদিন আবার তিনি হিন্দু সঙ্গীত প্রসঙ্গেও বলিয়াছেন, "তবে নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে হিসেবে আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে দণ্ডায়মান হয়েছি।...প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত এবং প্রাচীন মুসলমান সঙ্গীতের স্বরূপ দুই আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে অপর কেউ যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন আমার বিশ্বাস নয়।"

এই সকল উক্তি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে প্রমথবাবুর মনে কোনও অভিমান নাই। কোনও বিষয়ে লিখিতে বা বলিতে হইলে সে বিষয়টি জানার প্রয়োজন আছে এ-কথাটাও তিনি স্বীকার করেন না। প্রমথবাবু আরও এক জায়গায় বলিয়াছেন, "মনোজগতে ইউরোপের ছাড়া কাপড় পরাই আমাদের কপালে লেখা।" তবু যে তিনি লেখেন, তাহার কারণ লেখা জিনিসটা তাঁহার অতি প্রিয়। তিনি বলিয়াছেন, "বহুকাল ধরে মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করে করে ভাবরাজ্যে একপদও অগ্রসর না হলেও ভাষায় প্রকাশ করবার শক্তি তার ক্রমে বেড়ে যায়। অর্থাৎ তার পক্ষে লেখা জিনিষটে যেমন মেকানিক্যাল হয়ে আসে অর্থাৎ মনের সঙ্গে লেখার সম্পর্ক যত কমে আসে, সেই পরিমাণে অবলীলাক্রমে লিখে যেতে পারে।...গত পঁচিশ বৎসরে আমার প্রকৃতির বোধ হয় এই রকম রূপান্তর ঘটেছে।" প্রমথবাবু বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা প্রবন্ধসমূহের শিরোনামায় যে বিষয়টির উল্লেখ থাকে সেটি তাঁহার আসল বিষয় নয়। তাঁহার লেখার প্রকৃত বিষয়বস্তু যিনি, তাঁহার সহিত প্রমথবাবুর নিবিড় পরিচয় আছে। সেই কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তিটি প্রমথবাবু-ই এ-কথা বলিলে প্রমথবাবুকে অহং-সর্বস্ব বলা হয়। প্রমথবাবুর মতো বিচক্ষণ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি অহং-সর্বস্ব হইতে পারেন না। যিনি তাঁহার স্বপ্ন-জাগরণের সঙ্গী, যিনি তাঁহার সাহিত্যিকবৃত্তির প্রেরণা, যিনি তাঁহার সকল কাহিনীর নায়ক, তাঁহার সহিত প্রমথবাবু নিজেই আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি দিল্লিতে বলিয়াছিলেন, "বাঙলা দেশে আমার নিজ হাতে গড়া এবং হাত ধরা জনৈক সাহিত্যিক আছেন, যিনি এখানে এলে সম্ভবত নানাবিধ পূর্ব্বস্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে আনতে পারিনি— তিনি অনিমন্ত্রিত বলে। তাঁর নাম হচ্ছে বীরবল।"

সেদিন কি বহু শতাব্দীর পার হইতে এই revenant-এর— এই প্রেত-মূর্ত্তির—পুনরাগমন সংবাদ শুনিয়া দূর ফতেপুর শিক্রীর চির-পরিত্যক্ত বিজন হর্ম্যমালা পুলক-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ? রাজা বীরবলের প্রাসাদের ছায়াময়ী অন্তঃপুরিকারা কি গৃহস্বামীর আগমন-প্রত্যাশায় উৎসুকনেত্রে চিরাভ্যাসমত কারুকার্যখচিত বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ? দিওয়ান-ই-খাসের স্তম্ভ-সিংহাসনে উপবিষ্ট অমাত্য-বিরহ-কাতর সম্রাটের শোক-মলিন মুখে এ শুভসংবাদে কি আবার হাসি ফুটিয়াছিল ? এ সকল সংবাদ প্রমথবাবু দেন নাই। কারণ বাদশাহ তাঁহার পুরাতন পারিষদকে নূতন মূর্ত্তিতে চিনিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। প্রমথবাবু এ কার মূর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন ?—

"তিনি ডানহাতের সিগারেট বাঁ হাতে বদ্লি করে দিয়ে, অতি মোলায়েম অথচ দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ করলেন। লোকে যেমন করে গানের গলা তৈরি করে, তিনি তেমনি করে কথার গলা তৈরি করেছিলেন,— সে কণ্ঠস্বরে কর্কশতা কিম্বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তার উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে, তাঁর মুখের কথার প্রতি অক্ষর গুণে নেওয়া যেত। আমাদের এ বন্ধুটি সহজ মানুষের মত সহজভাবে কথাবার্ত্তা কইবার অভ্যাস অতি অল্প বয়সেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গোঁফ না উঠতেই চুল পেকেছিল। তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন। তাঁর অল্প কথা তিনি বল্তেন শানিয়ে আর বেশী কথা সাজিয়ে। তাঁর ভাবগতিক দেখে আমরা একটি লম্বা বক্তৃতা শোন্বার জন্যে প্রস্তুত হলুম্। অমনি আমাদের চোখ তাঁর মুখ থেকে নেমে তাঁর হাতের উপর গিয়ে পড়ল। আমরা জানতুম যে তিনি তাঁর আঙ্গুল কটিকেও তাঁর কথার সঙ্গৎ কর্তে শিখিয়েছিলেন।"—এ কে ? আবুল্ ফজল্, ফৈজি, রাজা মানসিংহ, টোডরমল্, মির্জ্জা আবদুল রহিম, তানসেন, হেকিম হুমাম, মোল্লা দোপেয়াজা,—কেহই তো এই নবাগতকে চেনে না ? তবে এ কে ?

কিন্তু প্রমথবাবু ও বীরবল, সেনাঁকুর ও ওবেরমান্, বায়রণ ও চাইল্ড্ হ্যারল্ড্, রুসো ও সেঁপ্রোকে আলাদা করিয়া দেখিবার নিষ্ফল প্রয়াস করিব না।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৩৫


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

## জের

[সম্পাদকীয় মন্তব্য]— বৈশাখ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে 'শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি প্রতিবাদ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সেইগুলি পড়িয়া এইটুকুমাত্র জানিতে পারিলাম যে, প্রবাসীর 'পাকা ডিপ্লোমাট' সম্পাদক মহাশয় নাকি প্রমথবাবু তাঁহার পত্রিকায় লেখা দেন না বলিয়া ঈর্ষা ও রাগের বশে পুত্র, কর্মচারী ও সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে প্রমথবাবুর নিন্দা করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রবাসীর সহিত 'শনিবারের চিঠি'র কি সম্পর্ক বুঝিতে পারিলাম না। তবুও স্বপক্ষে অন্য কোনও যুক্তির অভাবে প্রমথবাবু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ যদি এই কথাটা মনে করিয়াই সান্ত্বনা পান, তবে আমরা তাঁহাদের সে সুখে বাদ সাধিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে, প্রতিবাদকারীদের কাহারও এই লেখাটির অর্থবোধ হয় নাই। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে প্রমথবাবুকে সাহিত্যিক হিসাবে উড়াইয়া দিবারও চেষ্টা করা হয় নাই, তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে কোনও আক্রমণও করা হয় নাই। আমাদের লেখক ইচ্ছা করিয়াই প্রমথবাবুর রচনাসমূহের দোষ অথবা গুণের কথা উত্থাপন করেন নাই। তাঁহাকে প্রমথবাবুর literary ও philosophical personality-র বিশ্লেষণ করিতে বলা হইয়াছিল, তিনি সেইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রমথবাবুর লেখারও বিস্তৃত সমালোচনা করা হইবে, আমাদের পাঠকবর্গকে এই বিষয়ে আশ্বাস দিতেছি।

লেখকের রচনাই সমালোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু, তাঁহার মানসিক রূপ, চিন্তার ধারা ও চরিত্রের বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা যাইবে না, এ-কথাটা আমরা মানি না,— বিশেষ করিয়া প্রমথবাবুর মতো লেখকের ক্ষেত্রে। প্রমথবাবুর লেখার গুণ কি, দোষই বা কোথায়, এ সম্বন্ধে, তাঁহার 'মলাট সমালোচনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ভারত-রোমক সমিতি'র অভিভাষণ পর্যন্ত সকল রচনা যত্নের সহিত পড়িয়া আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক ও সমালোচক হিসাবে, প্রমথবাবুকে যদি উচ্চশ্রেণীর Journalist বলা যায়, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার উপর কোনও অবিচার করা হয় না। অবশ্য তাঁহার রচনার মধ্যে নিম্ন স্তরের Journalismও আছে কিন্তু মোটামুটি ভাবে এই কথাটা বলা চলে যে, তাঁহার সকল প্রবন্ধেই আমরা শিক্ষা, মার্জিত বুদ্ধি ও রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাই। প্রমথবাবু যদি তাঁহার রচনাসমূহে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, মৌলিক গবেষণা অথবা প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় না দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে কোনও সঙ্কোচের বিষয় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তিনি ইউরোপীয় যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্র পর্যন্ত অনেক বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতগুলি বিষয়ে সমান অধিকার রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কিন্তু প্রমথবাবুর যে বৈশিষ্ট্য সকলের আগে লোকের চোখে পড়ে সেটা তাঁহার রচনার গুণ অথবা দোষ নয়, তাঁহার temperament-এর বিশেষত্ব। তাঁহার সকল রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিতে পাই। এই মার্কা-মারা বিশেষত্বের একটা সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আছে তাহা আমরা মানি, সমাজবিশেষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে, তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের কালে, প্রমথবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এই উগ্র ও অবিরত আত্মপ্রকাশ ও তাঁহার intellectual frivolity শিক্ষা, সাহিত্য ও 'কালচারের' পক্ষে একটা গুরুতর অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেইজন্য আমরা সকলের আগে এই দিক হইতেই প্রমথবাবু সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াছি।

কিন্তু এখানে আমাদের পাঠকদিগকে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। যে-কোনও লেখকের চরিত্র আলোচনা করিবার অধিকার সমালোচকের থাকিলেও, আমাদের লেখক প্রমথবাবুর জীবনী লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। কারণ, প্রমথবাবুর জীবন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই জানা নাই। প্রমথবাবু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র প্রমথবাবুর রচনাসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। প্রমথবাবুর লেখায় তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই লেখক সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রমথবাবুর মনের চেহারার একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছবিমাত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি আসল প্রমথবাবুর যথাযথ প্রতিকৃতি না হইয়া থাকে তবে সে দায়িত্ব প্রমথবাবুর, আমাদের লেখকের নয়। আমাদের লেখক কোথাও প্রমথবাবুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিরপেক্ষ ও objective ভাবে প্রমথবাবু কি এবং প্রমথবাবু কি ন'ন তাহা বলিয়া দিয়া বিচারের ভার পাঠকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের একমাত্র দেখিবার বিষয়, এই চিত্র প্রমাণানুযায়ী হইয়াছে কিনা। বলা বাহুল্য, রসরচনার জন্য যতটুকু অত্যুক্তির প্রয়োজন, সেইটুকু বাদ দিয়া আমরা এই ছবিটিকে প্রমথবাবুর,—কাহারও বন্ধু, কাহারও গুরু, কাহারও বা আত্মীয় প্রমথবাবুর নয়,—সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রমথবাবুর মানসিক রূপের যথার্থ চিত্র বলিয়াই মনে করি। যদি কেহ নূতন প্রমাণের সাহায্যে প্রমথবাবুর অন্য কোনও চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন, তবে আমরাই সর্বাগ্রে আমাদের ভুল স্বীকার করিব। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে কেবলমাত্র 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ও লেখকদিগকে কটূক্তি করিলে, অথবা প্রবাসীর সম্পাদককে টানিয়া আনিলে প্রমথবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইবে না। লোক-হিসাবে অথবা সাহিত্যিক-হিসাবে প্রমথবাবুর বিচার করিতে হইলে প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহার সকল রচনাই সুলভ ও সুপ্রাপ্য। আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে প্রমথবাবুর ভক্তবৃন্দের অনেকেই যেন গুরুর রচনাবলীর সহিত পরিচিত ন'ন। তাঁহাদিগকে ইংরেজি অথবা ফরাসি সাহিত্য পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা প্রমথবাবুর রচনাগুলি পড়িয়া দেখিবেন, এই অনুরোধ কি নিতান্তই অসঙ্গত ?

পরিশেষে আমাদের মূল কথাটা আবার বলিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আমাদের লেখক তাঁহার প্রবন্ধে প্রমথবাবুর প্রতি অবিচার করেন নাই। প্রমথবাবুর শিষ্যেরাও তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কোনও তথ্যের অবতারণা করেন নাই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করি না। তবে প্রতিবাদকারীরা আমাদের লেখক যে বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই, সেই সকল বিষয়েও অনেক মতামত তাঁহার উপর আরোপ করিয়াছেন। এই কারণে আমরা তাঁহাকে সব কথা খোলসা করিয়া বলিবার সুযোগ দিতে বাধ্য হইলাম। —সম্পাদক, শনিবারের চিঠি।]

## লেখকের জবাব

আনাতোল ফ্রাঁসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাইবেলের একটি গল্প বলি। —"পরে নোহ্ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইলেন, এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। তখন কনানের পিতা হাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তাহাতে শেম ও যেফৎ বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলেন, পশ্চাদ্দিকে মুখ থাকাতে তাঁহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না। পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ অবগত হইলেন। আর তিনি কহিলেন,

কনান অভিশপ্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।

তিনি আরও কহিলেন,

শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য;
কনান তাঁহার দাস হউক।
ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুক,
আর কনান তাঁহার দাস হউক।"

(আদি পুস্তক, ৯ ; ২০—২৭।)

বাংলার কথা, ফরোয়ার্ড ও আত্মশক্তির লেখকগণের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তাঁহারা 'জোলা'র পঞ্চশিষ্যের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। প্রমথবাবু যখন ফরাসি লাল মদ পান করিয়া (কথাগুলি প্রমথবাবুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের) একটু অসম্বৃত অবস্থায় রসিকসমাজে নিজেকে উপহাসাস্পদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই ভক্তবৃন্দ বাইবেলে বর্ণিত শেম্ ও যেফতের মতো ছুটিয়া আসিয়া, তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধের* সাহায্যে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের কুরুবৃদ্ধ-পিতামহ-ভীষ্মের তুল্য প্রমথবাবুও নিশ্চয়ই ইস্রায়েল-বৃদ্ধ নোহ'র মতো কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছেন,

"'শনিবারের চিঠি' অভিশপ্ত হউক,
সে আপন 'সহযোগীদের' দাসানুদাস হইবে।
'আত্মশক্তি'র ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য ;
'শনিবারের চিঠি' তাঁহার দাস হউক।
ঈশ্বর 'বাংলার কথা'কে বিস্তীর্ণ করুক্,
'শনিবারের চিঠি' তাঁহার দাস হউক।"

* বাংলার কথা, ২২শে বৈশাখ ১৩৩৫ সন ; Forward, May 13, 1928; ও আত্মশক্তি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা প্রমথবাবুর শিষ্যবর্গের অবিচলা গুরু-ভক্তি ও 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি অবিমিশ্র ক্রোধ ছাড়া আর কিছুরই প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রমথবাবু একবার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয়কে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "[উল্লিখিত বিষয়ে] ভট্টশালী মশায় ভট্টতারও পরিচয় দেন নি, শালীনতারও পরিচয় দেন নি।" প্রমথবাবুর দেহরক্ষী মহানায়ক ও মহাপ্রতীহারগণের কাহারও নামের পিছনে ভট্টশালী পদবী দেখিলাম না, তাই তাঁহাদের নিকট হইতে ভট্টতা ও শালীনতার দাবি করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও পদবী যদি ভট্টশালী হইত, তবে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতাম, ইঁহারা নিজেদিগকে ভট্টশালী বলিয়া প্রচার করিলেও ইঁহাদের কাহারও মধ্যে ভট্টতা ও শালীনতার আভাস মাত্রও পাইলাম না।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'আত্মশক্তি'তে যিনি প্রমথবাবুর হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমাকে "অগণিত তীর্থযাত্রীর বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা চিরন্তন জীবনপথ", এই কয়টি কথার জন্য বড়ই নাকাল করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এত অল্প পরিসরে এতগুলি mixed metaphor-এর আমদানী সেক্‌স্‌পীয়ারেও দুর্ল্লভ।" শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার মতো বিদ্যা আমার নাই, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রে যদি এই দোষ একান্ত দুর্লভ হয়, তবে রবীন্দ্রনাথে এই দোষ অত্যন্ত সুলভ বলিতে হইবে, কারণ উপরের কথা কয়টি রবীন্দ্রনাথের। আমি এই কথাগুলিকে কোটেশন মার্কার মধ্যেই দিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার মনে সমালোচকদের বিদ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার একটা কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠাতে কোটেশন মার্কা আর দিই নাই। কিন্তু কেহ এই ফাঁদে এত সহজে পা দিবেন, এ দুরাশা আমি স্বপ্নেও করি নাই। 'আত্মশক্তি'র লেখক ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি সভ্যতার অনুরাগী প্রমথবাবুর ওকালতি করিতে গিয়া ফরাসি লেখক মরিস্ বার্‌রেজটি কে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সম্রাট নিরোর সময়ে রোমান্ সাম্রাজ্যের কতটুকু বিস্তার ছিল তাহা না জানিয়া সে সম্বন্ধে রসিকতা করিতে যান, অথবা 'ছেঁদো কথা' এই শব্দটির অর্থ জানেন না, সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। কারণ, বার্‌রেজ আনাতোল ফ্রাঁসের সমকক্ষ লেখক হইলেও তাঁহার কোনও বই-ই ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত রোমের ইতিহাস ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাঠ্য হইলেও ছেলেরা সম্রাটদের কথা পড়ে না। তৃতীয়ত 'বাংলার কথা' ও 'আত্মশক্তি'র লেখকগণের মুখে আমরা বাংলাভাষা শুনিবার আশা করি না। কিন্তু একজন শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত পরিচিত নহেন অথচ সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত, এ-কথাটা যে সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আত্মশক্তির লেখক কি সত্যই বলিতে চান তিনি লিপিকার ২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটি পড়েন নাই,—"দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদ-চিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা,— ?" না, তিনি ছলনা করিতেছেন ? লীলাময় প্রমথবাবুর লীলাময় শিষ্যদের দ্বারা সবই সম্ভব।

এখন শালীনতার সম্বন্ধে কিছু বলি। বিদগ্ধ-চূড়ামণি প্রমথবাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বাংলার কথায় সুরগুরু বৃহস্পতি লিখিয়াছেন, "তিনি (প্রমথবাবু) দিলীপের গানের প্রশংসাপত্র ছাপাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, অথচ শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় আজ চারি বৎসর ধরিয়া গোপেশ্বরবাবুর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আলাপ শিক্ষা করিতেছেন এবং প্রবাসী আফিসে প্রতি শুক্রবার জল্‌সা অধিবেশনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় European Costume-এ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্রুপদ আলাপ করেন, প্রমথবাবুর যাওয়া ত দূরের কথা তাহার সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন নাই।...প্রমথবাবু নজীর দেখাইয়া জিতিতে পারিবেন না, কারণ শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয় তার কৃশ শরীরকে কৃশতর করিয়া Thacker Sprink (*sic*) হইতে catalogue আনিয়া মুখস্থ করিতে বসিয়াছেন। চিন্তার সম্পদ তাহার না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার cram করিবার শক্তি নাই, এই দুর্নাম তাহাকে কেউ দিতে পারিবে না।" হায় শনিবারের চিঠির কৃশকায় সম্পাদক! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি অবশেষে তোমাকে করিতে হইল? কিন্তু সুরুচির নাম করিয়া তোমার আপত্তি করিবার অধিকারটুকুও নাই!

[স্বগত— পাঠকগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন আমার এই স্বগত উক্তিগুলিকে আমার লেখার অঙ্গ বলিয়া না ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে আমার মনের মধ্যে যে সকল অপ্রকাশ্য ভাব জাগিয়াছে, এইগুলি তাহারই আভাসমাত্র। (স্বগত)

"অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্‌নি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। কিন্তু আমি চিরাভ্যাস বশতঃ এম্‌নি মজা করিয়া এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি। তাহার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশ ছাড়া করিল।"]

ভদ্রতা ও শালীনতা লইয়া মিথ্যা ঝগড়া করিব না। কিন্তু প্রমথবাবু বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের পুরোহিত। তাঁহার পক্ষ-সমর্থন কি বাংলা ভাষায়ই হওয়া উচিত নয়? প্রমথবাবু সম্বন্ধে 'বাংলার কথা'য় শ্রীবৃহস্পতি লিখিয়াছেন, "যৌবনের উজ্জ্বল খরস্রোতে সংশয় ও বিঘ্নের মাঝে অবমানিত মনুষ্যের কাছে তাঁহার এক মাত্র দর্শন Rationalism। এই Rationalism-এর জন্ম ছিল সন্দেহে প্রগতি ছিল মুক্তিতে, পরিণতি ছিল বিশ্বাসে।" ইহা নিশ্চয়ই বাংলা নয়! তবে কি ইহা সুরগুরুর মাতৃভাষা? না 'বাংলার কথা'র লেখক বিপরীতলক্ষণায় এই নাম ধারণ করিয়াছেন? দেবগুরুর ভাষা যতই পড়িতেছি ততই মুগ্ধ হইতেছি। "তিনি এই গম্ভীর জীবনকে গম্ভীরভাবে দেখেন নাই,..."— এ কোন্ ভাষা? "তিনি বিশ্বাস করেন যে, আজ ভারতবর্ষের নবজাগরণ হইল বাংলার জাগরণেরই অপর দিক্।..."—ইহাই বা কোন্ ভাষা? "কিন্তু তাঁহারা বুঝিলেন না যে এবম্বিধ বিদ্রূপ হইল চিৎ হইয়া থুথু ফেলার মত, তাতে পার্শ্বস্থ লোকের অসুবিধা হইলেও নিজেরই মূর্খতা প্রমাণ করে!"—এই গালিটিই বা কোন্ ভাষায় লেখা?

এতক্ষণে বুঝিলাম! প্রমথবাবু সবুজপত্রে যে ভাষা-বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ বাংলার কথা ও আত্মশক্তির পৃষ্ঠায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। সবুজপত্র সবুজকে, অবুঝকে পুচ্ছটি উচ্চে তুলিয়া নাচিতে আহ্বান করিয়াছিল, তাই আজ প্রমথবাবুর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্য বলিতেছেন, "ধর্ম্ম ও নীতিবাগীশ বাঙ্গালীকে তিনি (প্রমথবাবু) বিদ্রোহের মন্ত্র শিখাইয়াছেন,...স্বাধীন চিন্তাকে তিনি **প্রশ্রয়** দিয়াছেন... বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে **স্বপ্ন** দেখাইয়াছেন— রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে **মুখর** (বাচাল নয়, vocal) করিয়াছেন।" সত্যই তো ! প্রমথবাবু যদি স্বাধীন চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিতেন, রবীন্দ্রনাথ যদি বাঙালিকে মুখর না করিতেন, তবে কি আমরা এই ভাষায়, এইরূপ যুক্তিতে প্রমথবাবুর ওকালতি শুনিতে পাইতাম ?

কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? আমাদের দোষ কোথায় ? আমাদেরও তো, "ব্যর্গসঁপন্থীদের সকল জিনিস ভাঙ্গিবার ও অকারণে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইবার একটা নিরর্থক ঝোঁক আছে। তাই প্রমথবাবু সবুজ-অভিযানের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান নাই।"—এই কথাটাই বলিয়াছিলাম। দুর্বোধ ভাষার বাধা অতিক্রম করিয়া প্রমথবাবুর শিষ্যদের বক্তব্য যতটুকু বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে মনে হইল তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের কোনও পার্থক্য নাই। আমরা লিখিয়াছিলাম প্রমথবাবুকে "বুঝিবার জন্য লোকের যতটুকু চতুর, হৃদয়হীন...বিদ্রূপ-বিলাসী হওয়া উচিত, এ দেশের লোক এখনও ততটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই বলিয়া কি প্রমথবাবুর মূল্য কিছুমাত্র কমিয়া যাইবে ?" প্রমথবাবুর শিষ্যও লিখিয়াছেন, "তিনি রসিক ও মর্ম্মী ( ?), তিনি পঙ্গু মানুষকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনি দুর্ব্বলকে ঠাট্টা করিয়াছেন, সবল ও তাজা প্রাণকে শ্রদ্ধা করেন।" ঠিক কথা ! প্রমথবাবু যে দুর্বল ও অসহায়কেই আক্রমণ করেন ও সবলকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলেন, তাহা আমাদেরও একবার মনে হইয়াছিল, শুধু এত খোলাখুলি ভাবে বলিতে পারি নাই। আবার দেখুন, আমরা লিখিয়াছিলাম, "সে সমাজ কোথায় ? বড় দেরি হইয়া গিয়াছে ! প্রমথবাবুর স্বধর্মী ধর্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রজ্ঞ পাটলিপুত্রিকদের ধূলি আজ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া দিকে দিকে উড়িতেছে। তাই যে বিদগ্ধচূড়ামণি, নগর ও উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বীর গৌরব ও মুকুটমণি হইতে পারিত"— ইত্যাদি। প্রমথবাবুর শিষ্যও লিখিয়াছেন, "জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে, জীর্ণ মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে, পচা ও পূতিগন্ধময় সমাজের বিরুদ্ধে প্রমথবাবুর ছিল **অভিসার**" !! ছি, শিষ্য, ছি ! গুরুর অভিসারের কথা কি ঘোষণা করিতে আছে ? অভিসার ? প্রমথবাবুর অভিসার ! কোথায়, কাহার উদ্দেশে ?...

[স্বগত—পাঠকদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমার এই স্বগত উক্তিগুলিকে আমার লেখার অঙ্গ বলিয়া না ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে আমার মনের মধ্যে যে সকল অপ্রকাশ্য ভাব জাগিয়াছে, এইগুলি তাহারই আভাসমাত্র। (স্বগত)

গুর্জরীরাগেণ একতালীতালেন গীয়তে ॥

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ ১ ॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
গোপীপীনপয়োধরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ধ্রুবম্ ॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্। ধীর ॥ ৩ ॥
মুখরমধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিসুলোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্। ধীর ॥ ৪ ॥]


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম আমাদের কি দোষ ? প্রমথবাবুর ভক্তবৃন্দ ও আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ কোথায় ? তাঁহারা যে কথাটা বিশুদ্ধ বাংলায় বলিতে পারিতেছেন না, আমরা সেই কথাটাই বলিয়াছিলাম। তবে কি সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই তাঁহারা আমাদের উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ? নহিলে তাঁহারা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শেয়াল বলিয়া গালি দিতেছেন কেন ? "বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক একজন পাকা ডিপ্লোমেট। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের লেখকদের লেখা যে কিছু নয়—তাহা প্রচার করবার জন্য ছোক্‌রার দল নিয়োগ করেছেন। ছেলেরা যদি ওই করে প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের ক্ষতি করতে পারে, তা হ'লে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের লাভের কারণ আছে অথচ কাদা ছোড়বার জন্য দুর্নামের আশঙ্কা নেই" এই কথাটাই বলিতেছেন কেন ? তাচ্ছিল্যের ছদ্ম-হাসি হাসিয়া,— "কলম ধরার পর থেকে আজ অবধি অনেক মূর্খই তাঁর [প্রমথবাবুর] সম্বন্ধে অনেক কটুকথা বলেছে, প্রমথবাবু সে-সব শুনেছেন আর হেসেছেন। তাঁর সে হাসি মূর্খদের অপ্রতিভ করেছে এবং এখনও কর্‌ছে।" —মনকে এই প্রবোধই বা দিতেছেন কেন ?

[স্বগত— পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন আমার এই স্বগত উক্তিগুলিকে আমার লেখার অঙ্গ বলিয়া না ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে আমার মনের মধ্যে যে সকল অপ্রকাশ্য ভাব জাগিয়াছে এইগুলি তাহারই আভাসমাত্র। (স্বগত)

দ্বারী কহে একি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতী ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবা হরকরা ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর ॥
সবিনয়ে দ্বারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া যোড় পরা বিদেশী হেতের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥]

AMARBOI.COM

প্রমথবাবুর হাসি দেখিয়া আমরা অপ্রতিভ না হইলেও তৃপ্ত হইলাম। তাঁহার শিষ্যগণ গুরুর যে উপকার করিলেন তাহার দাম হয় না। তাঁহারাও অবশ্য এই সামান্য কাজটুকুর জন্য টাকার প্রত্যাশা করেন নাই। দেখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন, "আমরা প্রমথবাবুর দুঃখে দুঃখী এবং তাঁহার সুবিধার জন্য charge-sheet এখানে জানাইয়া দিলাম। জুনিয়ারী করার ফি চার্জ্জ করিলাম না কারণ তিনিও আইন-ব্যবসায়ী।" প্রমথবাবু এমন 'এটিকেট্' দুরস্ত উকিল পাইয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান ! তবুও বলিব, তাঁহার শিষ্য-ভাগ্য ভাল নয়। তাঁহার শিষ্যেরা শুধু গুরুকে মানেন, গুরুর ঠাকুরকে মানেন না। আমরা প্রমথবাবুকে সকল বিষয়ে মানিতে পারি নাই বটে, কিন্তু প্রমথবাবুর দেবতার উপর আমাদের ভক্তি আছে। প্রমথবাবু বলিয়াছিলেন, "আমার মত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকর্ম্মণ্য লোকের মনে নানা সন্দেহ কিল্‌বিল্‌ করতে বাধ্য।" তাঁহার মনে সকল বিষয়েই সন্দেহ জাগিয়াছিল, শুধু নিজের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ জাগে নাই। আমাদের মন এই অটল, অবিচল, স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সম্বন্ধেও সন্দেহপরায়ণ। আত্মশক্তির লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, "এতকাল চৌধুরী মহাশয় [প্রমথবাবু] নানা লেখক লইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, প্রবন্ধকার [শনিবারের চিঠির লেখক] সেই বিদ্যাই চৌধুরী মহাশয়ের উপর প্রয়োগ করিতে চান।"—কিন্তু আমরা প্রমথবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছি এ-কথা প্রমথ-শিষ্যেরা বলিলেন কি করিয়া ?

অগণিত ক্ষুদ্র প্রমথগণের ক্ষুণ্ণ গুরুভক্তির উচ্ছ্বাস শুনিতেছি, "প্রমথবাবু উদার-পন্থী...সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে তিনি কখনও ক্ষুব্ধ (?) হন নাই।...সত্যকে তিনি হয়তো অনেক সময় অপ্রিয় করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য মিথ্যার সঙ্গে তিনি রফা করেন নাই...রবীন্দ্রসাহিত্য প্রমথবাবুর কাছে যথেষ্ট ঋণী" !!! আর একজন বলিতেছেন, "শ্রী প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আসল রূপ কি, বাংলাভাষার ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার নিজস্ব (?) দান কি ধরণের, বিদ্যামণ্ডলীতে তাঁহার স্থান কোথায়, এই প্রবন্ধে সেই সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতাও বাংলা দেশের কম লেখকের আছে।" তাই তো! শ্রীপ্রমথবাবুকে লইয়া আলোচনা করিবার সময়ে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলেই নারী। কিন্তু প্রমথবাবুর ভক্তবৃন্দ আশ্বস্ত হউন। তাঁহারা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, আমরা তর্ক করিতে গিয়া তাঁহাকে শুধু হারাইয়াছি।

AMARBOI.COM

[স্বগত—পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমার এই স্বগত উক্তিগুলিকে আমার লেখার অঙ্গ বলিয়া যেন মনে না করেন। প্রসঙ্গক্রমে আমার মনের মধ্যে যে সকল অপ্রকাশ্যভাব জাগিয়াছে এইগুলি তাহারই আভাসমাত্র।

(স্বগত) "And the same time there arose no small stir about that way. For a certain man named Demetrius...called together with the workmen of like occupation and said, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods,—And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is the Diana of the Ephesians. And the whole city was filled with confusion...all with one voice about the space of two hours cried out, Great is the Diana of the Ephesians...And when the townclerk had appeased the people he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter? Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.]

আর নয়! প্রমথবাবুর শিষ্যমণ্ডলীর ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রমথ-তাণ্ডব একটু থামিয়াছে কি ? আমি শুধু আর একটি কথা বলিয়া বিদায় লইতে চাই। প্রমথবাবু একবার ব্রাহ্মণমহাসভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কালীঘাটে সম্প্রতি বাংলার মহা-ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে মহাগর্জ্জন করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। কেননা গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হবে না ; কিন্তু লজ্জিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে— বহু আরম্ভে লঘুক্রিয়া, অজাযুদ্ধেই শোভা পায়। মানুষে ওরূপ ব্যবহার করলে, মানুষের তাতে হাসিও পায়—কান্নাও পায়।" আমরাও প্রমথবাবুর প্রতিধ্বনি করিয়া বলি, "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে প্রমথবাবুর মহাশিষ্যমণ্ডলী যে মহাগর্জ্জন করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কেননা সে গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হবে না ; কিন্তু লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে— বহু আরম্ভে লঘুক্রিয়া, অজাযুদ্ধেই শোভা পায়। মানুষে ওরূপ ব্যবহার করলে, মানুষের তাতে হাসিও পায়—কান্নাও পায়।"

শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য

আমি কেন পড়ি এবং কেন পড়ি না—এই প্রশ্ন দু'টির উত্তর দেবার আগে আমার আর একটা কথা বলিবার আছে, উহা এই : আমার সম্বন্ধে দেশীয় মত ও বিদেশীয় মতের মধ্যে একটা আমূল পার্থক্য আছে।

## দেশী ও বিদেশী বিচার

প্রথমে বিদেশীয় অভিমতের পরিচয় দিব। গত বৎসরের শেষের দিকে লন্ডনের 'সানডে-টেলিগ্রাফ'-এর সাহিত্যিক পরিচালিকা মিসেস গ্রোস্ আমাকে জানান যে, তিনি আটজন সমসাময়িক মনীষীকে একটা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতে অনুরোধ করিতেছেন, এবং ইঁহাদের একজন আমি। এইটুকু পর্যন্ত আমার বক্তব্য শুনিয়াই বাঙালি পণ্ডিতেরা (অধ্যাপক, সাহিত্য-সমালোচক শ্রেণীর) ভাবিবেন, নিশ্চয়ই প্রবন্ধটা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কিছু, নহিলে উন্মাদ বা মূর্খ না হইলে কেহ কি নীরদ চৌধুরীকে লিখিতে অনুরোধ করিতে পারে ? তাঁহাদের অনুমান কিন্তু ঠিক হইবে না, কারণ বিষয়টা একেবারে স্বতন্ত্র। যখন প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইল, উহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এই শিরোনামা দেওয়া হইয়াছিল,—

'CLASSICS OF OUR TIME'

What are the most significant books to be published since the War ? To begin the year we asked eight distinguished writers and thinkers to name five or six works which they believe to have been the greatest and most influential over the last half century. (The Sunday Telegraph, 2 January, 1994)

যাঁহাদেরকে অভিমত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল তাঁহাদের নাম দিতেছি—

(1) Max Perutz (chemist, Nobel Prize, 1962) ; (2) Muriel Spark (novelist) ; (3) Hugh Trevor-Roper (Lord Dacre, historian) ; (4) Isaiah Berlin (historian of ideas) ; (5) Anthony Powell (novelist) ; (6) Doris Lessing (novelist) ; (7) Stephen Spender (poet, novelist, critic) ; (8) Nirad Chaudhuri (author, aged 96).

আমি কিন্তু প্রবন্ধ লিখিতে সম্মত হই নাই। এ বিষয়ে আমি এই চিঠি লিখিয়াছিলাম,

Dear Literary Editor,

I feel it a great honour to be asked to contribute to the feature you have in nind. However, the stark fact is that I do not deserve it, for I have not read a *single book* published since 1945, except some biographies, and military and political histories bearing on my own



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

writings.

I have indeed kept in touch with current publications through reviews in newspapers and journals, but, *entre nous,* not one book has seemed to me to be of any value in helping a man to orient himself in the contemporary human situation. The reason is that our times have become dogmatic, and historical awareness has disappeared. No one can understand a contemporary situation who is a slave to the present. Today, I find St. Augustine with his two great books to be more relevant to our existence than any book by a contemporary author.

Thanking you, though, I remain very sincerely yours.

Nirad C. Chaudhuri

ইহা প্রকাশ করিয়া 'লিটারারি এডিটর' এইটি যোগ করিয়াছিলেন, 'Published with the author's permission.' কেন এই কৈফিয়ৎ দিলেন, বলিতেছি।

তিনি চিঠিটা পাওয়ামাত্র টেলিফোনে আমার পত্নীকে জানাইলেন যে, চিঠিটা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছে যে, তিনি উহা ছাপাইবেন, এবং যে পারিশ্রমিক ইহার জন্য দিবেন, তাহা প্রবন্ধের জন্য যাহা হইত তাহাই হইবে। আমার পত্নী চিঠির জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু মিসেস গ্রোস্ হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাহা হইতেই পারে না। পারিশ্রমিক আসিল, এদেশের হিসাবেও কম নয়। তাও একটা ছোট চিঠির জন্য।

ইহার পর, দেশে এইরূপ একটা চিঠির ফল কি হইত বলি। বাঙালি পণ্ডিতেরা আমার স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া অপমানসূচক উত্তর দিতেন। আমার বন্ধু বিভূতিভূষণ বিরক্ত হইলে যাহা বলিতেন হয়তো সেইরূপ উক্তিই করিতেন—'মুখে ঝ্যাঁটা মার! ঝ্যাঁটা মার!'

আমার সম্বন্ধে বিদেশী ও দেশীয় পণ্ডিতদের বিচারের এইরূপ পার্থক্য কেন হইল তাহা প্রণিধানের বিষয়। ভদ্রতা রাখিয়া ইহার উত্তর দিতে পারিব না। কি পড়া যায়, কি পড়া যায় না—এ-বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লর্ড চেস্টারফিলড্ বলিয়াছিলেন, 'Let blockheads read what blockheads wrote.' আমি কিন্তু এই অবজ্ঞা সর্বাংশে ন্যায্য মনে করি না। সব দেশে ও সব যুগেই উচ্চতম সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অতি নিম্নস্তরের লেখাও প্রকাশিত হইয়াছে। কোনও যুগে কেবল উৎকৃষ্ট সাহিত্য দেখা গিয়াছে, অন্য যুগে কেবল নিকৃষ্ট সাহিত্য, এই কথা কখনও বলা চলে না। সাহিত্যসৃষ্টিতে আবহমান কাল ধরিয়া একটা দ্বিত্ব দেখা গিয়াছে। কখনও, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

## বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সাহিত্যিক বিচারে যে একটা দ্বিত্ব ছিল তাহা দেখাইবার জন্য ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত 'লোকরহস্য'-এ একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম দিয়াছিলেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর'। উহা কথোপকথন আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেজন্য কাহাদের মধ্যে কথাবার্তা তাহার পরিচয় এইভাবে দিয়াছিলেন,—

Dramatis Personae

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালি বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

'উচ্চ' পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পড় ?' ভার্য্যা উত্তর দিলেন, 'যা পড়িতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।'

তর্ক এইভাবে চলিল,—

উচ্চ—ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন ?...

ভার্য্যা—তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

(ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা—ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই—তোমার ইংরেজরাও তত করে না। ইংরেজরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ—ক্ষেপেছ ?

ভার্য্যা—কেন ?

উচ্চ—বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা ? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায় ? বইখানা seditious ত নয় ? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা ?

ভার্য্যা—বিষবৃক্ষ।

উচ্চ—সে কাকে বলে ?

ভার্য্যা—বিষ কাহাকে বলে জান না ? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ—বিষ—এক কুড়ি ?

ভার্য্যা—তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না ? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব।

উচ্চ—ওহো! Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল! ফেল!

ভার্য্যা—এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি ?

উচ্চ—Tree.

ভার্য্যা—এখন দুটা কথা এক করে দেখি।

উচ্চ—Poison Tree! ওহো! বটে বটে! Poison Tree বলিয়া একখানা ইংরেজি বই-এর কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বই-এর তরজমা ?

ভার্য্যা—তোমার বোধ হয় কি ?

উচ্চ—আমার idea ছিল যে Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন ?

ভার্য্যা তখন ইংরেজি হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত একখানা বই স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'এর নাম "ছায়াময়ী"।' স্বামী হাতে লইয়া বলিলেন, 'Dante, by Jove!' ভার্য্যা টিপিটিপি হাসিয়া বলিলেন, 'তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না। পোড়া কপাল বাঙ্গালীর মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে ?'

তখন স্বামী বলিলেন, 'তার আর আশ্চর্য কি ? Dante lived in the fourteenth century.' দান্তে সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতার পর স্বামী একটা বাংলা বই পড়িতে স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, 'Yes, for *thy* sake, my jewel, I shall do it.'

ইহার পর পত্নী 'বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক' স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন, স্বামীও আদ্যোপান্ত পড়িলেন। পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন বই ?' স্বামী উত্তর দিলেন, 'বেড়ে! বাঙ্গলায় যে এমন বই হয়, তা আমি

জানিতাম না।'

ইংরেজিতে লিখিত ও বাংলায় লিখিত বই-এর বিচারে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির রুচি ও বিচারের ব্যতিক্রম এই রকম হয়, তাহা আমিও লক্ষ্য করিয়াছি। যে ব্যক্তি দু'মিনিট আগে টমাস হার্ডিরও কঠিন সমালোচনা করিতেছিলেন তিনি একটা বাংলা বই-এর নাম করিবামাত্র তরতর করিয়া জলের মতো নীচের দিকে নামিলেন—ইহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

শরৎচন্দ্রও এই দ্বিত্বের কথা একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। উহা এইরূপ,—

'আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি ছোটগল্প আছে, তার Plot-টা সংক্ষেপে এইরূপ—নায়ক একজন বড় লোক জমিদার। Hero, অতএব, হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তাঁর একটা মস্তবড় বাড়ি আছে; ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখো টাকা। এক তারিখে বাড়িটা মাসখানেকের জন্য একজন ভাড়া নিলে। বাড়িওয়ালা জমিদার ত পাশের বাড়িতেই থাকেন, হঠাৎ একদিন রাত্রে ওই বাড়িটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। দিন-দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়িটার মধ্যে ভ্রূণহত্যা [abortion] হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়ি ভাড়া না দিয়েই পালিয়েছে। তাদের ঠিকানা জানা নেই, পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব, তাই তিনি হুকুম দিলেন, বাড়িটা ভেঙেচুরে মাঠ করে দাও। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে অতবড় লাখো টাকার বাড়ি ভেঙে মাঠ হয়ে গেল।

গল্প এইখানেই সমাপ্ত হল। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন English-এর প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে অশ্রু নেত্রে বারবার বলতে লাগলেন, জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই এবং এমন গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।'

(১৩৩১ সনের ১০ই আশ্বিন তারিখে একটি সাহিত্য সভায় সভাপতিপদে শরৎচন্দ্রের উক্তি।)

এই দ্বিত্বের তাৎপর্য এই। ইংরেজির প্রবীণ অধ্যাপক যখন ইংরেজি সাহিত্য পড়েন ও পড়ান তখন তিনি অক্সিজেনের মুখোস পরিয়া হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, কিন্তু সেখানে তাড়াতাড়ি শৃঙ্গ আরোহণের জয়পতাকা বরফে প্রোথিত করিয়া নীচের তরাই-এ নামিয়া আসেন, যেখানের জলাতে ও বনবাদাড়ে বাঙালি জীবনের চিরন্তন লাম্পট্য ও কুসংস্কারের মধ্যে নিঃশ্বাসের বায়ু পাইয়া প্রকৃতিস্থ হন। 'য স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।' সংস্কৃত বুকনির বাকিটুকু শালীনতা ও ভদ্রতার খাতিরে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

আমার মধ্যে এই একান্ত নিজস্ব বাঙালি দ্বিত্ব নাই, সেজন্য কোনও বাঙালি পণ্ডিতই আমাকে স্বজাতীয় মনে করিতে পারেন না, আমাকে স্বভাবতই অপাংক্তেয় করেন। ইহা তাঁহাদের দিক হইতে একেবারেই অস্বাভাবিক আচরণ নয়। যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করিতে পারে যে, সে ১৯৪৫ সন হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজি বই-ই পড়ে নাই—Somerset Maugham নয়, Orwell নয়, Hemingway নয়, Graham Greene পর্যন্ত নয়, সে বাংলা ভাষায় লিখিত আধুনিক সাহিত্যের সংবাদ লইবে না, ইহাই ধরিয়া লওয়া যায়। তবে বাংলা বই না-পড়া আরও নিন্দনীয় এজন্য যে এই আচরণ বাঙালির পক্ষে স্বাভাবিক নয়; কারণ তাহার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র এই,—

'দেশের কুকুর ধরি।
বিদেশের ঠাকুর ছাড়িয়া॥'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে এদেশের সাহিত্য পড়িবার জন্য 'কুকুর' ধরিতে হইবে এই প্রশ্নই উঠে না। বাংলা সাহিত্য পড়িলে 'ঠাকুর'ই ধরা হইবে, বাংলা ভাষাতে তো প্রবাদই রহিয়াছে, 'আমাদের ছেলেটি, নাচে যেন ঠাকুরটি ; ও-বাড়ির ছেলেটা, নাচে যেন বাঁদরটা।' তবে বাঙালি পণ্ডিতেরা আধুনিক ইংরেজি লেখককে বাঁদর বলিবেন এইরূপ সাহস তাঁহাদের নাই। তাঁহারা শুধু বলিবেন, ইংরেজ লেখক 'ঠাকুর', কিন্তু বাঙ্গালি লেখক 'বাপের ঠাকুর!'

এইরূপ সাহিত্যও আমি পড়ি নাই, তাহা অমার্জনীয় অপরাধ। তবে কেন পড়ি নাই ও পড়ি না, উহার জবাবদিহি সবিস্তারে করিব।

## প্রথম কারণ—শক্তির অল্পতা ও সময়ের অভাব

আমি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাংলা, ফরাসি, ও ইংরেজি ভাষায় নূতন যাহা কিছু প্রকাশিত হইত তাহার সংবাদ রাখিতাম, ও যে-বইগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইত সেগুলি পড়িতাম ; ইংরেজিতে অনূদিত এই ধরনের বই অন্য ইউরোপীয় ভাষার হইলেও পড়িতাম। এইভাবে ফ্যাশনেব্‌ল হইবার প্রয়াস সকল শিক্ষিত বাঙালি যুবকের মধ্যেই দেখা যাইত। এই ঝোঁককে বিদ্রূপ করিয়া একজন রসিক বাঙালি লিখিয়াছিলেন,

'পড় নাই হপ্তমান (Hauptmann)
কিংবা সুধর্মান (Sudermann)
কাব্যের স্বধর্ম বঙ্গে তাই হতমান।'

আমারও এই ঝোঁকটা ছিল। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পার হইবার পর দেখিলাম উহা আর সম্ভব নয়। আমি নিজে তখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার জন্য পড়াশোনা করা দরকার। সুতরাং পড়িবার সময় কমিয়া গেল। তাহার উপর আর একটা সম্ভাবনার কথাও মনে জাগিল—নূতন বই যদি পড়িতে থাকি তাহা হইলে অনেকগুলি পাঠযোগ্য মনে নাও হইতে পারে। যদি দু-চারটা উৎকৃষ্ট মনে হয়, তবে দশটা-বিশটা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে—এই অবস্থায় একটা ভাল বই পাইবার প্রত্যাশায় কি নয়টা বাজে বই পড়িবার জন্য সময় ব্যয় করিতে পারি?

পক্ষান্তরে যুগে যুগে নানা ভাষায় লিখিত যে-সব বই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলি পড়িলে সময় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার অল্প বয়সে সারা পৃথিবীতে যত বিখ্যাত বই লিখিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে 'Hundred Best Books'-এর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার একটি লর্ড অ্যাক্টনের নির্বাচিত, অপরটি স্যর জন লাবকের (Lord Avebury-র) নির্বাচিত। আমি দুইটি তালিকাই দেখিয়াছিলাম। স্যর জন ল্যাবকের নির্বাচিত বই-এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা ইত্যাদির ইংরেজি অনুবাদ ছিল।

এই সব আলোচনা পড়িয়া স্থির করিলাম পূর্বেকার যে-সব শ্রেষ্ঠ বই মূলে পড়িতে পারি, মূলেই পড়িব, নহিলে অনুবাদে পড়িব। কি বই পড়িব তাহা স্থির করিবার জন্য বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসনের লেখা 'Choice of Books' বলিয়া আলোচনাও পড়িলাম। এই সব বই-এর দ্বারাই পরজীবনে আমার শখের পড়াশোনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইহাও স্থির করিলাম, যে-সকল বই-এ আমি গভীর চিন্তা বা অনুভূতি পাইব, সেগুলি বারবার পড়িব, উহাতে আমার সাহিত্যিক বিচারের ক্ষমতা বাড়িবে।

এই রীতি অনুসরণ করিয়া শুধু ফরাসি সাহিত্যের ব্যাপারেই কি করিলাম তাহা বলি। আমি ১৯২৩ সনেই ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি রঁসারের সাত ভলুম গ্রন্থাবলী কিনিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এইভাবে বোদলেয়ারের Les Fleurs du Mal পর্যন্ত পৌঁছিলাম। ইহার পর শুধু Paul Valery-র কাব্য পড়িয়াছি, Paul Claudel পড়ি নাই, St. Jean Perseও পড়ি নাই, যদিও উঁহারা অতি উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার ও কবি বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমি ইংরেজি, ফরাসি, বাংলা এই সবগুলি ভাষাতে লিখিত সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে সমবিচার করিয়াছি। কেবল সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেই অবহেলা দেখাই নাই।

তবে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বিভূতিবাবু তাঁহার 'পথের পাঁচালি'র সাত আট পৃষ্ঠা লিখিয়াই আমাকে পড়িয়া শোনান, এবং আমি তাঁহাকে বইখানা শেষ করিতে অনুরোধ করি। ইহার পর চার বছর ধরিয়া উপন্যাসটি শেষ করিবার জন্য তাগাদা দিতে থাকি। ইহারও পরে যখন তিনি প্রকাশক পান না, তখন আমিই প্রকাশক জোগাড় করিয়া দিই। আমার সহায়তার কথা বিভূতিবাবুর জীবন ও রচনা সম্বন্ধে বই-এ আছে। সুতরাং আমি বাংলা ভাষায় লিখিত বই-এর উৎকর্ষ বিচার করিতে পারি নাই, এ-কথা কাহারও বলা উচিত নয়। তবে সময়াভাবে হয়তো অন্য উৎকৃষ্ট বই পড়ি নাই। আমি সমসাময়িক বাংলা বই-এর উল্লেখ করি না সত্য, তবে বাংলা ভাষায় একটাও উৎকৃষ্ট বই লিখিত হয় নাই, তাহা কোথাও বলি নাই।

## দ্বিতীয় কারণ—শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজি ও বাংলা পড়ার ধারা

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকত্ব করার জন্য আমার মনে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য না-পড়ার একটা প্রবল কারণ নিশ্চয়ই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহার জন্য, ইংরেজি বাংলা পড়ার ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির যে আচরণ দেখা যাইত আমার মধ্যে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এই শ্রেণীর বাঙালিরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর, অধ্যাপক না হইলে, মনোরঞ্জনের জন্য (recreation হিসাবে) ইংরেজি বা বাংলা কিছুই পড়িত না—ইহার প্রধান কারণ অবকাশের অভাব। আমিও ১৯২৮ সনের শেষের দিকে 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক হইবার পর ও উহার অল্প পরেই রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করিবার পর যাহা এই দুই বিষয়ে পড়িবার প্রয়োজন হইত তাহা ছাড়া কিছুই পড়িবার সামান্য অবসরও পাইতাম না।

তবে কার্যসূত্রে 'প্রবাসী'-তে গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি যাহা প্রকাশিত হইত তাহা দেখিতাম। এই সব রচনা নির্বাচন করিতেন রামানন্দবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবী, আমাকে প্রুফ দেখিতে হইত। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা ছাড়া নবীন লেখকদের রচনাও পড়িতে হইত।

নবীনদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ। তাঁহার 'অপরাজিত' ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'-তেই প্রকাশিত হইয়াছিল, আমিই উহার প্রুফ দেখিতাম, দু-একটি পরিবর্তন করিতে বলিতাম, উহা তিনি মানিতেন না। যেমন, উনি 'খোঁজাখুঁজির' বদলে 'অনেক তাড়াতাড়ি করা হইয়াছিল', লিখিয়াছিলেন। আমি আপত্তি করা সত্ত্বেও তিনি উহা রাখিলেন। তখন বিভূতিবাবুর লেখার উচ্চতম দিক সম্বন্ধে আমার যেমন ধারণা হইল, কিছু যে অক্ষমতাও আছে তাহাও দেখিলাম। পরজীবনে এই বিচার ত্যাগ করিবার কারণ দেখি নাই। অথচ তিনি ১৯৪২ সনে আমরা দিল্লি চলিয়া আসা পর্যন্ত আমার পত্নী ও আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

বিভূতিবাবু ছাড়া অন্যের রচনাও আমাকে পড়িতে হইত, যেমন, তারাশঙ্কর, মানিক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। ইঁহাদের সম্বন্ধেও আমি ব্যক্তিগত অভিমত করিবার সুযোগ পাইলাম। তবে বলা প্রয়োজন, এইটুকু প্রয়োজনের চাপে আমাকে বাংলা সাহিত্য যতটুকু পড়িতে হইত, তাহা বাদ দিলে সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষিত বাঙালির সাধারণ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে-ধারণা ছিল আমারও তাহাই ছিল।

এই ধারণা বঙ্কিমের যুগ হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমই উহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উহা প্রকাশিত হইয়াছিল কমলাকান্তের মুখে 'দপ্তর'-এর দশম সংখ্যা 'বড় বাজার' প্রবন্ধে 'সাহিত্যের বাজার' অংশে। কমলাকান্ত লিখিল,

'সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিসের দোকান ?'

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গলা সাহিত্যের"।

"বেচিতেছে কে ?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।'

AMARBOI.COM

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাহিত্যের বাজার' লিখিবার তাৎপর্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি নিজে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা প্রকাশিত হইবার পরই নিজেকে প্রদত্ত ফুলের মালা তিনিই রবীন্দ্রনাথের গলায় দিতে বলিয়াছিলেন। তবু তিনি সাধারণ বাংলা লেখা সম্বন্ধে এই বিচার কেন করিলেন ? তিনি যেটা দেখিলেন সেটা অবাচীনতা। উহা অন্যায় হইয়াছিল তাহা কেহই বলে নাই। সেজন্য বহু প্রচলিত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমারও যদি এইরূপ অভিমত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার লজ্জার কারণ নাই, অপরাধও হয় নাই। যখন বাংলা সাহিত্য শুধু উদীয়মানই নয়, উহার বিভাময় প্রভাত ও দীপ্ত মধ্যাহ্নও দেখা দিয়াছে, তখন উহাতে একটা বিস্ময়কর নিম্নস্তর ছিল। এই দ্বিত্ব আমিও দেখিয়াছিলাম।

## তৃতীয় কারণ—একটা অভূতপূর্ব দ্বিত্ব

আমাদের যুগে যে-দ্বিত্ব দেখা দিল, উহা এত নূতন, যে উহাকে দ্বিত্ব না বলিয়া ত্রিত্ব বলা উচিত। আগেকার দ্বিত্বে কোনও বড়াই ছিল না। যে-নিম্নস্তরের রচনার কথা বলিলাম, তাহা অশ্লীলই হউক কিংবা কাঁচাই হউক, উহার লেখকেরা টাকা করিবার জন্যই লিখিতেছি, উহা বলিতে বা মানিয়া লইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিত না। বেশ্যাবৃত্তিকে এক ধরনের স্ত্রীলোক যেমন লাভজনক ব্যবসা বলিয়াই অসঙ্কোচে করিত, পূর্বযুগের নিম্নস্তরের লেখকেরাও সেইভাবেই যে-লেখায় লাভ হইবে তাহাই লিখিত।

কিন্তু আমরা 'শনিবারের চিঠি'-তে যে-সব লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযানযাত্রা করিলাম,

তাহারা বলিল, আমরা বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতেছি, উহাতে বাংলা সাহিত্যের যে উন্নত রূপ দেখা যাইবে এরূপ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। পরে এই সব লেখকদের কীর্তির ইতিহাস 'কল্লোল যুগ' বলিয়া একটি বই-এ দেওয়া হইয়াছিল। কল্লোল যুগ আসলে কি তাহার কথা কিছু 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' বই-এ লিখিয়াছি। আপাতত আমরা, অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র দল, বিশেষ করিয়া আমি, কি চক্ষে দেখিয়াছিলাম তাহার কথা বলি।

তখনও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার ও অন্য কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক লিখিয়া যাইতেছেন। সুতরাং এই নূতন সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে এ-কথা আমি মনে করি নাই। আমার শুধু হাসি পাইত, অবশ্য অবজ্ঞামিশ্রিত। আমি তখন ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য তাহা মূলে পড়িয়াছি, রুশিয়ান, জার্মান ও ইতালিয়ান সাহিত্য অনুবাদে পড়িয়াছি, গ্রিক এবং ল্যাটিন সাহিত্যও অনুবাদে কিছু কিছু পড়িয়াছি। ইউরোপের বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকদের লেখা প্রায় সবই পড়িয়াছি। সুতরাং আমার সাহিত্যিক বিচার ও রুচি সম্বন্ধে একেবারেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি নূতন লেখকদের রচনা ও বড়াইকে ব্যঙ্গ করিলাম। যেমন, ১৯২৮ সনের চৈত্র মাসে লিখিলাম,

> 'কি শুভ মুহূর্তেই না পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। আজ বাঁচিয়া আছি বলিয়াই বাংলা সাহিত্যে নবীনের, তরুণের, বিদ্রোহের, অশ্লীলের অভিষেক দেখিতে পাইলাম।
>
> 'বয়সে অথবা বুদ্ধিতে শিশু হইবার একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে তখন আদেখলেপনা করিতে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ হয় না। সেই বয়সে ঝাড়ের তিনকোণা কাচ হইতে আরম্ভ করিয়া 'কুমারসম্ভব'-এর অষ্টম সর্গে হরগৌরীর মিলনের বর্ণনা পর্যন্ত যাহা কিছু একটা দেখিয়া হাঁ হইয়া যাইবার একটা অপরিসীম, অফুরন্ত, দুর্নিবার ক্ষমতা থাকে।'

আমি নূতন লেখকদের মধ্যে এই আদেখলেপনাই দেখিয়াছিলাম। তবে এ-কথা বলিব না যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিভার বিচ্ছুরণে দুই-চারিটা ভাল কবিতা লেখেন নাই। বহুল পরিমাণ ব্যাং-এর ছাতার মধ্যে কোথাও একটা ফুলও দেখিতাম। তবে উহাকে নিয়মের ব্যতিক্রম মনে হইত। কিন্তু উহাদের মধ্যে আন্তরিকতার অপেক্ষা অনুকরণশীলতা বা ভান বেশি ছিল। তাহাদের মানসিক ব্যাধিকে অশোক চট্টোপাধ্যায় এই আখ্যা দিয়াছিলেন— 'Whitmania, Leninosis ও Ibsenitis.' ইহা কিন্তু এই সব বাঙালি লেখকদের সম্মান করা ভিন্ন অপমান করা হয় নাই। যদি কোনও তরুণ বাঙালি লেখক প্রকৃতপ্রস্তাবেই হুইটম্যান, লেনিন অথবা ইবসেনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারিত তাহা হইলে উহারা নিন্দাভাজন হইত না। কিন্তু অক্ষমের লম্ফঝম্ফ হাস্যকর হয়। লেনিনের যুগের রুশিয়াকে 'দুঃখী রাশ্যা' লিখিলেই কেহ লেনিন হয় না।

নূতন যুগের লেখকদের দুইটি কেন্দ্র ছিল—একটি কলিকাতা, অপরটি ঢাকা-কুমিল্লা। কলিকাতা কেন্দ্রের নব্য লেখকদের জীবন বিদ্রোহ হইতে হাকিমিতে, হাকিমি হইতে গুরুবাদে অবসান হইয়াছিল। ঢাকা কেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সত্যকার কবিপদ হইতে অধ্যাপকত্বে নামিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ বিবর্তন হইতে পারে তাঁহাদের লেখার কোনও স্থায়ী মূল্য হইতে পারে তাহা আমার মনে হয় নাই।

এই যুগেই নব্য লেখকদের মধ্যে অন্য রকমের একটা ধারা দেখা গিয়াছিল যাহাও তাহাদের রচনার প্রতি আমার বিরাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। উহা তাহাদের বিচারহীন পাশ্চাত্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের অনুকরণ। ইহা প্রদর্শন করিল তাহারাই যাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও শিক্ষা বেশি ছিল। তাহাদের রচনাতে এমন সব বিষয়, অবস্থা ও ভাব প্রবেশ করিল যাহা বাঙালি জীবনে কখনও ঘটে না। সুতরাং এই সব প্রকাশ করিবার জন্য বাংলা ভাষাকেও ইংরেজি ভাষার বাংলা রূপ দিতে হইল। এক ধরনের বাংলা রচনাকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'জোর করা ভাব ও ধার করা ভাষা'-র আবির্ভাব বলিয়াছিলেন। আমাদের সময়ে ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নব্য সাহিত্যিকদের রচনা স্থায়ী না হইলেও এই দুইটি দিকে তাহাদের প্রভাব বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। যদিও বা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে সে যুগের নবীন সাহিত্যিকদের রচনাকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি, তাহাদের কার্যকলাপের এই পরিণতিকে পারি না।

## চতুর্থ কারণ—বাঙালি জাতির শক্তিক্ষয়ের অনুভূতি

সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত, গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার ফলে আমার মনে দুইটি ধারণা জন্মিয়াছে, দুইটিই দৃঢ়বদ্ধ, তাহা ছাড়া এগুলি সত্য বলিয়াও আমি মনে করি। সেগুলি এই—

১। যে কোনও জাতি সবদিকে শক্তিমান, জয়কামী ও সমৃদ্ধ না হইলে উহার দ্বারা উচ্চতম সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সবদিক বলিতে আমি রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত অবস্থা বুঝি। বৃক্ষ ভাল না হইলে যেমন ফল ভাল হয় না, তেমনি শক্তিমান না-হইলে কোনও জাতির সাহিত্য উৎকৃষ্ট হয় না।

২। কোনও ভাষার প্রচলন ও প্রয়োগের কালের সহিত উহার সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ একটা ভাষা যদি কথিত, লিখিত ও পঠিত হয় এক হাজার বৎসর ধরিয়া, তাহা হইলেই যে এই এক হাজার বৎসর ধরিয়াই উহাতে উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি হইবে এমন কোনও কথা নাই। কার্যত অতি অল্পকালেও হইতে পারে।

এই দুইটি ধারণার সহিতই আমার সমসাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য না-পড়ার সম্বন্ধ আছে। তাই এই দুইটির মাপকাঠিতে আমি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে কেন উপেক্ষা করি, তাহার বিবরণ দিব।

প্রথমে জাতি বিশেষের শক্তির সহিত সাহিত্যসৃষ্টির কি সম্বন্ধ তাহা বলি। মানবজাতির ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই যে, কোনও রাষ্ট্রীয় শক্তিহীন, আর্থিক সম্পদ বর্জিত, সামাজিক স্বাস্থ্যহীন জাতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্য হিন্দু বা আর্যের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সম্পদ, সভ্য ও সবল সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতিগত বৈদগ্ধের যুগে লিখিত হইয়াছিল।

শ্রেষ্ঠ গ্রিক সাহিত্য এথেন্সের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সহিত যুক্ত। শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন সাহিত্য রোমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সেই সাম্রাজ্যের অবিসম্বাদিত প্রভুত্বের যুগে লিখিত।

তেমনই বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্য বাঙালি জাতির সর্বদিকে ভারতব্যাপী নেতৃত্বের যুগে রচিত। তখন বাঙালি, কি ধর্ম-প্রচারে, কি রাজনৈতিক কার্যে, কি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়, কি সমাজ সংস্কারে, কি পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বনে, অর্থাৎ সবদিকে ভারতবাসীর একটা নূতন জীবন সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া সকল অবাঙালিদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল।

লর্ড লরেন্স যখন ভাইসরয় (১৮৬৪-৬৯) তখন স্যর হেনরি মেন তাঁহার সদস্যসভায়

আইন সচিব ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। তিনি ১৮৭১ সনে কেমব্রিজে একটি বক্তৃতায় বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বলেন,

> 'I have had unusual opportunities of studying the mental condition of the educated class in one Indian province (অবশ্য বঙ্গদেশ) ...Its peculiar stock of ideas is probably the chief source from which influences proceed and which are more or less at work everywhere. Here has been a complete revolution of thought, in literature, in taste, in morals and in law.'

এই মানসিক অবস্থাতেই নূতন বাংলা সাহিত্য সৃষ্ট হইল, এবং শুধু তাই নয়, উহার অনুকরণে অন্য ভারতীয় ভাষাতেও নূতন সাহিত্য সৃষ্ট হইল।

এখন বাঙালির এই ভারতব্যাপী প্রাধান্য গিয়াছে। ইহার কারণ জাতীয় জীবনে শক্তিক্ষয়। আমি ১৯২২-২৩ সন হইতেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম যে বাঙালি জাতির শক্তিক্ষয় দেখা দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই ধারণা আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়বদ্ধ হইতে হইতে ১৯৩৭ সনে বদ্ধমূলই হইয়া যায়। উহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বর্তমান যুগের বাঙালির অধিকাংশকেই, আমি যে বাঙালিকে চিনিতাম সেই বাঙালি বলিয়া চিনিতে পারি না।

এখন যে ভারতবর্ষে বাঙালির প্রাধান্যই শুধু গিয়াছে তাহা নয়, বাঙালি অবাঙালির দাস হইয়াছে। আজিকার বাঙালি সম্বন্ধে বলা চলে—

'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।'

AMARBOI.COM

তাই জিজ্ঞাস্য, যে-জাতি সকল দিকে পরাভূত হইয়া এক সঙ্কীর্ণ অচলায়তনে বাস করিতেছে তাহারা কি উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবে? অতীতে সব যুগে সব দেশে সাহিত্যসৃষ্টির যে-ধারা দেখা গিয়াছে, কাহার দয়ায় বা কাহার সাহায্যে একমাত্র বাঙালির বেলাতেই তাহা কার্যকরী থাকিবে না। আমার দীর্ঘ জীবনে আমি অনেক বাঙালি দেখিয়াছি যাহারা আজিকার মাপকাঠিতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ; কিন্তু আমার কখনও মনে হয় নাই যে ইহাদের দ্বারা আমার উপস্থাপিত থিওরি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইবে। কোনও আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম না দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই বজায় থাকিবে। সুতরাং সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিব ইহাকে অযৌক্তিক আচরণ বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব,

> 'এ তো বাঁধা পুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে?
>
> 'তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা জীবনের উপর চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।'

এই বাঁধা পুকুরে যদি সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহা পানার মতো হইবে ইহা মনে করা কি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসঙ্গত ? উহাতে বিদেশী ওয়াটার-হ্যায়াসিন্থের ফুল ফুটিলেও উহা বদ্ধ জলাশয়ই থাকিবে।

## পঞ্চম কারণ—ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান

এখন আমার দ্বিতীয় ধারণার কথা বলি। উহার পুনরুক্তি করিয়া আরম্ভ করি—ভাষার প্রচলনকালের সহিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধ নাই।

প্রথমে সংস্কৃত ভাষার, অর্থাৎ যাহাকে বৈদিক সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন 'ক্ল্যাসিকাল' অথবা সাহিত্যিক সংস্কৃত বলা হয় তাহার কথা বলি। আমার মতে উহার সৃষ্টি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হইয়াছিল, উহার পূর্বে নয়। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উহা অন্ততপক্ষে দেড় হাজার বৎসর প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহাতে উচ্চস্তরের সাহিত্যসৃষ্টির কাল খুব বেশি হইলে চার শত বৎসর, ভাস বা কালিদাস হইতে ভবভূতি পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, যে ভাষাকে ক্ল্যাসিকাল গ্রিক বলা হয়, উহা প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া পঠিত ও লিখিত হইত, হয়তো বা কথিতও হইত। কিন্তু উহাতে উচ্চতম সাহিত্যসৃষ্টির কাল দুই শত বৎসর মাত্র।

তৃতীয়ত, যাহাকে ক্ল্যাসিকাল ল্যাটিন বলা হয় তাহা পঠিত এবং লিখিত হইত দুই হাজার বৎসরের বেশি, কথিতও হইত সম্ভবত ছয় শত-সাত শত বৎসর। কিন্তু উহাতে উচ্চতম সাহিত্য, যাহা স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, উহার কাল বেশি হইলে তিন শত কি সাড়ে তিন শত বৎসর—অর্থাৎ প্লেউটুস হইতে আরম্ভ করিয়া ট্যাসিটাস পর্যন্ত।

তবে দুই-চারিটা ব্যতিক্রম এই তিন ভাষার সাহিত্যেই দেখা গিয়াছে। পরবর্তী যুগেও এই তিনটি ভাষায় যাহাকে উচ্চস্তরের সাহিত্য বলা যায় তাহা দেখা গিয়াছে—যেমন, সংস্কৃতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ, গ্রিকে থিওক্রিটাস ও তাঁহার যুগের 'ইডিল'-এ, ল্যাটিনে আপুলেইউস ও অন্যান্য দুই-একজনের রচনাতে। এই সব ছাড়া কিছুই স্থায়ী হয় নাই।

AMARBOI.COM

তবে বই লেখা অবিরত চলিয়াছে। সমসাময়িক যুগে উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও শোনা যাইত, এমন কি কেহ কেহ বলিত পূর্বেকার সাহিত্য হইতেও শ্রেষ্ঠ রচনা দেখা যাইতেছে। সংস্কৃতে যখন 'নৈষধ' কাব্য দেখা দিল, তখন সকলেই বলিল, 'উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব চ মাঘ ক্ব—ভারবি!' কালিদাসের 'রঘুবংশ'-কে তো কাব্য বলিয়াই গ্রাহ্য করা হইল না, বলা হইল 'রঘুরপি কাব্যং, তদপি চ পাঠ্যং, তস্যাপি টীকা সানপি চ পাঠ্যা।' ল্যাটিন-গ্রিক সাহিত্যেও এই ব্যাপার দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমান প্রদেশ গল-এর বর্দো অঞ্চলে একটি সাহিত্যিক দল ছিল। সেই দলের লোকেরা বলিত তাহারা যেরূপ গ্রিক ভাষাতে পুস্তক রচনা করে সেরূপ গ্রিক গ্রন্থ প্লেটোও লেখেন নাই। বিস্মৃত সাহিত্যস্রষ্টাদের বিশিষ্ট ধর্ম ছিল নিজেদের ঢাক পিটানো। সুতরাং সমসাময়িক বাঙালি সাহিত্যস্রষ্টাদের ঢাকের বাদ্য শুনিয়া মনে করা উচিত হইবে না যে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্য স্থায়ী হইবে।

আপত্তিকারীরা আমাকে বলিতে পারেন, আপনি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিবার কে ? আপনার ব্যক্তিগত মতকে মানিয়া লইতে হইবে কেন ? ইহার উত্তরে আমি বলিব, কাহাকেও আমার মত মানিয়া লইতে বলিতেছি না, আমি শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যকে মানিয়া লইতে বলিতেছি। যখন সাহিত্যসৃষ্টি চলিতেছে তখন সমসাময়িক মতের কোনও মূল্য নাই। উহা সত্য বা ভ্রান্ত দুই-ই হইতে পারে। তবে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির যদি অবনতি হয়, তাহা হইলে রুচি ও বিচার শক্তিরও অবনতি হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইটি ব্যাপার পাশাপাশি—pari passu—না চলিলে অবনতি হইতে পারে না। কেহই জানিয়া শুনিয়া অবনতির পথে যায় না। সুতরাং সমসাময়িক মতের মূল্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলা চলে না। কোন মত সত্য, কোন মত ভ্রান্ত তাহা একমাত্র কালক্রমেই দেখা যায়, তাহাও সাধারণত হয় বহু কাল অতিক্রান্ত হইলে।

ইহা বিশদ করিবার জন্য একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিব, যদিও উহা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হইবে। ১৯২৩-২৪ সনে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ও আমি ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে থাকিতাম। আমি থাকিতাম দোতলার এক প্রান্তে, তিনি থাকিতেন ঠিক তাহারই উপরের ঘরে তেতলায়। তাঁহার সঙ্গে একই ঘরে রূপকথার সঙ্কলনকর্তা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয়ও থাকিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই তাঁহার বই-এর বিজ্ঞাপন লিখিতে দেখিতাম, উহাতে তিনি নিজেকে 'কথাসাহিত্য সম্রাট' বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

একদিন সকালে বিভূতিবাবু ও আমি তাঁহার খাটে বসিয়া গল্প করিতেছি। সম্মুখের খাটে দক্ষিণারঞ্জনবাবু স্নান নিত্যপূজা সমাধা করিয়া ছোলা-গুড় খাইতেছেন। পরনে তসরের ধুতি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। তাঁহাকে শান্তিতে খাইতে দিয়া আমরা দুজন নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছি।

হঠাৎ বিভূতিবাবু কি প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার নব প্রকাশিত গল্পের উচ্চ প্রশংসা একটা কোন পত্রিকায় হইয়াছে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, দক্ষিণাবাবু খাটের উপরে দণ্ডায়মান, বাম হাত বুকে, ডান বাহু ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উত্থিত, তিনি তারস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, 'কিছু নয়, কিছু নয়, পত্রিকার প্রশংসা কিছু নয়। মহাকাল বিচার করবেন।'

আমরা তো হতভম্ব। দক্ষিণাবাবু আমার পিতৃতুল্য, পিতার সহিতও পরিচিত। সুতরাং তাঁহার উক্তি শুনিয়া হাসিতে পারি না। আমরা দুই জনে সেই ঊর্ধ্ববাহু প্রবীণ সাহিত্যিকের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

পরে বিভূতিবাবু মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন, 'ওহে নীরদ! মহাকাল!' আমি কিন্তু সেই উক্তি লইয়া পরিহাস করিতে পারিতাম না। আপাতত উহা হাস্যকর মনে হউক না কেন, মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম, 'মহাকাল'-ই শেষ বিচারক।

তবে নিজের মতের সপক্ষে শুধু একটা কথা বলিব। আমি সারা জীবনে কম হইলেও দশ হাজার বই পড়িয়াছি। উপরন্তু যাহা এ পর্যন্ত নানা ভাষায় স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি বহুবার পড়িয়াছি। এই পড়ার ফলে রুচির ও বিচারশক্তির কিছু অনুশীলন হইয়াছে। উহার উপর নির্ভর করিয়াই সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিবার সাহস পাই, উহা আপাতদৃষ্টিতে স্পর্ধা বলিয়া মনে হইলেও।

আমার সাতানব্বই বৎসর বয়স হইয়াছে। পরিশ্রমের ক্ষমতা একান্তই কমিয়া গিয়াছে। একে তো যাহা পড়িয়াছি তাহার ভারেই অবসন্ন। অনেক সময়েই একটা অতি পুরাতন বচন আবৃত্তি করি— 'Of making many books *there is no end*; much study *is* a weariness of the flesh.' হস্তলিখিত পুস্তকের বেলাতেই যদি এই কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে উহা আরও কত সত্য! ব্রিটেনে এখন বৎসরে ষাট হাজার মতো বই প্রকাশিত হয়।

তবু বাঙালি সমালোচকেরা আমাকে পড়িতে বলেন। আমার বার্ধক্যের প্রতিও তাঁহাদের করুণা নাই। এ বিষয়ে দিল্লির বাসে যাহা শুনিয়াছি তাহার সহিত বাঙালির মুখে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা শুনিতে হইতেছে তাহার তুলনা করিব। দিল্লিতে বাসে উঠিলে উপবিষ্ট হিন্দুস্থানী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে বলিত, 'আপ বুর্জুক (বয়োজ্যেষ্ঠ), বৈঠিয়ে।' বাঙালি সমালোচকেরা সেই একই শব্দ বাংলা উচ্চারণ ও বাংলা অর্থে প্রয়োগ করেন, 'আপ বুজরুক।'

দুই শিরোনামে—"সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্য : চিরায়তের ধারেকাছে আসে না" এবং "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য : বাঁধা পুকুরে কচুরিপানা"—প্রকাশিত ; রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ কার্তিক ১৪০১, ৩০ অক্টোবর ১৯৯৪ ; ২০ কার্তিক ১৪০১, ৬ নভেম্বর ১৯৯৪।

AMARBOI.COM

# বাঙালি ও রমণীর রূপ

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে রমণীর রূপ নূতন চক্ষে দেখিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, রূপোন্মাদে যেমন সুখ ও গরিমা আছে, তেমনই দুঃখ এবং বিপদও আছে। নবকুমার, প্রতাপ, ভবানন্দ রূপের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। তাই তিনি প্রতাপ ও ভবানন্দের বেলাতে রমণীর রূপকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু সেটা রূপমোহের নিদারুণ শোকাবহ পরিণাম দেখিয়া। সাধারণত তিনি রূপের মাহাত্ম্যই দেখাইয়াছেন।

সেজন্য 'কমলাকান্তের দপ্তরে' একটি রচনায় স্ত্রীলোকের রূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত গতানুগতিক হিন্দু মত পড়িয়া আমি বিশেষ আশ্চর্য হইয়াছিলাম। পরে মনে পড়িল, 'কমলাকান্তে'র সব রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের নয়। বই খুলিয়া দেখিলাম, 'স্ত্রীলোকের রূপ' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। এই সব সাধারণ বাঙালি লেখক কেন যে কমলাকান্তি বৈদগ্ধ্য দেখিয়া অনুকরণ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বোঝা কঠিন। যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'চন্দ্রালোকে' তেমনই আর একটি অসার চালাকি।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যের বঙ্কিমচন্দ্র হইবার ইচ্ছা দেখিলে খুশি হইতেন না। গল্প শুনিয়াছি, একটু বিশেষ অবস্থায় থাকিলে তিনি মাথায় টোকা দিয়া বলিতেন, "এর ভেতর কি ছিল কেউ বুঝলে না!" ফরাসি কবি আঁদ্রে শেনিয়েও গিলোটিনে বলি হইবার আগে নিজের কপালে টোকা দিয়া ঠিক তেমনই বলিয়াছিলেন, "Il y avait pourtant quelque chose la!" (যাই হোক, এর ভেতর কিছু ছিল।")

বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় কি ছিল, এখনও বাঙালি বুঝিয়াছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাহার কারণ বলিতেছি—আমার নূতন ইংরেজি বই-এ আমি লিখিয়াছি যে, সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে মনীষায় একমাত্র শঙ্করই বঙ্কিমচন্দ্রের সমান—ইহাই আমার মনে হয়। ইহা পড়িয়া অনেক শিক্ষিত বাঙালি আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়িয়া থাকিলে বা বুঝিয়া থাকিলে তাঁহারা এই ভাব দেখাইতেন না। অথচ 'ঋষি বঙ্কিম' বলিয়া অর্থহীন মূর্তি পূজাতেও আমাদের অত্যধিক নিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে কোথায় তুলিয়াছিলেন তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে শুধু রূপের প্রসঙ্গেই দিব। কিন্তু উহার আগে স্ত্রীলোকের রূপ সম্বন্ধে আমাদের সমাজে জনপ্রচলিত ধারণা ও মনোভাব কিরূপ ছিল তাহার কথা বলা দরকার। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই আরম্ভ করিব।

যখন বাঙালি রূপ দেখিয়া বলিতে পারিত—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারল, নয়ন না



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরপিত ভেল",—তা সে পুরুষেরই হউক বা স্ত্রীলোকেরই হউক, সে যুগ অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছিল। বর্তমান কালে যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা একটি অকাট্য ধারণা—রূপ কামের উদ্দীপক মাত্র। সকলেই ধরিয়া লইত, রূপবতী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার পর একমাত্র ভাবনাই হইবে কি করিয়া উহার সহিত সঙ্গত হওয়া যায়। এই ইতরতার জন্যই যাঁহারা ধার্মিক, তাঁহারা রূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ করিতেন। এই বিরাগ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বাঙালিকে বীর করিবার জন্য আখড়ায়-সমিতিতে ডন-বৈঠক, কুস্তি, লাঠি-খেলা ইত্যাদি ব্যায়াম করানো হইত ; অন্য দিকে মানসিক ব্যায়ামও কম হইত না। আমাদের সকলকেই ব্রহ্মচর্য লইয়া দাদাদের শাসনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিতে হইত।

এই ব্রহ্মচর্যের একটি অঙ্গ ছিল একখানি "পাপের খাতা" রাখা। দিনে কতবার কত রকম কুচিন্তা মনে হইতে পারে, আর কতবার কোন দুর্বলতার বশে কি কুকর্ম করা যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা উহাতে থাকিত। অপরাধ হইয়া থাকিলে সেই সব পাপের ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতীকে দিনের শেষে ঢ্যাঁরা কাটিতে হইতে। সেই সবের সংখ্যা ও গুরুত্ব দেখিয়া শোধনের জন্য উচিত ব্যবস্থা হয় নিজেদের কিংবা দাদাদের করিতে হইত। অন্য পাপের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একটা শারীরিক পদস্খলনের পরই যে পাপটির দ্বিতীয় স্থান ছিল সেটি—"রূপমোহ"।

আমিও এই পাপের খাতা কিছুদিন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই বয়সেও একটু রসবোধ থাকায় চালাইতে পারি নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আরও উগ্র স্বদেশী ছিল, হাসি-তামাশা বা এই ধরনের দুর্বলতাও তাহার কম ছিল, গম্ভীর প্রকৃতির প্রমাণ হিসাবে তাহার দেরাজে কখনও ছোরা পাওয়া যাইত। একদিন মা তাহার দেরাজ খুলিয়া তাহার পাপের খাতাটি পাইলেন, এবং খুলিয়া দেখিলেন, "রূপমোহে"র ঘরে অসংখ্য ঢ্যাঁরা। বারো-তেরো বৎসরের পুত্রের এত রূপমোহ তাঁহার সহ্য হইল না, ডেঁপো, জ্যাঠা ইত্যাদি বকাবকি করিয়া খাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

AMARBOI.COM

কিন্তু বলিব, এ কৃচ্ছ্রসাধনের ফল খারাপ হয় নাই। যখন যুবা বয়সে কলিকাতায় পড়ি, তখন কখনও কখনও মা আসিয়া আমাদের লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। একসময়ে আমরা উত্তর কলিকাতার অতি-রক্ষণশীল পল্লীতে থাকি। পাশের বাড়ির গৃহিণী আসিয়া মাকে বলিলেন, "দিদি, তোমার ছেলেরা কি ভাল! একদিন জানলায় দেখতে পাই নে!" তিনি ঝি-বউ লইয়া ঘর করিতেন, সুতরাং প্রাণে ভয় ছিল।

তখনকার দিনে ছাতে উঠা, দূরবীন বা ক্যামেরা রাখা যুবকদের চরিত্রহীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাস কলিকাতার বহু বাঁদর এই দুইটি জিনিস খারাপ অভিসন্ধি ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যেই রাখিত না। আমাদের নারীদেহ সম্বন্ধে কৌতূহলের অভাব মফঃস্বলের, বিশেষ করিয়া বাঙাল ছেলের লক্ষণ বলিয়াই ধরা হইত।

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, অন্তত এইটুকু ভদ্রস্থতা রাখিয়া রূপ দেখিবার দেশাচারসম্মত জায়গা ছিল ঘাট। গ্রামেই হউক আর শহরেই হউক ঘাটই ছিল রূপের হাট। "শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি, কে ধনী মাজিছে গা, যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা..."—ইহারই ইতরীকৃত কোরাস সর্বত্র শোনা যাইত। তাই শরৎচন্দ্র "পণ্ডিতমশাই" গল্পে কুঞ্জের শাশুড়িকে দিয়া কুসুমকে এই কথা বলাইয়াছিলেন—"তুমি যে এলো চুলে, ভিজে কাপড়ে ঘাট থেকে এলে তাতে বল দেখি মুনির মন টলে কি না!" (স্মৃতি হইতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধৃত করিতেছি, তাই একটু-আধটু ভুল থাকিতে পারে।)

ব্যঙ্গ, বিশেষ করিয়া রঙ-চড়ানো ব্যঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের বিশেষ রস ছিল। তাই তাহাতে স্নানের ঘাট লইয়া বহু রসিকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়তো সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কম্বিত কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন 'দেখ দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।' "

ঘাটে বা ঘাটের পথে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার কথা যুবক বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গল্প "রাজমোহনের স্ত্রী"-তে এই ব্যাপারটার যে বিবরণ দিয়াছেন, রূপ সম্বন্ধে বাংলাদেশের দেশাচারসম্মত মনোভাব বুঝাইতে হইলে উহার অপেক্ষা ভাল দৃষ্টান্ত পাইব না। তাই অনেকটা তুলিয়া দিতেছি। দুইটি যুবক (সম্পর্কে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই হয়; একটি গ্রাম্য বড়লোক, নাম মথুর: অপরটি কলিকাতার শিক্ষিত, নাম মাধব) দুইটি অল্পবয়স্ক মেয়েকে ঘাট হইতে জল লইয়া ফিরিতে দেখিল। বয়সে বড় মেয়েটি গ্রামের কন্যা, অপরটি বধূ—অপরূপ সুন্দরী। বড়টি ছোটটিকে এই বলিয়াই ঘাটে লইয়া গিয়াছিল—"এখন এস দেখি, মোর গৌরবিনী, হাঁ-করা লোকগুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।"

হঠাৎ হাওয়াতে বধূটির ঘোমটা সরিয়া যাওয়ায় মাধব ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকায়, স্থূলদেহ, গলায় হার পরা গ্রাম্য দর্পেটি বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ, তুমি ওকে চেন।" ইহার পর যে কথাবার্তা হইল সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

মাধব—"চিনি।"

মথুর—"চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এইখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয় দিন! চেন যদি, তবে কে এটি?"

মাধব—"আমার শ্যালী।"

মথুর—"তোমার শ্যালী? রাজমোহনের স্ত্রী? রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখনও দেখি নাই?"

মাধব—"দেখিবে কিরূপে? উনি কখনও বাটীর বাহির হয়েন না।"

মথুর—"হয়েন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন?"

মাধব—"কি জানি।"

মথুর—"মানুষ কেমন?"

মাধব—"দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর।"

মথুর—"ভবিষ্যদ্‌বক্তা গণকঠাকুর এলেন আর কি! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল?"

মাধব—"ভাল মানুষ কাহাকে বল?"

মথুর—"আঃ কলেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা বলা ভার। বলি ওর কি—?"

মাধবের বিকট ভ্রূভঙ্গ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা হইতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষান্ত হইলেন।

মাধব গর্বিত বচনে কহিলেন, 'আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই ; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে এত বক্তৃতার আবশ্যক কি ?"

মথুর—"বলিয়াছি তো দু'পাত ইংরাজী উল্টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না তো কাহার কথা কব ? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব ? যাক, চুলায় যাক ; মুখখানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহুনে গোবর্ধন এমন পদ্মের মধু খায় ?"

এই তো গেল বনিয়াদি বাংলায় স্ত্রীলোকর রূপ সম্বন্ধে পরপুরুষের আগ্রহ। তার পর স্বামীদের ভাবটা কি রকম দেখা যাক। রাজমোহনের স্ত্রী ঘরের কাছে গিয়াই দেখিল স্বামী কালমূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কথাবার্তা এইরূপ হইল—

রাজমোহন—"তবে রাজরানী কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?"

স্ত্রী—"জল আনিতে গিয়াছিলাম।"

রাজ—"জল আনিতে গিয়াছিলে ! কাকে বলে গিছলে, ঠাকুরাণি ?"

স্ত্রী—"কাহারেও বলে যাই নাই।"

রাজ—"কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না ?"

স্ত্রী—"করেছ।"

রাজ—"তবে গেলি কেন, হারামজাদি !"

স্ত্রী—"আমি তোমার স্ত্রী। গেলে কোনো দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।"

তখন রাজমোহন স্ত্রীকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিল। "অবলা বালা কিছু বুঝিলেন না ; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতরচক্ষে স্ত্রীঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব রহিয়া রাজমাহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্বমত বজ্রনিনাদে কহিল, 'তোরে লাথিয়ে খুন করব।' "

amarboi.com

এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ঘরে-বাহিরে রমণীর রূপের সম্মান।

কিন্তু নূতন পূজারও বেশি দেরি ছিল না। এই অন্ধকার যেন ঠিক উষার আগেকার অন্ধকার। রাজমোহনের স্ত্রীর রূপের এই অচিন্তনীয় অপমানের কথা লিখিবার পরেই তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র, তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্ক বঙ্কিম, রূপের অন্য ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার একেবারে প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"তেই আছে। তিনি তিলোত্তমার রূপ সম্বন্ধে লিখিলেন—

> "তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক ! কখনও কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন ? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ-বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃপুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন ? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন।'

এই সুর কোথা হইতে আসিল ? এইখানে উহার উত্তর দিব না, শুধু একটু সূচনামাত্র দিব। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক নয় বৎসর বয়স্ক বালক এক রূপসীকে দেখিয়া যাহা অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছিল, তাহার কথা পরজীবনে কবি হইয়া লিখিয়াছিল—"Incipit vita nova. Ecce deus fortior me, qui veniens domina tatur mihi." ("আজ হইতে নবজীবন আরম্ভ হইল। দেখ এই দেবতা আমার চেয়ে শক্তিমান, তিনি আসিয়া আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন।") হোমারের কথায় তাঁহার মনে হইয়াছিল এটি মানবকুমারী নয়, দেবকন্যা। (ইলিয়াড, ২৪ সর্গ—২৫৮)। বাংলাদেশে উহার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর ভারতচন্দ্রের ধারায় রমণীর রূপ বর্ণনা করা—"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা, পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা" বা "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া", এই সব অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ছড়ান, শুধু হাস্যরসের অবতারণার উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঙালি লেখকের পক্ষে আর সম্ভব রহিল না। তাই বঙ্কিম এই স্টাইলে আসমানির রূপ বর্ণনা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রেরই পরিণত বয়সে লিখিত আর একটি রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমি বাঙালির নূতন রূপানুভূতির প্রথম পরিচয় সমাধা করিব। বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অনুনমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল। অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি।"

আমি অবাক হইয়া ভাবি—এই অনুভূতি বঙ্কিমচন্দ্রকে কে দিয়াছিল! বৈষয়িক ব্যক্তিরা, জড়চেতন ব্যক্তিরা বলিবে, ইহা কল্পিত অনুভূতি, মিথ্যা অনুভূতি। মূর্খের দল! লোকোত্তর অনুভূতি আর মিথ্যা অনুভূতি এক জিনিস নয়। যদি আমরা মানসিক জীবনে আটপৌরেকে ছাড়াইয়াই না উঠিতে পারিলাম, তাহা হইলে দেহের উপর পোশাকী শাড়ি ও ফিনফিনে ধুতি চাপাইবার মূঢ়তা কেন?

কিন্তু শুধু কল্পিত জগতের কথাই ধরি কেন? বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র তাঁহার সৃষ্ট রোমান্টিক জগতেই রমণীর রূপের মহিমা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সাধারণ বাঙালি জীবনেও উহার অনুভূতি আনিয়াছিলেন। এমন কি, রূপের এই নূতন উপাসনা এমনভাবে দেখাইলেন, এমন জায়গায় রূপপূজার প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা কল্পনা করাও কঠিন। বাংলাদেশে গৃহস্থ ঘরে কামের সবচেয়ে ঘৃণ্য রূপ ছিল পরিচারিকা-প্রীতি। কর্তাদের উৎপাতে কোনও সচ্চরিত্রা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের নিরাপদে থাকিবার উপায় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইলেন, এই স্তরের রূপলালসাও কোথায় উঠিতে পারে। এই কাহিনী 'ইন্দিরা' উপন্যাসে আছে।

ইন্দিরা ডাকাতির পর আশ্রয়হীনা হইয়া রামরাম দত্তের বাড়িতে পাচিকা-বৃত্তি করিতেছে। এক সন্ধ্যায় পরিবেশন করিতে আসিয়া অপরিচিত স্বামীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পরে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানাইয়া পত্রও লিখিল। তাহার স্বামীও তখনকার দিনের রেওয়াজ মতো এই প্রস্তাব গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। তিনি ইন্দিরার রূপের একটু আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে যখন রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা গেল কমিস্যারিয়াটের ঠিকাদারের রূপমোহও ঠিক পুরানো ঠিকাদারি স্টাইলের নয়।

ইন্দিরা বলিতেছে, "আমি উপযাচিকা, অভিসারিকা হইয়া আসিয়াছি—আমাকে আদর করিবারও তাঁর অবসর নাই। তিনি সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একবারমাত্র বলিলেন, 'এমন রূপ ত মানুষের দেখি নাই।' "

তারপর ইন্দিরা যখন চলিয়া যাইতে উঠিল, তখন তাহার মল্লিকাকোরকের বালা পরা হাতখানা ধরিয়া যেন বিস্মিতের মতো হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "দেখিতেছ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "এ কি ফুল ? এ ফুল ত মানায় নাই। ফুলটার অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।" তাহার পরে ইন্দিরা যখন চলিয়া যাইতে উদ্যতই হইল, তখন তিনি, আপাতদৃষ্টিতে জার বা উপপতি হইলেও হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "আমার কথা রাখ, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই। আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।" আমাদের পুরাতন চিরপরিচিত পরিচারিকা-প্রীতির এই রূপান্তর কেহ কি প্রত্যাশাও করিতে পারিতেন ? কিন্তু দেখিবার পর তাঁহারাও কি উ-বাবুর মতোই বলিতেন না—"এমন কখন দেখি নাই, এমন আর দেখিব না !"

বঙ্কিমচন্দ্র যখন পরিচারিকা-প্রীতির এই রূপ দেখাইতেছিলেন, তাহার অল্প পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জীবনে নরনারীর সম্পর্কের যে-যুগ ছিল, তাহা সেই সম্পর্কের ঘোর অমানিশা। মুখে সতী-লক্ষ্মী, সীতা-সাবিত্রীর বড়াই যতই থাকুক, লোককটাক্ষের পিছনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে জিনিসটা ছিল, উহা রিরংসা, নির্জলা রিরংসা ছাড়া কিছুই নয়। এই ঘনান্ধকার রাত্রি বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টার দিবা-নিশা দুই ভগিনীর এক ভগিনী নয়, ফ্লোরেন্সের মেডিচি চ্যাপেলে মিকেল এঞ্জেলোর "Notte"-র রাত্রিও নয়। সেই সব রাত্রি মানুষের মনের অপরিসীম, তলহীন প্রশান্তির আশ্রয়। যে-রাত্রি বাংলাদেশে ছিল, তাহার রূপ অন্য প্রকার—Walpurgis Nacht, তবে আরও ক্লেদাক্ত আরও পঙ্কিল : উহা বেশ্যালয়ের শেষ রাত্রি, যখন অপরিমিত মদ্য পানের আবেশে ও অবিরত সম্ভোগের অবসাদে বিস্রস্তবসন যুবক-যুবতী বমির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিত, আর বন্ধুদের সকালে মেস হইতে আসিয়া বন্ধুকে ধুইয়া, মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইত। এই বীভৎস রাত্রির পর সহসা ঊষার রক্তিম বিভা আসিয়া পড়িল—কোথা হইতে আসিল ?

গ্রাম্য মথুরের গ্রাম্য ভাষায় বলা যাইতে পারে, আসিল কলেজে "রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া" ও "দু'পাত ইংরাজী উল্টাইয়া।"—অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের মারফৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে। ইহার সপক্ষে শুধু শেকসপীয়রেরই উল্লেখ করিব। বাঙালি শুধু তাঁহার ভাষা হইতে রূপের যে গৌরবের সন্ধান পাইয়াছিল, কোনও চিত্র হইতে তাহা পায় নাই। তাই অমরনাথ "সেক্সপীয়র গ্যালারি"র ছবি দেখিয়া শচীন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই ?" এবং জুলিয়েটের মূর্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই ?"

এইভাবে ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ফলে বাঙালির মানসিক জগৎ রূপ ও প্রেমের বিভায় এমনই বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে বলিতে পারিত—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

এই অনুভূতিই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রমণীর রূপের বর্ণনাতে পাই। রবীন্দ্রনাথ উহার উপযুক্ত অনুবর্তন করিয়াছিলেন।

কিন্তু উহা মানস জীবন হইতে সত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পুরাপুরি সুযোগ কখনও পায় নাই। এমন কি পুরাতনপন্থীরা উহাকে সাহিত্যেও গ্রহণ করা দূরে থাকুক, উহার কদর্থই করিয়াছে। আমাকে ছাত্রাবস্থায় সমপাঠীর মুখে প্রবীণদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার বিকৃত ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। উহার একটি "হৃদয়-যমুনা"। উহা নাকি বিবস্ত্রা নারীর স্নানের দৃশ্য প্রকারান্তরে দেখাইবার জন্যই লেখা হইয়াছিল। আর একটি কবিতা "শ্রেষ্ঠ দান"। উহার এই কয়টি চরণ—

"অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে,
ভূতলে।"

—লেখা হইয়াছিল নগ্ন নারী অঙ্কিত করিবার জন্যই। যাহারা আশ-শ্যাওড়ার আড়ালে লুকাইয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মাঠে যাওয়া দেখিয়া কাম তৃপ্ত করিতে পারিত, তাহাদের উপযুক্ত কাব্য-সমালোচনাই বটে। অতি-আধুনিক অশ্লীলতা এই পবিত্রতারই উল্টা পীঠ।

রূপের পূজা জীবনে গ্রহণ না করিবার কারণ প্রথমত আমাদের সামাজিক জীবনের একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা। উহাতে নিঃসম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ একেবারে না থাকাতে রূপের প্রতি ব্যাপকভাবে নিষ্কাম মুগ্ধতা কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আজকাল মেলামেশা বেশি হইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও উহা স্বাভাবিক, সাবলীল বা ধাতস্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণ কমই পাই। সমপাঠী বা সহকর্মী যে সমপাঠিনী বা সহকর্মিণীর জন্য গাছে বা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে সিক্ত মার্জারের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, উহাকে আমি স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক ও সামাজিক মেলামেশা বলি না, কারণ পিতার গৃহদ্বার দৃষ্টিগোচর হইলেই তরুণী আনতলোচনা ও আরক্তমুখী হন, এবং অপর পক্ষ চম্পট দেন।

তাই দৈনন্দিন জীবনে রূপ দেখিবার সুযোগ এত কম যে, উহার জন্য অনেকেরই সিনেমার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই। কিন্তু তাহা তো জীবন্ত রূপ দেখা নয়, স্বাভাবিক মানুষের রূপ দেখা নয়, এমন কি অভিনেত্রীর রূপ দেখাও নয়, উহা কাপড়ের উপর রূপের অশরীরী ছায়া মাত্র। অনেক সময়ে তাহাও জোটে না, তাই রাস্তার মোড়ে মোটর-চালকের বিভ্রান্তিকারী, অতিবৃহৎ, বর্বরোচিত রঙ ও রেখায় অঙ্কিত পোস্টারের দিকেই হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয়। এই সব প্রতিমা সামনে রাখিয়া রূপ-পূজা সম্ভব নয়।

ইহার পরও আর একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে, যাহার কথা বলিলে পাঠক-পাঠিকা হয়তো আশ্চর্য হইবেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার কথাটা অসঙ্গত নয়। রূপের সহিত প্রেমের একটা নিগূঢ় যোগ আছে, দুটি অঙ্গাঙ্গীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু হিন্দুর দাম্পত্য জীবনে এই যোগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে বিশেষ বাধা আছে। যে-প্রেম রূপের দ্বারা জাগ্রত হয়, তাহার প্রথম বেগ যতই প্রবল হউক, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান হইতে সময় লাগে; শুধু যে সময়ই লাগে তাহাই নয়, রূপের সাক্ষাৎ দৈহিক উপভোগ হইতে কিছুকাল বঞ্চিত থাকিবারও অপেক্ষা রাখে। এই জন্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপ যদি বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা প্রেমের ভিত্তি হইবার আগেই কামের অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে বিবাহিত জীবনে সত্যকার রূপানুভূতির পথে বাধা জন্মে। যে-রূপ দেখিলে বিবাহের বহু বৎসর পরেও স্বামী বলিতে পারেন—ইনি গৃহে লক্ষ্মী, নয়নে অমৃতবর্তি, ইঁহার বাহু মৌক্তিক হার, ইঁহার স্পর্শ চন্দনানুলেপন, সেই রূপের অনুভূতি অল্প ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে।

ইহার জন্য আমাদের প্রথাগত দাম্পত্যজীবনের ধারাও দায়ী। এই ধারায় গঠিত জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের সব দিক মিলাইয়া কখনও কোনও সমন্বয় করা হয় নাই, উহার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন কোঠায় আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। বড় কোঠাগুলির উল্লেখ সংক্ষেপে করা যাইতে পারে। প্রথম কোঠা বিবাহের সামাজিক কর্তব্য সাধনের জন্য রিজার্ভ করা, অর্থাৎ উহা সন্তানোৎপাদন ও গৃহস্থালীর ক্ষেত্র—উহা সমগ্র পরিবারের তত্ত্বাবধানে ছিল, তাহাতে অল্পবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর কোন হাতই ছিল না, সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব কোনও পারিবারিক জীবনও ছিল না। দ্বিতীয় কোঠা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর স্নেহের, প্রেমের নয়—দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তত অর্ধেক ক্ষেত্রে এই স্নেহ কখনও জন্মাইত না। তৃতীয় কোঠা কাম পরিতৃপ্তির, ইহাতে অনেক সময়েই (সব সময়ে নয়), স্ত্রী গহনা-কাপড়-পয়সা-আদায়কারিণী গণিকার বৃত্তি করিতেন, আর স্বামী ধর্মভ্রষ্ট না হইয়া বারবনিতা ভোগ করিতেছেন মনে করিয়া খুশি হইতেন। সব দিকে তুচ্ছ বা হেয় না হইলেও এই দাম্পত্যজীবনের কাঠামোতে না প্রেম, না রূপপূজা, কিছুরই স্থান ছিল না।

কিন্তু ইহা ছাড়াও বাঙালি সমাজে রূপের আর এক ধরনের অপমান হইত। উহার কথা না বলিলে আমার প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিবে। রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই অল্প বয়সে বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়া যাইত, অর্থাৎ মেয়ের পিতা সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কন্যাকে রূপের বাজারে বিক্রয় করিতেন। এই বড়লোকের ছেলেদের অনেকেই বিবাহের পূর্ব হইতেই বেশ্যা বা উপপত্নীর সংসর্গ করিতে অভ্যস্ত থাকিত। সুতরাং পত্নী কিছুদিনের জন্য একটি অতিরিক্ত উপপত্নীর পদ পাইত। এই সাময়িক মোহ ঘুচিয়া গেলে ধনীপুত্র বারাঙ্গনার কাছে ফিরিয়া যাইত।

কলিকাতার সমাজে রূপের এই নিষ্ঠুর অবমাননার একটি নিদারুণ গল্প রবীন্দ্রনাথের "মানভঞ্জন"। গিরিবালার সে কি রূপ! "শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে। গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।"

কিন্তু এই সৌন্দর্যের উপাসক তাহার স্বামী নয়। সে "যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে 'প্রাণনাথ', 'প্রাণেশ্বর' করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোট পরা ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী 'এক্সেলেন্ট্‌' 'এক্সেলেন্ট্‌' করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।"

একদিন গিরিবালা তাহার স্বামীকে পাইল, ভাবিল তাহাকে জয় করিবে। কিন্তু গোপীনাথ "তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।" কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। "কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত।"

সম্প্রতি আর একটি রূপ বিক্রয়ের বাজার জুটিয়াছে। সেটি সিনেমা-স্টুডিও। যাঁহারই রূপ আছে, তিনিই অভিনেত্রী হিসাবে যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে (আর কোন্ সুন্দরী যুবতীর অভিনয়ের ক্ষমতা নাই!) সেখানে আত্মবিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছেন, পিতারও উদ্যোগ আছে। এই ইচ্ছা সকলের ক্ষেত্রে পূর্ণ না হইলেও রূপ যে-ভাবে সেদিকে যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় প্রেম ও দাম্পত্য জীবন শীঘ্রই রূপ হইতে বঞ্চিত হইবে।

এ-কথা কখনই বলিব না যে, যাঁহারা ওদিকে ঝুঁকিতেছেন, তাঁহারা এক ধরনের সাফল্য পাইবেন না। যাহা পাইবেন, তাহাও কাম্য। এমন কি লৌকিক দিক হইতে উহাকে সর্বোচ্চ সাফল্যই বলা চলে, কারণ উহাতে খ্যাতি হইবে, ঐশ্বর্য হইবে, ভক্ত জুটিবে, পূজা পাওয়া যাইবে। যাঁহারা ঠিক জায়গায় রূপকে পণ্য করিতে পারেন, তাঁহাদের সাংসারিক প্রতিষ্ঠার অভাব কখনও হয় না। অতীতে তাঁহাদের অনেকেই রাজরানী হইয়াছেন।

আমি দিল্লিতে রোজ সকালে যে-বাগানে কুকুর লইয়া বেড়াইতে যাই, উহার নামকরণ এক বাদশাহ-বেগম ও বাদশাহ-মাতার নামে হইয়াছিল। তিনি মহম্মদ শাহের স্ত্রী ও আহমদ শাহের মাতা। কিন্তু যৌবনে তিনি নাচওয়ালী ছিলেন, নাম ছিল উধামবাঈ। এইরূপ পদোন্নতির সংবাদ আব্বাসীয় খলিফাদের মাতৃকুল খুঁজিলে আরও অনেক পাওয়া যাইবে। খলিফা-অল-মনসুরের মাতা বের্বের-জাতীয়া ক্রীতদাসী ছিলেন, অল-মামুনের মাতা ইরাণী ক্রীতদাসী ছিলেন, অল-ওয়াথিক ও অল-মুহতাদির মাতারা ছিলেন গ্রিক ক্রীতদাসী, অল-মুস্তাইনের মাতা ছিলেন স্লাভ-জাতীয়া ক্রীতদাসী, অল-মুকতাফি ও অল-মুকতাদিরের মাতারা ছিলেন তুর্ক ক্রীতদাসী, অল-মুস্তাদির মাতা ছিলেন আর্মানী ক্রীতদাসী, স্বয়ং হারুন-অল-রসীদের মাতা বিখ্যাত অল-খাইজুরানও ছিলেন বিদেশী (অর্থাৎ আরব নয়) ক্রীতদাসী। ইঁহাদের সকলেই রূপের জন্য সম্রাট-পত্নী, সম্রাট-মাতা হইয়াছিলেন। ইহার পর মূর্খও স্বীকার করিবে যে, সংসারের কাছে রূপ বিক্রয় করিলে সংসার তার যথেষ্ট মূল্যই দিয়া থাকে।

কিন্তু সে-মূল্য সাংসারিক মূল্য, অন্য কোনও মূল্য নয়। যে-জগৎ ঊষার আলো ও চতুর্দশীর জ্যোৎস্নার তুল্য ভালবাসা প্লাবিত, যেখানে স্নেহ আষাঢ়ের নবীন মেঘের মতো, করুণা ভরা বাদরের মতো, যে-জগতের সুখ নদীর স্রোতের মতো, যে-জগতে পাখি উড়ে ও গান গায়, যে-জগতের বনে দেহসৌন্দর্যে অপরাজেয় বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়, হরিণ লাফাইতে লাফাইতে চলে, যে-জগতে শিশু খেলা করে, যে-জগতের উপর বিশ্বনিয়ন্তার আশীর্বাদ অবিরত বর্ষিত হইতেছে, এ সেই জগৎ নয়। আজ পর্যন্ত এমনটি কখনও দেখা যায় নাই যে, কেউ সংসারের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের অনির্বাণ উৎসবে যোগ দিতে পারিয়াছে। তাই যীশু সারা পৃথিবীর একাতপত্র আধিপত্যের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

তবু তো আজিকার রূপসীরা নিজেদেরকে শুধু লোকোত্তর জীবন হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। সেকালে যাঁহারা রূপের হাটে নিজেদের বিক্রয় করিতেন বা ভাগ্যদোষে বিক্রীত হইতেন, তাঁহাদের প্রেমেরও অধিকার ছিল না। তাঁহাদের ঐশ্বর্যের ভোগের, এমন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি মর্যাদারও কোনও ক্রটি হইত না। আমীর-অল-মুমির্নিন যখন বাগদাদের বাব-অল-ধাহাব অথবা অল-খুল্‌দ্ বা অন্য প্রাসাদে সহস্র ক্রীতদাসীর মধ্যে একজনের ঘরে সন্ধ্যাযাপনের জন্য যাইতেন তখন যাহাদের কক্ষ পার হইয়া যাইতেছেন, তাহারা নিজেদেরকে খণ্ডিতা না মনে করে সেজন্য দ্বারের পাশে রক্ষিত বহুমূল্য চীনা রেকাবে একটুকু মৃগনাভি রাখিয়া যাইতেন। এই মর্যাদা তাহাদের অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

হয়তো এই মরুভূমিতে বাস করিতে না পারিয়া কেহ টাইগ্রিস-নদীর উপরে নৌকা হইতে বা বাগান হইতে দড়ির মই দিয়া প্রণয়ীকে ঘরে আনিত ; কিন্তু তাহার কাছে ভালবাসার যাহা চরম আত্মসমর্পণ, সেই আত্মনিবেদনের সাধ্য ছিল না। কারণ যুবতীর অতিপিনদ্ধ অন্তর্বাসে সুতার কাজে অতি সুন্দর আরবি অক্ষরে যাহা লেখা থাকিত, তাহা দেখিলে মনে হইত অপরূপ কারুকার্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য অতি ভয়ানক—"ইহা আমীর-অল-মুমিনিন অল-মুকতাদির বিল্লার সম্পত্তি। সাবধান !" তাই অশ্রুসিক্ত আকুল চুম্বন দিয়াই প্রণয়ীকে বিদায় করিতে হইতে।

দিল্লির শাহজাদীরা আরও অভাগিনী ছিলেন। তাঁহাদেরকে মর্মে মর্মে বুঝিতে হইত যে সম্রাটের কন্যা হইয়াও তাঁহারা ক্রীতদাসী। বিবাহের স্বাধীনতা দূরে থাকুক, ভালবাসিবার স্বাধীনতাও তাঁহাদের ছিল না। সাজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা বেগমের কথাই বলিতেছি। বাদশাহ জানিতেন, কন্যার প্রণয়ীরা কখনও কখনও মহলে প্রবেশ করে। একদিন এই সন্দেহে হঠাৎ তিনি কন্যার কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শাহজাদীর এক প্রণয়ী ভিতরে ছিল। তাহাকে লুকাইবার আর কোনও জায়গা না পাইয়া জাহানারা পাশের হামামে এক বৃহৎ কটাহের মধ্যে বসাইয়া রাখিলেন। বাদশাহ চাহিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন এবং কন্যাকে বলিলেন, "তুমি যেন অনেক দিন স্নান কর নাই, এখনই স্নানের ব্যবস্থা করিতেছি।" তখনই খোজা ডাকিয়া ঐ কটাহের নীচে আগুন জ্বালানো হইল। যতক্ষণ না খোজা ইশারা করিল যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ততক্ষণ বাদশাহ বসিয়া রহিলেন। এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া, একটি আর্তনাদ না করিয়া শাহজাদীকে ইহা সহ্য করিতে হইল। দুর্ভাগিনী !

বার্নিয়ার এইরূপ লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা শোনা কথা হইতে পারে। কিন্তু যে-সমাজে এইরূপ গল্প রচিত হইতে পারে এবং জনসাধারণ বিশ্বাস করিতে পারে, সে কি সমাজ !

সে যাহাই হউক, যাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে জীবনের স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান, তাঁহাদের ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব আমার নয়। আমি শুধু আমার কথা বলিয়াই খালাস। তারপর তাঁহাদের ধর্ম তাঁহারা জানেন।

আমার কেবল ইহাই বিবেচনার বিষয় যে, ভুল পথে যাওয়ার ফলে বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে মানসিক জীবনের ও বিশেষভাবে প্রেমের কোনও ক্ষতি হইয়াছে কিনা। রূপসীদের বড়লোকের ঘরে বিবাহ হওয়ার ফলে ক্ষতি যে হইয়াছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ক্ষতি ভবিষ্যতে আরও গুরুতর হইতে পারে।

তবে বাঁচোয়া এই যে, আমাদের মধ্যে সাধারণত রূপ আর বর্ণকে এক বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ গৌরী না হইলে রমণীরা 'সুন্দরী' বলিয়া স্বীকৃত হন না। তাঁহাদের তনুদেহের সৌষ্ঠব যতই সঞ্চারিণী-পল্লবিনী লতার মতো হউক না কেন, মুখশ্রী যতই অনবদ্য হউক না কেন, ভাব যতই মধুর হউক না কেন, তাঁহারা নিরেস বা খুব বেশি হইলে চলনসই-এর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীতেই পড়েন

ইহার কারণ অবশ্য প্রাচীন আর্যের বর্ণে আস্থা ও বর্ণের অহঙ্কার। যে সামাজিক অপরাধ জাতিসঙ্কর তাহাকে এই আস্থা ও অহঙ্কার হইতে তাহারা বলিত বর্ণসঙ্কর। আদিতে আর্য জাতি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় জাতি, বর্ণের অহঙ্কার ইউরোপীয় মাত্রেরই অস্থিমজ্জায়। সেই শ্বেতাঙ্গ জাতি যখন ভারতবর্ষে আসিয়া মলিন বর্ণ হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহার বর্ণের প্রতি আসক্তি আরও বাড়িয়া গেল। এই দুর্বলতা যে আমারও নাই এ-কথা বলিব না। একদিন আমার একটি ভাগিনেয়ীকে লইয়া আমি এক ইউরোপীয় বন্ধুর পার্টিতে গিয়াছিলাম। একজন ফরাসি ভদ্রলোক তাহার দিকে চাহিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম এই সুন্দরী মেয়েটি কে ?" আমি সত্যই চমকিয়া উঠিলাম, কারণ আমার ভাগিনেয়ী শ্যামা।

তবে এই মোহের বশে বড়লোকের ঘরে শুধু গৌরীরা বিক্রীত হইবার ফলে, যাঁহাদের গৌরবর্ণ ছাড়া আর সকল সৌন্দর্যই আছে, তাঁহারা অন্তত প্রেম, স্নেহ ও ভক্তির ভাগে পড়িয়াছেন। সৌন্দর্য হইতে জীবন একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। একদিক হইতে ইহা লাভেরই কথা। কারণ বাঙালি সমাজে গৌরবর্ণ, সত্যকার গৌরবর্ণ, এত কম যে, গৌরাঙ্গীরা তাঁহাদের বর্ণ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন ও উগ্র অহমিকায় ভরা হইয়া থাকেন। তাই সমান গৌর না হইলে তাঁহারা কাহাকেও ভালবাসা দিতে পারেন না। এমন কি যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানেও আমাদের বর্ণ লালসা হইতে উহার মধ্যে একটা বিসম্বাদী ভাবের, ভোগের আশ্লেষ আসিয়া পড়ে। এই কথাটা সকলেই নিজের অনুভূতি দিয়া প্রণিধান করিতে পারিবেন।

তাই বলিব, যাঁহারা সচল ইন্দ্রনীল পুত্তলিকার মতো, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীল আকাশের মতো, শ্যামায়মান বনানীর মতো, হরিৎ ক্ষেত্রের মতো, বাংলার কালিন্দী—আমার অতি সাধের মেঘনার মতো, তাঁহারাই আমাদের মনপ্রাণ জুড়িয়া থাকুন। মা বা দিদি হইলে তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিব, কনিষ্ঠা হইলে মাথায় হাত রাখিয়া চিরসুখী হইবার জন্য আশীর্বাদ করিব, কন্যা হইলে কোলে বসাইয়া ললাট চুম্বন করিব, আর প্রিয়া হইলে বুকে বাঁধিয়া কানে কানে যে কথা কহিব, তাহা তখনই ভুলিয়া যাইব, তাই কখনও প্রণয়গুঞ্জনের শেষ হইবে না।

শ্বেতাঙ্গিনী হইলে কি তাহা পারিতাম ? আর্যের অতৃপ্ত ও অনির্বাণ বর্ণপিপাসা দুই-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "মধ্যবর্তিনী"র মতো অলঙ্ঘ্য বাধা রচনা করিত। তাই নয় কি ?

শারদীয়া দেশ, ১৩৭৩



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# অসতীত্ব : পুরাতন ও নূতন

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসও বাঙালির প্রেমের দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবারই কথা। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুই-এর সমন্বয় করিয়াছিলেন। আমার পিতা আমাকে অল্পবয়সে একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নীরু, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি বউ ঘরের বার হয়েছে।' তবু তাহাদের সকলেই সতী রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় দেখান নাই,—তাহা কি তিনি ব্রাহ্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বলিয়া ? কে জানে ?

যাহা হউক, সেকালের বাঙালি জীবনে ও একালের বাঙালি জীবনে অসতীত্বের কথা এখন বলিব। হয়তো আমার পাঠক-পাঠিকারা এই কথাটা আমার মুখে শুনিয়া অবাক হইয়া যাইবেন এমন কি হয়তো বিশ্বাসও করিবেন না যে, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার সূত্রে ইউরোপীয় জীবনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে সতীত্ব সম্বন্ধে বড়াই দূরে থাকুক সতীত্বের প্রশংসাও নাই। বরঞ্চ এ-কথাটাই সত্য যে, পুরাতন বাংলা সাহিত্য অসতীত্বের স্তুতিতেই পূর্ণ। সে সাহিত্যে কোথাও সতীত্বে সুখ আছে এ-কথা নাই, বরঞ্চ অসতীত্বেই যে আনন্দ ও সুখ তাহার ঘোষণা আছে। একটি কবিতা হইতে ইহা দেখাইতেছি।

একটি যুবতী বধূ সচ্চরিত্রা, স্বামী প্রবাসে, শাশুড়ি কন্যার সন্তান হওয়াতে তাহার বাড়ি গিয়াছেন, দেবর শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, তিনি একাকিনী বাড়িতে আছেন, গ্রামে তাঁহার প্রণয়ের (অর্থাৎ দৈহিক মিলনের জন্য) পিপাসু বহু যুবক আছে। তবুও তিনি পথভ্রষ্টা হন নাই, কিন্তু দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

'পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্মভয়
এত করে মরি লো।
পরপুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ,
এ কি জ্বালা সদা জ্বলি,
হরি, হরি, হরি লো!'

বাঙালি মেয়ের চিরাচরিত পরপুরুষ প্রীতির বর্তমানকালে বহুল ব্যতিক্রম দেখিয়া আমি দুঃখ অনুভব করি, ও সেই দুঃখের বশে অক্সফোর্ড-এ বাস করিয়া তরুণী (অবশ্য আজকালকার হিসাবে) বাঙালি বধূদের যাহা বলি, তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। কোনও যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি। যখন মেয়েটি বলে—'স্বামী-স্ত্রী', তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি, 'হায়, হায় ! এ কি হল ! বাঙালি যুবতীর এত অধঃপতন হয়েছে, তা তো আমি কল্পনাও করতে পারতুম না ।' তখন প্রশ্ন হয়, 'কেন ?' আমি বলি, 'বাঙালি মেয়ে যখন সত্যিকার বাঙালি মেয়ে ছিল, তারা কখনও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আসবার মতো কুকাজ করবে ভাবতেও পারত না ।' আবার প্রশ্ন হয়, 'তবে কি করত ?' আমি উত্তরে বলি যে, স্নান করিতে যাইতে যাইতে পথে একটি যুবককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিত—

'আহা ম'রে যাই, লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে ॥'

সেই বাঙালি মেয়ে আজ স্বামীর সঙ্গে বিলাতবাস করিতেছে, তাও আবার সেই স্বামীর মুখ দাড়ি গোঁপে সমাচ্ছন্ন, নাভির অধোদেশ নীল রং-এর মোটা কাপড়ের জীন্‌স-এ আবৃত ! এটা কি পরিতাপের বিষয় নয় ?

যুবতী বধূরা যখন দল বাঁধিয়া ঘাটে যাইত তখন তাহাদের মধ্যে এই রূপবান যুবক সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত-রূপ কথাবার্তা হইত—

প্রথমা । 'কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে ।
বিরহে জ্বলিঞা সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ।'

দ্বিতীয়া । 'আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি ।
হলদি জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিঞা হৃদয়ে মাখি ।'

হঠাৎ বাড়ি ফিরিতে হইবে মনে পড়িয়া গেল ।

তাই একজন বলিল,

ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার ভাতার জরা ।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥'

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে এই যুবতীদের পতি সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিল । প্রাচীন বাংলা কাব্যে-গল্পে পতিভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দূরে থাকুক পতি লইয়া সন্তোষের কথাও নাই । যাহা আসলে থাকিত উহা নারীগণের পতিনিন্দা । উহা এত সহজবোধ্য ও খোলাখুলি ভাষায় হইত যে উহাকে কাল্পনিক উক্তি মনে করা কঠিন । পত্নীদের পতিনিন্দার মূলে ছিল বাল্যবিবাহ । অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার পরে স্বামী-সহবাস করার ফলে স্বামী সম্বন্ধে কোনও কাব্যময় রোমান্টিক ভাব পোষণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল । প্রাচীন কাব্যে একমাত্র কবি-স্বামী ভিন্ন অন্য স্বামীর প্রশংসা স্ত্রীদের মুখে পাওয়া যায় না । ইহার জন্যই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'কবির পুরস্কার' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন । অবশ্য এ-কথা বলিতে পারা যায় যে, কবিরাই যখন সাহিত্যস্রষ্টা তখন তাঁহারা স্ত্রীদের মুখে কবি-স্বামীর নিন্দার কথা দিবেন না । তবে অন্য স্বামীদের বৈষয়িক বা সামাজিক পদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ অনেক নিন্দাই যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

সেজন্য, অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় উক্ত বলিয়া সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। তাহা হইলে আজকালকার অনেক স্বামী মনে কষ্ট পাইতে পারেন, বিশেষত অধ্যাপকেরা ও রাজকর্মচারীরা, কারণ সেকালের বাঙালি যুবতীদের বিরাগ ইঁহাদের সম্বন্ধেই বেশি ছিল। এই বিরাগের কেন হ্রাস হইতেছে তাহা আমি বুঝি না।

তাঁহাদের আবার অসতীত্বের একটা 'ফিলসফি'ও ছিল। সেটা ভারতচন্দ্র এইরূপে ভাষাগত করিয়াছিলেন—

'কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুল-ফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥'

বাঙালির চিন্তাধারার এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়াই প্রমথ চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সমর্থন করিবার জন্য বাঙালি সমালোচককে উদ্দেশ্য করিয়া একবার লিখিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের বেনামীতে এই সব গান লিখিলে কোনও বাঙালি পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে দোষী করিতেন না।

এই প্রাচীন প্রেমিকাদের জন্য সেকালের আচারবিচার-মানা বাঙালির মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থানের দুর্নাম হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, অভিসারিণীরা প্রণয়ের আকর্ষণে 'সঙ্কেত তরু মূলে', 'সঙ্কেত নদীর কূলে', ঘাটে, ভাঙা মঠে ও মাঠে যাইতেন, সুতরাং জায়গাগুলির প্রতিও বিরাগ দেখা গেল। তাহা হইতে 'করোলারী' এই হইল, যে-সব যুবতীর গাছপালা, নদী, বাগান, পরিত্যক্ত মন্দির সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাহারা কুচরিত্রা, এমন কি ভ্রষ্টা। একটি নিষ্ঠুর অথচ সত্য ঘটনা হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯১৬ সনে আমার ভগিনীর বিবাহ হয় ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার মধ্যে কংশ নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ গ্রামে। আমি সেই গ্রামে ভগিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়া ভগিনীর ভাসুরের মুখে এই ঘটনাটির কথা শুনিলাম। গল্পটি এইরূপ।

বিবাহের পর একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পাকস্পর্শ হইতেছে। বধূ পরিবেশন করিতেছে, ননদ তাহাকে ধরিয়া আছে। এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় জ্ঞাতি ভাতের সঙ্গে লেবু চাহিলেন। শাশুড়ি জানাইলেন যে, ঘরে লেবু নাই। বধূটি খিড়কির ঘাটে যাইবার সময়ে একটি বড় লেবু গাছে একটি লেবু দেখিয়াছিল। সে ননদকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া লেবুটির কথা বলিল। জ্ঞাতিরা 'কি বলিল' 'কি বলিল' জিজ্ঞাসা করিলে ননদটি লেবুর উল্লেখ করিল। তখনই জ্ঞাতিরা হাত গুটাইয়া পাত হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আমরা এই কুলটা মেয়ের হাতের অন্ন স্পর্শ করব না।' মেয়েটি পরিত্যক্তা হইল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিটা এই—মেয়ে যখন লেবু গাছে লেবু দেখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসিবার একদিনের মধ্যেই সেই গাছের নীচে উপপতির সহিত সঙ্গত হইয়াছে। একটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতায় 'তথাপি তত্র রেবারোধসি বেতসী তরুতলে...চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে' এই কথাটি আছে। কিসের জন্য চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞাতিদের কাজটি অবচীন বাঙালি সমাজে কবিতাটির 'প্র্যাকটিক্যাল' প্রয়োগ। যে কৌমারহর সে-ই বর, এই প্রয়োগে উহার ইঙ্গিতও নাই। ব্যাপারটা যে কত অন্যায় ও নিষ্ঠুর তাহার কোনও অনুভূতিও বলিবার সময়ে প্রকাশ হইল না। আমার তখন বয়স অল্প, সবে আই-এ পাশ করিয়াছি। তাই এই ত্যাগের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লেবু দেখেছে তো কি হয়েছে ?' আমার ভগিনীর ভাসুর শুধু মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। যতই স্থূল হউক, উহার পিছনে দেশাচার নিশ্চয়ই ছিল।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিবাহবন্ধনের বাহিরে ভালবাসা পাইবার এই যে আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা আধুনিককাল পর্যন্তও লৌকিক গানে প্রকাশ পাইতেছিল। একটি গান আমি অল্প বয়সে আমাদের অঞ্চলে শুনিতাম। সম্প্রতি নির্মলেন্দু চৌধুরী উহা গাহিয়াছেন। উহা উদ্ধৃত করিতেছি—

'সুজন বন্ধু বাইয়া নাও,
একখান্ কথা কইয়া যাও,
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা
পান খাইয়া যাও।
রাঙা ঠোঁটে রাঙা পান,
শরমে রাঙ্গাইল প্রাণ,
হাসির বিজুলী দিয়া
পরাণ রাঙ্গাও।
বসে রইলাম নদীর ঘাটে
বন্ধু, তোমায় পাইবার আশে,
মাস যায় বছর যায়
প্রাণবন্ধু না আসে।
সোনার বরণ হইল কালা,
পিরিতের ওই অমনি জ্বালা,
ভাটিয়ালি গান গাইয়া
পরাণ রাঙ্গাও—
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা
পান খাইয়া যাও।'

এখন জিজ্ঞাস্য, এই সব কি কবিদের কবিত্ব বা রসিকতা, বা, নীতিবান লোকের কথায়, বদ্-রসিকতা ? না, এই সব কবিতার মূলে প্রচলিত সামাজিক আচরণও ছিল ? বিবাহের বাহিরে প্রেমের যে একটা প্রাচীন ধারা ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় এক ধরনের বাক্য ব্যবহার হইতেও অনুমেয়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৪-১৫ সনের কথা। আমি কলিকাতায় কলেজে পড়ি। আমাদের পরিবার কিশোরগঞ্জে থাকে। ছুটিতে গেলে মা আমার পরেরই যে ভাই তাহার সম্বন্ধে নালিশ করিতেন। আসলে সে তখন বিপ্লবী দলে জুটিয়া গিয়াছিল,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহার বিপ্লবী সহকর্মীরা বাড়ির বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিলেই সে কয়েক ঘণ্টার জন্য উধাও হইয়া যাইত। মা আমাদের কাছে বলিতেন, 'বাপ-মা, দাদা, কারুর কথাই তো গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু বন্ধুরা এসে কুহুস্বরে ডাক দিলেই পালিয়ে যাবে।' মা 'কুহুস্বরে' কথাটা কেন বলিতেন, বুঝিতে পারিতাম না, মাও নিশ্চয়ই জানিতেন না, নহিলে তিনি যেরূপ ব্রাহ্মপন্থী ছিলেন, উহা কখনই ব্যবহার করিতেন না। পরজীবনে পুরাতন বাংলা কাব্য পড়িয়া 'কুহুস্বরে' এই 'ইডিয়াম'-টার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম। কবিতাটি এইরূপ,—

'সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।
রামা বলে হৈল দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে হোর কাম ভয়ে পাছে ঘোর।
শ্রান্ত আছ নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল ॥
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়,
আর কি তোমারে ভয়, বলে দুই রাখিল।'

ইহার অর্থ কলিকাতার দিকে যে 'বাংলা করে বলে ফেলুন না',—উক্তিটি প্রচলিত আছে, সেইরূপ বাংলায় বুঝাইব। উপপতি বাগানে ঢুকিয়া কোকিলের ডাকের অনুকরণ করিয়া প্রণয়িনীকে বাহির হইয়া আসিতে ইসারা করিল। তাহার সঙ্কট স্বামী পাশে শুইয়া আছে, হঠাৎ জাগিয়া হয়তো দেখিবে স্ত্রী শয্যায় নাই। তাই কোকিলকেই যেন গালি দিতেছে এই ছল ধরিয়া বলিল, 'হতভাগা পাখি, তুই ভেবেছিস তোর ডাকে আমার বিরহব্যথা জেগে উঠবে, একেবারে না, আমার স্বামী কাছে রয়েছে, বিরহ নেই। দূর হয়ে যা, পোড়ারমুখো পাখি।' আমার মার 'কুহুস্বরে ডাকা' কথাটা এই দেশাচার হইতে আসিয়াছিল।

আর একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদ ছিল, 'কুকুর মারে হাঁড়ি ফেলে না।' বঙ্কিমচন্দ্র ইহার ব্যাখ্যা দিলেন, 'ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এ দেশের লোক তাহাদের বর্ণনার সময়ে বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা বা ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন।'

বঙ্কিম নিশ্চয়ই বার্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনীতে সাজাহান ও জাহানারা বেগম সম্বন্ধে গল্পটি পড়িয়াছিলেন। অবিশ্বাসিনী বেগমদিগকে, অথবা প্রণয়ীরা বেগম-মহলে ধৃত হইলে তাহাদিগকে যে আংটা হইতে ফাঁসি দেওয়া হইত তাহা দিল্লির রঙ-মহলের ও অন্য ইমারতের নীচের তলায় আছে।

কুকুর মারার ব্যাপার আমার অল্প বয়সে কিভাবে নিষ্পন্ন হইতে ইহার বিবরণ একটি সত্য ঘটনা হইতে দিব। ১৯২৩-২৪ সনে আমি ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রিটে বন্ধু বিভূতিভূষণের (ঔপন্যাসিকের) সহিত মেসে থাকি (আমিই তাঁহাকে এই মেসে আনি)। তিনি একদিন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'ওহে নীরদ, ন-এর কথা মনে আছে, সেই যে আমাদের সঙ্গে রিপন কলেজে পড়ত ?' আমার মনে না থাকায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আরও বলিলেন, 'স্কলার হয়েছে হে, ফ্রেঞ্চ পড়ে, প্রমথ চৌধুরীর কাছে যায়।' আমি বলিলাম, 'তা তো যেন হলো, এখন তার কথা কেন ?' বিভূতিবাবু 'বলছি' এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়া গল্পটি বলিলেন।

'এখন সে অমুক গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থেকে মাস্টারি করছে। (কলিকাতার অল্প দূরে, রেলে আসা-যাওয়া করা যায় একটি গ্রাম।) বৌ ছেলেমানুষ। কিন্তু শাশুড়িকে নিয়ে কানাঘুষো চলছে। জান তো, সব বাবুরাই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় চাকরি করে। তাইতেই সুযোগ।'

ইহার কিছুদিন পরে আসিয়া খবর দিলেন, 'ওহে ন শাশুড়িকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে—স্ট্রিটে আছে। (আমাদের মেসের কাছেই একটা গলির নাম করিলেন)। চল না, দেখে আসবে। জবর শাশুড়ি। বেশ সুখে আছে দুজনে।'

আমি যাইতে কোনপ্রকার আগ্রহ দেখাইলাম না। আবার আসিয়া বলিলেন, 'বড় তামাশা হয়েছে হে, বৌকেও নিয়ে এসেছে। এখন মা মেয়েতে একসঙ্গে ন-এর সঙ্গে আছে। চল, চল, তামশাটা দেখবে চল।'

তখনও আমি রাজী হইলাম না। ইহার পর আসিয়া বলিলেন, 'আরও মজা হয়েছে হে। শ্বশুর এসে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

ইহারও পর আবার খবর দিলেন, 'শ্বশুর ঝানু। মেয়েকেও নিয়ে গেছে। এখন ন একলা বসে হুক্কাহুয়া দিচ্ছে।'

ইহাই আধুনিক কুকুর মারা, হাঁড়ি না ফেলা।

আজকালকার স্বামী-স্ত্রীদের এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এখন পুরাতন কুলীন মেয়ের বিবাহের মতো বিবাহ আবার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং কুলীন মেয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে। তাহা এইরূপ—

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে,  
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।  
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই,  
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই।'

বয়সের তারতম্য অবশ্য আজকাল সাধারণত এত বিপরীত হয় না, তবুও সমান সমান হইতে পারে। তাই এখন শাশুড়ি-জামাইঘটিত ব্যাপার আর সম্ভব নয়। তবে সেকালে অনেক সময়েই শাশুড়ি ও জামাতার বয়স প্রায় সমান সমান হইত, বধূ হয়তো হইত এগারো-বারো বছরের। তাই যে-সব শাশুড়িরা আচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন তাঁহারা জামাতার সম্মুখেও ঘোমটা দিয়া থাকিতেন, এবং কথা কহিলেও অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বলিতেন। আমার দিদিমাকে এইরূপ দেখিতাম। কিন্তু সকল শাশুড়ি এক চরিত্রের হইতেন না, তখন আগুনের খাপরার মতো প্রগল্‌ভা-নায়িকাতুল্যা শাশুড়ির কাছে কচি স্ত্রী মুগ্ধা নায়িকার মতোও হইত না, নিতান্ত কাঁচা পেয়ারার মতো হইত।

আবার অল্পবয়সে কনে কাঁচা পেয়ারা না হইলেও শাশুড়ি জামাতার সমবয়সী হইতে পারিতেন। যেমন, আমার বড় শ্যালিকার বিবাহ হয় ১৯২১ সনে এক আই-এম-এসের কাপ্তানের সহিত। তাঁহার বয়স ও আমার শাশুড়ির বয়স একেবারে সমান ছিল। আমার নিজের বিবাহের সময় আমার বয়স ও আমার স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বারো বৎসরের পার্থক্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, আমার আর শাশুড়ির মধ্যে পার্থক্য ছিল তেরো বছরের। সুতরাং বিভূতিবাবুর সহপাঠীর মতো চরিত্র আমার হইলে সহজেই উভচর হইতে পারিতাম। বিভূতিবাবু যে ইতিহাস দিলেন তাহা আমাদের কালেও ঘটিতে পারিত।

শুধু এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই নয়, সব রকমের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই বাঙালি সমাজে যে বিবাহের বাহিরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, যাহাকে সমাজের দিক হইতে অনাচার বলা হয় তাহা বহুল পরিমাণে ছিল তাহার প্রমাণ অনেক আছে। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া নানা বাংলা সংবাদপত্রে ও বই-এ বাঙালি সমাজ-সংস্কারকেরা ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করিতে গিয়া যে-ভাবে ভ্রূণ হত্যার কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা যে খুবই প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

গল্প-উপন্যাসেও ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। শরৎচন্দ্র 'পল্লী-সমাজে' ক্ষেন্তি বামুনীর মুখে এই কথাগুলি দিয়াছেন—

'বলি, হ্যাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না ? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ারঘরে বসে পান সাজছে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে অমন হলদে রোগা শল্‌তেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি ? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি ? বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।'

কাশীর এই দুর্নাম প্রাচীন হিন্দুও ঘোষণা করিত, সংস্কৃত শ্লোকে—

'শ্রুতি-স্মৃতি-বিহীনানাং যে শৌচাচার-বিবর্জিতাঃ
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি, তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কাশী সম্বন্ধে বলিতাম,

'হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়...'

এই সব ভাঙা জাহাজের প্রসঙ্গে আমি একটি সত্য ঘটনার কথা বলিব। ১৯২৬ সনে আমি প্রথম কাশী যাই, দাদার দিদি-শাশুড়িকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যে। তিনি বাঙালিটোলার একটি খুব বড় বাড়িতে ঘর ভাড়া লইয়া থাকিতেন। সেখানে অন্যেরাও, বেশির ভাগই বাঙালি বিধবা, থাকিতেন।

একটি আধবয়সী বিধবা আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, তাঁহার একমাত্র পুত্র মিলিটারী অ্যাকাউন্টসে আমার সহকর্মী ছিল। (আমি তখন সবেমাত্র সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।) মহিলাটি মাথায় খাটো কিন্তু গঠনে সুন্দর ও দৃঢ়, গৌরাঙ্গী, ভুরু দুটি মোটা ও কালো এবং জোড়া ; নীচে চক্ষু দুটি নিবিড় কালো, জ্বল জ্বল করিতেছিল। হঠাৎ তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁকে খুব ভক্তি করে। এই কথাটা মায়ের মুখে এত অস্বাভাবিক লাগিল যে, আমি কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম। আমার এক বয়স্ক পিসতুতো দাদা এই পরিবারকে চিনিতেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কাছে বিধবার প্রসঙ্গ তুলিতেই, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া এ-সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। আমি আরও কৌতূহলী হইয়া বৌদিদির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, গ্রামে বাস করিবার সময় তাঁহার স্বামী একদিন আসিয়া তাঁহাকে প্রণয়ীর সহিত শয্যায় আইনের ভাষায় যাহাকে In flagrante delicto বলে সেই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় ধরেন, এবং তখন প্রণয়ীকে হত্যা করেন। সেজন্য তাঁহার স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। যখন আমি মহিলাটিকে দেখি তখন তাঁহার স্বামী জীবিত ও দ্বীপান্তরে না মৃত, তাহা আমি জানিতে চাহি নাই। তবে মহিলাটি বিধবার বেশে থাকিতেন। প্রভাতকুমার 'কাশীবাসিনী' গল্পে এবং শরৎচন্দ্র 'চন্দ্রনাথ' গল্পে কুলত্যাগিনীদের কাশীবাস করার কথা লিখিয়াছেন।

প্রবৃত্তির বশে ব্যভিচারিণী স্ত্রীরা কখনও রাক্ষসীর মতো হইয়া যাইত। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। একটি আমার এক বন্ধু স্বচক্ষে দেখেন। তিনি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় নিজের গ্রাম হইতে জাহাজ ধরিবার জন্য পদ্মার উপরে আর্‌চা স্টেশনে পাল্কী করিয়া আসিতেছিলেন। অর্ধপথে একটি সম্পন্ন মুসলমানের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিলে দেখিতে পাইলেন যে, একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক বাহিরের উঠানের একদিকে বদ্‌না হইতে জল লইয়া হাতমুখ ধুইতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন অন্দর হইতে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে একটি যুবতী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে একটা বড় দা। সে ছুটিয়া আসিয়া এক কোপে বৃদ্ধের মাথা কাটিয়া ফেলিল। আমার বন্ধু শশব্যস্ত হইয়া বেহারাদের পাল্কী দ্রুত চালাইয়া গ্রামের বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন, পাছে সাক্ষী দিতে হয়।

ইহার পর প্রভাতকুমারের লেখা হইতে একটি হিন্দু যুবতী হত্যাকারিণীর সত্য বিবরণ দিব। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে একটি গ্রামে মাতঙ্গিনী নামে একটি অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী ছিল। তাহার স্বামী অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া পশ্চিমে চাকুরি করিতে যায়। এই সময়ে মাতঙ্গিনীর সহিত একটি লোকের প্রণয় হয়। তিন বৎসর পরে যখন স্বামী ছুটি লইয়া বাড়ি আসিবার খবর দিল, তখন মাতঙ্গিনী ও তাহার প্রণয়ী প্রমাদ গুনিয়া স্থির করিল যে, রাত্রিতে স্বামীকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দিবে। তাহা ঘটিল। কিন্তু মাতঙ্গিনীর পাঁচ বছরের পুত্র হঠাৎ জাগিয়া যাহা দেখিল, তাহা আদালতে বালক যে-ভাবে বর্ণনা দিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

'অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা, যে সেদিন আসিয়াছিল তাহার গলা কাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ কর পাজি। চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি করে কেটে দেব।' ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম ও পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।'

মাতঙ্গিনী ভয় পাইয়া প্রণয়ীকে বলিল, 'চল দুজনে এইবার লাসটাকে নদীতে দিয়ে আসি।' কিন্তু ব্যক্তিটি ভয় পাইয়া পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। মাতঙ্গিনী প্রণয়ী পলাইয়াছে দেখিয়া গ্রামের এক ডোমকে লাস ফেলিয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিল। ডোম তাহাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া থানায় গিয়া খবর দিল। মাতঙ্গিনী লাস সমেত গ্রেপ্তার হইল। এই ডোম ও ছেলের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া জজ তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিলেন।

যিনি এই কাহিনী প্রভাতকুমারকে বলিয়াছিলেন, তাহার নাম দীননাথ সান্ন্যাল। তিনি ডাক্তার এবং সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি পরজীবনে জেলের ডাক্তার হিসাবে পোর্ট ব্লেয়ারে যান। সেখানে মাতঙ্গিনীকে দেখেন। তখনও মাতঙ্গিনী সুন্দরী ছিল। ইহার পর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

'একদিন নির্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও নদীয়া জেলার লোক। কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ি। ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন্ আদালতে যখন তোমার মোকদ্দমা হয়, তখন আমি বালক, স্কুলে পড়ি। সে সময়ে লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার সেই লোকটিই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ-বিষয়ে, অন্য সকলের মত আমার মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে-ঘটনার পর বহু বৎসর গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে-কথা বলিবে ?"

'এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে রহিল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে-কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।" '

অনেক সময়েই সমাজ-বিরুদ্ধ প্রণয়ের ফল প্রবঞ্চিতা যুবতী বা তরুণীর পক্ষে শোচনীয় হইত। প্রণয়ীর মোহ ঘুচিয়া গেলে সে মেয়েটিকে ত্যাগ করিত ও তাহার শেষ গতি একমাত্র বেশ্যালয়ে হইত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিচারক' গল্পে এইরূপ পরিণাম দেখাইয়াছেন, 'পয়লা-নম্বর' গল্পেও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। সরল প্রেমে বুদ্ধিহারা হইয়া তরুণীর পরে যে গতি হইত, এ-দুয়ের মধ্যে প্রভেদ ভাষাতেও প্রকাশ পাইত, এবং সে ভাষাগত প্রভেদও মর্মান্তিক। ইহার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্প হইতেই দিতেছি। মেয়েটি গৃহত্যাগিনী হইয়া যাইবার সময়ে ভয় পাইয়া প্রণয়ীকে বলিল, 'এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই। এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।' যুবক তাহার অনুনয় শুনিল না, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা মিটিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া গেল। তখন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া মেয়েটির আর গতি রহিল না। পরজীবনে যুবক স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান হইয়া জজ হইয়াছে, মেয়েটি একজনকে হত্যার অপরাধে তাহারই দ্বারা ফাঁসি যাইবার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে। জজ কৌতূহলবশে জেলে গিয়া দেখিলেন, মেয়েটি প্রহরীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। তাহার চুল হইতে একটি আংটি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া প্রহরী আত্মসাৎ করিয়াছিল। মেয়েটি বলিল, 'ওগো জজবাবু! উহাকে বলো আমার আংটি ফিরাইয়া দিতে।' জজ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, মেয়েমানুষের স্বভাব এমনই বটে। মরিতে বসিয়াছে তবু গহনার মায়া কাটাইতে পারে না। আংটিটি হাতে লইয়া দেখিলেন, উহাতে তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি।

এই চিরপ্রচলিত ধারা যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে লোপ পাইল তাহা নয়, লোপ পাইবার কথাও নয়। কিন্তু সেই শিক্ষার ফলে অসতীত্বের যে নূতন ধারা দেখা দিল, তাহা পুরাতন খাতের পাশে সমান্তরালভাবে বহিতে লাগিল। এখন তাহারই পরিচয় দিব।

দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একটি বাঙালি লেখক একশত বৎসরেরও আগে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে 'ইয়ং বেঙ্গল' পূর্বাপেক্ষা পত্নীব্রত হইয়াছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, 'ইয়ং বেঙ্গল' তেমনই উপপত্নীব্রতও হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯২৩-২৪ সনে যখন আমি ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকি, তখন আমার দাদা হেদুয়ার কাছে মানিকতলা স্ট্রিটে থাকিতেন। আমি আপিস হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতে যাইতাম ও সন্ধ্যা আটটা নাগাদ মেসে ফিরিয়া আসিতাম। পথে রাজা উপাধিকারী একজন বিখ্যাত ও অতি ধনবান বাঙালির প্রাসাদ ছিল। উহার ফটকের একদিকে সর্বদাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দুকধারী পাহারাদার দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি ফুটপাথ ধরিয়া আসিবার সময়ে প্রায়ই দেখিতাম যে, রাজা বাহাদুরের জুড়িবাহিত বিরাট ল্যান্ডো ফটকের ভিতর দিয়া বাড়িতে ঢুকিতেছে। এ-সব বাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন না। সুতরাং এ-সময়ে কে এই প্রাসাদে জানালা-বন্ধ ল্যান্ডো করিয়া আসেন সে বিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিল। সন্ধানের জন্য আমার এক বন্ধুর শরণ লইলাম। তাঁহার সহিত রাজা বাহাদুরের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিচয় ছিল। যে সংবাদ পাইলাম তাহা এইরূপ।

রাজা বাহাদুর তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাহা ছাড়া বাতে (আরথ্রাইটিসে) পঙ্গু। সুতরাং তিনি তাঁর যুবাবয়সের রক্ষিতার বাড়িতে যাইতে পারেন না। তাই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধা রক্ষিতা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পদসেবা করিয়া নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেন। মনে রাখিতে হইবে সম্ভ্রান্ত বাঙালি গৃহস্থ তখনকার দিনে প্রৌঢ় হইবার পর আর অন্তঃপুরে ঘুমাইতেন না। ব্যাপারটা শুনিয়া বুঝিলাম, ইংরেজি শিক্ষার গুণে রক্ষিতার বেলাতেও সতীত্বের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। প্রৌঢ় স্বামী পত্নীকে অবহেলা করিলেও উপপত্নীকে ভোলেন নাই। কারণ পত্নী তাঁহার পিতার দান, উপপত্নী স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়িনী।

বিবাহিত জীবনের মধ্যেও অসতীত্ব একটা নূতন রূপে দেখা দিল। সে অসতীত্বে দৈহিক সঙ্গমের, এমন কি দৈহিক মিলনের বাসনারও ছোঁয়াচ ছিল না। উহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার ছিল। তাহাতে অসতীত্বের জন্য কোনও গ্লানি বা অপরাধবোধ ছিল না। ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিত। হয়তো কোনও তরুণী বিবাহে সুখী হয় নাই, স্বামীর প্রতি কোনও ভালবাসাও অনুভব করে নাই। উহার যে নানা সঙ্গত কারণ থাকিতে পারিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই তরুণী হয়তো বালিকা বয়সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছিল, অথবা বিবাহের পর কোনও যুবকের সহিত পরিচিত হইয়া অনুরাগিণী হইয়াছিল। সে তখন বঞ্চিত জীবনের অতৃপ্তিকে দূর করিবার জন্য সেই প্রণয়ের পাত্রের কথা ভাবিত। এ-কথাও মনে করিত যে, স্বামীকে দৈহিক জরিমানা দিয়া সে মনের স্বাধীনতার অধিকারিণী হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মানব-চরিত্রের খোঁজ রাখেন তাঁহারা আর একটা ব্যাপারও অনুমান করিতে পারিবেন। এই বঞ্চিতা যুবতীরা স্বামীকে জরিমানা দিবার সময়েও ভালবাসার পাত্রকে মনে না রাখিয়া উহা দিতে পারিত না। প্রভাতকুমার তাঁহার একটি গল্পে একজন যুবতীকে দিয়া এইরূপ কথা একটু ঘুরাইয়া বলাইয়াছেন। যুবতীটি বিবাহের পূর্বে একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল। স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাহার আরও বিরাগ জন্মিয়াছিল। এমন অবস্থায় কলিকাতায় অর্ধোদয় যোগে স্নান করিতে আসিয়া হারাইয়া যাওয়াতে দৈবক্রমে পূর্ব প্রণয়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই যুবক তাহার স্বামীকে অনেক খুঁজিয়া না পাইয়া যখন সেই সংবাদ দিল, তখন মেয়েটি বলিল, সে যুবককে ভুলিতে পারে নাই। তাহার উক্তি এইরূপ—

> 'পতিভক্তি পতিসেবা করবার জন্যও আমি কত চেষ্টা করেছি, পারিনি। বিজয়ার রাতে যখন তাঁকে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে তোমাকে যেন প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখ বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আদর করছ।'

আশ্চর্যের কথা এই যে, বন্ধু বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পই এই বিষয়ে, উহার নাম


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উপেক্ষিতা'। উহা ১৯২০ সনে (যত দূর মনে পড়ে) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তখনই গল্পটা পড়ি, এটা যে আমার পূর্বতন সহপাঠীর লেখা তাহা জানিতে পারি ১৯২২ সনে আবার দেখা হইবার পরে। গল্পটি আমার কাছে খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর বিভূতিবাবু 'মৌরীফুল' গল্পটি লেখেন। উহার বিষয়ও এইরূপ। পরজীবনে এই বিষয় লইয়া আরও একটি গল্প লেখেন, উহার নাম 'অসমাপ্ত'। শেষের এই গল্পটির মতো গভীর অনুভূতির গল্প আমি কম পড়িয়াছি। গল্পটি অসাধারণ। এক বধূ একজনকে তাহার পূর্ব প্রণয়ী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যখন তাহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার একটি তেরো চৌদ্দ বছরের পুত্র আছে। তখনও তাহার ধারণা ছিল, তাহার জন্য সেই যুবক বিবাহ করে নাই। তাই অনুরোধ জানাইয়াছিল, যেন সে বিবাহ করে। অথচ যুবক বিবাহিত ছিল।

কিন্তু এইরূপ অসতীত্বের সর্বাপেক্ষা করুণ ও বিভাময় কাহিনী দিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পথ-নির্দেশ' গল্পে। হেমনলিনী তাহার সুবাদে ভাই গুণীন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে জোর করিয়া অন্যের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। শরৎবাবু যে-ভাবে গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয় হেমনলিনী দৈহিক জরিমানা দিতেও স্বীকৃত হয় নাই, দেয়ও নাই। এক বৎসর পরে যখন সে বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন গুণীন্দ্রকে বলিল, 'কি করবে গুণীদা ? তোমরা ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে, সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টের পেয়েছিলাম। তখন আমার কথা তোমরা গ্রাহ্য করলে না—এখন কান্না আর হায়, হায় !'

হেম বিধবা হইয়াও গুণীর পদসেবা করিত, ও বলিত, 'তোমার পায়ের কাছে বসলেই আমার হাত দেবার লোভ হয়।'

কিছুক্ষণ পরে গুণী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি ?'

হেম উত্তর দিল, 'একটুও না সে কথা আমার কোনদিন মনেও হয়নি।...'

গুণী আবার বলিল, 'কিন্তু যারা সতীলক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে তাঁর মুখ মনে ক'রে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত তাঁরা মরণকালে 'স্বামীর কাছে যাচ্ছি' মনে করেন।'

হেম বলিল, 'আমাকে তোমরা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিল। আমিও সতীলক্ষ্মী তাই মরণকালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব ?'

শরৎচন্দ্র লিখিলেন, 'তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই।'

এই ধরনের একটি ব্যাপারের উদাহরণ ইউরোপের ইতিহাস হইতে দিব। উহা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। শরৎচন্দ্র যে এই কাহিনী কখনও পড়িয়াছিলেন তাহা সম্ভব নয়। যে বই-এ উহা আছে সে বই শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে আমাদের দেশে আসে নাই, উহা ফরাসি ভাষায় লিখিত, উহার ইংরেজি অনুবাদও নাই। তবু যে বই-এ উহা পাইয়াছি, উহা ফরাসি লেখক শাতোব্রিয়ঁর। এই কাহিনীটি তাঁহার নিজের জীবনের। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে।

১৭৯৪ সন, শাতোব্রিয়ঁর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। ফরাসি বিপ্লবে তাঁহার বহু আত্মীয় প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি পলাইয়া ইংলন্ডে আসিয়া নিজেকে বাঁচান। কিন্তু কপর্দকহীন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া আসাতে লন্ডনে তাঁহার অত্যন্ত দুরবস্থা হয়। কিছুদিন পরে সাফোক কাউন্টির বাঙ্গে শহরে একজন পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার নাম ছিল ডাঃ আইভ্‌স্। তিনি গ্রিক সাহিত্যে ও গণিতে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা ছিল, তাহার নাম শারলোট্। মেয়েটি পিতার কাছে লেখাপড়া শিখিতেছিল, সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে মেয়ে পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিত। শাতোব্রিয়ঁ পিয়ানোর গায়ে ভর দিয়া বসিয়া তাহা শুনিতেন। তিনি পর-জীবনে লেখেন যে, শারলোটের গানের ক্ষমতা ইউরোপের একটি বিখ্যাত গায়িকার মতো ছিল। গানের পর মেয়েটি দান্তে ও তাস্‌সোর বিখ্যাত কাব্যগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য শাতোব্রিয়ঁকে অনুরোধ করিত। দুজনের মধ্যে প্রণয় জন্মে, যদিও কেহ কাহাকেও বলে নাই। তখন শাতোব্রিয়ঁ কিন্তু বিবাহিত। ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিবার আগে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া বিবাহ দেন। নববিবাহিতা পত্নীর সহিত বাস করা দূরে থাকুক, তাহার সঙ্গে ঠিকমত পরিচয়ও হয় নাই। আইভ্‌স্‌রা অবশ্য তাহা জানিতেন না। কিন্তু উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া একদিন আইভ্‌স্ গৃহিণী শাতোব্রিয়ঁকে একা পাইয়া বলিলেন যে, শাতোব্রিয়ঁর বর্তমান অবস্থা যাই হউক তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার স্বামী প্রস্তুত আছেন। শাতোব্রিয়ঁর আর উপায়ান্তর রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ম্যাডাম, আমি বিবাহিত।' গৃহিণী এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। শাতোব্রিয়ঁও বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। আর আইভ্‌স্ পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ১৮০০ সনে তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া যান।

বহুদিন পরে ১৮২২ সনে শাতোব্রিয়ঁ ফরাসি রাজদূত হইয়া আবার লন্ডনে আসেন। তখন একদিন তাঁহার আপিসে বসিয়া আছেন, এমন সময় ভৃত্য ঘরে আসিয়া বলিল, লেডি সাটন নামে এক মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তখনই প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুটি সুশ্রী বালক, একজনের বয়স ষোলো, অন্যের পনেরো মত্রো।

মহিলাটি আবেগ-কম্পিতস্বরে ইংরেজিতে বলিলেন, 'My lord, do yor remember me?' শাঁতোব্রিয়ঁ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মিস আইভ্‌স্।' দুজনেই কথা বলিতে পারেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি বলিলেন,

> 'মাই লর্ড, আমি বাঙ্গেতে আপনার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলতুম, আবার সে ভাবেই বলছি। আমার লজ্জা হচ্ছে। আমায় ক্ষমা করুন। আমার এই ছেলে দুটি অ্যাডমিরাল সাটনের পুত্র। আপনি ইংলন্ড ছেড়ে চলে যাবার তিন বছর পরে আমি তাঁকে বিবাহ করি। কিন্তু আজ আমার মাথার ঠিক নেই, সব কথা বলতে পারব না। আমাকে আবার আসবার অনুমতি দিন।'

শাতোব্রিয়ঁ নিজেই লেডি সাটনের সহিত দেখা করিতে গেলেন। দুজনের আলাপের মধ্যে দুজনের মুখেই শুধু এই কথাটারই ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল, 'সে কথা মনে আছে কি?' কিছুক্ষণ পরে শাতোব্রিয়ঁ বলিলেন যে, মাই লর্ড সম্বোধনটা তাঁহার কাছে খুবই কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে।

শারলোট উত্তর দিলেন, 'আমি যখন আমার পিতামাতার কাছে আপনার কথা বলতাম, তখন সর্বদাই 'মাই লর্ড' বলে আপনার উল্লেখ করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি তাই। আপনি কি আমার কাছে স্বামীর মতো ছিলেন না? আপনি কি আমার লর্ড অ্যান্ড মাস্টার' ছিলেন না?' তখন ইংরেজ পত্নীরা স্বামীকে 'লর্ড অ্যান্ড মাস্টার' (হৃদয়ের রাজা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রভু) বলিয়া মনে করিত এবং উল্লেখ করিত।

কিন্তু শারলোট আইভ্‌সের বেলাতে প্রণয়, বিরহ ও বিচ্ছেদ সে যুগের ইউরোপীয় সামাজিক আচরণের মধ্যেই রহিল। শরৎচন্দ্র গুণীন্দ্র ও হেমের প্রণয়, বিরহ ও বিচ্ছেদকে হিন্দুর প্রাচীন অসতীত্বের ধারার সহিত যুক্ত করিলেন। হেম যখন গুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি আমি সহ্য করতে পারব ?' তখন গুণী উত্তর দিল,

> 'পারবে। যখন বুঝবে, সংসারে ভালবাসাকে মহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায়নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ ব্যাথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে হেম।'

তখনকার চিরাচরিত সামাজিক বিধানে হেম ঘোর অসতী। শরৎচন্দ্র তবু তাহাকে সেইরূপ অসতী করিয়াই বাঙালি জীবনে নূতন অসতীত্বের মহিমা কীর্তন করিলেন। ইহা একটা মানসিক বিপ্লবের ফল। শরৎচন্দ্রের রাধাও সেই বিপ্লবেরই মানসিক সৃষ্টি। এই রাধা জয়দেবে দূরে থাকুক চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতেও নাই।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ কার্তিক ১৩৯৫, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৮। পরে লেখকের 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' গ্রন্থের অংশবিশেষ।

AMARBOI.COM

# বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম

প্রাগ্‌-ব্রিটিশ যুগে বাঙালির দাম্পত্য জীবন কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় দিবার জন্যও কাব্যেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইবে না, কারণ সে-যুগের কাব্য লৌকিক কাব্য, সাধারণ লোকের জন্য রচিত হইত। সুতরাং জীবনের যে-কোনও ব্যাপার কাব্যে বর্ণনা করিতে হইলে, বিষয়বস্তু যাহাই হউক কাব্যেও তাহার বর্ণনা প্রচলিত বাঙালি আচার-ব্যবহার ও ধারার অনুযায়ী করিতে হইত। হরগৌরীর বিবাহের বর্ণনাতেও তাহাই দেখা গেল। দাম্পত্য জীবনের বেলাতেও তাহা দেখা যাইবে। আমি সেকালের দাম্পত্য জীবনের পরিচয় ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের রচনা হইতে দিব। তবে এই ক্ষেত্রে দুই কবির বর্ণনাতেই দুই রকমের দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দেখা যায়—উহার একটি দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের, অপরটি সম্পন্ন ভূস্বামী অথবা বণিকের ঘরের। দুই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যাইবে। দরিদ্র বাঙালির ঘরে দাম্পত্য জীবন প্রধানত অর্থাভাবের জন্য ঝগড়া, ধনবান বাঙালির ঘরে দাম্পত্য জীবন সতীনদের মধ্যে স্বামীর রতি পাইবার জন্য আড়াআড়ি।

প্রথমে দরিদ্রঘরে দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দিব। এক্ষেত্রেও দরিদ্র দম্পতি হরগৌরী।

পার্বতী স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া যাহা পাইলেন ও করিলেন তাহা 'কুমারসম্ভবে' অষ্টম সর্গের বিবরণের অনুযায়ী হয়। নিজের বিবাহিত জীবন স্মরণ করিয়া পার্বতী বলিলেন,

> 'করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
> তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
> শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
> নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥'

কিন্তু শিবও পত্নীর এই অবস্থা দেখিয়া কুণ্ঠিত হইলেন না। উল্টা তিনি পার্বতীর বিরুদ্ধে নালিশ আরম্ভ করিলেন।

> 'নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
> সাধ করে এক দিন পেট ভ'রে খাই ॥
> সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
> সরমে ভরম গেল উদরের লেগে ॥'

তারপর দুঃখ করিলেন,

> 'আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতমতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥'

কিন্তু তাঁহার বেলাতে,

'সর্ব্বদা কোন্দল বাজে কথায় কথায় ।
রস-কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥'

এই উল্টা গঞ্জনায় পার্বতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তারপর যখন আরও শুনিলেন, দারিদ্র্যের জন্য শিব তাঁহাকেই দায়ী করিতেছেন, তখন আর তাঁহার মুখে বাঁধ রহিল না। শিব বলিয়াছিলেন,

'পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র ।
স্ত্রী-ভাগ্যে ধন পুরুষ-ভাগ্যে পুত্র ॥'

অর্থাৎ শিবের কপালের জোরে গণেশ-কার্তিক জন্মিয়াছেন, কিন্তু পার্বতীর কপালের জন্য অভাব। পার্বতী এই উক্তির সমুচিত উত্তর দিলেন,

'উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা ।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
বড় পুত্র গজানন চারি হাতে খান ।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি ক্ষুদ কুড়া যা পান ঠাকুর ।
তাঁহার ইন্দুরে করে কুটুর-কাটুর ॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ষড়াননে খায় ।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায় ॥'

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, শিব যদি তাঁহারই জন্যই দরিদ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিবাহের পূর্বে কত ধন ছিল ?

'গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে ।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু ।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন ।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥'

ভারতচন্দ্র যে পার্বতীর মুখে এই কটূক্তি দিলেন, তাহার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, নিশ্চয়ই জানিতেন দারিদ্র্যের জন্য পতিকে গঞ্জনা দেওয়া ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী শুধু যে মহাপাপ তাহাই নয়, হিন্দু 'ক্রিমিন্যাল কোড' অনুযায়ী 'ক্রিমিন্যাল অফেন্‌স্‌'-ও বটে। মনু বিধান দিয়াছেন,

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ।

অর্থাৎ যে স্ত্রী জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা হইয়া, অর্থাৎ বাপের টাকার গুমোরে, স্বামীর অপমান করে তাহাকে রাজা বহুলোকের সমক্ষে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন। ভারতচন্দ্র কামশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মনুসংহিতা পড়েন নাই তাহা মনে করা যায় না, তবু পার্বতীকে দিয়া শিবের অপমান করাইলেন। এমন কি পরবর্তী যুগের বাঙালি গল্প-লেখক স্ত্রীকে 'জ্ঞাতি-গুণদর্পিতা' বলিয়া দেখাইলেও পরে যে অনুতপ্তা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহাও দেখান নাই। যেমন শরৎচন্দ্রের 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দু দরিদ্র স্বামীকে শুধু যে দিনের পর দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহ্য অপমান করিল তাহাই নহে, তাহাকে পীড়িত ও মৃত্যুমুখীন দেখিয়া এ-কথাও বলিল, 'নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন।' কিন্তু শেষে সে-ও গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ননদকে বলিল, 'যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম।'

প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগের লেখক ভারতচন্দ্র স্ত্রীর এরূপ অনুতাপ কল্পনাও করিতে পারিলেন না, তাই তাঁহার কাব্যে ক্রুদ্ধা বাঙালি পত্নীর যা স্বাভাবিক কাজ তাহাই পার্বতী করিলেন, অর্থাৎ বাপের বাড়ি চলিলেন। ইহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইল অন্যকে,

'কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
এ কি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ-ঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালী ॥..
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥'

এই কথায় পার্বতী বাপের বাড়ি যাওয়া হইতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভর্ৎসনায় শিব গৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন,

'হোথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥'

কিন্তু ইহাতে পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, শিব গ্রাম্য বালকগণের হাসির অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইলেন,

'দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল ব'লে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥'

এই সব বর্ণনায় শিবের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধার অণুমাত্র নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতচন্দ্র শিবকে এইভাবে দেখাইলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ।

ভারতচন্দ্রের যুগে শিব সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা এইরূপ ছিল, সুতরাং হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়া ভারতচন্দ্র দরিদ্র বাঙালি গৃহস্থ ঘরে দাম্পত্য জীবনের যে-রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই হর-পার্বতীর উপরেও আরোপ করিয়াছিলেন।

পুরাতন দাম্পত্য জীবনের রূপ বাহিরে কি ছিল তাহা দেখানো হইল। এইবার দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গ ব্যাপারের সন্ধান লইতে হইবে। ইহার বিবরণ ভারতচন্দ্র কালিদাসের মতো হর-পার্বতীর মধ্যে দেখান নাই, দেখাইলেন বাঙালি জমিদার বাড়িতে। ভবানন্দ মজুমদার দিল্লি হইতে রাজা হইয়া আসিবার পর তাঁহার দুই পত্নী চন্দ্রমুখী (বড়) ও পদ্মমুখী (ছোট) যেমন নিজেরা ঝগড়া আরম্ভ করিলেন, তেমনই স্বামীর জন্যও এক সমস্যার সৃষ্টি করিলেন। জমিদার বা রাজা-রাজড়ার ঘরে যেমন হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও ঝগড়ার জোগানদার দাসীরা। দুই দাসীই নিজ নিজ ঠাকুরানীকে মন্ত্রণা দিতেছে। 'বড় ঠাকুরানী


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষাকৃত বয়স্কা, তিন পুত্রের মাতা ; ছোটজন সন্তানহীনা যুবতী। সুতরাং বড়র দাসী সাধী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল।

'সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দরবড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥
খোঁপা বান্ধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণশাড়ী
পীড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা ॥
পড়া তৈল মুখে মাখি, শড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পরিলা ॥'

কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান করিতে মুশকিল বাধিল।—

'গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া সে উপায় নাহি পান।'

যাহা হউক, রাত্রি করিয়া ভবানন্দ যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে গেলেন, তখন বড়জন দেউড়ির কাছে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে প্রণাম করিয়া সমস্ত সংবাদ দিয়া বলিলেন,

'এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল।'

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ছোটজনের দাসী মাধী দৌড়িয়া গিয়া তাহার ঠাকুরানীকে বলিল,

'কি কর চল তাড়াতাড়ি গো ছোট মা,
তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥
সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।'

পদ্মমুখীও তখন দেউড়িতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভবানন্দ চোখ ঠারিয়া ইসারা করিলেন। তিনিও ইসারার মর্ম বুঝিয়া মুখে উদারতা দেখাইলেন, বলিলেন,

'বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উঁহারি মন্দিরে আগে যান ॥'

ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া—

'চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড় ॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি ॥'—ইত্যাদি

মজুমদার কৌশলে বড়কে আগরাত ও ছোটকে শেষরাত ভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু বড়র ঘরেও ভয় করিতে লাগিলেন।—

'রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥'

শেষকালে ছোটর ঘরে যখন গেলেন তখন—'কথায় না সহে ভর, দুঁহে কামে জরজর'—ইহার পর আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পূর্ববর্তী যুগের, সুতরাং তাঁহার বিবরণ ভারতচন্দ্রের কাহিনী অপেক্ষা গ্রাম্য। তিনি দুই সতীন, লহনা ও খুল্লনার আচরণ এইভাবে বর্ণনা করিলেন।

'মল্ল যেন কোন্দলে যুঝে দু-সতীন।
বিদেশে সদাগর পাইয়া শূন্যঘর,
লাজ ভয় হৈল হীন ॥
বড় বহুড়ী প্রবলা, ছোটজন একলা
কলহ হৈল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুতা হইয়া,
খুল্লনা হৈল বলাধীন ॥
... ... ...
চট চট চাপড় ছিঙিলেক কাপড়
বেগে মারিল কঙ্কণ।
দোঁহোতে করিল ধুম, কিলের গুম গুম
মেঘ যেন শিলা বরিষণ ॥'

শেষে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করা হইল।

কিন্তু ধনপতি ফিরিয়া আসিলে দুই সতীনের আড়াআড়ি চাতুরীর যুদ্ধে উন্নীত হইল। খুল্লনা তরুণী, লহনা প্রায় বিগতযৌবনা (তখনকার ধারণাতে), সুতরাং তিনি কনিষ্ঠাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন,

'তুমি অতি ক্ষীণবালা, নাহি জান রতিকলা,
না যাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুকের বেলা, যেন নব শশিকলা,
পড়িবি লো বিষম সঙ্কটে ॥
রতিরঙ্গে সদাগর, চিরদিনে আইলা ঘর।
জর জর মনমথ শরে।'
... ... ...
'আকুল দেখিয়া জায়া, সাধু নাহি করে দয়া,
বিনয় বচন নাহি শুনে।
সাধুর গজের লীলা, নলিনী যেমন বালা,
মূঢ়মতি তুহু কামবাণে ॥'

কিন্তু লহনা যতই বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, খুল্লনা ততই হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি উত্তর দিলেন।

আজকাল বাঙালি মেয়েরা যুক্তি, উক্তি ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন আমেরিকান ফিল্ম্ হইতে, খুল্লনা সে-যুগের মেয়ের মতো সংগ্রহ করিলেন রামায়ণ-মহাভারত হইতে, ও সহাস্যে বলিলেন,

'শুন গো প্রাণের দিদি লহনা বহিনী।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি ॥
স্বর্গে দেখ দেবরাজ মহাবলবান্ ।
কেমনে কামিনী শচী করে রতিদান ॥
আরো দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে ।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে ॥
দশমুণ্ড বিশ বাহু লঙ্কা-অধিকারী ।
কেমনে শৃঙ্গার তার সহে মন্দোদরী ॥
ভীম সম বলবান্ নাহি ত্রিভুবনে ।
কেন না দ্রৌপদী মরে তাহার রমণে ॥'

এইরূপ আরও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইতে উদ্যত হইলে লহনা খুল্লনার কি দশা হইবে তাহাও বলিলেন,

'যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা ।
বিড়ালেতে যেমন মূষিকা ॥
চিলে যেন ছুঞ্যা লয় মীন ।
আমি তোর সুহৃদ সতীন ॥
লাজ ভয় নাহি তোর ঠেটি ।
আমি কেন বলি খায়্যা মাটি ॥
ছিঃ ছিঃ ! ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ।
মম আগে যাস তুই ঘরে ॥'

কিন্তু কোনও ফল হইল না। কেহ যদি বলেন যে, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম এই সব বর্ণনায় তাঁহাদের সমকালীন বাঙালি জীবনের চিত্র আঁকেন নাই, তবে তাঁহার বিদ্যা বা বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না ।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের যুগে নূতন শিক্ষার ফলে বাঙালির দাম্পত্য জীবন যে একেবারে বদলাইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এক ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি লিখিলেন,

'The domestic virtues are now better cultivated in India than they used to be before. Young Bengal is a more constant husband than the old Hindu was.'

বর্তমানকালে যদি কেউ বলেন যে, পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসী না হওয়া বাঙালিকে কোনও ইংরেজের কাছ হইতে শিখিতে হইবে, তিনি সত্যই হাস্যাস্পদ হইবেন। বরঞ্চ এ-কথাটাই সত্য যে, পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার প্রবৃত্তিই পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তে প্রায় রেওয়াজ হইবার দিকে চলিয়াছে। কিন্তু যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পত্নীপ্রেম ইংরেজ সমাজে প্রায় অটুট ছিল। ইংরেজি পড়িয়া বাঙালিও নিজের বিবাহিত জীবনকে সেই আদর্শে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিল ।

ইহার জন্য পত্নী সম্বন্ধে বাঙালি সমাজে চিরপ্রচলিত আচরণ ও ধারণা যাহা ছিল, তাহার প্রায় সবই নব্য বাঙালিকে ছাড়িতে হইয়াছিল। ধারণার উদাহরণ হিসাবে একটি প্রবাদের উল্লেখ করিব। সেটি এই, 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে।' ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। আচরণটি এই—মৃতা পত্নীকে চিতানলে দগ্ধ হইতে দেখিবার সময়েই স্বামীকে একজন আত্মীয় বা বন্ধুর বলিতে হয় 'শীঘ্রই আবার বিবাহ কর।' ইহার অতি-আধুনিক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্নী সম্বন্ধে নূতন মনোভাব ও পুরাতন মনোভাবের সংঘাতের কথা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পে বৃন্দাবন পিতার কৃপণতার জন্য স্ত্রীর প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হইলে পিতাকে স্ত্রী হত্যাকারী বলিয়া গালি দিল। পিতা বলিল, 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না ? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে ? যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে ?'

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন, 'বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ-কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময়ে ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক তামাক টানিত।'

ইহার পর বৃন্দাবন যখন রাগে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন গ্রামসুদ্ধ লোক পিতা যজ্ঞনাথের পক্ষ লইল। বলিল, 'সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।' আরও বলিল, 'একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না।'

এই গল্পটির তারিখ পৌষ ১২৯৮ সন (ইংরেজি ডিসেম্বর ১৮৯১ অথবা জানুয়ারি ১৮৯২)। ইহার পর ১৮৯৫ সনে রবীন্দ্রনাথ আর একটি গল্প লিখিলেন, সেও পত্নীর চিকিৎসা উপলক্ষে। 'আপদ' গল্পে কিরণের কঠিন পীড়া হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গঙ্গার ধারে চন্দননগরে লইয়া যাওয়া হইল। (তখনও মধুপুর-দেওঘর অকল্পনীয় ছিল।) কিরণের শাশুড়ি বধূকে ভালবাসিতেন, তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু গ্রামবাসী সকলে নিন্দা করিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

'যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ু পরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা, নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, "ইতিপূর্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টলিপি সফল হয় নাই"—তথাপি শরৎ এবং তাহার মা, সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।' ইহারও পরে আবার ১৮৯৮ সনে রবীন্দ্রনাথ 'মণিহারা' গল্পে স্কুল-মাস্টারের মুখে এই উক্তি দিলেন—

'কিন্তু তাঁহাকে [ফণিভূষণকে] একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজী বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত। আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত।'

স্কুল-মাস্টার এও মন্তব্য করিলেন যে, 'নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল-মাস্টার এ-স্থলে পুরাতনের মুখপাত্র হইলেও উহা যতটা না আন্তরিক তাহার অপেক্ষা 'সিনিক্যাল' বেশি। নূতন দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে পুরাতন পন্থীদের মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রও জানিতেন। তাই 'বিষবৃক্ষে' তিনি স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠাইবার পর শ্রীশচন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিলেন, ইহার জন্য আপিসের কাজে এমনই অমনোযোগী হইলেন যে 'সেবার সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে করেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশবাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্ম্মে বড় মন দেন নাই, কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই তো। আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ।" '

এই ধরনের আরও বহু উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু যতটুকু করিলাম তাহাই যথেষ্ট মনে করি। এই সব কথা যে সে-যুগের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। সমকালীন জীবন লইয়া গল্প উপন্যাস লিখিলে তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহারের সত্য বিবরণ না দিলে কেহই সে-সব কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য মনে করিত না।

তবে সত্যকার জীবন হইতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। যাঁহারা বাঙালির নবযুগ ও নবজীবনের প্রবর্তনকর্তা তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে পুরাপুরি সংবাদ নাই। রামমোহনের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি জানা আছে বটে, তবে সেটা প্রকৃত দাম্পত্য জীবন না থাকারই প্রমাণ। তাঁহার বিবাহের তারিখ ও সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ আছে। তবে এখন যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজি ১৮১১ সনে সতেরো বৎসর বয়সে নয় বৎসর বয়স্কা দিগম্বরী দেবীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। দিগম্বরী এরূপ সুন্দরী ছিলেন যে তাঁহাকে সকলে মর্ত্যে অবতীর্ণা লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি এমনই ধর্মনিষ্ঠা ছিলেন যে, একমাত্র সন্তানজন্মের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে স্বামী সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার মতোই উদাসীন বলা যাইত। তিনি অল্প বয়স হইতেই সারাদিন জপতপ পূজা লইয়াই থাকিতেন, এবং রাত্রিতে ম্লেচ্ছাচারী স্বামীর শয্যাভাগিনী হইয়া নিজেকে অশুচি মনে করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুরোহিত ডাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। একটি কন্যা হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হইবার পর ১৮১৭ সনে তাঁহার প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তখন তাঁহার বয়স পনেরো বৎসর। ইহার পর তাঁহার আরও চারিটি পুত্র হয়। উহাদের মধ্যে দুইটি শিশুকালেই মারা যায়। ১৮২৯ সনে শেষ পুত্র হইবার পর দিগম্বরী সাতাশ বৎসর বয়স হইতে আর স্বামীসহবাস করেন নাই। ১৮৩৯ সনে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথও অন্তঃপুর হইতে নির্বাসিত হইবার পর আর পুরাতন বাড়িতে বাস করেন নাই। এখন যেটি ৫নং জোড়াসাঁকো (যাহাতে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ বাস করিতেন) সেই বাড়ি তৈরি করাইয়া নিজের রুচি অনুযায়ী থাকিতেন। সেই বাড়ি তিনি দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথকে দিয়া যান।

আশ্চর্যের কথা এই—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবনও একেবারেই অজ্ঞাত। এইটুকু মাত্র জানা যে, ১৮৩৪ সনে সতেরো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৮৪১ সনে প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মের পর তাঁহার আরও চৌদ্দটি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সর্বসুদ্ধ ১৫টি) সন্তান হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চতুর্দশ সন্তান। ১৮৭৫ সনে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়। ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ আর বিবাহ করেন নাই।

নবযুগের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ইতিহাসসম্মত ধারণা করা যায় প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্র হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।' কিন্তু এই পত্নী, রাজলক্ষ্মী দেবী, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ বাল্য বয়সে হইয়াছিল। সেই বালিকা পত্নী ১৮৫৯ সনে বঙ্কিমের যখন একুশ বৎসর বয়স তখন মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিবাহ দুই যুগের—প্রথম বিবাহ সেকালের, দ্বিতীয় বিবাহ একালের। বলিতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালি জীবনে নূতন বিবাহ ও নূতন দাম্পত্যের স্রষ্টা। এ-কথা বলা হয় যে, সূর্যমুখীর চরিত্র রাজলক্ষ্মী দেবীর অনুকরণে চিত্রিত। বঙ্কিমের পর কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালির সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা আছে। তবে তাহাও পুরাপুরি বর্ণনা দিবার মতো নয়। উহার জন্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

এই পর্যন্ত বাঙালি ভদ্রঘরের বিবাহে স্নেহের কথাই বলিলাম, প্রেমের কথা নয়। স্নেহ যে সেকালের দাম্পত্য জীবনে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার পর নাতি-নাতনি জন্মিলে পত্নীর স্নেহ স্বামীকে বর্জন করিয়া তাহাদের উপর যাইত। ১৯৫০-৫৫ কাল হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই। এক অতি উচ্চপদস্থ বাঙালি রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া একা দিল্লিতে বাস করিতেছিলেন। আমার দাদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে দাদা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সকলেই কলকাতায় আছেন, তবে আপনি কেন এই ভাবে হোটেলে আছেন?' উচ্চপদস্থ বাঙালি ইংরেজি ভাষায় উত্তর দিলেন, 'Does she care for me? She has her grandchildren.'

ইহা ছাড়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলে সমৃদ্ধ বাঙালি ঘরেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘোর বিদ্বেষ দেখিয়াছি। তাহার কারণ অনেক সময়ে থাকিত, কিন্তু কখনও কখনও কাল্পনিক হইত। ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতা হইতে দিতে পারি। সুতরাং পত্নীস্নেহ বাঙালি সমাজে প্রবর্তিত হইলেও একেবারে অবিচল ছিল, তাহা বলিতে পারি না। এখন নূতন প্রেমের কথা বলিব।

## প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে প্রেমের স্থান

এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধেই আপত্তি উঠিতে পারে যে, এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সন্দেশে ছানা ও চিনি আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তোলারই মতো। তবু প্রশ্ন কেন উঠিতে পারে তাহার কারণ দেখাইতেছি। যেমন ইতিপূর্বে সেকালের বাঙালির একটা প্রশ্নের কথা বলিয়াছি যে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত— 'বায়ু পরিবর্তনের জন্য, যেখানে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া হইতেছে সেখানে কি মানুষ অমর?' তেমনই এই প্রসঙ্গেও আমাকে হয়তো অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইংরেজি সাহিত্য পড়িবার আগে কি বাঙালির দাম্পত্য জীবনে প্রেম ছিল না?' অবশ্য ছিল, তবে প্রেমের রূপ যে কেবলমাত্র বিভিন্ন হইতে পারে তাহাই নয়, বিচিত্রও হইতে পারে। সেজন্যই প্রাচীন হিন্দুরা বলিত, 'কামস্য বামা গতি।' প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দুর জীবনে প্রেমের রূপ কি ধরনের ছিল, তাহার পরিচয় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করিয়া 'শকুন্তলা' নাটক ও 'কাদম্বরী' উপন্যাস হইতে পাওয়া যায়। ইহার পর যখন প্রেমের মাহাত্ম্য কৃষ্ণ ও রাধার বেনামীতে প্রচার করিতে হইল, তখন প্রেম কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা সংস্কৃতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে, এবং বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব কাব্য ও বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস বা পরবর্তী অপর চণ্ডীদাস হইতে পাওয়া যাইবে, মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতি হইতেও পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রেমের বর্ণনায় স্পষ্টতা আছে, কিন্তু কাব্য নাই ; গীতগোবিন্দে স্পষ্টতা ও কাব্য দুই-ই আছে। তেমনই এক চণ্ডীদাসে গ্রাম্যতা আছে, কাব্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যেমন ফল্গু নদী হইতে জল বাহির করিত সেই ভাবে। পরের চণ্ডীদাসে উহা প্রকট, নদীর স্রোতের জলের মতো।

কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বর্ণিত প্রেমের গন্ধও প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগের বাঙালির মধ্যে প্রচলিত বিবাহিত জীবনে ছিল না। বাংলা কাব্য হইতে উহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। এখন লৌকিক আচার হইতে দিব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লী জীবনের বর্ণনা বাস্তব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার একটি গল্প হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিয়া সেকেলে বাঙালি বধূদের মধ্যেও প্রেমের কি ধারণা ছিল তাহার পরিচয় দিব। একটি বাঙালি বধূ আধুনিকা অবিবাহিতা ননদের প্রেম সম্বন্ধে বাচালতা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পাকামি শুন্‌লে গা জ্বালা করে। আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন।'

তখন তিন ছেলের মা হওয়াকেই প্রেমের হদ্দমুদ্দ মনে করা হইত। তিন ছেলের মা হইয়া প্রেমের অভিজ্ঞতা কিরূপ হইত তাহার পরিচয় আমার বাল্যকালের একটি সত্য ঘটনা হইতে দিব। ময়মনসিংহ জেলায় আমার পৈতৃক গ্রামের কাছেই আর একটি গ্রামে একজন যুবা বয়সী গৃহস্বামী বাস করিতেন। পিতামাতা না থাকায় তিনি ও তাঁহার বছর বাইশের স্ত্রীই সংসারের কর্তা ও কর্ত্রী। একদিন ভিতর বাড়ির উঠানে নিম্নজাতীয় মজুরেরা জ্বালানি কাঠের ভারা নামাইয়া বলিল, 'ঠাকরুন, আঁটিগুলো রান্নাঘরে তুলে দিতে কাউকে বলুন।' ঠাকরুন দেখিলেন একটি লোক খালি গা কিন্তু খড়ম পায়ে অন্তঃপুরে ঢুকিতেছে। তিনি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ লোকটাকে তুলে দিতে বল।' মজুরেরা জিভ কাটিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'কি বলেন, ঠাকরুন, কর্তা যে।' তখন গৃহিণীর তিন ছেলে, কিন্তু স্বামীর মুখ চেনার সুযোগ হয় নাই। তিন ছেলের মা হইবার জন্য যতটুকু প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা অবশ্য পাইয়াছিলেন।

এইরূপ একটা ঘটনা ঘটা কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা বলি। প্রথমত, তখনও গোঁড়া পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ দিনের বেলায় হইত না। স্ত্রী ঘরের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ গিয়া শুইয়া থাকিতেন। মশার জন্য মশারী থাকিত, তাহা ভারী হইত—'নেটে'র হইত না। বাহিরে পিলসুজের উপর প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিত। কাছে একটা লম্বা কঞ্চে থাকিত। স্বামী দশটার পর বাহির বাটি হইতে আসিতেন ও শয়নঘরে ঢুকিয়া বিছানার কাছে গিয়া সেই কঞ্চে দিয়া দীপ নিবাইয়া স্বস্থান অধিকার করিতেন। সুতরাং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান যেটি, অর্থাৎ চক্ষু, সেটা দিয়া স্ত্রীকে উপলব্ধি করার সুযোগ হইত না, অন্য চারটি অর্থাৎ কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ মাত্র দিয়া হইত। স্ত্রীরও তদ্রূপ। একমাত্র ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও সম্ভব ছিল।

এই অসুবিধা ছাড়া একটা বিশেষ ধরনের স্ত্রী-আচারের জন্যও আমাদের অঞ্চলে ঘরে আলো রাখা হইত না। তখন সেখানে সম্পন্ন গৃহস্থেরও পাকা বাড়ি ছিল না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটচালাগুলির বেড়া হইত দরমার, তাহাতে ফাঁক বা ছিদ্র থাকিত। রাত্রিতে কৌতূহলী জায়েরা ও ননদেরা ওই সব জায়গায় চক্ষু রাখিয়া দাম্পত্য প্রেম কিরূপ তাহা দেখিতে চাহিত। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বামীরা শয্যায় প্রবেশ করিবার আগেই প্রদীপ নিবাইত, পত্নীকে লজ্জা নিবারণের জন্য মুষ্টিচূর্ণ ছুঁড়িয়া নিবাইতে হইত না।

এই তো গেল সেকালের দাম্পত্য জীবনে প্রেমের কথা। এখন নূতন দাম্পত্য প্রেমের কথা বলি। উহা যে কেবলমাত্র বিবাহের পূর্বে কল্পিত পূর্বরাগের মধ্যেই দেখা দিল তাহাই নয়, বিবাহের পরেও ছেলে হইবার বয়স হইলেও ছেলে হওয়া স্থগিত রাখিয়া (মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে ছেলে হওয়া স্থগিত রাখার কোনও কৃত্রিম উপায় ছিল না।) প্রেমকে বিবাহিত জীবনে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাতেও দেখা দিল। আপাতত নূতন প্রেমের পথে একটা বাধার কথা বলিব।

বাঙালি জীবনে ইউরোপ হইতে আনা 'রোমান্টিক' প্রেম সেই যুগেই বাংলাদেশে বিলাত হইতে আনা নূতন গোলাপের মতো ফুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বিনা বাধায় নয়। বাধাটাও একটা বিদেশীয় প্রভাব হইতেই সৃষ্ট হইল। উহা ব্যাখ্যা করিবার আগে বাধাটার রূপ কি ছিল তাহার পরিচয় দিব। উহা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস হইতে।

পরেশবাবুর বাড়িতে যাইবার জন্য বিনয়কে অত্যন্ত উৎসুক দেখিয়া গোরা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,

"মনে হচ্ছে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেশন করে তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ?"

রবীন্দ্রনাথ লিখিতে লাগিলেন,

বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, "গোরা, বস্, এইবার থামো।"

গোরা। "কেন, এর মধ্যে তো অসম্ভ্রমকর কোনো কথা নেই। শ্রীহস্ত তো অসূর্যম্পশ্য নয়। পুরুষমানুষের সঙ্গে যার শেক্‌হ্যান্ড চলে সেই পবিত্র কর-পল্লবের উল্লেখটি পর্যন্ত তখন তোমার সহ্য হলো না, তদা নাশংসে মরণায় সঞ্জয়!"

বিনয়। "দেখো, গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি—আমাদের শাস্ত্রেও..."

গোরা। "স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করছ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ো না। ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি তো মারতে আসবে।"

বিনয়। "এ তুমি গায়ের জোরে বলছ।"

গোরা। "শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন—পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। তাঁরা পূজার্হা, কেননা গৃহকে দীপ্তি দেন। পুরুষমানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বললেই ভালো হয়।"

বিনয়। "কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড়ো ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষ করা উচিত!"

গোরা অধীর হইয়া কহিল, "বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নাও। আমি বলছি বিলিতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে যে-সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্ছে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মা'র ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন, সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মতো তোমার মনটা যে কারণে পরেশবাবুর বাড়ির চারিদিকে ঘুরছে, ইংরাজিতে তাকে বলে 'লাভ'—কিন্তু ইংরেজের নকল


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ 'লাভ' ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে, এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে না পেয়ে বসে।"

'গোরা' উপন্যাসে যে-যুগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তখন ইংরেজি শিক্ষিত নব্যহিন্দুপন্থী বাঙালি ও তেমনি ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মপন্থী উদার বাঙালির মধ্যে নারী সম্বন্ধে এই ধরনের তর্ক চলিত। তাহারা মনে করিত এই তর্ক ভারতীয় ধারা ও পাশ্চাত্য ধারার মধ্যে পার্থক্য লইয়া। এখনও অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গোরা যাহা বলিল তাহা হিন্দু 'থীসিস্', ও বিনয় যাহার পক্ষে তাহা আমাদের জীবনে ইউরোপীয় 'অ্যান্টিথীসিস'—হয়তো বা দুইটির সমন্বয়, অর্থাৎ মিলিবার পর 'সিনথেসিস্'-এ পৌঁছানো যাইত। কিন্তু উহা মোটেই নয়। প্রথমত, বিনয়ের মতই 'থীসিস', গোরার মত 'অ্যান্টিথীসিস'। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে নূতন ধারণা ইংরেজি শিক্ষার ফলে আসিবার পর নব্য বাঙালি জাতীয়তাবোধ হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা কল্পিত হিন্দু ধারণা খাড়া করিল। গোরা এই বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে 'থিওরি' খাড়া করিল, তাহা প্রাচীন কোনও হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করা যায় না। 'পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ' বচনটা মনুসংহিতা হইতে, উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা ছাড়া মনুসংহিতাতেই স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে যে-কথা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিলে আজকালকার সাহেব-মারা বাঙালিরা কানে হাত দিবেন, ও মেম-মারা বাঙালিনীরা ক্ষেপিয়া যাইবেন। আমার মাতাই আমার কাছ হইতে মনুসংহিতার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনিলে রাগ করিতেন। আমি তখন বি-এ পড়ি, কুড়ির নীচে বয়স। ওই বয়সে স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখানোর একটা ঢং হয়। আমি উহার বশে স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলে মা মনুসংহিতা হইতে 'যত্র নার্য্যঃ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' এই বচন আওড়াইয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেন। আমি তাঁহাকে ইহা বুঝাইতাম—'মা! জান-না তো মনু কেন এই কথা বলেছিলেন। তাঁর মত—বাড়ির মেয়েদের পিতা, স্বামী, এমন কি ভ্রাতা পর্যন্ত সর্বদাই বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে খুশি রাখবে। এই হলো পুজো। এই পুজো না করলে, তারা এমনই খিটিমিটি করবে যে, গৃহদেবতা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন।' তখন মা আমাকে হাতের কাছে যাহা পাইতেন, সে পাখাই হউক কিংবা হাতাই হউক, লইয়া তাড়া করিতেন।

গোরার কথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রেরও বহুবিধান চাপা দিতে হইত, সমস্ত সংস্কৃত কাব্য ও কামশাস্ত্রের অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতে হইত। সংস্কৃত কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কামশাস্ত্রের কথাই বলিব। উহাতে যে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের কথাই আছে তাহা নয়, গার্হস্থ্যাশ্রমে পত্নীর আচরণ সম্বন্ধেও বহু বিধান আছে। এই বইটির 'ভার্যাবিকরণ' অংশে উহার পরিচয় আছে। আমি শুধু দুইটি উপদেশের উল্লেখ করিতেছি। একটিতে উপদেশ আছে—পত্নী কখনও স্বামীর সম্মুখে গাত্র মার্জনা করিবে না, কারণ ওই অবস্থা দেখিলে স্বামীর 'বৈরাগ্য' হইতে পারে। আরেকটি কথা এই যে, স্বামীর কাছে যাইতে হইলে—এ-স্থলে স্বামীকে 'নায়ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—পত্নী 'বহুভূষণ' গ্রহণ করিয়া 'বিবিধকুসুমানুলেপন' ও বিবিধ অঙ্গরাগ করিয়া সমুজ্জ্বল বাস পরিবে, এমন কি 'প্রতনু-শ্লক্ষ্ণ-অল্প-দুকূলা' হইয়া (অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও মসৃণ রেশমী বস্ত্র পরিয়া) যাইবে। আমি সমাস ভাঙ্গিয়া উদ্ধৃত করিলাম। সুতরাং বুঝিতে হইবে হিন্দুগৃহে নারীর স্থান সম্বন্ধে নূতন ধারণা ইংরেজ শাসনের যুগে বাঙালির ইউরোপ-লব্ধ জাতীয়তাবোধ হইতে আসিয়াছে। উহা নব্য বাঙালির একেবারে স্বকপোল কল্পিত ধারণা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোরা এই ধারণার বশেই প্রেমকে নিজের জীবন হইতে চিরতরে বিসর্জন দিতে গেল কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দিনে তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল—"অন্যায় রহিয়া গেল।" 'এ অন্যায় নিয়মের ত্রুটি নহে, মন্ত্রের ভ্রম নহে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নহে, এ অন্যায় প্রকৃতির ভিতর ঘটিয়াছে।' গোরা এই অন্যায়ের কাছে নিজেকে বলি দিত। কিন্তু একটা অভাবনীয় ঘটনাচক্রে বাঁচিয়া গেল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এ ধরনের বিরোধ, অর্থাৎ ধর্মবোধ ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ যেন ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এটা ললিতার বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের আপত্তির ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। হারাণবাবু ললিতাকে বলিলেন—

> 'আসক্তির ছিদ্র দিয়ে দুর্বলতা যে মানুষকে কি-রকম দুর্নিবার ভাবে আক্রমণ করে তা অনেক দেখেছি এবং মানুষের দুর্বলতাকে কি-রকম করে ক্ষমা করতে হয় তাও আমি জানি, কিন্তু যে দুর্বলতা কেবল নিজের জীবনকে নয়, শত সহস্র লোকের জীবনের আশ্রয়কে একেবারে ভিত্তিতে গিয়ে আঘাত করে, তুমিই বলো, ললিতা তাকে কি এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা করা যায়? তাকে ক্ষমা করবার অধিকার কি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন?'

'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১০ সনে, শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। শরৎবাবু নিশ্চয়ই 'গোরা'তে এই জায়গাটা স্মরণ করিয়া বিলাসের মুখে বিজয়ার প্রতি এই উক্তি দিয়াছিলেন—

> 'আমি জানি আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালবাসাকে উর্ধ্বে স্থান দিতাম, তা হলে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যেতাম—বিজয়া, তুমি যাকে ভালবেসেচ, তাকেই বরণ কর। আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে!'...
>
> 'কিন্তু, একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা, যাকে ভালবাসা বলে মানুষ ভুল করে সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর চরম লক্ষ্য? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হতে পারে না। এই বিরাট উদ্দেশ্য সত্য! মুক্তি! পরব্রহ্মপদে যুগ্ম আত্মার একান্ত আত্মসমর্পণ। আমি বলচি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে।'

বিজয়া অন্য কারণে আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার প্রতিবাদ করিল না। তবে সেও গোরার মতো বাহ্যিক অবস্থাচক্রে বাঁচিয়া গেল।

বাঙালি জীবনে ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের পথে বাধা যে কেবল সেই ইউরোপ হইতেই আমদানী করা দেশপ্রেম ও ধর্মবোধ হইতেই আসিল তাহা নয়, ইংরেজ সমাজ হইতে আমদানী করা একটা নৈতিক ধারা হইতেও আসিল। উহা ইংরেজের 'পিউরিট্যানিজ্‌ম্', উহার প্রভাব বাঙালির উপর পড়িবার পর বাঙালির মধ্যে একটা নৈতিক বায়ু দেখা দিল। সেই শুচিবাই-এর বশে বাঙালি নূতন প্রেমকে নিন্দা করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া বাঙালি 'পিউরিট্যান'রা নূতন প্রেমের প্রচারক ঔপন্যাসিকদের উপর ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। উহার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিন্তু দৃষ্টান্তটি দিবার আগে উহার পূর্ব-ইতিহাসও দিবার প্রয়োজন আছে, কারণ উহা একটি প্রচলিত ধারা হইতেই উদ্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জীবনে নূতন 'রোমান্টিক' প্রেমের প্রবর্তক, উহার বিরোধিতাও তাঁহার সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার মুখের উপরও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বাঙালি লেখক পর্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নবীনচন্দ্র সেন ১৮৯৩ সনে বঙ্কিমকে বলেন যে, প্রেমের অবাধ প্রচার করিয়া তিনি বাঙালি সমাজের অহিত করিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধরনের বিরোধিতার কথা এমন করিয়াই জানিতেন যে, তাঁহার একটি গল্পে এই ব্যাপার লইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহাতে এক রায়বাহাদুরকে বঙ্কিমের বাল্যবন্ধু বানাইয়া তাঁহার মুখে এই উক্তি দিয়াছিলেন—

> 'বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐসব লভ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুনবে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ দেখি। আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ, যৌথ কারবার সম্বন্ধে...'

রায়বাহাদুর বলিলেন, 'তা নয় খালি লভ আর লড়াই।' বঙ্কিমবাবু এই বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে রায়বাহাদুর রাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তির কথা রবীন্দ্রনাথও জানিতেন, তাই তিনি লিখিয়াছিলেন, 'যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাহির হয়, সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়।' ব্রাহ্মসমাজেও এই শুচিবাই কম প্রবল ছিল না। প্রভাতকুমারের গল্পের এক নায়ক প্রচণ্ড গোঁড়া ব্রাহ্ম সন্তোষকে ক্ষেপাইয়াবার জন্য বলিল, 'গিল্‌বার্ট পার্কারের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই আমি পড়েছি। ওখানা কোন্ উপন্যাস?' সন্তোষবাবু অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া বলিলেন, "উপন্যাস! 'উপন্যাস' হবে কেন? এ থিওডোর পার্কারের' 'টেন সার্মন্স'—ধর্মগ্রন্থ।"

AMARBOI.COM

এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-বিরোধী উক্তি তাঁহার "পথ-নির্দেশ" গল্পে হেমনলিনীর মাতা সুলোচনার মুখে দিয়াছিলেন। হেম তাহার সুবাদে ভাই গুণেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সম্বন্ধের বিবাহ করিতে প্রবল আপত্তি করিতেছিল। ইহা শুনিয়া সুলোচনা রাগিয়া গুণীকে বলিলেন, 'এইসব দিনরাত বই পড়ার ফল। চব্বিশ ঘণ্টা নভেল, নাটক নিয়ে থাকলেই এই সমস্ত দুর্মতি হয়।'

এখন ভূমিকার পর দৃষ্টান্তটি দিই। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রভাতকুমারের গল্পসমষ্টি 'ষোড়শী' গ্রন্থের সমালোচনা। উহা ১৯০৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অক্ষয়চন্দ্র 'ঋষি বঙ্কিমে'র প্রতিভূ—যেমন ওমর ছিলেন হজরত রসুলের খলিফা। প্রভাতকুমারের 'ষোড়শী' সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের আপত্তি গুরুতর—'সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা-গ্রন্থন। ষোলটি গল্পের আটটিতে ষোড়শীই "জান্"। বাকিগুলিতেও অক্ষয়চন্দ্রের আপত্তি যে, নায়িকারা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ বা সপ্তদশ বর্ষীয়া। এইবার সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিব, কারণ এই লেখাটির মতো গোঁড়ামির বশে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমগ্র বাংলা লেখাতেও আর একটি দেখা যায় না। সবটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

> এখন জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, বহুধবা ('সচ্চরিত্র' গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও ছাড়েন নাই) ষোড়শী লইয়া কারবার করিবে? এখন বুড়ো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের দোষে এইরূপ বিষয় উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। ভোর "যুবত্ব" সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, ভিক্টর হুগো যেমন নাইন্টীথ্রিতে একটি মাতৃচ্ছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইরূপ কিছু দেন না। সতীশবাবুর মা এক টুকরা কমলমণিকে লইয়া আমাদের ত আশা মিটে না। বঙ্কিমবাবু কার্যত কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরে, তোমরা অনেকেই দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর : 'ষোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে চিনি না) বেশ ভাবুক, সামাজিক অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু, তাঁহার লেখার সুন্দর ভঙ্গি আছে ; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে। তাঁহার যখন এত গুণ, তখন তিনি কেন কেবল ষোড়শী আর ষোড়শী করিবেন, কেন বর্ষীয়সী বাঙালি মার চিত্র অঙ্কন করিবেন না ? ভালবাসা ত আর দাম্পত্য প্রণয়ে বা যৌবযোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। বরং এমনও অনেকে বলেন যে মার ভালবাসাই ভালবাসা। অনেক সময় মাতা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না। ব্যভিচারিণী 'কাশী-বাসিনী'র গল্পে সেই কথাই গ্রন্থকার একরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ষোলটি গল্পের মধ্যে একটি কুলটা মার কাহিনীই কি যথেষ্ট ? কখনও না।

'বাঙ্গালি বহুকাল হইতেই মাকে চিনিয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্য সেবনে বিকৃত মস্তিষ্ক হইবার পূর্বে 'মা-মা' করিয়া বাঙ্গালি পাগল হইত আর ছড়ায়, গানে, যাত্রায়, পাঁচালিতে—কি মাতৃগাথাই না গাহিয়া রাখিয়াছে। মহাশক্তি মা, কিন্তু মার উপর এক ডিগ্রী মা বাঙ্গালি চড়াইয়াছে। গিরিরাণী মেনকা বাঙ্গালির অপূর্ব সৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের যশোদা বাঙ্গালির হস্তে কত মোলায়েম, কত ভাবময়ী—তাহাও কি আবার লিখিয়া বলিতে হইবে, যশোদাকে না দেখিলে ভূতভাবন ভগবানকে কি কেহ নীলমণি গোপাল বলিয়া কোলে টানিতে সাহস করিত, রামপ্রসাদ মার নামে যে জীবনীশক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে বাঙ্গালি এখনও নড়িতেছে। আর সেই মাকে তোমরা তোমাদের সাধের সাহিত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া রাখিবে ? তুমি পথেঘাটে বলিবে বন্দেমাতরম্ আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে 'বন্দে ষোড়শীং রূপসীং প্রেয়সীম্।' ছি ! তুমি আপনাকে আপনি চিন না। ইংরাজি সাহিত্যের কুহকের মোহে তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ মোহ কাটাইতে যত্ন কর। সাহিত্যে মাকে ভুলিও না। যে রাম বসু কিশোর-কিশোরীর বিরহগীতি গাইয়াছেন, তিনিও ত আগমনী গানে মেনকার উক্তিতে নানাবিধ মাতৃচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তুমিও যত্ন করিলে, সেইরূপই করিতে পারিবে, তবে কিনা একবার চোখে, মুখে জল দিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিতে হইবে, দারুণ মোহ ভাঙ্গিতে হইবে।'

অক্ষয়চন্দ্র নানা মাতৃভক্তের সঙ্গে রামপ্রসাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ভগবানের মাতৃরূপের উপাসক ছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া কালী কন্যারূপিণী হইয়া তাঁহার বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ কি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও লেখেন নাই ? সেটি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনায় কত গ্রাম্য তাহা না পড়িলে বলা সম্ভব নয়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এই ধরনের সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে নায়িকার যে একটা বিশেষ কাজের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, যাহা অন্য বই ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং গীতগোবিন্দেও অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে, এবং যাহা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও আছে—তাহাতে কি সুন্দর বিদ্যাকে 'মা, মা' বলিয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকিয়াছিল ? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বিশেষ অবস্থায় কৃষ্ণকে গালি দিলেন, 'আমি তোর মাউলানী, আর তুই এরকম কাজ কচ্ছিস ?' তিনি কৃষ্ণকে বাবা বলিয়া ডাকেন নাই। আমি একটা পুরানো গানে রাধার কৈফিয়ৎ শুনিয়াছি। গানটি এই—

'কদম্ব-তরুতলে যে বাঁশী বাজিয়েছিল,
সে তো মোর বাবা নয়কো
আর জনমে ভাতার ছিল।'

অক্ষয়চন্দ্রের কথার মতো কথা বলা মূঢ়তা কি ভণ্ডামি তাহা বলা শক্ত হইত, যদি না আমি জানতাম যে, এক অন্ধ জাতীয়তাবোধের গোঁড়ামি হইতেই আমাদের দেশের সকলেরই, বিশেষ করিয়া বাঙালির বুদ্ধি লোপ হয়।

**রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, ২৭ নভেম্বর ১৯৮৮ ; লেখকের 'আত্মঘাতী বাঙালী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'আজি হতে শতবর্ষ আগের' সংক্ষেপিত অংশবিশেষ।**

AMARBOI.COM

# ‘খাঁটি বাঙালি ব্যভিচারিণী থাকিব—না, মেকী ইয়োরামেরিকান ব্যভিচারিণী হইব ?’

আজকাল প্রায় প্রতিটি বাঙালি তরুণী বা যুবতীকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আমি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই কথা বলিতেছি। ইহাতে উদ্ভটতা দেখাইবার প্রয়াস নাই। কথাটা গুরুগম্ভীরভাবেই বলিতেছি। কেন ? উহারই বিশদ আলোচনা করিব।

বাঙালি চরিত্রের চরম দুর্বলতার ধারণা আমার প্রথম হয় ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি পড়িয়া। উহা এই—‘বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।’ যে কোনও অবস্থার কাছে পরাজয় স্বীকার করিবার একটি দৃষ্টান্ত বর্তমানে বাঙালির পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়াছে। উহা হইতেই আমি যে-প্রশ্নটা বাঙালি রমণীর মুখে দিয়াছি তাহার উদ্ভব হইয়াছে। উহা শুনিবামাত্রই উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাদ না-করিয়া বাঙালি পিতা-মাতারা যদি আমার সমস্ত আলোচনাটা ধৈর্য ধরিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবত স্বীকার করিবেন যে, আমার কথাটা প্রণিধানের যোগ্য, নির্বিচারে মানিয়া লইতে বলিতেছি না।

কন্যার বিবাহের ব্যাপারে বাঙালি একশত বৎসর ধরিয়া এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার দাস হইয়া ক্রমাগত মত-পরিবর্তন করিতেছে। একশত বৎসর আগে এগারো বৎসর বয়স্কা হইবার আগে মেয়ের বিবাহ দিতে না-পারিলে বাঙালি পরিবার জাতিচ্যুত হইত। উহার পর অবস্থার চাপে বিবাহের বয়স তেরো-চৌদ্দতে উঠিল। কিন্তু সেই বয়সে বিবাহ দিতে না-পারিলে পিতার দুশ্চিন্তা হইত, মাতার বুক শুকাইয়া যাইত। ১৯২২ সন পর্যন্তও সাধারণ বাঙালি ভদ্র পরিবারে কন্যার বিবাহ কিরূপ সঙ্কটের ব্যাপার ছিল তাহার পরিচয় দিতেছি একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া।

সে-বৎসর আমার ছোট ভাই ক্ষীরোদ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বৎসরে পড়িতেছিল। তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টিতে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চল ভাসিয়া গিয়াছে। একজন সমপাঠীকে লইয়া সে এক হাঁটু জল ভাঙিয়া ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে আসিতেছিল। উহারা দেখিল, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকও হাঁটুর উপরে ধুতি তুলিয়া ছাতা-মাথায় অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে আসিতেছেন, উল্টা দিক হইতে। যুবকদের ইহা দেখিয়া করুণা হইল, উহারা তাঁহার দিকে চাহিল। ভদ্রলোকও কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, “আপনাদের কেউ দয়া করে আমার মেয়েটাকে বিবাহ করবেন ?” ভাইয়ের সমপাঠী হাসি চাপিতে পারিল না, জল দেখাইয়া বলিল, “আপনার মেয়ে কি ওই জলে পড়েছে ?” ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, “মেয়ের বাপ তো নন। তাই ঠাট্টা করতে পারছেন।”



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকাল সেই বাঙালি বাপেরাই, এমন কি মায়েরাও মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তাও করে না, এমন কি লেখাপড়া এম. এ. পর্যন্ত করাইয়া চাকুরি করিতে পাঠায়। সেখানে যে বহু সমবয়স্ক যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা হয়, তাহার সম্বন্ধেও সঙ্কোচ বোধ করে না। অবস্থার দাস হওয়া আর কাহাকে বলে ? একশত বৎসরে এ বিষয়ে যে-পরিবর্তন হইয়াছে, উহার পিছনে বিচারও নাই, নিজস্ব ইচ্ছাও নাই, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে।

এই অবস্থায় আমি যে-প্রশ্নটার কথা বলিলাম, তাহা যুবতীদের মনে জাগা কি অস্বাভাবিক, না অপ্রত্যাশিত ? নৈতিক শুচিবাইয়ের বশে কুতর্ক না-করিয়া এ-বিষয়ে স্থিরভাবে বিচার করিতে হইবে।

প্রথম কথাটাই এই যে, ব্যভিচার মানবসমাজে নূতন জিনিস নয়। অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক সত্য যে, যতদিন ধরিয়া মানবসমাজে বিবাহবন্ধন আছে, ততদিন ধরিয়া একই সঙ্গে ব্যভিচারও আছে। ইহার ব্যতিক্রম কোনও যুগে কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই।

সুতরাং ধরিয়া লইতেই হইবে, আবহমান কাল ধরিয়া মানবসমাজে যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা বাঙালির মধ্যেও দেখা দিতে পারে ; শুধু পারে কেন, দেখা দিয়াছে। তবে যেটা নূতন সেটা কুমারীজীবনে ব্যভিচারের প্রসার। ইংরেজি ভাষায় বিবাহের বাহিরে পুরুষ-স্ত্রীর দৈহিক মিলন সম্বন্ধে দুইটা শব্দ আছে। উহার একটা adultery, ইহা শুধু বিবাহিত ব্যক্তির বেলাতেই প্রয়োগ করা হয়। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের ইংরেজি শব্দ Fornication। যেহেতু বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় শব্দটার প্রতিশব্দ নাই, আমি এই প্রবন্ধে 'ব্যভিচার' শব্দটা দুই ইংরেজি অর্থেই ব্যবহার করিতেছি।

আমি সম্প্রতি অন্য প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইংরেজিতে করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, বাঙালি সমাজের বর্তমান অবস্থায় এই ব্যাপারটার আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া একটা বিশেষ উপলক্ষও আছে। কিছুদিন আগে কয়েকটি বাঙালি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রবীণ—অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌঁছিয়াছেন—তিনি দেখিলাম আমার ইংরেজি বইগুলি শুধু যে পড়িয়াছেন তাহাই নয়, উহাতে যে-সব উক্তি করিয়াছি উহা প্রণিধানও করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, বইগুলির মধ্যে ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত The Continent of Circe তাঁহার বেশি ভাল লাগিয়াছে। এই বইটি বিলাতে একটি সাহিত্যিক পুরস্কার পাইয়াছিল। তবে উহাতে একটি বিষয়ে আমার অভিমত সম্বন্ধে তাঁহার মনে খট্‌কা জাগিয়াছে বলিলেন, ও আমার এই অভিমতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অভিমতটা ডি-এইচ লরেন্সের Lady Chatterley's Lover সম্বন্ধে। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এইরূপ—

'Hindu poets and story writers would have considered a book like Lady Chatterley's Lover outrageously low, and there can be no doubt that so it is. The trouble with D.H. Lawrence was that he was a literary genius from the most vapid and insignificant class of human beings which so far has been evolved in history, namely, the modern urban lower middle-class of the West. Next, intuition, not intellect, being his forte, he could never perceive when he was being driven by his genius and when by his itch to rebel in a very lower middle-class manner.'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে ঐইরূপ মত প্রকাশ করিবার জন্য আজিকার দিনের সাহিত্য সমালোচকেরা আমাকে শুধু যে অনধিকারচর্চাকারী মনে করিবেন তাহাই নয়, অপাংক্তেয়ও করিয়া রাখিবেন। সেই জন্যই কলিকাতাতেও বাঙালি সাহিত্যরসিকেরা আমাকে পুরুষত্বহীন বলিয়া মনে করিবেন, কারণ তাঁহাদের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব মতামতে ও ব্যাপারে পাশ্চাত্য ধরনে ফ্যাশনেবল হওয়া। আমি এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছিলাম—

'It needs considerable discipline of the mind and also moorings in a great cultural tradition, to be able to write erotic books which are acceptable to a civilized society, and which a civilized person can read without feeling a *sale bete* all the time.'

ইহার পর আমি সম্রাট নিরোর অমাত্য পেট্রোনিয়াসের উল্লেখও করিয়াছিলাম। তিনি রোমান 'প্যাট্রিশিয়ান' হইয়াও একটা অশ্লীল গল্প লিখিয়াছিলেন, তবে উহার সাফাই হিসাবে বলিয়াছিলেন, 'Ideo ego adulesceentulos existimo in scholis stultissimus fieri, quia nihil ex, his, quae in usu habemus, aut audiunt aut vident.' (I believe that college makes complete fools of our young men because they see and hear nothing of ordinary life there.)

লেডি চ্যাটারলি-জাতীয়া রমণীরা কিসের জন্য ব্যভিচারিণী হইতেন তাহা হিন্দু কবিরা যে জানিতেন না, তাহা মোটেই নয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় কার্যকলাপের বাস্তব বিবরণ আছে। এই বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে বলা হইয়াছে—'শশো-বৃষোজশ্ব ইতি...নায়ক বিশেষাঃ নায়িকা পুন মৃগী-বড়বা-হস্তিনী চেতি।' এই ইঙ্গিতই কি যথেষ্ট, না 'বাংলা করে' বলিব—'আমি তো আর আজকের নই গো, বলি আরও বলব, না এতেই হবে ?' তবু কিন্তু চক্ষুলজ্জা একেবারে কাটাইতে না-পারিয়া সূত্রটা হইতে একটা শব্দ বাদ দিলাম।

তবে প্রাচীন হিন্দু কবিরা ব্যভিচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাব্য লিখিতেন। উহার দৃষ্টান্ত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কুমারী কন্যার ব্যভিচারের কাহিনী। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যভিচারকে গান্ধর্ববিবাহ বলা হইত। এই গন্ধর্ব-গান্ধর্বীরা কিন্তু কোনও কল্পলোকে ছিল না, প্রাচীন ভারতে তাঁহারা ঘরে ঘরেই বাস করিত।

পিতারাও এইরূপ ব্যভিচারকে দূষণীয় মনে করিতেন না। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে গর্ভবতী দেখিয়া 'অ্যাবর্সন্' করাইতে চাহিলেন না, উল্টা প্রণয়ীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আজিকার দিনে কয়জন বাঙালি পিতা এই মনোভাব দেখাইবেন ?

পক্ষান্তরে গ্যেটে পর্যন্ত এই নাটকের স্যর উইলিয়াম জোনস্-কৃত অতি জলো অনুবাদ পড়িয়াও মুগ্ধ হইয়া একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন—

'Willte Du die Bluthe des fruhnen,
die Fruchte des spateren Jahres, (Wilt
Thou the blossom of spring and the
fruits that are latest in season,)
'Willte Du, was reizt und ent ziickt,
Willte Du was sattigt und nahrt,
(Wilt Thou have charms and delights,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Wilt Thou have strength and support)
'Willte Du den Himmel
die Erde mit einem
Namen begreifen,
(Wilt Thou with one short word
encompass the earth and heaven)
'Nenn ich, *Sacontala,* Dich, und so
ist Allesgesagt'.
(All is said if I name only
Sacontala, Thee.)'

গ্যেটের এই কবিতা লিখিবার অধিকার ছিল, কারণ তিনি ব্যভিচারের রসিক এবং বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে এইরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তখন অভিজাতবংশীয়া শার্লট ফন স্টাইনের আকর্ষণ তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে, তিনি তাঁহার চাকরানি ক্রিস্টিয়ানে ফুলপিউসের বাহুপাশে আবদ্ধ। গ্যেটে এই সেবিকাকে তাঁহার Bettschatz (Treasure of the bed) বলিতেন, কিন্তু দর্পিতা হ্বাইমার (WEIMER) বাসিনী অভিজাতবংশীয়ারা বলিতেন 'তাঁহার father half'।

প্রাচীন ভারতীয় ব্যভিচারের সৌন্দর্যবোধ এখন পাশ্চাত্য জগতে থাকা দূরে থাকুক, বাঙালির মধ্যেও নাই। তাঁহারাও আধুনিক ইয়োরামেরেকীয় ব্যভিচারের পূজারী হইয়াছেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে আমার বর্তমান মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য বহুকাল আগে প্রকাশিত কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিব। ১৯২৮ সনে পূর্ববঙ্গীয় কয়েকটি অবাচীন বালক-লেখক অশ্লীল গল্প লিখিয়া ইংরেজি সাহিত্যের দোহাই দিতেছিল। ইহাদের সম্বন্ধে আমি 'শনিবারের চিঠি'-তে এই উক্তি করিয়াছিলাম :

'হাজার বৎসর ধরিয়া কাব্যের পর কাব্যে নরনারীর আসঙ্গলিপ্সার কথা লিখিয়া বৃদ্ধের অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, তাহার চোখে আর অশ্লীলতার নেশা জাগিয়া উঠিতেছিল না। আজ কি সে নিজের জরা অন্য কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া যযাতির মত যৌবন ও ভোগের কামনা ফিরিয়া পাইল, না সে মরিয়াছে? চৌরপঞ্চাশৎ, অমরুশতক, শৃঙ্গারশতকের নির্জলা ব্র্যান্ডিতে যাহার নেশা হইত না, সে আজ এক পয়সার বিড়ি খাইয়া নেশা করি বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৃদ্ধ হিন্দুসমাজ আর বাঁচিয়া নাই। সে পাঁড় মাতাল মরিয়াছে। তাহারই পোশাক পরিয়া এক অবাচীন ছোকরা বাপের হুঁকায় চুরি করিয়া এক টান দিয়াই ঘুরিয়া পড়িয়াছে।'

আমাদের দেশে আজ যাঁহারা বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যভিচারের অনুকরণশীল হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও আমি এই কথাগুলিই আরও তীব্র করিয়া বলিব। নরনারীর সম্পর্কের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে ইহা যাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন তাঁহারা পাশ্চাত্যের অকেনা-গোলাম হইয়াছেন, কেনা-গোলাম হইলেও কিছু প্রশংসার পাত্র হইতেন। ইহা বুঝাইবার জন্য আমি বাঙালি সমাজে প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগে ব্যভিচার কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় দিব। তাহা হইতেই আমি যে-প্রশ্ন নব্যা বাঙালি যুবতীদের মুখে দিয়াছি তাহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই প্রবন্ধের এটাই মুখ্য বক্তব্য, অনেক ভূমিকা করিলাম, এখন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল কথা বলি।

বাঙালি সমাজে লেডি চ্যাটারলি-জাতীয়া ব্যভিচারিণী যে ছিল না তাহা একেবারেই নয়। বরঞ্চ যতদিন হইতে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, ততদিন ধরিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। উহার কিছু গুজব, কিছু কানাঘুষা, তবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে ইহার সন্ধান পাইয়াছি। দুইটির কথা বলি।

১৮৩১ সনের ৫ই নভেম্বর তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকাতে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে সম্পাদক বলেন যে, তিনি তাঁহার পত্রিকায় এক গ্রামবাসীর পত্র ছাপেন। উহাতে সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, সে কলিকাতায় আসিয়া কোনও এক প্রধান ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য ছিল, এবং সেখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছিল। যাহা সে দেখিয়াছিল তাহার বিবরণ সম্পাদকের কথায় দিতেছি—

> 'দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিয়াছিল তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্ত্তা, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও, ইঁহারা একে একে ভাবতেই বাটি হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোনও কোনও চাকর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থানে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব।'

সম্পাদক শেষে বলিলেন যে, পুরুষেরা যে স্বাধীন আচরণ নিজেরা করিত, সেই স্বাধীনতা পত্নীদেরও দেওয়া সঙ্গত মনে করিত।

AMARBOI.COM

আর একটি সংবাদপত্রে এক বাড়ির পাঁচি-নাম্নী একটি ঝি-র স্বাক্ষরিত একটি পত্র পড়িয়াছিলাম। পত্রিকাটির নাম মনে নাই, যতদূর মনে পড়ে 'সংবাদ প্রভাকর।' ইহাতে ঝিটি কলিকাতার একটি গণ্যমান্য বাড়ির নাম করিয়া জানাইয়াছিল যে, সে আড়ি পাতিয়া রাত্রিতে বাড়ির কর্ত্রী ও একটি ভৃত্যের ব্যাপার দেখিয়াছিল।

আমি অল্পবয়সে এই সব কথা শুনি নাই। কিন্তু সংসার-প্রবেশের পর যাহা শুনিলাম তাহাও এই জাতীয় সংবাদ। এই সব কেচ্ছাপ্রচার সামাজিক দলাদলি ও পারিবারিক আড়াআড়ির ফল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আমি শুনিতে পাইতাম যে, কলিকাতার প্রত্যেকটি জমিদারই বলেন যে, অন্য জমিদারদের কেহই তাঁহাদের পিতার সন্তান নহেন, সইসের সন্তান।

এইরূপ ধারণা যে খুবই প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯২৮-২৯ সনে আমার সহিত একটি উচ্চশিক্ষিতা বাঙালি মহিলার পরিচয় ছিল। তিনি সধবাও নন, বিধবাও নন, একটা দুর্বিপাকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব-জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য পুরুষ সম্বন্ধে একটু বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। ইহা দেখিয়া যে-পাড়াতে তিনি বাস করিতেন—কলিকাতার সুপরিচিত ভদ্রপল্লী, তবে খুবই রক্ষণশীল—সেই পাড়ার যুবকেরা তাঁহাকে ক্ষেপাইত। উনি ক্ষিপ্ত হইয়া তিনতলার জানালা হইতে উহাদের অতি কটু গালি দিতেন। আমার এক বন্ধু সেই পাড়ায় বাস করিতেন। তিনি একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'আপনার—দেবীকে সামলান তো! ওঁর পক্ষে তো পাড়ায় তিষ্ঠানো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায় হয়েছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী হয়েছে ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'সকাল বিকাল জানালায় দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা ছোকরাদের অত্যন্ত বনেদী গালি পাড়েন, বলেন, ("তোরা কি তোদের বাপের ছেলে ? দুপুরবেলা চাকরে তোদের পয়দা করেছে !") ছোকরারা আমোদ পাইয়া আরও ক্ষেপাইতে থাকে।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জনপ্রবাদে বিশ্বাস করিলে মানিতেই হইবে যে, বাঙালি রমণীদের মধ্যে লেডি চ্যাটারলির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অন্ততপক্ষে বহু স্বামী পত্নীকে লেডি চ্যাটারলি বলিয়া সন্দেহ করিত। আমার এক আত্মীয় কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আদালতে যাইবার সময়ে, স্ত্রীকে তালাবন্ধ করিয়া যাইতেন, ও কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তালা খুলিয়া দিতেন !

কিন্তু আমি যাহাদের খাঁটি বাঙালি ব্যভিচারিণী বলি তাহারা অন্য স্তরের নারী ছিল। ব্যভিচারকে কত উন্নীত করা যায় তাহা উহারা দেখাইয়াছিল। একটা আশ্চর্যজনক কথা বলিব—ব্যভিচারের যে-স্তরকে বাঙালি লেডি চ্যাটারলির স্তর বলিব, সেখান হইতেও কোনও কোনও বাঙালি বধূ ব্যভিচারের উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারিত। এই ব্যাপারও একটা সংবাদপত্রে পাইয়াছিলাম—উহার তারিখ ১৮৩০ নাগাদ, যতদূর মনে পড়ে 'সমাচারদর্পণে'—শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সংবাদপত্রে—পড়িয়াছিলাম। ঘটনাটা এইরূপ—

একটি যুবতী ব্রাহ্মণবধূ বাড়ির মুসলমান চাকরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। কিন্তু তাহাকে লেডি চ্যাটারলির সমধর্মী মনে করা গেল না। একদিন মুসলমান চাকরটি গ্রামের বাহিরে গিয়াছিল, সেখানে জঙ্গলে তাহাকে বাঘে মারিয়া ফেলে। তিন-চার দিন পরে দেখা গেল সেই ব্রাহ্মণবধূ বিষপান করিয়া কঙ্কালকে জড়াইয়া মৃত পড়িয়া আছে। তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিব ? না সহমৃতা সতী বলিব ? সতী মনে করিবার কারণ প্রাগ্-ব্রিটিশ বাঙালিজীবনের ইতিহাস হইতে দিতে পারি। এই ইতিহাস পাই পুরাতন বাংলা সাহিত্যে। কী পাই তাহা বলি।

AMARBOI.COM

ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধারা দেখা দিবার আগে, একটি বাংলা কাব্যেও সমসাময়িক জীবনে পতিভক্তি বা স্বামীর প্রতি ভালবাসার কথা পাওয়া যাওয়া যায় না। আমি এই যুগের প্রত্যেকটি কাব্য (তখন গদ্য ছিল না) পড়িয়াছি। উহার একটিতেও স্বামীর প্রতি ভালবাসা বা ভক্তির কথা নাই, যাহা আছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বিদ্বেষপূর্ণ নিন্দা। সেই যুগের কাব্যের একটা পুরাপুরি সর্গই হইত 'নারীগণের পতিনিন্দা'। ইহার ভাষা অতি স্পষ্ট হইত, তাই আমি যে এত মুখফোড় হইয়াছি আমিও উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। স্বামী পণ্ডিতই হোন, রাজার মুনসীই হোন, বৈদ্যই হোন, সকলেরই যথাযোগ্য নিন্দা উহাতে থাকিত।

পক্ষান্তরে বিবাহের বাহিরে যুবক-যুবতীর প্রেমের অতি কবিত্বপূর্ণ উক্তি প্রতিটি কাব্যেই পাই। উহার পিছনে দৈহিক প্রেরণা যে থাকিত তাহা কোথাও গোপন করা হয় নাই। তবে দু দিকেই সেই দৈহিক প্রেরণার প্রকাশ কাব্যময়—

'গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।'

... ... ...

'অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন

কে ধনী মাজিছে গা
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।'

অথবা—

'গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী
চক্ষুমুখ পদ্মছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ
নীলাম্বরে কাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী।'

যুবতীদের উক্তি ইহার অপেক্ষাও কবিত্বময়। দল বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইতেছে, পথে দেখিল সম্মুখে বকুল গাছের তলায় একটি রূপবান যুবক বসিয়া আছে। অবস্থা এইরূপ হইল—

'চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ্‌লো সই।
মদন জ্বালায় মরম জ্বলায়
বকুল তলায় বসিয়া ওই॥'

মনের ইচ্ছাও প্রকাশ করিল—

'আহা ম'রে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে॥'

অক্সফোর্ডে কোনও বাঙালি যুবক-যুবতী যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন এই সব কবিতা স্মরণ করিয়া যুবতীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করি, 'ইনি ?' যখন উত্তর পাই 'আমার স্ত্রী', তখন মনে মনে কপাল চাপড়াইয়া বলি, 'বাঙালি মেয়ের হল কী ? শেষ কালে স্বামীর সঙ্গে সাগরপারে আসে !'

এই সব কথা আমি আগেও অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তবু পুনরুদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে মনে করি। যুবতীরা মনের ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল—

'কহে একজন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে,
বিরহে জ্বালিঞা সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি,
হলদি জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥'

এইরূপ ব্যভিচারের লোকোত্তর সৌন্দর্যের মোহ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আশ্চর্যের কথা ইহার প্রমাণ পাই তাঁহার ঈশ্বরভক্তির কাব্য 'গীতাঞ্জলি'তে। উহার ২৬ নং কবিতাটির প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে সন্ধ্যাকালে মেয়েদের চিরাচরিত ধারায় জল আনিতে যাইবার কথা আছে। মনে পড়ে ১৯১৫ সনের বর্ষার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রারম্ভে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেতের ধার দিয়া সাইকেল চালাইয়া যাইতে যাইতে জল দেখিয়া গাহিয়াছিলাম,

'আর নাই বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে
এখন চলরে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।'

ইহার কথা 'বধূ' কবিতাটিতেও আছে—

'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।'

কিন্তু কবিতাটির প্রথম ভাগের সহিত দ্বিতীয় ভাগের কোনও যোগ পাওয়া যাইবে না, যদি বাঙালি মেয়েদের প্রাচীন ব্যভিচারের রীতি জানা না থাকে। সেই ভাগটি এইরূপ—

'এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসাযাওয়া—
ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফিরব কি না,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।'

এক বাঙালি ভিন্ন অন্য কেউ এই কবিতাটির দুই ভাগের মধ্যে পারম্পর্য আছে ধরিতে পারিত না, তাই ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তে রবীন্দ্রনাথ এই ভাগটা অসম্পূর্ণ অনুবাদ দিলেন, শুধু লিখিলেন—The ripples are rampant in the river, (No. 74 of the English translation), ইহাতে প্রেম সম্বন্ধে ইঙ্গিতও নাই। কিন্তু বাংলা কাব্যে এই ইঙ্গিতের এমনই মাধুর্য ছিল যে, এই ব্যভিচারকে ভালবাসার অমল ধবল পাল তুলিয়া ভাসিয়া যাওয়া, অথবা Wattean-র চিত্রে Voyage pour Cythere বলা যাইতে পারে।

WWW.AMARBOI.COM

কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিবাহিত জীবনের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিবরণ কেন পাই? যে-যুবতীদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের যখন বাড়ি ফিরিবার কথা মনে পড়িল, তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,

'ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা।।'

এই বিদ্বেষের কারণ বাল্যবিবাহ। আট-নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইবার পর স্বাভাবিক পুরুষস্পৃহা জাগ্রত হইবার আগে স্বামীর কামের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বালিকারা বিবাহকে অভিশাপ বলিয়া মনে করিত। উহার প্রমাণ আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেও দিতে পারি।

তাই যৌবনে পৌঁছিবার পর যখন তাহাদের ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিত, তখন তাহারা কিছুতেই স্বামীকে উহার অবলম্বন করিতে পারিত না। তাহারা বিবাহিত জীবনের কারাগার হইতে বাহির হইয়া মুক্ত আকাশের নীচে যাইতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাহিত। ইহাই পুরাতন বাঙালি ব্যভিচারিণী চরিত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি এ যুগেও ব্যভিচারিণী হইতেই হয়, তাহা হইলে কি এইরূপ সত্যকার বাঙালি ব্যভিচারিণী না হইয়া, আজিকার বাঙালি যুবতীরা নব্য পাশ্চাত্য ব্যভিচারিণী হইবেন ? সেই ব্যভিচার কী, বিদেশে থাকিয়া প্রতিদিন আমাকে দেখিতে হইতেছে। উহার কিছু আভাস দিই।

তবে দিবার জন্য কানাঘুষার উপর নির্ভর করিতে হইবে না। পাশ্চাত্যে লাম্পট্য ও ব্যভিচারের জয়যাত্রা ঢাক পিটিয়া চলিতেছে। উহার বিবরণ প্রতিদিন প্রভাতে খবরের কাগজ খুলিয়াই পাই। বিলাতের অতি উচ্চস্তরের কাগজও আজ এই ব্যাপারে পুরাতন 'News of the World'-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সব সংবাদপত্রকে ছদ্মবেশধারী Playboy বলা যায়। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের মটো ছিল, সম্ভবত আজও আছে—All That's Fit to Print, এখন আর ছাপার অযোগ্য বলিতে কিছুই নাই। আরও দেখি, উলঙ্গিনীর চিত্র না-ছাপাইয়া কোনও বিজ্ঞাপনই প্রকাশিত হয় না, এমনকি লোহার কড়িরও।

লাম্পট্য এবং ব্যভিচার সব যুগে, সব দেশে, সব জাতির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। তবে আজিকার পাশ্চাত্যে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা কখনও কোনও যুগে বা দেশে দেখা যায় নাই। এ-বিষয়ে লেখা বর্তমানে কিভাবে হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত পরে দিব। আপাতত অতীতে ইংলন্ডে কিভাবে হইত তাহার পরিচয় দিই। ইংরেজ জাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লস্‌ ও অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষার্ধ লাম্পট্যের যুগ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু এই দুই যুগেও ব্যাপারটা নিন্দিতই হইত, লাম্পট্যের বিবরণ দিলেও উহা যে ঘৃণ্য তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই হইত। কেহই বলিত না যে, উহা স্বাভাবিক বা বাঞ্ছনীয়। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উহার নিন্দা পিউরিটান যুগের তুলনায় কম উগ্র হইত না। প্রচলিত ধারণা এই যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালই চরম লাম্পট্যের যুগ। অষ্টাদশ-শতাব্দীর নীতি-প্রচারকেরা কিন্তু তাহাদের যুগকে সেই যুগ হইতেও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া মনে করিত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৭৭২ সনে একটি বিখ্যাত মাসিক পত্র London Magazine সে যুগের এইরূপ বিবরণ দিয়াছিল,—'When we look around us, we seem to see only a scene of universal debauch. The doors of profligacy are unhinged and morality seems overwhelmed in its own ruins.'

কিন্তু পত্রিকাটি লিখিয়াছিল যে, এই অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই উহার কৃত্য।

'In our description of the foibles of life, particularly those of the passions, we shall not suffer anything to escape us : if we attack too closely, let them blame themselves and mend their manners. We wound only to cure.'

সম্পাদক ইহাও বলিয়াছিলেন, 'We felicitate ourselves on having continually stemmed the torrent of iniquity.' পত্রিকাটির আক্রমণের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উহাতে দ্বিতীয় চার্লসের যুগের সহিত সম্পাদকের যুগের তুলনা ছিল। তিনি লিখিলেন—

'Nell guynn, though she was the loosest, harlot in the King's bedchamber, was yet the modest lady in the drawing-room, and was the chastest look in the circle. But our women, so distant are they from being


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ashamed of their follies, are sometimes the first to publish it; they glory in their infamy, and come in the fair face of the day, with all those wanton and lascivious airs which they carried from the adulterer's crew's arms.'

সেই যুগের কুকীর্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্য কী তাহাও সম্পাদক স্পষ্ট ভাষায় লিখিলেন—

'The torch of unlawful love which now burns so fiercely, burns mostly in secret, and in darkness: it will be our business to snatch in forth into daylight, where it will expire itself.'

আমি পত্রিকাটিতে এই সব পড়িবার সময়ে বোকা বনিয়া গিয়াছিলাম। এখনকার পত্রিকাতেও ব্যভিচারের বিবরণ পড়িয়া বোকা বনিয়া যাইতেছি, তবে বিপরীত দিক হইতে। সূর্যালোক এখন লাম্পট্য ও ব্যভিচারকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

লজ্জার বিষয় হইলেও লিখিতে হইবে। আমি যখন প্রথম ১৯৫৫ সনে বিলাতে আসি তখনও আজ যাহা দেখিতেছি তাহা দেখি নাই। শুধু একটা নতুনত্ব চোখে পড়িয়াছিল। জানিতাম প্রণয়সূচক কোনও আচরণ ইংরেজ প্রকাশ্যস্থানে করে না। দেখিলাম করিতেছে। তবে উহাতে হাসি পাইয়াছিল, ঘৃণা হয় নাই।

কিন্তু এখন যাহা দেখি তাহাতে ঘৃণা হয়। এই জুগুপ্সা, যাহা বমির উদ্রেক হইবার মতো, তাহা যদি না-হইত তবে আমাকে বলিতে হইত যে, আমি বাল্যকাল হইতে চরিত্রবান ও সভ্য হওয়া সম্বন্ধে যাহা শিখিয়াছি ও মানিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আমি নিজের চোখে প্রকাশ্য জায়গায় যুবক-যুবতীকে সঙ্গত হইতে দেখিয়াছি। আমার পত্নীরও একদিন এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। চলিতে অক্ষম হওয়াতে তিনি একটা 'কার-পার্কে' গাড়িতে বসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পাশে আর একটা গাড়িতে একজন যুবক বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি আসিল, উহা হইতে একটি যুবতী নামিয়া যুবকের গাড়িতে উঠিল, পত্নী দেখিলেন তাহার বাঁ হাতে বিবাহের আংটি। সে যুবকের সঙ্গে গাড়িতে যাহা করিল তাহা অনুমানমাত্র সাপেক্ষ হয় নাই।

ইহা এখন কাহারও অশালীন মনে হয় না, কারণ এই নূতন সত্যটা পাশ্চাত্য জগতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকায় গৃহীত হইয়াছে যে, রিরংসার অসংযত তৃপ্তিই স্বাভাবিক এবং উচিত, উহার দমন অন্যায়, এ-বিষয়ে সংযম সমাজের অমানুষিক অত্যাচার হইতে আসিয়াছে। এখন অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া তবু যে দেশ খানিকটা সংযত তাহার কথা বলি—উহা অবশ্য ইংলন্ড।

এই দেশে এইরূপ আচরণ সম্বন্ধে সংবাদ প্রথম পাই ১৯৬৩ সনে প্রফুমো (তিনি বিলাতের গভর্নমেন্টে সমর-সচিব ছিলেন), ক্রিস্টিন কিলার ও ওয়ার্ডের ব্যাপারে। মনে পড়ে এই ব্যাপারের কথা দেশে থাকিয়া পড়িয়াও মনে গভীর আঘাত পাইয়াছিলাম। দেশেও উহার অশ্লীলতার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। তবে তখন এই ব্যাপারের কর্মকর্তা ওয়ার্ড আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এখন হইলে তাহাকে সকলেই নর-নারীর ব্যাপারে Freedom fighter বলিয়া মাথায় তুলিয়া নাচিত। ইহার পর ব্যভিচার বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা কী দাঁড়াইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

(ক) রাজনৈতিক নেতাদের ব্যভিচার। পূর্বে কোনও প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী হইলে উহাদের নেতৃত্বের অবসান হইয়া যাইত। সম্প্রতিও বিলাতে দুইজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে হইয়াছে। তবে উহা সুনীতির বুড়ি ছোঁয়াইয়া রাখিবার মতো—কিছু দলাদলি হইতে, কিছু সেকেলে ভোটারদের আপত্তিতে। তবে শাস্তিটা সাময়িক হয়। হুজুগ মিটিয়া গেলেই উহারা মন্ত্রিত্ব ফিরিয়া পান। একজন ফিরিয়া আসিয়াছেন, আর একজনও হয়তো আসিবেন।

(খ) ইঁহাদের পত্নীরাও ক্ষমাশীলা হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন যে, উহা শুধু মন্ত্রী-পত্নী থাকিয়া সামাজিক মর্যাদা রাখিবার জন্য। তবে আমি মনে করি, কিছু আন্তরিকও বটে। এখন ডিভোর্স করা স্বামী সম্বন্ধে একটা কথা পত্নীদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—'আমরা বিবাহে বিচ্ছিন্ন বটে, তবে এখনও বন্ধু।' বিশ্বাসঘাতককে কেহ বন্ধু বলিতে পারে তাহা এর আগে শুনি নাই।

(গ) অ্যাংলিকান চার্চের যাজকেরাও এখন যে শুধু ব্যভিচারী হইয়াছেন তাহা নহে, 'হোমোসেক্সুয়্যাল'ও হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্তারা বলেন, তাঁহারা করুণার পাত্র।

(ঘ) ধনবান দম্পতিদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া যাহারা শিল্পবাণিজ্যে আছে—তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারের এক নূতন ও পাইকারি রূপ দেখা দিয়াছে। সংবাদপত্রেই পড়ি যে, এই ব্যভিচার কোনও কোনও বিশেষ ক্লাবে হইয়া থাকে। বহু দম্পতি এই সব ক্লাবে যায়, ও পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রীকে লইয়া ব্যভিচার করে, এক দম্পতি উহা নিজেরা তো করেই, অন্য দম্পতির আচরণ দেখিয়া আনন্দও পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে 'গোষ্ঠীপরিগ্রহ' বলিয়া একটা ব্যাপার ঘটিত। কিন্তু উহাতে একপক্ষে হয় একজন পুরুষ বা একজন নারী থাকিত। আজকাল সেই এক তরফের এককতা আর নাই।

(ঙ) এখন সবচেয়ে ব্যাপক ও লক্ষ্য করিবার ব্যভিচার কুমারীদের মধ্যে। আমি পোস্ট অফিসে গেলেই সম্মুখে যুবতীদের পেনশন লইতে দেখি। ইহারা সকলেই One-parent family-র কর্ত্রী। সেদিন পর্যন্তও অবিবাহিতা নারীর সন্তানের কথা অত্যন্ত গোপন রাখা হইত। কিপলিং-এর Gardener বলিয়া একটি গল্প আছে, উহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন যত জারজ সন্তান, পেনশনও তত বেশি। এই অবিবাহিতা যুবতীদের গভর্নমেন্ট সুখে রাখেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, তিনি One-parent family-র বিরোধী নহেন। এই যুবতীরা সন্তানের পিতার নাম দিতে চায় না, পেনশন হারাইবার ভয়ে। কিন্তু সমাজহিতের কর্তারা বলেন যে, অনেক সময় উহারা সন্তানের পিতার নাম নিজেরাও বলিতে পারে না, কারণ নিজেরাও নিশ্চিত জানে না। ইহার তাৎপর্য কী, আশা করি আমাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

সম্প্রতি সন্তানজন্মের সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এখন বিবাহের বাহিরে সন্তানের জন্ম সমস্ত জন্মের ৩১ পারসেন্ট, ও এই ৩১ পারসেন্টের ৮৪ পারসেন্ট কিশোরীদের মধ্যে। বিলাতে সন্তানজন্মের বয়স বারোতে নামিয়াছে, উহা স্বামীদের অত্যাচারে নয়, কুমারীর আগ্রহে।

(চ) আধুনিক ব্যভিচারের আর একটা দিক আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমার এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী আছেন—বয়স আশির উপরে। তাঁহার পত্নী বিদেশিনী, সাধারণত বিদেশেই থাকেন। তাঁহার বাড়িতে সন্ধ্যার পর তরুণীকে, কখনও বা তরুণীদের আসিতে দেখি, তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। উহারা রাত্রি-দ্বিপ্রহরে চলিয়া যায়। ইহাদের কেহই 'পেশাকর' নয়, 'পেশাকরেরা' মক্কেলের বাড়িতে আসে না। ইহারা সকলেই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাই নূতন। বৃদ্ধেরা লম্পট হয়, ইহা সর্ববিদিত, উহাদের লাম্পট্যে মানসিক কোনও আকর্ষণ থাকে না, উহা নিত্যনৈমিত্তিক বাহ্যিক কর্মের চাপের মতো হইয়া যায়, উহার চাপ লাঘব না-করিলে কষ্ট হয়। পূর্বে বৃদ্ধেরা এই চাপ হইতে মুক্ত হইত ব্যবসায়িনীদের সহায়তায়। এখন মুক্ত হয় গৃহস্থঘরের তরুণীদের অনুগ্রহে।

কিন্তু এই তরুণীরা বৃদ্ধদের কাছে আসে কেন? তাহাদের জৈব-ধর্ম তো লোপ পায় নাই? আমি উহার কারণ আবিষ্কার করিয়াছি। উহারা এখন দেহকে একই সঙ্গে বিক্রেয় ও উপহার দিবার জিনিস বলিয়া মনে হয়। তাই দেহ টাকার জন্য বৃদ্ধের কাছে বিক্রয় করিয়া, উহাকে boy-friendদের, অথবা প্রচলিত বাংলা ভাষাকে ইংরেজি করে যাহাদের P.N. বলা হইত, তাহাদের উপহার দেয়। ইহাতে তরুণীদের দুই দিকই বজায় থাকে।

আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যভিচারের যে বৈচিত্র্য ইংলন্ডে দেখিতেছি তাহার পরিচয় দিলাম। উহার মধ্যে একটা আশ্চর্য জিনিস কিন্তু চোখে পড়ে। ব্যভিচার পূর্বে সর্বদাই দৈহিক রূপের সহিত যুক্ত হইত। সেজন্য সংস্কৃতে একটা প্রবচন ছিল যে, 'ভার্য্যা রূপবতী শত্রু।' ইহার কারণ রূপবতী হইলেই তাঁহার ব্যভিচারিণী হইবার প্রলোভন আসিতে পারে। এখন আর সেজন্য রূপের আবশ্যক হয় না। তাহা চোখেও দেখি, সংবাদপত্রের ছবিতেও দেখি। এখনকার ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের চেহারা প্রায় সব সময়েই পরশুরামের গল্পের কেঁকড়া ও শাঁকচুন্নির মতো হয়।

এ-যুগের পাশ্চাত্য ব্যভিচারে মন তো লুপ্ত হইয়াছেই, দেহেরও অবমাননা হইতেছে। দেহের গৌরব ও শুচিতা একদিন কিভাবে অনুভব করিয়াছিলাম বলি। তাহা ঘটিয়াছিল রোমের ন্যাশনাল মিউজিয়মে। মিউজিয়টি রোমান সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের বিশাল স্নানাগারের মধ্যে—যাহা ভাঙিয়া গিয়াছিল তাহা মেরামত করিয়া মিউজিয়মে পরিণত করা হইয়াছে। একটি ঘরে গিয়া বিখ্যাত ভিনাস অফ্ কিরিনির মূর্তিটি দেখিলাম, শ্বেতপ্রস্তরের। উহার মাথাটি নাই, সুতরাং দেবীর মনের রূপ দেখিতে পাইলাম না, তবু নগ্নদেহের যে রূপ দেখিলাম তাহাতে নতজানু হইয়া পূজা করিবার ইচ্ছা হইল। নারীদেহের এই পূজা আর নাই।

ব্যভিচার জৈববৃত্তির ফল হইতে পারে, জৈববৃত্তির বিকারের ফলও হইতে পারে। এখন শুধু বিকার হইতেই প্রসূত। উহার মধ্যে স্বাভাবিক জৈববৃত্তিও আর নাই।

ইহা সংক্রামক ব্যাধির মতো। উহার ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উচ্চতম স্তরের সভ্যতা ও নৈতিক শিক্ষাতে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে যে-সব ভারতীয় পরিবার বিলাতপ্রবাসী তাহাদের কাহারও সেই দীক্ষা হয় নাই। সুতরাং বিলাতি ব্যভিচার তাহাদের সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে। উহার সংবাদ পাইতেছি, কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমার হাতে আছে। তবে উহার কথা লিখিয়া প্রবন্ধটিকে কলঙ্কিত করিব না। এইটুকু শুধু বলিব, এই দুর্গতির সম্ভাবনা ধর্মনিষ্ঠ বিলাতপ্রবাসী পিতামাতার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

আরও দুঃখের কথা, বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যভিচারের জোয়ারের ধাক্কা দেশেও পৌঁছিয়াছে। উহার জন্যই আমি এই প্রবন্ধের শিরোনামায় প্রশ্নটি দিয়াছি।

ইহা হইতে কি রক্ষার কোনও উপায় নাই? আছে। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য দুচারটা ঐতিহাসিক কথা বলিতে হইবে। বর্তমান যুগের ব্যভিচার বর্তমান যুগের নারীজীবন হইতে আসিয়াছে। এই নারীজীবনের প্রবর্তনকর্তা ইবসেন। তাঁহার নাটক Et


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Dvkkehjem (A Doll's House) ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত হয় ও ১৮৮৯ সনে প্রথম লন্ডনে অভিনীত হয়। আমি উহার কথা অতি অল্পবয়সেই শুনিয়াছিলাম। আমার এক মামা অত্যন্ত সাহিত্যরসিক ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'নীরু, এখন ইউরোপ 'ইবসেনিরামে' আবিষ্ট হয়ে গেছে।' এই শব্দটি অবশ্য বার্নার্ড শ' প্রচলিত করিয়াছিলেন। আমি ষোলো বৎসর বয়সে এই নাটকটি ইংরেজি অনুবাদে প্রথম পড়ি। উহার নায়িকা লোরা হেলমার বিবাহিত জীবনের তুচ্ছতা দেখিয়া স্বামীর বাড়িকে পুতুল খেলার ঘর বলিয়া মনে করিল ও উহা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন এবং পূর্ণতর জীবনের সন্ধানে বাহির হইল। কোথায় পৌঁছিল তখন বোঝা যায় নাই, এখন বোঝা যাইতেছে। এই সব নারীরা এখন আপিসে আপিসে বিরূপমানা, অর্থাৎ Doll's House হইতে বাহির হইয়া Robot's House-এ জীবনযাপন করিতেছে। উহা মানুষের মনকে বিনষ্ট করিয়া দেহেও শুধু ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা রাখে, নহিলে শূন্যতার অনুভূতি হইতে অব্যাহতি পায় না।

তবে কি ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও উপায়ই নাই? আছে, উহার নির্দেশ পুরাতন বাঙালি যুবতীজীবন হইতে পাওয়া যায়। সেই যুগের যুবতীরা সখির স্বামীর উল্লেখ করিত দুইভাবে—(১) 'তোর ভাতার', (২) 'তোর বর' বলিয়া। যতদিন পর্যন্ত স্বামীকে প্রণয়ী বলিয়া মনে করা সম্ভব ছিল, ততদিন তাহাকে 'বর' বলা হইত।

আমি বর্তমান যুগের বাঙালি যুবতীদের Robot House হইতে, Heartless House হইতে, ও Heartbreak House হইতে অভিসারিকা হইয়া বর-প্রণয়ীর খেলাঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। সেখানে তাঁহারা সতী এবং ব্যভিচারিণী দুই-ই হইতে পারিবেন, ব্যভিচারের জন্য পরপুরুষের আবশ্যক হইবে না।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ মাঘ ১৪০০, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৪

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# "পাসকরা মাগ"
# বা
# সেকালের বাঙালির চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা

কয়েক মাস আগে আমি 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকার কাছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে দেখা একটি বাংলা প্রহসনের পরিচয় দিয়াছিলাম। সেটির বিষয় ছিল, আমাদের দেশে ভোটের প্রথম হুজুগ। আজ সেই ব্রিটিশ মিউজিয়মেই দেখা আরও দুইটি সামাজিক প্রহসনের কথা বলিব। বইগুলি আমার কাছে এমন মজার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, হাতে লিখিয়া আংশিকভাবে নোট না লইয়া পুরাপুরি ফোটো কপি লইয়া আসিয়াছি।

বই দুইটির একটির নাম "পাসকরা মাগ" অপরটির নাম "বউবাবু"। উহাদের বিষয় কি তাহা নাম হইতেই বোঝা যাইবে। ইহার পর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নাটকগুলির প্রতিপাদ্য কি তাহা বলিয়া দেওয়াও অনাবশ্যক। কিন্তু খাঁটি বাংলা ভাষা ও বাঙালির নিজস্ব ধ্যানধারণা ও 'ঐতিহ্যে'র সহিত বর্তমান যুগের বঙ্গ সন্তানের পরিচয়ের প্রমাণ এত কম পাই যে, ব্যাখ্যাটা উহ্য রাখিতে ভরসা হয় না। এই নাটক দুইটি পড়ার পর হইতে গ্রন্থকারদের প্রাকৃত রসবোধ এবং খাঁটি দেশজ বৈদগ্ধ্যে আমি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, কোনও আধুনিক বাঙালি দম্পতির সহিত দেখা হইলে এই প্রশ্নটা আমার জিবের ডগায় আসিয়া পড়ে—"মিঃ...বা...বাবু। ইনি কি আপনার পাসকরা মাগ ?" কিন্তু পাছে সহজে বুঝিতে না পারেন এই ভয়ে উচ্চারণ করি না।

খাঁটি বাঙালি পুরুষ সর্বদাই স্ত্রীকে 'মাগ' বলিয়া উল্লেখ করিত, খাঁটি বাঙালি মেয়েও স্বামীকে 'ভাতার' বলিয়াই উল্লেখ করিত। আজ এই সনাতন প্রয়োগ কোথায় গেল ? যে বাঙালি মহিলারা দু পাতা ইংরেজি পড়িয়া 'মাগ-ভাতার' ভুলিয়াছেন তাঁহাদিগকে একজন খাঁটি বাঙালি কবির কথায় জিজ্ঞাসা করি,—

> "এই বাল্মীকির দেশে,
> হা ধিক ! ফেরঙ্গবেশে
> কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কিমুখী আয়া ?"

কিন্তু আমার বাল্যকালেও কথাটা এত জানা ছিল যে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে একটা রসিকতা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। সন্দিগ্ধা স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"দুপুর বেলা কোথা যাও ?" স্বামী—"পাবলিক লাইব্রেরীতে।" "সেখানে কে থাকে ?" একটু রঙ চড়াইয়া স্বামী উত্তর দিল যে তাহার অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রেরা। "যেমন ?" "কালিদাস।" "তার কথা বলতে হবে না। আর কে ?" "ভবভূতি, ভারবি...।" স্ত্রীর রাগ ক্রমেই উদ্দীপিত হইতেছে। তারপর আসিল, "মাঘ"। স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "রাখো, রাখো, আমাকে কত ভালবাসো তা তো জানি।" আমরা হাসিয়া গড়াইয়াছিলাম। কিন্তু আট-দশ বৎসরের বালক দূরে থাকুক, কতজন প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ এই রসিকতা বুঝিবেন ? ইহার পর গোঁসাঘরে বসিলেই স্ত্রী কাঁদিয়া বলিতেন, "তোমার ভব আছে, ভূতি আছে, আরও কত বিদ্‌ঘুটে রূপসী আছে।"

বেহাই-বেহানের সম্পর্ক লইয়া আদিরসাত্মক রসিকতা বাঙালির 'ঐতিহ্যে'র আর একটি অংশ। উহাতেও "মাঘ" শব্দটা (প্রাচীন উচ্চারণে) আসিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বেহাই গোবিন্দ মুখুজ্যে একদিন মহারাজকে কয়েকটা মাগুর মাছ পাঠাইয়াছিলেন। পরে যখন দুইজনের দেখা হইল তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "মুখুজ্যে, কাল যে মাছ পাঠিয়েছিলে তার অন্ত্য ছিল না।" মুখুজ্যেও রসিক ব্যক্তি, তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ওর আদিও ছিল না।" আজ কয়জনে এই রসিকতা বুঝিতে পারিবেন ?

অনেক অবান্তর বকিয়া ফেলিলাম। হয়তো বা তেমন অবান্তরও নয়—'মাগ' কথাটা একেবারে বনিয়াদি বাংলা শব্দ তাহা অন্তত বোঝান গেল। এবার আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করি।

বই দুইটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা। সেই সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালির ধারণা কিরূপ ছিল তাহার খুব প্রকৃষ্ট পরিচয় এগুলিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রহসন দুইটিকে রসরাজ অমৃতলালের 'খাস দখল'-এর পিতামাতা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু সাহিত্যিক গবেষণার পরিচয় দিবার অধিকার আমার নাই, কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নই। উপরন্তু আমি নিছক ভালমানুষও নই, তাই একেবারে অভেজাল সাহিত্যিক আলোচনাও আমার উদ্দেশ্য নয়। ভোট সম্বন্ধে আমার আগেকার প্রবন্ধেও খানিকটা অসাহিত্যিক ভেজাল ও প্যাঁচ ছিল। প্যাঁচটা এইরূপ—

> "পুরাতনের প্রতি অবিচল আসক্তি যেমন সংস্কার, নূতন মাত্রেরই প্রতি চঞ্চল ভক্তিও তেমনই সংস্কার—দুইটা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ।"

এই সূত্রেরই আজ আরও একটু বিস্তারিত কারিকা ও ভাষ্য করিব।

স্ত্রীশিক্ষা বর্তমানে একটা অবশ্যকরণীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-বিষয়ে যে-প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক—যেমন, কেন স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া দরকার ? লেখাপড়া শিখিয়া উহারা কি করিবে ? কষ্টার্জিত লেখাপড়া বিবাহের পর ফুটা কলসীতে রাখা জলের মতো বাহির হইয়া যাইবে, না চরিত্র ও মনের উপরও চিরস্থায়ী একটা ছাপ রাখিয়া যাইবে, যাকে ল্যাটিন বুকনিতে বলিত Abeunt studia in mores (অধ্যয়নের ফল চরিত্র ও আচরণে পরিণতি লাভ করে) ? না কি, শুধু চাকুরি পাইবার জন্যই স্কুল-কলেজে যাইতে হইবে ?—এ-সব প্রশ্নের কোনও বিচার নাই।

শুধু আছে অবস্থা ও সাময়িক জনমতের দাস হইয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া। স্ত্রীশিক্ষা দিতেই হইবে, কারণ ভদ্রসমাজে উহার রেওয়াজ হইয়াছে ; ফ্যাশনেব্‌ল হইবার জন্য উহার দরকার, উহা মেয়ের বিবাহে সহায়ক ; পাত্রীর চাকুরি নূতন ধরনের পণ ; কন্যা বা পত্নীর পয়সা খাওয়া যাইতে পারে, কিংবা পিতা বা স্বামীর টাকার খাঁই না থাকিলে অতিরিক্ত উপার্জন শাড়ি ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও গড়িয়াহাট রোডে কাপড়ের দোকানে ইহার যে-প্রমাণ সম্প্রতি দেখিয়া আসিয়াছি তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না) ; বোন চাকুরি করিলে অকর্মণ্য যুবক ভ্রাতা রাস্তায় রাস্তায় বোনের মোষ কৃতজ্ঞচিত্তে না চরাইয়া কম্যুনিজমের মোষ চরাইতে পারে—এই সবই বর্তমান যুগের স্ত্রীশিক্ষার পিছনে বড় বড় কারণ। উহা বিচারের অপেক্ষা রাখে নাই, যুগধর্মের বশে অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হইয়াছে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনই পূর্ববর্তী যুগের অভ্যাস ও সংস্কার বাঙালিকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইল, তখন স্ত্রীশিক্ষাকে আক্রমণ বা নিন্দা করারও কোনও প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর তাহা সর্ববাদিসম্মত ছিল। অন্য আপত্তি ছাড়া শুধু একটি বিশ্বাসই স্ত্রীলোকদের মনে শিক্ষা সম্বন্ধে ভয় জন্মাইত, সে ভয় বিধবা হইবার। তাই ১৮২২ সনে প্রকাশিত একটি বাংলা বই-এ দুইটি গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মধ্যে এই কথাবার্তা পাই।

প্রশ্ন। "সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়, এ কি সত্য কথা ? যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙা কপাল যদি ভাঙে।"

উত্তর। "না, বইন ! সে কেবল কথার কথা। করণ আমি ঠাকুরানী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এ মত লেখা নাই যে, মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতরশোগা মাগীরা এ-কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।"

তখন যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ছিলেন তাঁহাদিগকে প্রাচীন ইতিহাস মন্থন করিয়া নজির দেখাইতে হইত। নজিরগুলি দুই-চারিটা নমুনা দিতেছি—(১) মৈত্রেয়ী, "কিছু দোষ লেশ থাকিলে অতি জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রীকে জ্ঞান দান করিতেন না" ; (২) শকুন্তলা, "দুষ্মন্ত রাজা যে নামাক্ষরের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন তাহা আপনি পড়িয়া তাহার অর্থ আপন সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে বুঝাইয়াছিলেন" ; (৩) রুক্মিণী, "যদি বিদ্যা না জানিতেন, তবে আপন মনের বাঞ্ছিত পত্র আপন প্রিয়তমের নিকট পাঠাইতে পারিতেন না" ; (৪) লক্ষ্ণণ সেনের স্ত্রী, "এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে, এমন সময় লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী আপন শ্বশুরের ভোজনের জন্য স্থান মার্জন করিতে করিতে অতি সাধ্বী স্বামী-বিরহে কাতরা হইয়া মৃত্তিকাতে এই কবিতা লিখিলেন—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥

"...সেই স্থানে বল্লান সেন আসিয়া ঐ শ্লোক পড়িয়া পুত্রবধূ বড় কাতর হইয়াছেন ইহা জানিয়া, সেই দিনেই পুত্রকে বাটিতে আনাইলেন।"

ইহা হইতে আমি শুধু যে জানিলাম প্রাচীন বাংলার যুবরাজ বধূ লিখিতে পারিতেন তাহাই নয়, আর একটা তথ্যও জানিলাম যে, আমাদের নিজের পৈতৃক ভিটা ও বাসাবাড়ি দুই-এরই মেজে যেমন মাটির ছিল তেমনই বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের মেজেও মাটির ছিল।

ইহা ছাড়া বইটাতে বারেন্দ্রশ্রেণীর রানী ভবানী, রাঢ়ী শ্রেণীর হঠী বিদ্যালঙ্কার এবং বৈদিক শ্রেণীর শ্যামাসুন্দরীর লেখাপড়ার উল্লেখও আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অতি অল্প সংখ্যক বাঙালি ভদ্রলোকের মেয়েকেও বেথুন কলেজের ছাত্রী করিতে প্রায় সত্তর বৎসর লাগিয়াছিল। এইটুকুতেই আবার হিন্দু আচারে আস্থাশীল বাঙালি ভদ্রসমাজের বেশির ভাগ লোকেরই রাগে আত্মসংযম লোপ হইয়াছিল। তখন তাহারা স্ত্রীশিক্ষাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া উহা কিরূপ দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারের হেতু তাহাই দেখাইতে লাগিয়া গেল। যে বই দুইখানার কথা বলিতে যাইতেছি, সেগুলির উদ্দেশ্যও এই।

স্ত্রীশিক্ষার ফল কি ?—এই প্রশ্নের উত্তর "পাসকরা মাগ" বইখানাতে তীব্রস্বরে দেওয়া হইয়াছে। কিরণশশী বেথুন স্কুলে পড়ার ফলে ব্যভিচারিণী হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে অনুতপ্তা হইয়া স্বামীকে বলিতেছে,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না—তুমি আমাকে হত্যা কর,—তোমার হাতে আমার জীবন গেলে, আমি সুখে মরলাম বোধ ক'র্ব্বো।"

স্বামী তখন উত্তর দিল—

"তুই আমার বড় আদরের স্ত্রী ছিলি। তুই এখন বেশ্যা হয়েছিস। না—আমি হত্যা কর্ত্তে পারবো না। তোর এখনও অনেক যাতনা আছে ; তুই আমার সেই আদরের কি র ণ শ শী,—তুই আজ ভিখারিণী—ম্লেচ্ছ রমণী ! ওঃ ! আমি বড় আশা করেছিলাম; আমার পাসকরা মাগ।"*

[প্রস্থান যবনিকা পতন]

এই উক্তির পর "পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোটপরা ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী" 'এক্সেলেন্ট্‌' 'এক্সেলেন্ট্‌' করিয়া নিশ্চয়ই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা "ওঃ, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল !"—এই বক্তৃতার সুরে বাঁধা।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 'বউবাবু'র রায় এত চড়া সুরে বাঁধা না হইলেও নিতান্ত খাদেও নয়। যবনিকা পতনের আগে স্বামীর মুখে এই বক্তৃতা শুনিতে পাই,

"আমার দেখেও কি লোকে শিখবে না ? এত দেখে শুনেও কি লোকে ইংরাজী মেজাজের স্ত্রীর স্বামী হবার ইচ্ছা করবে ? করে আমার মত ফল পাবে। আর বাড়ি ঢুকব না, কলকাতায় আর থাকব না, পৈতৃক ভিটে মাটি সমস্ত গিয়েছে আর দাঁড়াবার স্থান নাই, আজকের মেলেই পশ্চিম চলে যাব। পাশ্চাত্যশিক্ষানুরাগিণী কুহকিনী পত্নীর কুহক জালে জড়িত হলে লোকে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়, এ অভাগাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর হিন্দু মহিলার ইংরাজী কুশিক্ষার বিষময় চিত্র আমার শরৎশশী আর ভোলার এই বউবাবু !!!"

www.amarboi.com

তখন বাঙালি মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়িতেছেন, কেহ কেহ উচ্চ ডিগ্রীও পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথাবার্তা আলাপ-সালাপের ধরন কিরূপ, তাহার সংবাদ সাধারণ বাঙালির মধ্যে পৌঁছে নাই। তাই 'পাসকরা মাগে'র নায়িকা কিরণশশী ও তাহার ভগিনী চাতকিনীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা নাটকের গোড়াতেই পাই—

কিরণ—"আমি কেয়ার করি না। ড্যাম্‌ নাষ্টি নেটিভগণ, মেয়েমানুষের অনার বোঝে না। ভাতার বলে যে একটা পদার্থ আছে—কি জানোয়ার আছে—[আধুনিক শিক্ষিতারা লক্ষ্য করিবেন, 'পাসকরা মাগ'ও 'ভাতার' শব্দ বর্জন করেন না।] তা আমার আইডিয়াতেই আসে না ;—তা আমি কি ইষ্টুপিট্‌ নেটিভ পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে—ব্রুট, অসভ্য পরাধীনা বাঙালীর মতন থাকবো ? তা কখনই নয় ! যদিও আমি বাঙালীর মেয়ে—কিন্তু এখনকার বাঙালীর মেয়ের মতন মূর্খ নই। আমি বেথুন স্কুলে হাইপ্রাইজ পেয়েছি ; যেদিন তোমার বিয়ে হয়—সেই দিন তোমার পতি আমার মুখে ইংলিশ স্পীচ্‌ শুনে থান্ডার-স্ট্রক হয়েছিল ; আমার সেই ড্রেস দেখে ফেয়ারী মনে করে, জগৎকে নথিং জ্ঞান করেছিল..."

চাতকিনী—"তোমাকে যদি নিতে আসে, তা হলে কি শ্বশুরবাড়ি যাবে না ?"

কিরণ—"কেন যাব না ? আমার হাজব্যান্ড যদি ইনভাইট করে পাঠায়, তা হলে না হয় এক ঘণ্টার মতন বেড়িয়ে আসি।"

* এখানে বলিয়া দেওয়া দরকার যে, ইতিমধ্যে স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে ও দ্বিতীয়পক্ষে তাহার চার-পাঁচটি ছেলেপিলেও হইয়াছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাতকিনী—"তবে কি তুমি শ্বশুর ঘর করবে না ?"

কিরণ—"নেভার—নেভার—এ প্রাণ থাকতে তো কখনই নয়। কখনও গরুর মতন শ্বশুরবাড়ি যে'য়ে গোয়ালে বাউন্ড হয়ে থাকতে পারবো না..."

'বউবাবু'র নায়িকা শরৎশশীর কথাবার্তা এতটা বক্তৃতার মতো নয়, আরও স্বাভাবিক ; তবে সে আলাপ চাকরের সঙ্গে। খানিকটা নমুনা দিতেছি,

শরৎশশী—"ওঃ Too hot, too hot!"

(ভোলার স্লিপার লইয়া প্রবেশ ও বুট খুলিয়া চরণে স্লিপার প্রদান।)

শরৎ—"ভোলা !"

ভোলা—"আজ্ঞে।"

শরৎশশী—"Again আজ্ঞে ? 'হাজির' বলতে পারিসনে তুই ? পাড়াগেঁয়ে মেড়া !"

ভোলা—(কাণ মলিয়া) "এই কাণ মল্‌ছি, আর ভুলব না। কিন্তু বউবাবু! যদি হাজির না থাকি, তা হলেও কি হাজির বলতে হবে ?"

শরৎ—"You fool, হাজির না থাকলে উত্তর দিবি কেমন করে

ভোলা—"হাঁ, তা বটে—তা বটে। আচ্ছা বউবাবু! কলকাতার সব বউবাবুরা কি তোমার মতন বিদ্বেন ?"

শরৎ—"অনেকেই—যারা নয়, তাদের আমরা করব।"

*

শরৎ—"Look here, টুপীটাও নিয়ে যা, চ"

ভোলা—(টুপী গ্রহণ) "এই নেজা মুড়ো ছাড়লেই এ গাঁয়ের পথ বেড়ান দোষ কেটে গেল ; কিন্তু আমাদের গাঁয়ে কাপড় ছাড়তে হয়, পা ধুতে হয়, গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়।"

শরৎ—"এখানকার সমস্ত পবিত্র। তুই পাখা নিয়ে আয়, too hot!"

(ভোলার প্রস্থান ও পাখাহস্তে প্রবেশ।)

ভোলা—(বাতাস করিতে করিতে) "বউবাবু! আজ গাড়ি করে কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?"

শরৎ—"আজ আমাদের সভার Extra-ordinary meeting ছিল, বুঝলি ?"

ভোলা—"তোমার বাংলা কথাই সব বুঝতে পারিনে, তার খিচুড়ি বুঝবো কোত্থেকে ?"

শরৎ—"অসাধারণ অধিবেশন ; আমার খাস চাকর হয়ে এইটে বুঝতে এত দেরি হয় ? আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস কেন ? আমি কি সং ? কারোর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।"

ভোলা—"ভগবান তোমায় সং গড়বেন কেন ? তুমি আপনি সং হয়েছ। আমাদের দেশে জামাজোড়া পরলে বেবিশ্যে হয়।"

ইহার উপর টিপ্পনী হিসাবে একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। বৎসর ত্রিশেক আগেকার কথা। একটি আধুনিকা তরুণী আধুনিক পোশাক পরিয়া মাতামহীর বাড়ি হইতে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তখন মাতামহী চেঁচাইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ি থেকে অমন খান্‌কীর মতো পোশাক পরে বেরোতে দেব না !"

এইবার দাম্পত্য সম্ভাষণের পরিচয় দিব। অবশ্য দুইটি নাটকেই দাম্পত্য আলাপ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাম্পত্য কলহ। তবে যাঁহারা আজকাল দাম্পত্য কলহে ঝানু হইয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিবেন এই নাটকের দাম্পত্য কলহে নুতন রস আছে।

স্বামীর ভর্ৎসনা শুনিয়া একটু আপত্তি করাতে 'পাসকরা মাগে'র নায়িকা কিরণশশী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,

"ড্যাম-বাগার-ফুল গো আউট স্টুপিট—তুমি আমার পতি ? এতদূর স্পর্ধা। বেহারা, বেহারা, বেহারা—জলদি এস্কো থানা মে লে যাও—লেডির কাছে কু-কথা বলে—ব্রুট, অনধিকার প্রবেশ করেছে—জলদি থানামে লে যাও।"

ইহার পর স্ত্রীর ঘুষি ও ধাক্কা খাইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে স্বামী বলিল,

"আমি যে মনে করেছিলাম, শিক্ষিত স্ত্রী পেয়েছি—সুখী হব। তার ফল খুব পেলাম। হে হিন্দু ভ্রাতাগণ ! যদি মর্যাদা চাও, জাতি চাও, তবে যেন কেউ পাসকরা মাগ না চায়—সকলে আমার দুরবস্থা দেখ, হায় রে পাসকরা মাগ !"

এখন স্বামীর সহিত বউবাবুর কথা কাটাকাটি শুনিতে হয়। বউবাবু শরৎশশী স্বামী হরিশের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া চাকুরি খুঁজিতে পাঠাইয়াছেন, উহারই কথা হইতেছে।

শরৎশশী—(সক্রোধে) "কিছু যোগাড় হ'ল ?

হরিশ—"কত অফিসে দরখাস্ত কল্লেম, কিছুই হ'ল না।"

শ—"তবে আজ আর বাড়ির ভেতরে যেতে পাবে না, বাড়ি থেকে বেরোও।"

হ—"শরৎ। আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল কতক আত্মসাৎ কল্লে, কতক প্রেম ইত্যাদি অনধিকার চর্চা কোরে খোয়ালে। এই দেখ, ভিটে মাটি চাটি কোরে সর্বস্বান্ত করেছ। ভাত নাই যার জাত নাই তার ; কাজেই ঘরজামাই হয়েছি, এততেও তোমার আশা মেটেনি ! এখন আবার চাকরি না করতে পারলে এ চামচিকের বাসটুকু ওঠাতে চাচ্ছ।"

শ—"হরিশ ! এ বড় দুঃখের বিষয় যে আমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণীর পাণিগ্রহণ কোরে, আজও বিশুদ্ধরূপে বাক্যবিন্যাস করতে শিখলে না ; কি কথায় কি কথা আনলে, আবার চামচিকে হলে কিসে ?"

হ—"কেন ? মেগের গোলাম চামচিকে ! এর উপর আবার বাক্যবিন্যাস, রক্ষা কর, তোমার ও জুতোর ঘাড় মোচড়ান আর চেত্তা-খাওয়া ধনুক হয়ে লড়াই-এ নমস্কার।"

শ—"When have you seen war?"

হ—"When you deliver a lecture."

শ—"সে আবার কি ?"

হ—"ওই ডিঙ্গি মেরে মেরে, বুক চিতিয়ে চড় দেখান, ঘুসো উঠান, ওতে জুতোরও ঘাড় ভেঙ্গে যায়, আর টঙ্কারে রোগীর মত দেখায়। স্ত্রীলোক অবলা, এত বোলবোলা কেন বাপু ! লেখাপড়া কি কেউ শেখে না ?"

শ—"উহা আমাদের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির ফল।"

এখানে পাঠক লক্ষ্য করিবেন, স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা অনেকটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এই সূত্রে দুইটা টিপ্পনী না করিয়া পারিলাম না। "মেগের গোলাম" যে চামচিকা হয় এই প্রথম জানিলাম। আমার জানা যত "মেগের গোলাম" আছেন তাঁহাদের সকলেই তো বেশ নাদুস-নুদুস, গোলগাল, হাসিখুশি মেজাজের মানুষ। তাঁহাদের সহিত চামচিকার কোনও সাদৃশ্যই নাই। এটা বোধ হয় যুগধর্মে হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা—আজকাল কোন্ রাজনৈতিক পত্নীর কোন্ স্বামী স্ত্রীর উদ্দেশে বলিতে পারিবেন, "ডিঙ্গি মেরে মেরে বুক চিতিয়ে বক্তৃতা করলে জুতোর ঘাড় ভেঙে যায়, আর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টঙ্কারে রোগীর মত দেখায়। স্ত্রীলোক অবলা [আসলে 'অবোলা'] এত বোল্‌বোলা কেন ?"

নাটক-পরিচয় শেষ করিলাম, এবার এগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই।

যে-যুগে এই বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যে-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এই ধরনের মত প্রকাশ করিয়া লেখকেরা বেশির ভাগ বাঙালির কাছে বাহবা পাইতেছিল, সেটা বাঙালি জীবনের কোন্ যুগ তাহা স্মরণ করিতে বলিব। বাহবা যে পাইতেছিল সে বিষয়ে কেহ যেন নিরর্থক সন্দেহ প্রকাশ না করেন। আমি ১৯১০ সনে প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া 'মডেল ভগিনী'র মতো বই-এর যে-প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেরও এর চেয়ে বেশি প্রশংসা শুনি নাই। সুতরাং অধিকাংশ বাঙালি যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অথচ বইগুলি প্রকাশের কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা, কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মপ্রচার শেষ হইয়া গিয়াছে ; বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক জীবন শেষ হইতে চলিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' ইত্যাদি প্রকাশিত করিয়াছেন, বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচার আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। 'গোরা' উপন্যাসে বাঙালি সমাজের যে-চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা এরও বৎসর দশেক আগেকার। তবু বাঙালির মানসিক জীবনের এই আলোকের পাশে বেশির ভাগ বাঙালির মানসিক জীবনের অন্ধকারও পুরোপুরি বর্তমান। এই দ্বিত্বটাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিত্বটা আজ ঘুচিয়া গিয়াছে কি ? যে-বাঙালি সাধারণ সেকালে উন্নতিবাদীদের মুখে "অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও" শুনিলে এই উক্তি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহার খোঁজ না লইয়া অশালীনভাবে হি হি করিয়া হাসিত, তাহারা আজ অন্ধকার হইতে মুখ ফিরাইয়া আলোকের দিকে চাহিয়াছে কি ? দ্বিত্বটা ঘুচে নাই বলিতে পারিলেই সুখী হইতাম, তাহা হইলে আলোক কোথাও আছে ইহাও সত্য হইত। কিন্তু আজ কোনও দ্বিত্ব আর নাই, সবই অন্ধকার—কারণ স্ত্রীশিক্ষা লইয়া এ-যুগের বিচারহীন মাতামাতি বা উদ্দেশ্যহীন পরিশ্রম সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতার মতোই অন্ধ সংস্কার মাত্র। এক ধরনের অন্ধকারের বদলে আমরা আর এক ধরনের অন্ধকারে আছি, সুতরাং যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই চলিতেছি ; শুধু সামান্য যে আলোটুকু ছিল, তাহাও নাই।

বাঙালির এক সংস্কার হইতে আর এক সংস্কারে যাওয়ার স্বরূপ একটা উপমা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। গত বৎসর বিলাত থাকার সময়ে একদিন ভোরবেলা পল্লী অঞ্চলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম, পাশের একটা মাঠে শতাধিক ভেড়া, হয় ঘাস খাইতেছে কিংবা শান্তভাবে বসিয়া আছে। ফিরিবার সময়ে দূর হইতে দেখিলাম, ভেড়াগুলি ফটকের ভিতর দিয়া দুড়দাড় করিয়া বাহির হইয়া জলপ্রবাহের মতো রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং মেষরক্ষী কলি-কুকুর ও লাল ফ্রক-পরা একটি ছোট মেয়ে উহাদের পিছনে তাড়া দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ভেড়াগুলি বাঁদিকে আর একটা ফটকের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দেখি, উহারা শান্তভাবে নূতন মাঠে ঘাস খাইতেছে বা বসিয়া আছে—চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। তখন 'গড্ডলিকা-প্রবাহ' বাক্যের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলাম।

বাঙালি জনসাধারণও এই ধরনের গড্ডলিকা প্রবাহ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতার মাঠ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে বিতাড়িত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার মাঠে ঢুকিয়া ঘাস খাইতেছে। ইহার পিছনে ফ্যাশন-রূপ কলি-কুকুরের তাড়া ভিন্ন কিছুই নাই। ইহাদের জীবনই প্লেটোর, সেই "অপরীক্ষিত জীবনযাত্রা"। সুতরাং 'পাসকরা মাগ' ও 'বউবাবু'তে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে-মত প্রচার করা হইয়াছে তাহাকে মূঢ়তা বা বর্বরতা বলিবার অধিকার সাধারণ বাঙালির নাই। মানুষ বর্বর বা সভ্য, সংস্কার পরিবর্তনের দ্বারা হয় না, হয় মানসিক ধর্মের জন্য বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতির জোরে।

সর্বশেষে আমার ব্যক্তিগত একটা দুঃখের কথা বলিয়া প্রবন্ধটা শেষ করিব। আমার এক জীবনে আমি বাঙালি সমাজকে এক সংস্কার হইতে আর এক সংস্কারে যাইতে দেখিলাম। অল্প বয়সে বামপন্থী ছিলাম; ব্রাহ্মমতে 'বামাচারী' ছিলাম এও বলিতে পারেন; অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারী-পূজা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলাম। সুতরাং যে পরিবর্তন দেখিতেছি, তাহাতে আমার খুশি হইবারই কথা। হইতে পারি না শুধু উহাতে বিচারের অভাব দেখিয়া। আজিকার স্ত্রীশিক্ষার পিছনে না যুক্তি, না অনুভূতি, না মূল্য বিচার, কিছুই নাই। সুতরাং এই ব্যাপারে যে ভুল হইতেছে তাহা বলিতে গিয়া গালি খাই। এক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে বলিয়া তিরস্কারভাজন হইতাম, এখন স্ত্রীশিক্ষার ভুল পরিণতি দেখাইতে গিয়া তেমনই তিরস্কারভাজন হইতেছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও ঠিক উহাই হইয়াছে। সারাজীবন একটা না একটা সংগ্রামে নিযুক্ত আছি। তাই ক্লান্তিবোধ করিয়া মাঝে মাঝে বলি, "হায় বাঙালি! তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন, এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবনযৌবন কোথায় পাইব!"

দেশ, ২০ আষাঢ় ১৩৭৬, ৫ জুলাই ১৯৬০

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন ?

আমি যদি কালিদাসের কালে জন্ম নিতাম, তাহা হইলে যে-বিষয়ে যে-ভাবে লিখিতে চাহিতেছি, তাহার জন্য সাফাই গাহিতে হইত না। আবার পাশ্চাত্য জগতে বাস করিলেও তাহার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এদেশে এমনই দিনকাল পড়িয়াছে যে, ইতরজন (সংস্কৃত অর্থে, বাংলা অর্থে নয়) আমাকে অশ্লীলতা দোষে দোষী মনে করিতে পারে। তাই সর্বাগ্রে নান্দী পাঠ করিতেছি—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

নান্দ্যন্তে কথাটা বলি।

*

হিন্দু-মুসলমান বিরোধে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইয়াছে, বাংলাদেশের আরও বেশি। সেই আগুন আজও নিবে নাই। উহা আন্তর্জাতিক রূপ ধরিয়া একবার খণ্ডযুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; মহাযুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে ; আমাদের শাসক সম্প্রদায় এই যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে নিযুক্ত ; ইহার জন্য সহস্রকোটি টাকা ব্যয় হইতেছে।

অথচ এই শাসক সম্প্রদায়ই হিন্দুর উপর মুসলমানী পোশাক চাপাইতেছেন। শেরওয়ানি ও চুড়িদার পাজামা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের রাজকীয় বেশ। এই কারণে যে-পোশাককে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার পশ্চিমপ্রবাসী বাঙালিরা লৌকিক ভাষায় 'ভেরুয়ার পোশাক' বলিত, তাহাই আজ আভিজাত্যের সূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার এক বন্ধু ১৯১৬ সনের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে শেরওয়ানি-পাজামা পরিয়াছিলেন, তাঁহাকে এক বাঙালি ব্যঙ্গ করিয়াছিল, 'দেখ না, ব্যাটা ভেরুয়ার পোশাক পরে এসেচে' ; তাহাতে তিনি সেই বিদ্রূপকারীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন হাওয়া অন্যদিক হইতে বহিতেছে, তাই যাঁহাদের এই পোশাকের প্রয়োজন বা অধিকার নাই, তাঁহারাও শেরওয়ানি-পাজামা পরিয়া দেখা দিতেছেন। হয়তো অভিসন্ধি—শাসকদিগের অনুগ্রহ পাওয়া, পান কিনা বলিতে পারি না।

শুধু তাই নয়। হিন্দু ধুতিচাদর পরিয়া সরকারি মহলে গেলে অপমানিত হইবারও সম্ভাবনা আছে। কয়েক বৎসর আগে দিল্লির অশোক হোটেলের খাইবার ঘরে এক ভদ্রলোককে ধুতি পরিয়া ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। ব্যাপারটা লোকসভা পর্যন্ত গিয়াছিল। তখন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, কোথাও হিন্দু পরিচ্ছদের অবমাননা হইতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে না হইলেও ধুতির উপর একটা উহ্য নিষেধ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব দূরে থাকুক, আমার মনে হয় সম্রাট অশোকও অশোক হোটেলে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন না।

এই তো গেল পুরুষের কথা। মেয়েদের বেলাতে মুসলমানী পোশাকের উপর পক্ষপাত এখনও রাজকীয় হয় নাই, উহার পিছনে রাষ্ট্রশক্তি নাই ; কিন্তু তাহার চেয়েও বড় শক্তি আছে। আর একেবারে রাষ্ট্রশক্তি নাই তাহাও বলিতে পারি না। যে হিন্দু কিশোরী বা যুবতীরা সালওয়ার-কামিজ ধারণ করিতেছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে, ইহা পরিলে যুব-শাসকদের গৃহিণী, সচিব, সখী, প্রিয়শিষ্যা ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং অন্য শক্তি—সে এক বিরাট শক্তি, নারী যে কারণে শক্তিরূপিণী সেই শক্তি—প্রবলতর হইলেও সালওয়ার-কামিজের পিছনে গৌণভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তিও আছে।

বহুকাল পূর্বে অলবেরুনী লিখিয়াছিলেন যে, এক হিন্দু রাজা শত্রুকুলকে নিঃশেষে বধ করিতে না পারিয়া, যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে ঘৃণিত করিবার জন্য মুসলমানী পোশাক পরাইয়াছিলেন। আবার শূন্যপুরাণে আছে যে, বৌদ্ধদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ সবে হইয়া হৃষ্টমন, আনন্দেতে পরিলা ইজার' কিন্তু আজকালকার মুসলমানী পোশাক পরা বা পরানো, এই দুইটি পর্যায়ের এক পর্যায়েরও নয়। হিন্দু-পুরুষ ও হিন্দু-রমণীকে আজ জাতে তুলিবার জন্য মুসলমানী পোশাক পরানো হইতেছে।

এই ব্যাপারটা আমার কাছে এত অস্বাভাবিক ও অশোভন মনে হয় যে, আমি কিছুতেই ইহার প্রতি বিতৃষ্ণা দমন করিতে পারি না। এই বিতৃষ্ণা যে কত উগ্র তাহার একটু আভাস দিব। আমাকে যদি ভারতবর্ষের দূত হিসাবে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিত, তাহা হইলে শুধু শেরওয়ানি-পাজামা পরিতে হইবে এই কারণেই আমি এই পদ গ্রহণ করিতাম না। কেহ যেন মনে না করেন, যে-পদ আমার পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই তাহা লইয়া আমি আস্ফালন করিতেছি। আমার মতো মূর্খ, নির্বোধ ও অবিদগ্ধ বহু লোক ভারত গভর্নমেন্টের দূতসমাজে আছে।

জিনিসটা বিস্ময়কর। ক্যাপিট্যালিস্ট আমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কম্যুনিস্ট রুশিয়ার দূত পর্যন্ত সকলেই দূতের আন্তর্জাতিক পরিচ্ছদ পরেন। এক সময়ে রুশিয়া তাতার জাতির অধীন ছিল বলিয়া সোভিয়েট দূত কখনও কসাকের পোশাক পরিয়া কোথাও দেখা দেন না। কিন্তু ফরাসি প্রেসিডেন্টের এলিজে প্রাসাদের একটি ছবিতে অন্য সকল সুবেশ দূতদের মধ্যে আমাদের দূতকে চোবদারের পোশাকে দেখিয়াছিলাম।

এইবার সালওয়ার-কামিজের প্রসঙ্গ। আমার মেয়ে নাই, কিন্তু যদি থাকিত তাহা হইলে এই পোশাক পরিতে চাহিলে তাহাকে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিতাম। আমি অন্যকে সালওয়ার-কামিজ না-পরিতে উত্তেজিত করিয়াছি। আমার কোনও বন্ধুর পরিবারের একটি মেয়েকে দিল্লির এক কলেজের কর্তৃপক্ষ পি-টি বা ব্যায়ামের জন্য সালওয়ার-কামিজ পরিয়া যাইতে বলেন। তাহার ভাল না লাগায় সে পরে নাই। দুই-তিন বার অবাধ্যতা দেখাইবার পর তাহাকে শাসন করা হইল যে, প্রতিদিন সালওয়ার-কামিজ না-পরিয়া আসার জন্য তাহাকে পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইবে। তখন তাহারা আমার পরামর্শ চাহিলেন।

আমি তো প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিতেই পারিলাম না। যদি আর্যকন্যার আযোচিত দ্বিবস্ত্র হইয়া ব্যায়াম করা সম্ভব না-ই হয়, তাহা হইলে মুসলমানী পোশাক কেন ? অন্য নজীর কি ছিল না ? কলেজের কর্তৃপক্ষ কি শিক্ষিতও ন'ন ? তাঁহারা কি 'জিমনাস্টিক' কথাটারও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ জানেন না ? আপনাদিগকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না যে, গ্রিক ভাষায় 'জিমনস' শব্দের অর্থ 'নগ্ন', এবং নগ্ন হইয়া এই কাজ করা হয় সেজন্যই ব্যায়ামের নাম 'জিমনাস্টিক'। প্লেটো এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "কিছু দিন আগে পর্যন্তও, আজকালকার অনেক বর্বর জাতির মতো গ্রিকরাও মনে করিত যে নগ্ন হওয়া কুৎসিত এবং হাস্যকর। এবং প্রথমে ক্রিটের ও পরে লাকিদিমনের (স্পার্টার) লোকেরা 'জিমনাস্টিক' (অর্থাৎ নগ্ন হইয়া ব্যায়াম) প্রবর্তন করিবার সময়ে তখনকার দিনের রসিক লোকেরা নিশ্চয়ই ইহা লইয়া রসিকতা করিবার সুযোগ ছাড়ে নাই।" (রিপাবলিক, ৫ম অধ্যায়, ৪৫২) স্পার্টার মেয়েরা অবশ্য নগ্ন হইয়া পুরুষদের সহিত সমানভাবে ব্যায়াম করিত। প্লেটো এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, বয়স্কা স্ত্রীলোক এইভাবে ব্যায়াম করিলে সৌন্দর্যের বিরোধী হওয়ার দরুন হাস্যকর হইতে পারে।

এই সব পড়া থাকায় বন্ধুর প্রশ্নটা বুঝিতে দেরি হইল। কিন্তু যখন মাথায় ঢুকিল, তখন বলিলাম, "কখনও সালওয়ার পরিতে দিবেন না। দরকার হইলে আমরা আদালতে যাইব।" অবশ্য ইহার কোনও প্রশ্নই উঠে নাই।

স্বীকার করি, এই সব অতিরিক্ত গোঁড়ামি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আসলে কোনও বাড়াবাড়ি করিয়াছি, তাহা মানিতে পারিব না। কোন-কোন যুগে সভ্যতার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, বেনোজলে, অনেক সময়ে পঙ্কিল বেনোজলে অসহায় হইয়া গা ভাসাইয়া দিতে না চাহিলে গোঁড়া না হইলে সভ্যই থাকা যায় না। আমার মনে হয়, বর্তমান যুগে শুধু পরিচ্ছদ বা সাজসজ্জাই নয়, সব ব্যাপারেই এমন ভাঙন ধরিয়াছে যে, চরিত্র, রুচি ও আচার-ব্যবহারকে পাথর দিয়া বাঁধাইতে হইবে।

সেজন্য কেহ যেন মনে না করেন, মুসলমানী পোশাকের সৌন্দর্য, শালীনতা ও রাজসিক ঐশ্বর্য (সংস্কৃত অর্থে) আমি স্বীকার করি না। আমি আব্বাসীয় যুগ হইতে লক্ষ্ণৌ ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের যুগ পর্যন্ত মুসলমানী পোশাকের বর্ণনা পড়িয়াছি এবং ছবি দেখিয়াছি। মুসলমান সমাজ পরিচ্ছদকে যে স্তরে তুলিয়াছিল তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র কম পাওয়া যায়। এক সময়ে এই ব্যাপারটার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন ইহা নয়, মুসলমানী পোশাক সুন্দর কি অসুন্দর, শালীন কি শীলতাবিরুদ্ধ। প্রশ্ন একমাত্র এই, উহা হিন্দু পুরুষ বা নারীর পক্ষে শোভন কিনা। প্রত্যেক জাতি বা সমাজের পরিচ্ছদের একটা ধর্ম আছে, সেজন্য ইসলাম বাদ দিলে মুসলমানী পোশাকের একটা রূপান্তর হয়, এমন রূপান্তর যে উহা অসহনীয় হইতে পারে। পাঞ্জাবের বহু হিন্দু উর্দু ভাষায় গীতার অনুবাদ পড়ে। ভাবিয়া দেখুন, ব্যাপারটা কি পরিমাণ অস্বাভাবিক। হিন্দু বিধবার মুখ হইতে ভক্ ভক্ করিয়া পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বাহির হইতেছে তেমন কিনা। হিন্দুর মুসলমানী পোশাক পরাও তেমনই।

দ্বিতীয় আপত্তিও কম গুরুতর নয়। আমাদের শাসক সম্প্রদায় পুরুষের জন্য যে মুসলমানী পোশাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা আসল মুসলমানী পোশাক নয়, উহার পতিত, ব্রাত্য ও জাতমারা রূপ। ব্যাপারটা জটিল, সুতরাং এখানে ভাল করিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে অধোগতির একটু আভাস দিতেছি।

প্রথমে বর্তমান শেরওয়ানি বা আচ্‌কানের ছাঁটের কথা বলি। যে-জামা হইতে ইহার উদ্ভব সেই মুসলমানী পোশাক ঢিলা-ঢালা সুপরিসর ছিল। আঁটা, বুকে-পিঠে সাঁটিয়া ধরা জামা পরা তাঁহাদের অভ্যাস ছিল না। এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, তাই তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র নায়ককে দিয়া বলাইয়াছিলেন, "তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া....." ইত্যাদি।

তবে উহা বুকে-পিঠে, গলায়, পশ্চাদ্দেশে সাঁটা হইল কি করিয়া? তাহা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। ব্রিটিশ আমলে আচকান যখন ইংরেজদের দরবারী পোশাক হইল, তখন তাহার উপর একদিকে বিলাতি ফ্রক-কোট ও অন্য দিকে বিলাতি সামরিক ইউনিফর্মের ছাপ পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে উহার গলা উঠিয়া হুক-ও-আই যুক্ত হইল, বাকী অংশ দেহলগ্ন হইল, ও ঝুল হাঁটুর কাছে উঠিয়া আসিল।

এরপর কাপড়ের কথা। পূর্বে শেরওয়ানি রেশমী কাপড়ের বা পশমিনা অর্থাৎ তাফ্‌তার হইত। খদ্দর দূরে থাকুক উহা বিলাতি ব্রডক্লথের মতো ভাল কাপড়েও মানানসই হয় না। পূর্বে উহা রঙিন কাপড়ে হইত, কিন্তু বিলাতি পূর্বাহ্ণ বা সান্ধ্য পোশাকের অনুকরণে উহা কালো কাপড়ে তৈরি হইতে আরম্ভ হইল। তাহার উপর প্রকৃত মুসলমানী আচকানে কারুকার্য থাকিত, খুব দামী হইলে উহা জামাওয়ারের (জামিয়ারের) হইত। আমি বহুকাল পূর্বে একদিন নবাব নবাব-আলি চৌধুরীকে জামাওয়ারের আচকান পরা দেখিয়াছিলাম। তখনই কৃষ্ণবর্ণ আচকানের কুশ্রীতা বুঝিতে পারিলাম।

এইবার চুড়িদার পাজামার কথা। এই বস্তুটি মুসলমানের নয় বলিয়া আমার অনুমান। আমি যতদূর জানি উহা মুসলমান আসার আগে আমাদের দেশে আসিয়াছিল ও নিশ্চয়ই (আমার মতে) শক হুন গুর্জর প্রভৃতি অশ্বারোহী যাযাবর জাতিরা ইহাকে আনিয়াছিল। এই পাজামার পূর্বতন রূপ কাঠিয়াবাড়ের হিন্দুদের, কাংড়ার গদ্দীদের ও নেপালীদের মধ্যে সেদিন পর্যন্তও দেখা যাইত। সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে এখনও আছে। মুসলমানদের নিম্নাবয়বের জামা ঢিলা হইত।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে উহার দুই দিকে রূপান্তর হইল। একদিকে উহা লক্ষ্ণৌ-এর দুর্বল ক্লীবোচিত 'চোষ' পাজামা হইয়া গেল, অন্য দিকে উহা ইংরেজি ঘোড়ায় চড়িবার 'ব্রীচেজের' প্রভাবে 'যোধপুরে' পরিণত হইল। একদিন কলিকাতায় আমি প্রিন্স ইউসুফ মির্জাকে 'চোষ' পাজামা পরা দেখিয়াছিলাম। কি-যে বিসদৃশ লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। যদিও 'যোধপুর' ইদানীং ইংরেজ পুরুষ ও রমণীরাও অশ্বারোহণের জন্য পরিতেন, তবু এটিকে আমার স-বুট অশ্বারোহণের পোশাক হইতে অনেক কম শোভন মনে হইত। স্বাধীন-ভারতের চুড়িদার পাজামা এ-দুটিরও কোনটি নয়, উহা দুয়ের বর্ণসঙ্করপ্রসূত অশ্বতর।

ইহার পর সমসাময়িক আর্যাবর্তে হুন-বিনাশী স্কন্দগুপ্তের বংশধরদের আচকান ও চুড়িদার পাজামা পরার শোভা বর্ণনা করি। মুসলমানী পোশাক যোদ্ধার পোশাক, যাঁহারা ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, যাঁহাদের দেহ আত্মকর্মক্ষম ও ক্ষাত্র ধর্মের আশ্রয়, তাঁহাদের পোশাক। উহা লক্ষ্ণৌ, কানপুর বা আগ্রার কায়স্থ-মুন্সী বা বৈশ্য দোকানদারের গায়ে মানায় না। আমি দুকূলধারিণীর অতিপিনদ্ধ বক্ষ দেখিতে প্রস্তুত, কিন্তু লালা সন্তানের অতিপিনদ্ধ ভুঁড়ি দেখিতে চাই না।

এমন কি বর্তমান যুগের যে শেরওয়ানি-পাজামা তাহাও হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের গায়ে বেশি শোভন। আমি এই পোশাকে একদিকে জনাব জাকির হোসেন সাহেবকে ও রফি আহম্মদ কিদওয়াই সাহেবকে দেখিয়াছি, অন্য পক্ষে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে দেখিয়াছি। দুইয়ের কোনও তুলনা করিবার কথা কখনও আমার মনে হয় নাই।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাছে দৃষ্টিকটু। বিশেষ করিয়া চুড়িদার পাজামা। উত্তরাপথের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পা সাধারণত সোজা হয় না ; উহা ধনুর মতো বাঁকা হয়—ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'বো-লেগ'। জবাহরলাল নেহরুরও পা সোজা ছিল না। এই নিম্নাবয়ব যাঁহাদের তাঁহাদের চুড়িদার পাজামা পরা উচিত নয়। এও মনে রাখিবেন, পূর্বকালে মুসলমান রাজারা বা আমীররা অশ্বারোহণ ছাড়া অন্য কাজের জন্য জানু হইতে গুল্ফ পর্যন্ত জঙ্ঘা আবৃত রাখিতেন। উহা সাজাহান, আওরংজেব, এমন কি সিরাজ-উদ্-দৌলা পর্যন্ত সকলের ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তবে এই অতি অশোভন বেশ আমাদের অঙ্গে দাপান হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ, কিন্তু একটু বিস্তারের প্রয়োজন আছে। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র করিম খাঁ গল্পের নায়ককে বলিয়াছিল যে, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গুলবাগের ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক ; তেমনই শেরওয়ানি পাজামার ক্ষুধিত পাষাণের মতো আকর্ষণের অর্থ বুঝাইবার জন্যও হিন্দুস্থান বা উত্তরাপথের বিদগ্ধ সমাজের ও নেহরু বংশের পোশাকের পুরাতন ইতিহাস জানা দরকার।

বাংলাদেশের সঙ্গে হিন্দুস্থানের যে বড় সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ গত দুই-তিন শত বৎসর ধরিয়া দেখা গিয়াছে তাহা এই—আমাদের মধ্যে নাগরিক, সভ্য ও বিদগ্ধ জন হিন্দু, মুসলমানরা প্রধানত গ্রামবাসী, কৃষক ও গাঁওয়ার ; হিন্দুস্থানে ইহার উল্টা—হিন্দুরা প্রধানত গ্রামবাসী, কৃষক ও গাঁওয়ার, খুব বেশি হইলে দোকানদার, আর মুসলমান নাগরিক সভ্যতার অবলম্বন। তাই হিন্দুস্থানে হিন্দু মাত্রেই সভ্য বলিয়া গৃহীত হইতে চাহিলে মুসলমানী রীতি ধরিত, অর্থাৎ তাহাদের ভাষা হইত উর্দু, পোশাক হইত আচকান ইত্যাদি, আদব-কায়দাও হইত মুসলমানসুলভ। এখন যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে সাহেব হইতে চায়, তখন তাহারা মুসলমান হইত। ইহা ছাড়া সামাজিক জীবনে বিদগ্ধ হিন্দু মুসলমানেরই সঙ্গে মেলামেশা করিত বেশি।

এলাহাবাদে থাকায় নেহরু পরিবারের চালচলনও এই ধরনেরই, অর্থাৎ মুসলমান-ঘেঁষা হইয়াছিল। তাঁহাদের দেশী পোশাকও ছিল মুসলমানী। ইহার উপর কাশ্মীরী হওয়াতে তাঁহারা সাধারণ হিন্দুস্থানী হিন্দু অপেক্ষাও বেশি মুসলমানগন্ধী ছিলেন। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানের পিরালী সমাজভুক্ত বলা যায়।

সুতরাং নেহরু প্রধানমন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষের প্রায় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসক হইবার পর মুসলমানী পোশাক নিজে পরিবেন ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রবর্তন করিবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার নিজের পরিচ্ছদের ত্রিধা বিবর্তন। কিন্তু উহারও যথাযথ কারণ আছে।

নেহরু নিজে বাল্যকালে ও মোতিলাল প্রাপ্ত বয়সে ঘরে যাহাই পরুন, বাহিরে সাহেবী অর্থাৎ ইউরোপীয় পোশাকের পাট রাখিয়াছিলেন। ইহা ইঙ্গ-বঙ্গীয় ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ানের মতোই আচার। বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর জবাহর ব্যারিস্টারি করিলে নিশ্চয়ই সাহেবী পোশাকই বজায় রাখিতেন। কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মিল। পিতাপুত্র দুইজনেই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন, ইহার জন্য দুইজনকেই সাহেবী পোশাক ছাড়িতে হইল।

কিন্তু তাহার পর পিতা ও পুত্র দুই পথ ধরিলেন। মোতিলাল পূর্ণ গান্ধীপন্থী না হওয়ায় পুরাতন মুসলমানী বেশে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মহাত্মার শিষ্য জবাহরকে হিন্দু ধুতি পরিধান করিতে হইল। উহা সাধুর ভেকের মতোই অবশ্যপরিধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২০ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত তিনি সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি পরিতেন। আমি যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে এই পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে দেখি নাই।

তবে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করিল তখন জবাহরলালও জাতীয় আন্দোলনের হিন্দু ভেক ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পাইলেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার তাঁহার কাছে কখনই প্রীতিকর মনে হইত না, হিন্দু ধুতিও হইবার নয়। রাজনৈতিক কারণে যেমন তিনি বিশ্বাস না করিয়াও গান্ধীবাদ মানা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন, তেমনই উত্তরাপথের হিন্দু জনসাধারণের নেতা হিসাবে ধুতি পরাও সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কর্তব্য সমাপন হইল, তখন তিনি এই পোশাক ছাড়িয়া তাঁহার পরিবারের ধারা মতো মুসলমান পোশাকে ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পোশাক হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় পোশাক বলিয়াও গৃহীত হইল। ইহার পর হিন্দু বস্ত্রের সমর্থন করিতে পারে বা হিন্দু বস্ত্র পরিয়া রাজকার্যে যাইতে পারে এমন সাহসী হিন্দু আর আর্যাবর্তে দেখা গেল না। যে দাসসুলভ মনোভাব আমাদের চিরকালের, তাহা অব্যাহত রহিল।

এই দাসবৃত্তিতে মানসিক বৈকল্য না ঘটিলে সকলেই বুঝিতে পারিত যে, স্বাধীনতার যুগে মুসলমানী পোশাক পরিবার কোনও অর্থ হয় না। এটা ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখার অপেক্ষাও অস্বাভাবিক। এ-যুগে সারা জগতের যেখানে যেখানে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ স্বাভাবিক পরিচ্ছদ নয়, সেখানে মাত্র দুইটি পোশাক আছে। প্রথম, প্রত্যেকটি জাতির জাতীয় পোশাক ; দ্বিতীয়, ইউরোপীয় পোশাক, যাহাকে আজ বিশ্বজনীন পোশাক বলা যায়। জাপানীরা কার্যব্যপদেশে ইউরোপীয় পোশাক পরে, গৃহে বিশ্রাম বা অতিথির আপ্যায়নের জন্য নিজেদের পরিচ্ছদ পরে। অন্যত্রও এই নিয়ম। একটা তৃতীয় পরিচ্ছদ আমাদের মধ্যেই একমাত্র আছে, এবং সেটি আমাদের এক বিজেতা জাতির, আমরা এক সময়ে যাহাদের দাস ছিলাম তাহাদের। ইহাতে আমাদের অবস্থা হইয়াছে ত্রিশঙ্কুর মতো—হিন্দু পরিচ্ছদের মর্ত্য হইতে ইউরোপীয় পোশাকের স্বর্গে উঠিতে গিয়া আমরা কুপিত শতমুখরূপী নেহরুর হুঙ্কারে নিপাতিত হইয়া ইসলামী মধ্যপথে ঝুলিয়া আছি। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

এখনও মেয়েদের মুসলমানী পোশাকের কথা বাকী। ইহা পুরাতন মুসলমানী পোশাক নয়, বেগমদের পোশাক নয়, এমন কি হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের পোশাকও নয়। উহা পাঞ্জাব হইতে আগত হিন্দু মেয়েদের মারফতে পাওয়া মুসলমানী সালওয়ার কামিজ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি পাঞ্জাবের হিন্দু মেয়েদের পরিচ্ছদের আলোচনা করিব না। তাঁহারা বহু শত বৎসর ধরিয়া এই পোশাক পরিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের দেহধর্ম, মানসিক ধর্ম ও সামাজিক ধর্ম, তাঁহাদের পরিচ্ছদের ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাঁহারা যে পরিচ্ছদ সংস্কারে নিযুক্ত আছেন, তাহা হিন্দুত্বের অর্থাৎ শাড়ির দিকে। সালওয়ার কামিজ পরিয়া পরিচ্ছদের যে সংস্কার হইতে পারে, সেই আন্দোলন আসিতেছে আর্যাবর্তের ও বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েদের দিক হইতে। আমি তাহারই আলোচনা করিব।

সালওয়ার-কামিজ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন, উহা আদিতে নিশ্চয়ই হুন-তুরুষ্ক, তাতার প্রভৃতি যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর জাতির পোশাক ছিল। আর্য জাতির অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী কোনও জাতির মেয়েরাই এই ধরনের পোশাক পরিত না। তাহারা সকলেই অসীমিত বস্ত্র পরিত এবং এই সব জাতির মেয়েরা দ্বিবস্ত্র ছিল। একটু সেলাই থাকিলেও গ্রিক, রোমান ও প্রাচীন হিন্দুর স্ত্রী জাতির পরিচ্ছদ এক ছিল—যেমন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিকদের 'থিটন' ও 'হিমাটিয়ন', রোমানদের 'টুনিকা' ও 'পাল্লা' বা 'স্টোনা' এবং হিন্দুর বস্ত্র ও উত্তরীয়।

অর্থাৎ সালওয়ার-কামিজ অশ্বারোহিণীর পোশাক। যাহাদের দিনরাত ঘোড়ায় চড়িয়া শত শত মাইল যাইতে হইত, তাহাদের পক্ষে এই পোশাকই স্বাভাবিক। এই কথা মনে করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটু সমালোচনা করিয়াছিলেন। 'আনন্দমঠে' শান্তি এক লাফে ঘোড়ায় চড়িয়া এনসাইন লিডলেকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া ধূলা উড়াইয়া চলিয়া গেল। ইহার উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন যে, বে-সেলাই কাপড় পরিয়া ইহা কিভাবে করা যায়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার মানসচক্ষে হয়তো একটা অশোভন দৃশ্য ভাসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তখনকার দিনের ইংরেজ মেয়েরা গাউন পরিয়া কি করিয়া ঘোড়ায় চড়িত, তাহা স্মরণ করিলেন না কেন? 'সাইড স্যাডল' না হইলেও একটু চেষ্টা করিয়া পুরুষের জিনেও এইভাবে ঘোড়ায় চড়া যায়। সে যাহাই হোক, সালওয়ার-কামিজে যে ঘোড়ায় চড়িতে অনেক সুবিধা তাহা সকলেই মানিবেন।

এ দুটি দিল্লিতে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার আগে এগুলির প্রাধান্য ছিল না। সালওয়ার-কামিজ তখন কিভাবে দিল্লিতে আসিল, তাহা আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি। দেখিয়া কিভাবে উহা প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে প্রথমে আসিয়াছিল তাহার কথা মনে পড়িল। তবে সে-পরিচ্ছদ অশ্বারোহিণী তুরুষ্ক-রমণীর। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর দিল্লি, আজমীর, পুষ্কর তুরুষ্কেরা অধিকার করিয়াছে। দেবগৃহ সর্বত্র জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজের সভাকবি বিলাপ করিতেছেন। পুষ্করের জন্যই তাঁহার যাতনা বেশি। আমি সংস্কৃত হইতে তাঁহার আক্ষেপের তাৎপর্য দিতেছি—

> যেখানে জগৎসৃষ্টির পর ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই পুষ্করে মন্দির-ধ্বংসকারী ম্লেচ্ছচমূ দেব-হিংসার ক্লান্তি নিবারণ করিতেছে।
>
> যাহারা মরুযাত্রার তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য নিজের বাহনের কণ্ঠনিঃসৃত রুধির পান করে তাহারা আজ পুষ্করের জল পান করিতেছে। (যাযাবর জাতি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জল না পাইলে নিজেদের ঘোড়ার গলার ধমনী কাটিয়া রক্ত পান করিত। ইহার জন্য স্বতন্ত্র ঘোড়া থাকিত। মার্কো পোলোও এই ব্যাপার দেখিয়াছিলেন।)
>
> যে পুষ্করে শচীকেও অবগাহন করিতে দেখিলে স্বর্গ-গণিকারা পরিহাস করিত, সেখানে আজ ঋতুমতী অধম ম্লেচ্ছ রমণীরা স্নান করিতেছে।
>
> হায় বিষ্ণো! তুমি রামাবতারের পর অহিংস বুদ্ধত্ব ধারণ করিয়াছিলে, সে জন্যই কি আমাদের এই দশা ঘটিল!

এই বর্ণনা পড়িয়া পুষ্কর তীরের সেই দৃশ্য আমার চোখে ভাসিয়া উঠে। পুষ্করের ঘাট ও ধাপের উপর সালওয়ার-কামিজ পরিহিতা ভীষণ রমণীয়াকৃতি তুরুষ্ক সুন্দরীরা সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও ধনু—দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সন্নিহিত বিষধর চন্দনলতা। আরক্ত কপোল বহিয়া স্বেদ ঝরিতেছে, দুই দীর্ঘ বেণী কটি পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাম্রকুন্তলা, বিড়ালাক্ষী মূর্তি। পিছনে দাউদাউ করিয়া মন্দির পুড়িতেছে, ঘূর্ণায়মান স্তম্ভের মতো ধূম পিঙ্গল আকাশে উঠিতেছে, সেখানে হিন্দুর দেবতা আর নাই। তপ্ত মরুবায়ু বাহিয়া বন্দী ব্রাহ্মণের আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। এইভাবে সালওয়ার-কামিজ প্রথমে আর্যাবর্তে আসিয়াছিল, কিন্তু টিকিতে পারে নাই। টিকিবার জন্য নেহরু-যুগের অপেক্ষায় ছিল।

হিন্দু মেয়ে সালওয়ার-কামিজ পরিলে আমার ঐতিহাসিক বোধ হইতে কেন আপত্তি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে পারে, তাহার আভাস পাইলেন। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটা মোটা হিসাবের আপত্তির কথা বলি। প্রথমে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া আরম্ভ করিব। একদিন একটি কালো শীর্ণকায়া বাঙালি মেয়ে আমার কাছে সালওয়ার-কামিজ পরিয়া আসিয়াছিল। সে কেন এই বেশ ধারণ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে একটু উদ্ধত ভাব দেখাইল যেন সে খুব মডার্ন এবং আমি সেকেলে। বিরক্তির বশে যে জবাব মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, তা এই—

> "দেখ, সালওয়ার-কামিজ পরিবার আগে একটু নিজেকে আরশিতে দেখিও। সালওয়ারধারিণী ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবী কিশোরীরা সাধারণত গৌরী, রূপসী ও পূর্ণাবয়বা। তাহাদের কেহই শুধু সালওয়ার পরা দেখিয়া তোমাকে তাহাদের সমকক্ষ মনে করিবে না। যদি পাঞ্জাবী বলিয়া ভুলও করে তাহা হইলে তোমার মতো কালো চামচিকাকে তাহারা ভাঙ্গী (মেথর) বা চামারের মেয়ে মনে করিবে।"

কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইবে ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিয়াছিলাম। তবে যে-সব বাঙালি মেয়ে সালওয়ার পরিতে চান, তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে কথাটা প্রণিধান করিতে বলিব।

সালওয়ার বাঙালি মেয়েকে দূরে থাকুক হিন্দুস্থানী হিন্দু মেয়েকেও মানায় না। খানদানী ও বনিয়াদি ছাঁটে তৈরি সালওয়ার সুপরিসর দেহের সুপরিসরতর পরিচ্ছদ। যাঁহারা নিজেদের প্রচীন ধারা অনুযায়ী সালওয়ার পরেন, তাঁহাদের পরিমণ্ডলের মাপ মাঝামাঝি গোছের হইলেও পঞ্চাশ ইঞ্চ। ইহা অবশ্য আমার অনুমান, কিন্তু নিতান্ত ধাসা আন্দাজ নয়। বনিয়াদি সালওয়ারের জন্য এইরূপ কটিদেশের দুইটি যায় এই মাপে কাপড় নেওয়া হয়, কারণ ঢিলা-ঢালা ভাঁজওয়ালা হওয়ার মধ্যেই সালওয়ারের শোভা। বর্তমান যুগের হিন্দু মেয়েদের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক, দিদারগঞ্জের যক্ষিণীও এই মাপের নয়।

দ্বিতীয়ত, যাঁহারা সালওয়ার পরেন, তাঁহাদের চলার ধরন হিন্দুর মতো নয়। হিন্দু মেয়ে ছোট ছোট পা ফেলিয়া স্থিরভাবে চলে, মুসলমান মেয়ে বা সালওয়ারধারিণী পাঞ্জাবী হিন্দু মেয়ে চলে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া। প্রথমাকে দেখিয়া মনে হয় যেন পুত্তলিকাকে অদৃশ্য সুতা দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে; কিন্তু দ্বিতীয়াকে দেখিলে মনে হইবে যেন চিতাবাঘ শিকারের সন্ধানে যাইতেছে, স্থির থাকিলে মনে হইবে যেন বাত্যান্দোলিত তরু। একদিন একটি পাঞ্জাবী যুবতী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া পত্নী আসিয়া বলিলেন, 'দেখিলে না তো, এত বড় মেয়ে ঠিক ছাগল ছানার মতো লাফাইতে লাফাইতে গিয়া গাড়িতে উঠিল।' তাঁহার সঙ্গে একটি অতি ফ্যাশনেবল মুসলমান যুবক ছিল।

তৃতীয়ত, সালওয়ার-কামিজ মুসলমানী পোশাক বলিয়া মুসলমান সমাজে নারী সম্বন্ধে যে-সব ধ্যান-ধারণা আছে, তাহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানের কাছে নারী একমাত্র ভোগের সামগ্রী। হিন্দুরও যে অংশত তাহা নয়, সে-কথা বলিব না। কিন্তু হিন্দু চতুর্বর্গে বিশ্বাসী, তাই নারী কাম ছাড়া অন্য তিনটি বর্গ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ এই তিনেরও সহায়িকা, সে সহধর্মিণী। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দু নারী প্রাচীন স্পার্টা, রোম ও জার্মেনীর নারীর মতো। তাহার মর্যাদা স্বতন্ত্র। কিন্তু হিন্দু মেয়ে মুসলমানী পোশাক পরিলে তাহার সঙ্গে একটা বিরোধী ভাবের আশ্লেষ আসিয়া পড়ে। ইহা যে শুধু পুরুষের মনে জাগে তা নয়, মেয়েরাও তাহা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাদের ভাবভঙ্গির ধরন বদলাইয়া যায়, হাস্যলাস্যের তো কথাই নাই। জিনিসটা মোটেই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রীতিকর নয়।

এই তো গেল খানদানী ও বনিয়াদি সালওয়ার পরিবার বিরুদ্ধে আপত্তি। আজকাল উহার যে রূপ দেখা দিয়াছে, এবং আর একটি যে-জিনিস উহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে আপত্তির কথা বলাই বাহুল্য। আমি ১৯৯৫ সন হইতে সালওয়ারের সঙ্কোচন লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করি, এবং বলি যে, উহা সালওয়ারেট-এ পরিণত হইয়াছে। এই সঙ্কোচনেও ফ্যাশনের দাবি মিটিল না। তাই যাঁহারা অতি-ফ্যাশনেবল তাঁহারা চুড়িদার পাজামা পরিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই এখন স্টাইল।

এই সঙ্কোচনের প্রেরণা কোথা হইতে আসিয়াছে তা আমার ভালই জানা আছে। আসিয়াছে পাশ্চাত্য জগতের অতি-আধুনিক "জীনস" হইতে। কিন্তু সত্যই কি চুড়িদার পাজামা পরিয়া "জীনস"-এর "এফেক্ট" করা যায়? আমি সামাজিক জীবনে মেমমহলে ঘুরি। সুতরাং জীনস পরিহিতাদের অখণ্ড মণ্ডলাকার—না, ভুল হইয়াছে, খণ্ডিত-মণ্ডলাকার পশ্চাদ্দেশের শোভা দেখিয়া অভ্যস্ত। আমি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারি, চুড়িদার পাজামা যতই সঙ্কুচিত হউক না কেন, জীনসের পুরাপুরি রস তাহাতে নাই। উহা পরিয়া জীনসের সাধ মিটানো নিতান্তই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মতো। আর যাঁহারা শাড়িকে 'জীনসে'র স্টাইলে পরিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা কোনক্রমেই করিব না। গাধা পিটাইয়া হয়তো ঘোড়া বানানো যাইতে পারে, কিন্তু শাড়িকে টানিয়া-কষিয়া কখনই জীনস-এ পরিণত করা যাইবে না, দাক্ষিণাত্যের ধারা অনুযায়ী কচ্ছ দিলেও নয়।

আমি জানি, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী পুরাতন সালওয়ারকে বীভৎস ও চুড়িদার পাজামাকে মেয়েলী বেশ হিসাবে অতি সুন্দর মনে করেন। তিনি পিতার পুত্রী, তাহার উপর প্রগতিশীলা। তাঁহার এই মত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কি দেখি, এবং এই দেখার ফলে কি মনে করি, তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। প্রথমে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বলিব।

নূতন দিল্লির সবগুলি নূতন পাড়াই এমন গোলকধাঁধা যে অজানা লোকের পক্ষে পথ চেনা দুরূহ। তাই কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি পল্লীর প্রবেশপথে একটি করিয়া ম্যাপ দিয়া রাখিয়াছেন—যেমন, 'ম্যাপ অফ জোড়বাগ', 'ম্যাপ অফ নিজাম-উদ্দীন', 'ম্যাপ অফ লাজপত নগর' ইত্যাদি। কিন্তু শুধু ইংরেজিতে 'ম্যাপ' কথাটা থাকিলে হিন্দী ভাষার সম্মান থাকে না, উত্তরাপথের সার্বভৌমত্বও প্রচার হয় না, সেজন্য ম্যাপগুলির নীচে ইংরেজি শিরোনামা ছাড়া বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরেও লেখা আছে—

**মার্গ দর্শন চিত্র**

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পত্নী সহ নূতন দিল্লির দক্ষিণ দিকে একটি পাঞ্জাবী পাড়ায় থাকে। (আমি ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বে আস্থাশীল, তাই ছেলে বিবাহ করিবার পর স্বতন্ত্র হইয়া সাগ্নিক বা স-বৈদ্যুতিক গৃহস্থ হইয়াছে; এবং সময় মতো পৃথগন্ন হওয়াতে পিতাপুত্রে মুখদর্শন অব্যাহত অছে।) যখন আমরা তাহার বাড়ি যাই, তখন মহল্লার প্রবেশপথে এই আমন্ত্রণ পাই। পত্নী সঙ্কোচে মুখ ফেরান, কিন্তু আমি হাতজোড় করিয়া বলি, "ভগবান, পাঞ্জাবের ভগবান! তুমি কি তোমার নন্দিনীদের শুধু জিনিসটা দেখাইবার জন্য উদ্বেজিত করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, হিন্দীওয়ালাদিগকে উহার বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্যও অনুপ্রাণিত করিয়াছ?"

জিজ্ঞাসা হয়তো করিবেন—ইহাতে দোষ কি? বলিব, কোনও দোষই নাই—উহা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব জানা থাকিলে। আমি জন্মে এবং সংস্কারে হিন্দু, ইহার উপর সর্বদাই সংস্কৃত কাব্য পড়ি, তাহারও উপর আবার গ্রিক ও ইউরোপীয় মানসিক ধর্মে দীক্ষিত। একদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা-প্রসঙ্গে মঁসিয় আঁদ্রে মালরো আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিতে আমি কি বুঝি। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, গ্রিস হইতে ১৯০০ সন পর্যন্ত সবই। তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সভ্যতা ও প্রাচীন ভারতের সভ্যতার সহিত যাহার পরিচয় আছে, সে দেহ-সৌন্দর্যের উপাসক হইতে বাধ্য। স্তন ও নিতম্ব সম্বন্ধে তাহার শুচিবায়ু, ভণ্ডামি বা মূঢ়তা থাকিতে পারে না। সে স্বীকার করিবেই যে, এই দুইটি নারীদেহের সৌন্দর্যের সারভূত। আমিও করি।

যদি না করিতাম তাহা হইলে লন্ডনে ন্যাশনাল গ্যালারিতে প্রবেশ করিয়াই ভেলাসকেথের 'রোকবী ভেনাস' দেখিবার জন্য সর্বাগ্রে ছুটিয়া যাইতাম না; ইউরোপ হইতে ফিরিবার প্রাক্কালে রোমের ন্যাশনাল মিউজিয়মে 'ভেনেরে দি চিরেনে'র (Aphrodite of Cyrene) মস্তকহীন মূর্তির অপরূপ লাবণ্য দেখিয়া মনে হইত না যে, এই পাষাণীকে ছাড়িয়া যাইতে হৃদয়ের তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমার ঘরে বত্তিচেল্লির 'বার্থ অফ ভেনাস' চিত্রের ভেনাসের ছবি টাঙান আছে। তিনি নগ্না। কিন্তু তাঁহার লোকোত্তর পবিত্র দেহ-সৌন্দর্য ও চক্ষের স্বপ্নজড়িমা দেখিবার পর কাহারও তাঁহাকে 'প্রিয়তমা' বলিয়া বুকে টানিয়া লইতে সাহস হইবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই কথা বলাও স্পর্ধা মনে হইবে—

"কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন উপবনে বিরহবেদনে আমার
কারণে কেঁদে যায়।"

শুধু নতজানু হইয়া বলিবার ইচ্ছা হইবে, "দেবি! নারীদেহের মহিমা দেখাইয়া ধন্য করিবার জন্য কোন্ স্বর্গ হইতে মরজগতে নামিয়া আসিয়াছ?" আমার দুঃখ, আজ ফ্লোরেন্সের উফিৎসি গ্যালারিতে মূল চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার এই পূজার অঞ্জলি দিতে পারিলাম না।

কিন্তু সমস্ত জগতের ও সর্বকালের আর্টের বিবস্ত্রা রমণীর রূপের যত উপাসনাই করি না কেন, আমার পক্ষে দিল্লির 'মার্গদর্শন' কাম্য বা প্রীতিকর বলিয়া মানা সম্ভব নয়। কারণ ইহার পিছনে একটা প্রবঞ্চনা আছে—অর্থাৎ বিবস্ত্রা যে লালসার উদ্রেক করে তাহা পুরুষের মধ্যে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বিবস্ত্রা হইবার সাহস নাই। সুতরাং এই সব ছদ্ম-বিবস্ত্রার প্রতি, Crypto-nude-দের প্রতি আমার কোনও প্রকার শ্রদ্ধা হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুর আর যে দোষই থাকুক, ভণ্ডামি ছিল না। এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে তামাক, কোকেন ও সিফিলিসের মতো পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আসিয়াছে। আমি অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দু।

ফলে আমার সালওয়ার-কামিজের জন্যও দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। অশ্বারোহিণী, অসিধারিণী, রণরঙ্গিণী মরুকন্যার দৃপ্ত বেশ আজ কাম ও লালসার অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুর ভগবান বা মুসলমানের আল্লা, কেহ কি কোথাও নাই যাঁহার কোপানল এই লালসাকে দগ্ধ করিতে পারে? অথচ এই দেশেই ইহার চেয়ে অনেক কম অপরাধে মদন ভস্ম হইয়াছিল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ব্যাপারটা কেন ঘটিতেছে ? ইহার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু বলিলে সালওয়ার-ওয়ালীরা ও তাঁহাদের তরিবতে মুগ্ধ হিন্দু-পাজামা-ওয়ালারা আমার উপর রাগ করিবেন—কারণ কেহই হাটে হাঁড়ি ভাঙা পছন্দ করে না। তবে উঁহারা জ্ঞানপাপী এ-কথা কখনই বলিব না। যৌথ-ফ্যাশন বড় ভয়ানক জিনিস, গুপ্ত স্রোতের মতো—উহা যে কাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যায় কেহই বলিতে পারে না। হয়তো বা এই বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছি বলিয়া কেহ কেহ আমার স্পষ্টোক্তি ক্ষমাই করিবেন।

প্রশ্নটা গণিত বা জ্যামিতির সমস্যার মতো, উহার সমাধান ধাপে ধাপে করিতে হইবে। আমি ধাপগুলি পর পর দেখাইতেছি।

১ম ধাপ—ছোট-বড় সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ আমাদের একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এই ব্যাধি তাহাদের মধ্যে বেশি মারাত্মক যাহাদের সত্যকার ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, যাহারা শুধু নিম্নস্তরের বই, পত্রিকা বা ফিল্ম হইতে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের ইতরতার সংবাদ পায়।

২য় ধাপ—সমস্ত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সমাজ আজ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে প্রেম হইতে কামের দিকে লইয়া যাইতেছে, সুতরাং আমাদের মধ্যে এই গণতান্ত্রিকতা না আনিতে পারিলে আমরা অবনত ও তিমিরান্ধ হইয়া থাকিব।

৩য় ধাপ—স্ত্রী-পুরুষের মানসিক সম্পর্কের সহিত পরিচ্ছদ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যদি সেই সম্পর্ক স্নেহ, বন্ধুত্ব ও প্রেমের হয় তাহা হইলে পোশাক সৌন্দর্যের দিকে যায়, কামের হইলে কামোদ্দীপক হয়।

৪র্থ ধাপ—আমাদিগকে প্রগতিশীল হইবার জন্য কামোদ্দীপক পোশাক পরিতে হইবে, অথচ এই যুগের ইউরোপীয় কামোদ্দীপক পোশাক পরিতে জাতীয়তাবোধ হইতে ও অন্য দুই একটি কারণে বাধে। সুতরাং এই ধরনের দেশী পোশাক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

৫ম ধাপ—কিন্তু দেশী হিন্দু পোশাক যতই অশালীন হউক না কেন, উহা এত গতানুগতিক যে শানাইবার নয়, তাই উগ্রতর মুসলমানী পোশাক পরা ভিন্ন উপায় নাই।

৬ষ্ঠ ধাপ—হিন্দু সমাজে কাম চরিতার্থ করিবার জন্য বরাবরই যবনীর প্রতি ঝোঁক ছিল। কথাটা বিশ্বাস করাইবার জন্য শীলতাবিরুদ্ধ হইলেও প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। ১৮২৩-এর কাছাকাছি প্রকাশিত একটি পুরাতন বাংলা বই-এ একটি ধনী বাবুর মোসাহেব তাঁহাকে উপদেশ দিতেছে—"যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ওই বারাঙ্গনাদের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাণ্ডু অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোনও রাঁড়েই পাইবা না।" অবশ্য যবনীর পোশাকও পেঁয়াজ-রসুন জাতীয়।

৭ম ধাপ—সুতরাং ভদ্রসমাজে একটু সংস্কৃতভাবে যবনী বারাঙ্গানার ধর্ম আনিতে হইলে মুসলমানী পোশাক আনিতে হইবে।

৮ম ধাপ—এই বিশেষ ধরনের ফ্যাশন করিতে গেলে এ-যুগে সালওয়ার-কামিজ ভিন্ন নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

ইতি—কিউ-ই-ডি

আশা করি কেহ এই জ্যামিতিক সমাধানকে গোজামল বলিবেন না।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য—এই পথ ধরিয়া আমাদের ফ্যাশনেবল মেয়েরা কি সত্যই সাফল্য পাইবেন, না শুধু দুই কূল হারাইয়া ইতো ভ্রষ্টা ততো নষ্টা হইয়া হাস্যাস্পদ হইবেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কোনও তর্ক তুলিব না। আমার উত্তর কি তাহা নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে হইবে না। সেই উত্তর মনে মনে রাখিয়া আমি আমাদের নারী সমাজের কাছে একটি নিবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা যেন হিন্দুর ভগবানের উক্তি বিস্মৃত না হন,

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

এবং এই উক্তি স্মরণে রাখিয়া তাঁহারা যেন 'টপ-লেস' সম্বন্ধে ইতর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রসুলভ ফিরিঙ্গি মার্কা ইতরতর রসিকতা না করিয়া, হিন্দু মূর্তিতে—

"অবিরল চন্দনানুলেপন ধবলিত স্তনতটা, উন্মমজ্জ দৈরাবতকুম্ভমণ্ডলের মন্দাকিনী, শরদিব কলহংস ধবলাম্বরা" হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেন। তখন সেই বিভাসিত রূপ দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া আমি যে বৃদ্ধ, মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, আমি আমার দেশের দেবতার কাছে সংস্কৃতের জ্ঞানই ল্যাটিন ভাষায়, একটি বিখ্যাত প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া, এই ভিক্ষা চাহিব—

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace : quia viderunt o culi mei salutare tuum.

"প্রভু এখন তোমার ভৃত্যকে এই জগৎ হইতে তোমার কথামত শান্তিতে বিদায় লইতে দাও ; কারণ তাহার চক্ষু তোমার প্রদত্ত মোক্ষের ভাস্বর জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছে।"

দেশ, ১৪ শ্রাবণ ১৩৭৩, ৩০ জুলাই ১৯৬৬

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র
## (Woodcuts)

পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় শিল্পকলা তত্রত্য শিল্পীদের অদম্য উৎসাহ ও প্রবল প্রাণশক্তির প্রভাবে দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগের মতো প্রাচীন কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতিরও যেন পুনর্জন্ম ঘটিয়াছে। মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিত্রশিল্পের এই বিশেষ বিভাগটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস বহুদিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি কাঠ-খোদাই-চিত্র স্যার আউরেল স্টাইন্ তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান করেন সম্ভবত এই চিত্রটি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপের কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইহা ইয়োরোপে প্রবর্তিত হয়। চীনা শিল্পীরা এ-বিষয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের গুরু কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্ ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের পূর্বসীমান্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পের অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানের চমৎকার রঙীন-ছাপচিত্রে (Colour Print) পর্যবসিত হইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপে এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে ডূরের ও হোল্‌বাইন এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর হস্তে চরম গৌরবলাভ করিয়া হঠাৎ যেন সমাপ্ত হইয়া সৃজন-শিল্প (creative art) শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কাঠ-খোদাই-শিল্পের ইয়োরোপীয় ধারা লইয়াই আলোচনা করিব। বস্তুত এই শিল্পের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভিন্ন ধারা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিচার করিলে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়। ইয়োরোপে রঙীন কাঠ-খোদাই-চিত্র (colour woodcuts) অপ্রচলিত তো নহেই, এমন কি বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তবুও ইয়োরোপীয় কাঠ-খোদাই-শিল্প বলিতে আমরা সাদা ও কালোর সমাবেশে অঙ্কিত ছবিই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া থাকি। ডূরের ও হোল্‌বাইনের পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই শিল্প-বিভাগে কোনও নিপুণ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ে কাঠ-খোদাই-শিল্প কতকটা গতানুগতিক যন্ত্রশিল্পে পরিণত হয়। যে-কোনও ধরনের অঙ্কিত চিত্র আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুকরণে কাঠে যথাযথ খোদাই করিয়া আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পীদের মতো রঙে রেখায় বাহ্যত আসলের একটা নকল খাড়া করিয়া তোলাই তখন শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ক্যামেরা ও নানাধরনের প্রসেস্ এন্‌গ্রেভিং (তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর উপর বিশেষ বিশেষ দ্রাবক প্রয়োগে আলোকচিত্রের অনুরূপী আলো ও ছায়ার নিবিড়তার তারতম্য অনুযায়ী



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-ফলক উৎকীর্ণ হয় তাহার সাহায্যে ছবি ছাপান) আবিষ্কৃত হওয়াতে গ্রন্থাদি এইভাবে চিত্র-সম্বলিত করা অল্প পরিশ্রমে ও অনেক কম খরচে হইতে লাগিল ; সুতরাং এইরূপ গতানুগতিক ভাবেও কাঠ-খোদাই-পদ্ধতির অস্তিত্ব বজায় রহিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, একদিক দিয়া যাহা ক্ষতিকর বিবেচিত হইল অর্থাৎ

'স্বর্গচ্যুতির পর', ব্রুনো গোলড্‌স্‌মিট কর্তৃক খোদিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসার দিক দিয়া এই কাঠ-খোদাই-শিল্পীদের যে অনিষ্ট হইল যেন তাহারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই পদ্ধতি সূক্ষ্মশিল্পকলা শ্রেণীতে পুনর্বার স্থান পাইল। ব্যবসায়ের আবরণ খসিয়া যাওয়াতে ইহার স্বাধীন মূর্তি প্রকাশ পাইল। আজকাল আমরা অনেক পুস্তকই কাঠ-খোদাই-চিত্র-শোভিত দেখিয়া থাকি। ইহার কারণ এই নয় যে, এই পদ্ধতিতে অল্পমূল্যে আসল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া যায়। আসলে ইহাতে পুস্তকের শোভা যথার্থ বর্দ্ধিত হয়। কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে কোনও পুস্তকে কাঠ-খোদাই-চিত্রের সমাবেশ হয় না। যেদিন এইভাব লোকের মনে বদ্ধমূল হইল সেদিনই যেন এই শিল্পের নবজাগরণ হইল। ফরাসিদেশে সর্বপ্রথমে এই জাগরণের সূচনা হয়, সম্প্রতি পৃথিবীর সর্বদেশে ইহার অনুশীলন হইতেছে। এমন কি শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ব্র্যাঙ্গিন ও ডেরেনের (Brangwyn ও Derain) মতো প্রথিতনামা শিল্পীরাও কাঠ-খোদাইকে সূক্ষ্ম কলাশিল্পের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া ইহাতে হাত দিয়াছেন।

॥ ১ ॥

## খোদাই-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ কথা ও কাঠ-খোদাই-শিল্পপদ্ধতি

সচরাচর পুস্তক বা সংবাদপত্রাদিতে আমরা যে ছবি দেখিয়া থাকি তাহা কাগজের উপর পেন্সিল কলম বা তুলি-দ্বারা হস্তাঙ্কিত ছবিরই আলোকচিত্র ও প্রসেস্ এন্‌গ্রেভিংয়ের সাহায্যে নির্মিত ফলকের ছাপ মাত্র। এই সকল ছবিতে আমরা শিল্পীর ছবির আদর্শে যন্ত্র-সাহায্যে প্রস্তুত প্রতিকৃতিরই পরিচয় পাই—আসলে এই সকল ছবিতে শিল্পীর হাতের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। কাঠ-খোদাই ছবি ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহার সহিত শিল্পীর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কাষ্ঠখণ্ডের উপর হাতে খোদাই করিয়া শিল্পী যে ছাঁচ নির্মাণ করেন,

'গোলা ঘর', এথেলবার্ট হোয়াইট কর্তৃক খোদিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠ-খোদাই ছবি তাহারই ছাপ (Print)। অর্থাৎ কাঠ-খোদাই ছবি আসল ছাঁচের ছাপ মাত্র। কাঠ-খোদাই এন্‌গ্রেভিং বা তক্ষণ শিল্পের অন্তর্গত। এই দুই ধরনের ছাপে বিস্তর প্রভেদ।

সকল ছাপা ছবিকেই আমরা দুইটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করিতে পারি ; এক, যন্ত্রনির্মিত ফলকের ছাপ (অর্থাৎ 'প্রসেস্'), দুই, হাতে খোদাই-করা ফলকের ছাপ (অর্থাৎ 'এন্‌গ্রেভিং')। প্রথম শ্রেণীর ছাপ-চিত্র যে-ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে এইগুলিকে কোনও ক্রমেই শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত বলা চলে না। 'প্রসেসে' ছাপা ছবি প্রস্তুতের প্রকারভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখনও অল্প মূল্যের স্থূল হাফটোন হইতে পারে, কখনও বা মূল্যবান সূক্ষ্ম রঙীন কোলোটাইপ ছবিও হইতে পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম যে-ভাবেই এগুলি প্রস্তুত হোক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এগুলি প্রাণহীন কামেরার সাহায্যে গৃহীত ছবির যান্ত্রিক (instrumental) প্রতিকৃতি মাত্র। এই সকল প্রণালীর আসল উদ্দেশ্য কোনও হস্তাঙ্কিত রঙীন কিংবা রেখাচিত্রের, খোদিত চিত্রের, আলোকচিত্রের অথবা যে-কোনও ছাপা বা হস্তলিখিত পৃষ্ঠার রঙ, রেখা ও ধরনধারণ সর্বতোভাবে আসলের অনুরূপ করিয়া তোলা। মূল্যবান 'প্রসেসে' ছাপা ছবিতে (যেমন মেদীচি ছাপের ছবি) এমন সুকৌশলে ছাপ লওয়া হইয়া থাকে যে, যাহারা এই সকল ছাপ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা অদ্ভুত যন্ত্র-কৌশলের তারিফ না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু, এই সকল ছাপের প্রশংসার এইখানেই শেষ। ছাপা ছবিতে শিল্পনৈপুণ্য যা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা আসল ছবিখানির বস্তু। কিন্তু শিল্প-সমালোচনায় খোদাই-করা ছাঁচের ছাপা ছবি (এন্‌গ্রেভিং) সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হাতে খোদাই-করা কাষ্ঠ বা ধাতু-ফলকের ছাপ মাত্র। এই খোদাই-কার্যে সাতটি বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হয়।

এই সাত প্রণালীর কোনওটিতেই কোনও আদর্শকে অনুসরণ করিয়া তাহার যথার্থ প্রতিলিপি গড়িয়া তোলা হয় না। খোদাইকার বা শিল্পীর মন—রেমব্রান্ট ও ডূরেয়েরের মতো শিল্পীর বিরাট চিন্তাশক্তি—এই সকল প্রণালীর অন্তরালে কাজ করিতে থাকে। তাঁহাদের অন্তর্লোকে প্রতিফলিত দৃশ্যই তাঁহারা সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির সাহায্যে উপকরণের উপর অঙ্কিত করিয়া দেন। শিল্পীর শিল্পচিন্তাকে রূপে ফুটাইয়া তুলিবার যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উপকরণের আছে, তাহা এবং শিল্পীর আপন স্বাতন্ত্র্য এই দুই মিলিয়া সকল খোদিত-চিত্রকে (এন্‌গ্রেভিং) এমন একটি শিল্প-সুষমা প্রদান করে যাহা সাধারণ যন্ত্র-নির্মিত প্রসেস্ ছাপে পরিলক্ষিত হয় না।

জাইলোগ্রাফি বা কাঠ-খোদাইয়ের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কাঠ-খোদাই-শিল্পের আঙ্গিক* বা টেকনিকের আলোচনা করিতে হইবে।

শিল্পী তাঁহার প্রয়োজন-মাফিক আয়তনের ও নরম বা শক্ত একখণ্ড কাষ্ঠফলক লইয়া তাহার উপরে ছুঁচ বা পেন্সিল দিয়া তাঁহার কল্পিত ছবির একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া লন। সেই খসড়াটির উপর ইহার পর ছুরি বা বুরিন (খোদাইয়ের যন্ত্রবিশেষ) চালাইয়া খোদাই করা হয়। যে যে অংশ কাটিয়া ফেলা হয় ছাপ লওয়ার সময় সেগুলি সাদা দেখায় ; অকর্তিত অংশ কালো চিহ্নিত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কাঠ-খোদাই পদ্ধতির গোড়ার কথা এই সাদা রেখা। এক নম্বর চিত্রে যে ছাপের প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র এই সাদা ও কালো রেখায় চিত্রিত। সাধারণ হস্তাঙ্কিত চিত্র ঠিক উহার উল্টা,

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োগ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১নং চিত্র মার্সিয়া লেন ফস্টার কর্তৃক আনাতোল ফ্রাঁসের কোনও পুস্তকের জন্য খোদিত

তাহাতে সাদা পটভূমির উপর মানুষের বাহ্যাবয়ব কালো রেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়। কিন্তু এই ধরনের চিত্রে, শিল্পীর যাহা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে-চেষ্টা তাহা কতকটা ব্যর্থ হয়, অধিকন্তু, ছবির বর্ণোজ্জ্বলতা বা চটক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। কাঠ-খোদাই শিল্পে শূন্য কালো পটভূমির উপর সাদা রেখার সাহায্যেই শিল্পী বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় ; হস্তাঙ্কিত চিত্রে যেমন কালো রেখা বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, কাঠ-খোদাইয়ে তেমনি সাদা রেখা বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক। সাদা রেখার সাহায্যে চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুবিধা এই যে, ইহার বহুল প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না, তাছাড়া, শিল্পীর অন্য কিছু কৌশলের সাহায্যও লইতে হয় না ; কালোর উপর সাদার সমাবেশে সহজেই সমগ্র জিনিসটি সুস্পষ্ট করিয়া তোলা সহজ হয়। কাঠ-খোদাই ছাপে আমরা যখনই এই শিল্পের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের—অর্থাৎ সাদা রেখার যথাযথ প্রয়োগের অভাব দেখি তখনই বুঝিতে পারি শিল্পী অন্য কোনও শিল্পকে আদর্শ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ধরনের ভ্রমাত্মক কাঠ-খোদাইয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ—মিঃ রিকেট্‌স খোদিত "হিমনেরেটো মেকিয়া পলিফিলি" (১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ) বিষয়ক ছাপগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ছাপ হস্তাঙ্কিত 'পেন্সিল ড্রইং'য়ের হুবহু অনুকরণ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

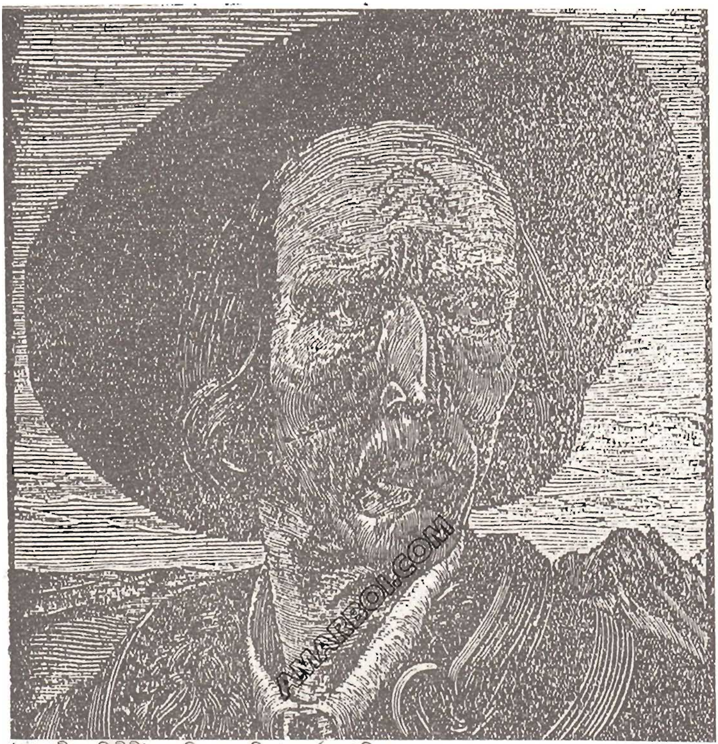

'পোলাণ্ডীয় কৃষিজীবী', ভ্লাডিস্‌ল্ স্ককজিলাস কর্তৃক খোদিত

একটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অঙ্কন-কালে যে আঙ্গিক বা টেকনিক অনুসরণ করা হয় ছবি তাহার অনুযায়ী হইবে। কোনও শিল্পী তৈলচিত্রের বিশেষত্বকে জলরঙা (water-colour) ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত নহেন, রেখাচিত্র ও বর্ণচিত্রের পার্থক্যও তিনি ভুলেন না। তেমনি খোদাই-শিল্পের সাতটি বিভাগের পার্থক্য ভুলিলেও চলিবে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কাঠ-খোদাই শিল্পীর উপকরণ অধিক নহে। রঙ বর্জন করিয়া কেবলমাত্র সাদা-কালোর সমাবেশে তাঁহাকে আলো ও বর্ণের খেলা দেখাইতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে মূর্তির সতেজ প্রকাশে রঙের অভাব প্রকাশ না পায়। এই কারণেই কাঠ-খোদাই ছাপের আকর্ষণী শক্তি অধিক, কারণ আমরা জানি যে, কেবলমাত্র বাহ্য মূর্তির সৌন্দর্য উপলব্ধি বস্তু-নিরপেক্ষ হইয়া করিতে হয় এবং ইহার জন্য সাধনা আবশ্যক। রঙ সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং রঙের প্রভাবে ছবি অনেক সময় যেন দেহ ধরিয়া উঠে, কিন্তু শিল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি রঙের এই সহজ আকর্ষণে প্রলুব্ধ হন না, তাই কাঠ-খোদাই ছাপ যখন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে তখন তাহা বস্তু-নিরপেক্ষ বা abstract ভাবেই করিয়া থাকে ; সুতরাং এই আকর্ষণ প্রবলতর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। কাঠ-খোদাই শিল্পীর অন্য বিশেষ অসুবিধা এই যে, কাঠের উপর ছুরির সাহায্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়—কাগজের উপর পেন্সিল বা কাপড়ের উপর তুলির প্রয়োগের মতো তাহা সহজ নহে। প্রথমত কাঠ জিনিসটিই যথাসাধ্য বাধা দিয়া থাকে, তাছাড়া যন্ত্রগুলিও এমন নহে যাহাতে কাঠ-খোদাই-শিল্পী এচিং-শিল্পীর মতো সহজ স্বাধীনতা পাইতে পারে। বস্তুত, কাঠ-খোদাই-শিল্প শিল্পের 'আঙ্গিক' বা টেকনিকের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, শিল্পীকে আপন কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খোদাই কার্য চালাইতে হয়। শ্রেষ্ঠ কাঠ-খোদাই-শিল্পীরা কাঠের উপর পেন্সিল দিয়া খসড়া না আঁকিয়াই একেবারে ছুরি চালাইয়া থাকেন। মিঃ গর্ডন ক্রেগের কথায়—"অনেক শুনিলে আশ্চর্য হইবেন যে, কাষ্ঠফলকের আয়তন ইত্যাদিই আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বিশেষ বিশেষ ছবি খোদাই করিতে সাহায্য করে। কাষ্ঠফলককে সাদা কাগজ কল্পনা করিয়াই যদি আমাকে কাজ করিতে হয় তাহা হইলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।" কাঠ-খোদাই কার্যে যে ভয়ঙ্কর মানসিক নিয়মানুবর্তিতা (discipline) প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দু নম্বর

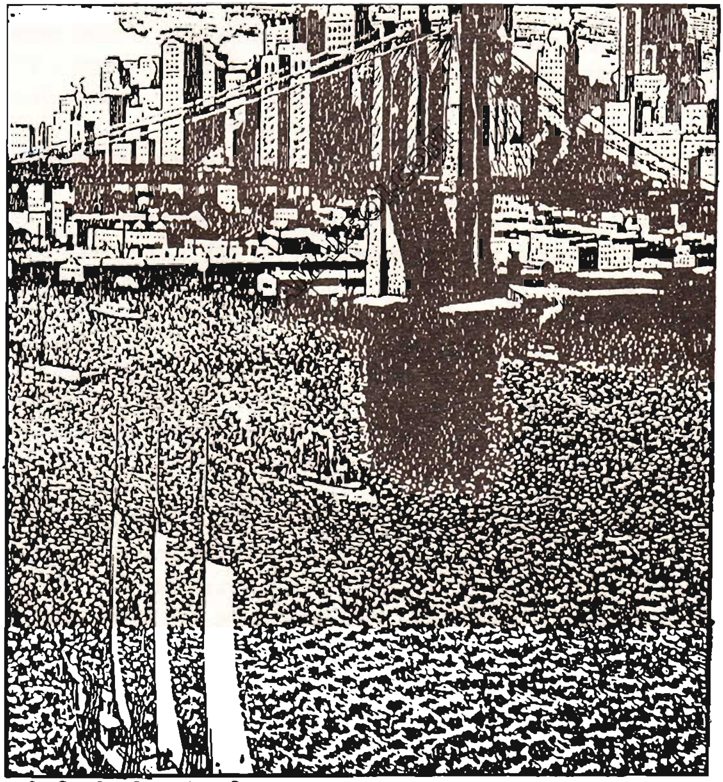

'ব্রুক্‌লিন ব্রীজ', পি. রুশিকা কর্তৃক খোদিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র।

এই সাদা রেখার কাজে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাঠ-খোদাই শিল্পী ক্রমে ক্রমে কালোর উপর সাদা জমি (spaces), কালো রেখা, কালো জমি, কালো ও সাদার সংমিশ্রণ, এবং বিন্দু ও রেখার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। কাহার পর কি প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা কঠিন। শিল্পীর কল্পনা ও কারু-ক্ষমতা দ্বারাই পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হার্মান পাউল একজন নিপুণ উচ্চ শ্রেণীর কাঠ-খোদাই শিল্পী—ইনি কালোর পাশে সাদা জমির বৈষম্য পরিস্ফুট করিয়া তাঁহার খসড়া (Design) গড়িয়া তোলেন। কিন্তু বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী গর্ডন ক্রেগ তাঁহার কাঠ-খোদাইয়ের আদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"আমি সাদা জমি ও কালো রেখা, দুটিকেই এমনভাবে ফুটাইয়া তুলি যে, সমগ্র ছবিখানি উগ্র ধূসর বর্ণে চিত্রিত মনে হয়।"

॥ ২ ॥

## শিল্পীর কল্পনা-শক্তির উপর উপকরণ বস্তুর প্রভাব

প্রত্যেক শিল্পীর সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁহার অনুসৃত বিশেষ শিল্পকলার যথাযথ ধারা বজায় রাখিয়া চলা। এই প্রাথমিক সূত্রটি ঠিক মতো আয়ত্ত হইলে শিল্পদীক্ষা-হীন লোকের অনেক অন্ধসংস্কার দূর হইত। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, কল্পনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিলেই শিল্প হয় না, শিল্প-সংক্রান্ত কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া না চলিলে শিল্পের অঙ্গহানি হয়। সাধারণ লোকের কাছে সেই ছবিই সবচেয়ে মূল্যবান্ যাহা দৃশ্যজগতের বস্তু বা বিষয়কে চোখে প্রত্যক্ষ দেখাইতে সক্ষম।

প্রত্যক্ষ বিশ্বে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন দিকের আয়তন প্রসার লইয়া প্রত্যেক বস্তু অবস্থিত ; ছবির কাগজের সমতল ভূমির উপর যখন সেই বস্তুই চিত্রিত হয় তখন তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ব্যতীত তৃতীয় দিকটি (dimension) লুপ্ত হয়। এখানেই শিল্পীর প্রথম অসুবিধা, কিন্তু নিপুণ শিল্পী অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া পারিপ্রেক্ষিক (perspective) ও ছায়ালোক রচনা করিয়া দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা এই তৃতীয় দিকের অভাবের বোধ দূর করেন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রে এই কৌশল চরম সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন এই চলচ্চিত্রের সহিত রঙীন ফোটোগ্রাফি ও গ্রামোফোন যুক্ত হইবে তখন শিল্পকলায় যাঁহারা আসলের নিখুঁত নকল সন্ধান করেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, দৃশ্য জগতকে প্রত্যক্ষগোচর করাইবার জন্য চিত্রশিল্পের মতো প্রাচীন ও অসম্পূর্ণ পন্থার অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই। চিত্রশিল্পের সমর্থনকারীদের পূর্বের মতো আবার বিশ্বাস করিতে হইবে যে, চিত্রশিল্প দৃশ্য-জগতের কোনও বস্তু বা বিষয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি নহে। রঙীন চিত্র অথবা খোদাই, রেখাচিত্র ইত্যাদি যে-কোনও চিত্রশিল্পই হউক না কেন ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য রঙ রেখা ইত্যাদির সমাবেশে একটি সুসমঞ্জস রূপোন্মেষশালী সুদৃশ্য চিত্র গড়িয়া তোলা ;—বাস্তব জগতের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ না থাকিতে পারে, চিত্রাঙ্কিত বস্তুর বাস্তব জগতে অস্তিত্ব না থাকাও অসম্ভব নহে। বস্তুত দর্পণে বা বাতায়নের ভিতর দিয়া আমরা বাস্তব জগতকে যেমন প্রত্যক্ষ করি ছবিতে সেরূপ করি না। সমতল জমির উপর রঙ ও রেখার আলঙ্কারিক সমাবেশে বা রূপোন্মেষিণী মূর্তির অঙ্কনে চিত্র প্রস্তুত হয়।

শিল্পীর কল্পনায় বাস্তবের যে ছাপ বা ইম্প্রেশন ছবি তাহারই প্রকাশ মাত্র ;—চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রশিল্প বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে ; সকল দিকেই সাধারণ কোনও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিতে যে কাঠ-খোদাই ছাপের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে বলি। রৌদ্রালোক ও ছায়ার যে অপূর্ব সমাবেশে ছবিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাষ্ঠফলকের প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পিত হইয়াছিল।

॥ ৩ ॥

## কাঠ-খোদাইকার্যে শিল্পসৃষ্টি

খোদাই বা এন্‌গ্রেভিং মাত্রই হয় অনুকরণ, নয় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। অনুকরণ খোদাই বলিতে কোনও একটি অঙ্কিত চিত্রকে আদর্শ করিয়া খোদাইয়ের বিশেষ পদ্ধতি (সাতটির মধ্যে একটি) অনুসরণ করিয়া খোদিত চিত্র বুঝায়। তেমনি কোনও কিছুকে আদর্শ না করিয়াই শিল্পী মন হইতে যাহা গড়িয়া তোলে তাহাকেই সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এই অর্থে আধুনিক অধিকাংশ কাঠ-খোদাই ছাপই শিল্পীর সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্বে কাঠ-খোদাই শিল্প 'শিল্প সৃষ্টি' পর্যায়ভুক্ত ছিল না। হস্তাঙ্কিত চিত্রের সস্তা অনুকরণ-স্বরূপ এগুলি বাজারে প্রচলিত ছিল। যাহারা অর্থাভাবে দামী ছবি কিনিতে

২নং চিত্র 'হরিণ', শ্রাগেনহাউজেন কর্তৃক খোদিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষম ছিল অথচ কুমারী মেরী প্রভৃতির ছবি ঘরে রাখিতে যাহাদের শখ হইত তাহারাই তখন এই সকল কাঠ-খোদাই-শিল্পীর (জার্মানীর) পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাহাদের সকল কাজই সাদা জমির উপর কালো রেখার সমাবেশে প্রস্তুত ; ইহাতে বুঝা যায় যে, পেন্সিল ড্রইংয়ের অনুকরণে এগুলি খোদিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ডূরেয়ের ও হোল্‌বাইন এই দুই জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কাঠ-খোদাই করিতে আরম্ভ করেন। তবে ইঁহারা স্বহস্তে খোদাই করিতেন, কিংবা আদর্শ চিত্র আঁকিয়া দিয়া অন্যের দ্বারা খোদাই করিয়া লইতেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহাদের ছাপের আঙ্গিক বা টেকনিক লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেগুলি হুবহু রেখা-খোদাই ছাপের অনুরূপ। তবে ইঁহারা উভয়েই যে, তাঁহাদের নামে প্রচলিত কাঠ-খোদাই ছাপগুলিতে শিল্পসৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের পর ইম্প্রেশনিস্ট দলের কয়েকজন শিল্পী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কাঠ-খোদাই-শিল্পের পুনরুদ্ধার করেন। জার্মানীতে মুন্‌ক্‌ ও ফ্রান্সে গোগ্যাঁ প্রথমে এই শিল্পের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারেন। ইহা যে উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্মশিল্প-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ইঁহারা তাহাই প্রচার করিতে থাকেন। একখণ্ড কাষ্ঠফলকের উপর আপন সুবিধা ও কল্পনা অনুযায়ী কোনও সূক্ষ্মভাব ফুটাইয়া তুলিবার অধিকার যে শিল্পীর আছে তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সেইদিন হইতে কাঠ-খোদাই-শিল্প যে যন্ত্রশিল্প বা অন্য ধরনের চিত্রের হীন অনুকরণ নহে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। যথার্থ শিল্পীর ও সাধকের হাতে এই কাঠ-খোদাই-শিল্প কি চমৎকার হইয়া উঠিতে পারে তাহা তাঁহাদের হাতের কাজ দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। এখানে আমরা কয়েকটিমাত্র নমুনার প্রতিকৃতি দিলাম। এই নূতন শিল্পের আসন ইয়োরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে বাঙালি শিল্পীর দৃষ্টি যদি এই দিকে আকর্ষিত হয় তাহা হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বাঙালি শিল্পীরা এই শিল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, এ-কথা অবশ্য আজকাল বলা চলে না।

শ্রীসজনীকান্ত দাস-এর সহিত যুগ্মভাবে লিখিত (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৪)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী

॥ ১ ॥

## গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের গোত্রবিচার

তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে চিত্র বা চিত্রকরের পরিচয় অনাবশ্যক। ছবি চোখে দেখিবার জিনিস ; চোখে ভাল লাগিলে দেখিব, ভাল না লাগিলে দেখিব না ; ব্যাপারটা সংক্ষেপে চুকিয়া গেল। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে না। প্রথমত, চোখকেও দেখিতে শিখাইতে হয়, অশিক্ষিতপটুত্বই যথেষ্ট নয়। ইহার উপর চোখের দুর্বলতা ছাড়া চরিত্রের দুর্বলতাও আছে। ছবির বা যে কোনও আর্টের নিদর্শনের মূল্যবিচার আমরা শুধু উহার নিজস্ব গুণাগুণ দিয়া করি না, জাতিকুলশীলের সংবাদ লই, বিদগ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার খোঁজ করি, এমন কি সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদারও হিসাব লইয়া থাকি। বৈষয়িক দিক হইতে আমাদের অপেক্ষা সব দিকে গণ্যমান্য ব্যক্তি একটা জিনিস দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন, উহাকে অনাদর করিবার সাহস কোন্ ইতরজনের হয় ? অমুকের ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, এই হৈম-লগুড়াঘাত কয়জন কাটাইয়া উঠিতে পারে ? তাই পরিচয়ের চাহিদা। আর্ট-ক্রিটিকের মতো বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে ইহা লাভেরই কথা। তাহার অস্তিত্বের, তাহার পেশার উচ্চতর সাফাই না থাকিলেও শুধু ইহারই জোরে সে কলিকা পাইয়া থাকে।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্র আমাদের কাছে দুইটি পরিচয় লইয়া উপস্থিত হইত, এবং এখনও সম্ভবত হয়। উহার একটি নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার তরফ হইতে, অপরটি নব্য পাশ্চাত্য 'কিউবিজম্' হইতে। দুটিই সমীহ উদ্রেক করিবার মতো পরিচয়পত্র। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা, যাহাকে ঘরোয়া কথায় 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির আসল মনের ভাব যাহাই হউক মুখের কথা আর অশ্রদ্ধাসূচক নয়। গেল বছর চল্লিশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি কায়েমী হইয়া বসিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষ উহাকে গ্রহণ করিয়াছে, চিত্রসমালোচকমাত্রেই উহার অবিশ্রাম প্রশংসা করিতেছেন। এমন কি সাহেবেরা পর্যন্ত উহার বাহবা দিতেছেন। প্রতিষ্ঠার এতগুলি লক্ষণ ও প্রমাণ যাহার পিছনে রহিয়াছে তাহাকে কে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে ? কিউবিজম্-এর সম্ভ্রম আরও বেশি। যাঁহারা পাশ্চাত্য চিত্রকলার একেবারে হালের খবর রাখেন না, তাঁহাদের ধারণা কিউবিজম্ একটা অত্যন্ত অভিনব ও ফ্যাশন-দোরস্ত জিনিস। একে ফ্যাশন, তার ওপর প্যারিসের ফ্যাশন, তাই কিউবিজম্-ও নমস্য।

এই দুই সুপারিশের জোরে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র সমাদর পাইয়া আসিয়াছে। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যকর, কারণ নব্যবঙ্গীয় চিত্র ও 'কিউবিস্ট' চিত্র, এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এত বেশি, শুধু পার্থক্য বলি কেন, দুটি এত বিপরীতধর্মী যে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পক্ষে একসঙ্গে দুই-এরই সুপারিশ পাওয়া ততটুকুই সম্ভব কোনও রাজনৈতিক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের পক্ষে সমবেতভাবে মুসলীম লীগ ও হিন্দু-মহাসভার অনুমোদন পাওয়া যতটুকু সম্ভব। যাহা আমাদের কাছে লাল ও বৃত্তাকার বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা একই সঙ্গে নীল ও চতুষ্কোণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। তেমনই গগনেন্দ্রনাথের চিত্র নব্যবঙ্গীয় হইলে উহা 'কিউবিস্ট'-ধর্মী হইতে পারে না। কিউবিস্ট-ধর্মী হইলে নব্যবঙ্গীয় হইতে পারে না। আসল কথা এই, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের আর যে গুণ বা লক্ষণই থাকুক না কেন, তাঁহার তরফ হইতে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা ও কিউবিজমের অযাচিত সুপারিশের কোনও মূল্য নাই। দুটিই অবান্তর। এ দুটির কোনটির সহিতই তাঁহার নাড়ীর যোগ নাই।

## গগনেন্দ্রনাথ ও নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা

গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের ভাই না হইলে, ঠাকুর-বংশীয় না হইলে, তাঁহার চিত্রগুলি বরাবরই নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে বিন্যস্ত না হইলে, এক কথায় নব্যবঙ্গীয় চিত্রের সহিত তাঁহার কয়েকটা কাকতালীয় সংযোগ না থাকিলে, কেহ তাঁহার চিত্রকে নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র অন্তর্ভুক্ত করিবার কল্পনাও করিত কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ এটাই আশ্চর্যের কথা নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার এত কাছে থাকিয়াও, নব্যবঙ্গীয় চিত্রের অনুপ্রেরণা যিনি জোগাইয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথের ও এই অনুপ্রেরণাকে যিনি চিত্ররূপ দিয়াছেন সেই অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সারাজীবন কাটাইয়াও, কি করিয়া গগনেন্দ্রনাথ নিজেকে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সম্পর্ক হইতে এতটা মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সহিত তাঁহার পার্থক্য বিবেচনা করিলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, তাঁহার সব ছবি এক ধরনের নয়। অঙ্কনরীতি, বিষয়বস্তু, চিত্রধর্ম, যেদিক হইতেই দেখা যাক না কেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীগুলি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, তাঁহার একার চিত্রে যতটা বৈচিত্র্য সমগ্র নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র মধ্যেও ততটা বৈচিত্র্য নাই। অবনীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যবঙ্গীয় 'স্কুলে'র হালের নবীন চিত্রকর পর্যন্ত সকলের কাজের মধ্যে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বেশ একটা আদল পাওয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের একশ্রেণীর চিত্র ও অন্য শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে ততটুকুও আদল নাই।

আরও আশ্চর্যের কথা, এই বহুমুখীনতা তিনি একই সঙ্গে বজায় রাখিয়াছেন। আধুনিক চিত্রকর এক ধরন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা ধরনে অতি সহজেই পৌঁছিতে পারেন তাহার সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত, পাব্লো পিকাসো। কিন্তু চিত্রধর্মের এই পরিবর্তন সাধারণত চিত্রকরের বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। উহা ধর্মান্তর গ্রহণের মতো, এক ধর্ম গ্রহণের পর কেহ আর পুরাতন ধর্মে ফিরিয়া যায় না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার ধরনগুলি একসঙ্গে চালাইয়াছেন, তথাকথিত রূপক চিত্রের সঙ্গে একই প্রদর্শনীতে একেবারে অন্য ধরনের পূর্ববঙ্গের দৃশ্য দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই যে বৈচিত্র্য ও বহুদেশদর্শিতা উহা নব্যবঙ্গীয় চিত্রে একেবারে বিরল।

দ্বিতীয়ত, কি বিষয়বস্তুতে কি অঙ্কনপদ্ধতিতে গগনেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় স্কুল হইতে একেবারে বিভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনী তিনি সাধারণত বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণবিন্যাস এবং রেখাপাতও সম্পূর্ণ নিজস্ব। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা যে 'প্যালেট' ব্যবহার করিয়াছেন, গগনেন্দ্রনাথ সেই 'প্যালেট' ব্যবহার করেন নাই। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরেরা নির্ভর করিয়াছেন প্রধানত রেখার উপর, গগনেন্দ্রনাথ নির্ভর করিয়াছেন 'ছোপে'র উপর। তাহা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া আলো-ছায়ার সংঘাত তাঁহার চিত্রে খুবই বেশি, যাহা সাধারণত নব্যবঙ্গীয় চিত্রে নাই-ই বলা চলে। জায়গায় জায়গায় আলো-ছায়ার সংঘাতের তীব্রতায় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর ইটালিয়ান চিত্রকর কারাভাদ্‌জোকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার এই তীব্রতাকে অত্যন্ত 'সেন্সেশ্যনাল', এমন কি কৃত্রিম বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, আলো-ছায়ার খেলা সম্বন্ধে গগনেন্দ্রনাথের এই যে অতিজাগ্রত অনুভূতি, উহাও নব্যবঙ্গীয় স্কুলে অবর্তমান।

সবচেয়ে বড় কথা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের যে কোনও শ্রেণীর কথাই ধরি না কেন, প্রত্যেকটিরই একটা বিশিষ্ট চিত্রধর্ম আছে। নব্যবঙ্গীয় স্কুল সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা অনেকটা নব্যবঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মতো, ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা বর্জিত। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা গোঁড়া গুরুবাদী। তাঁহারা ধর্ম কি জানিতে চাহেন না, কিন্তু মন্ত্র লইয়াছেন ; গন্তব্যস্থানের পরোয়া রাখেন না, পথের বাহ্যিক নির্দেশ লইয়াছেন। গুরু বলিয়া দিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে যাহা শহরের বহুদূর দিয়া বুড়ো শিবতলা, পদ্মদীঘি, দ্বাদশ দেউল, ভাঙা ঘাট ইত্যাদির পাশ ধরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাস্তব সম্পর্ক বর্জন করিয়া, রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি স্মরণ করিতে করিতে মোগল বা রাজপুত 'কলমে'র অনুকরণ করিতে হইবে, পুরাতন পট আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলে আরও ভাল।

আর একদল আছেন, যাঁহারা এত গোঁড়া নন, বরঞ্চ একটু বেশি উদার বা 'এক্লেক্টিক'ই বটেন। কিন্তু তাঁহারাও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন। তাঁহাদের ধরন দেখিয়া অনেক সময়ে অ্যালিসের সহিত চেশায়ার পুসের কথা কাটাকাটির কথা মনে পড়ে।

অ্যালিস জিজ্ঞাসা করিল—কোন রাস্তা ধরে যাওয়া উচিত আমায় অনুগ্রহ করে বলে দিন না ?

চেঃ পুঃ—তা নির্ভর করছে তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ তার ওপর।

অ্যাঃ—যেখানেই হোক না, বিশেষ কিছু এসে যায় না আমার।

চেঃ পুঃ—তা হলে যে কোনও রাস্তা ধর না কেন তাতেও কিছু এসে যাবে না।

অ্যাঃ—না, আমি বলছি কি কোনও একটা জায়গায় পৌঁছলেই হল।

চেঃ পুঃ—তা নিশ্চয়ই পৌঁছবে, শুধু যদি খানিকটা পথ হাঁটতে পার।

এইভাবে বহু নব্যবঙ্গীয় চিত্রকর ভারতীয়, চীনা, জাপানী, পারসীক, নানা বা যে কোনও একটা পথ ধরিয়া, বিশেষ কোনও জায়গায় পৌঁছিবার সংকল্প না রাখিয়াও একটা-না-একটা জায়গায় পৌঁছিবার আনন্দ পাইতেছেন।

গগনেন্দ্রনাথের পথচলা অন্য রকম। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার একটা লক্ষ্য লইয়া বাহির হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্ততপক্ষে তাঁহার চিত্রের ধর্মনির্ণয় খুব কঠিন কাজ নয়।

## গগনেন্দ্রনাথ ও কিউবিজম্‌

'কিউবিস্ট' চিত্রকলার সহিত গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের পার্থক্য আরও বেশি। প্রকৃতপ্রস্তাবে দুটি জিনিস বিপরীতধর্মী। গগনেন্দ্রনাথ 'কিউবিস্ট' চিত্রকর, এরকম একটা ভুয়ো কথা শিক্ষিতসমাজে প্রশ্রয় কি করিয়া পাইল তাহা একটা হেঁয়ালি। গগনেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে মতামত কি ছিল তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু আসল 'কিউবিস্ট'রা এই কথা শুনিলে যে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিউবিজম্‌


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্রজগতের একরোখা পাগলামি, উহাকে লইয়া অকারণ রহস্য করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। গগনেন্দ্রনাথ চতুষ্কোণ 'মোটিফ' ব্যবহার করিবার ইঙ্গিত কিউবিজম্ হইতে পাইয়াছেন, তাহা মানা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি 'কিউবিস্ট' চিত্রকর, এ-কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। তন্তু তাঁতিতেও বোনে মাকড়সাতেও বোনে, সেজন্য দুজনেই 'তন্তুবায়' নয়।

প্রথম আপত্তি, গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রে চতুষ্কোণ 'মোটিফ' যতটা ব্যবহার করিয়াছেন বৃত্তাংশ তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ব্যবহার করেন নাই। 'কিউবিস্টে'র কাছে কিউবই এক ও অদ্বিতীয়, কিউব ভিন্ন রূপ নাই। দৃশ্যজগতের যাবতীয় বস্তুকে চতুষ্কোণে অনুবাদ করিতে হইবে, এই সংকল্প লইয়াই কিউবিস্টরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দৃশ্যজগতে—অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্যের জগতে—বিশুদ্ধ সরলরেখা বা বিশুদ্ধ চতুষ্কোণ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, পক্ষান্তরে সব জিনিসই অল্পবিস্তর বৃত্তাংশ। এই অসমন্বয়ের সমন্বয় করিবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় 'কিউবিস্ট'রা দৃশ্যজগতের স্বাভাবিক রূপকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণের আসল তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য গণিত হইতে একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, কোনও গণিতজ্ঞের খেয়াল জন্মিল সব অখণ্ড সংখ্যাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে ফল অখণ্ড সংখ্যাই হইবে, অর্থাৎ ছয় বা নয়ের মধ্যে তিন যেমন যায় আট ও দশের মধ্যেও তিন তেমনই যায়, যদি কার্যত না যায়, তাহা হইলে যেখানে যত অবশিষ্ট থাকিবে, সব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে কারণ অঙ্কশাস্ত্রে তিনের 'মাল্টিপ্‌ল্' ভিন্ন সংখ্যা নাই। এই রকমের গোঁড়ামি গগনেন্দ্রনাথ কখনও দেখান নাই। তিনি জ্যামিতিক ডিজাইন অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুধু কিউবও অবলম্বন করেন নাই, সকল দৃশ্যরূপকে চতুষ্কোণ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টাও করেন নাই। এটা মনে রাখা উচিত।

ইহার উপরও আর একটা গুরুতর আপত্তি আছে। কিউবিজমের লক্ষ্য ও গগনেন্দ্রনাথের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিউবিজম্ ষোল আনা 'ফর্ম-বাদী' অর্থাৎ 'কিউবিস্ট' চিত্রকরেরা চিত্রে মানস আবেগের সামান্য একটু স্থান আছে বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন একেবারে নিভাঁজ দৃষ্টিগ্রাহ্য ডিজাইন তৈরি করিতে। ভাবে মনে হয়, তাঁহাদের মত এই যে চিত্রের ডিজাইন যত জ্যামিতি ও জড়ঘেঁষা হইবে ততই ভাল, কারণ তাহা হইলে বাস্তবজগতের প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের আশ্লেষ হইতে মানুষের মন যে আবেগ সঞ্চয় করে দ্রষ্টা চিত্রে তাহা খুঁজিবে না, শুধু জ্যামিতিক (আসলে জ্যামিতির একটিমাত্র রূপ অর্থাৎ চতুষ্কোণ রূপের প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট) সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'কিউবিস্ট' চিত্র দেখা দাবার ছক্‌কে চিত্র হিসাবে দেখার মতো সৌন্দর্যানুভূতি। কিন্তু মনে রাখিবেন এই নূতন রকম দাবার ছকে চালবেচালের উত্তেজনা নাই, উহা রাজা-মন্ত্রী গজ-নৌকাহীন হিমশীতল ডিজাইন মাত্র।[১]

পক্ষান্তরে গগনেন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিতে। সুন্দর ও নিখুঁত

১ বাস্তবানুকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জ্যামিতিক ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। গ্রিকোরোমান সভ্যতার শেষ পর্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে উহা দেখা গিয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দী হইতে এই আন্দোলন হেলেনিস্টিক আর্টের ন্যাচরালিজ্‌মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। যাহা কিছু স্বভাবানুকারী, মনুষ্য বা জীবদেহের অবিকল প্রতিচ্ছবি তাহাও তখন নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার ফলে পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার শিল্পে সুগঠিত মনুষ্য বা জীব মূর্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কে জানে, অতি-আধুনিক ইউরোপীয় আর্টের বাস্তববিরোধিতা রোমান সাম্রাজ্যের শেষযুগের বাস্তববিরোধিতার মতো একটা সংস্কৃতির (অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল ইউরোপীয় সভ্যতার) সায়ংকালের ছায়া কিনা?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিজাইন সৃষ্টি করিতে তিনি সুপটু, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি ডিজাইনেই পর্যবসিত নয়। ডিজাইন জ্যামিতিকই হউক কিংবা অন্য ধরনেরই হউক, চতুষ্কোণই হউক কিংবা বৃত্তাংশই হউক, গগনেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য স্বভাব-সম্পর্কবর্জিত নিভাঁজ 'কর্ম' সৃষ্টি নয়। তিনি ডিজাইনের দ্বারা নানা শ্রেণীর চিত্রে নানা ধরনের মানস অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, মানস আবেগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ডিজাইনকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। ফলে তাঁহার চিত্র দেখিয়া দ্রষ্টার মন কোনও ক্ষেত্রে কৌতূহলী হয়, কোনও ক্ষেত্রে বিচার ও বিতর্ক মুখীন হয়, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু পর্যাকুল হইয়া উঠে, যে পর্যাকুলতার কথা কালিদাস রাজার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।"

॥ ২ ॥

## চিত্রকলা ও বাস্তব

আমার বিশ্বাস এই ভাবপ্রবণতাই গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহার চিত্রাবলীর লক্ষণবিশ্লেষণ, স্টাইল ও পদ্ধতির আলোচনা, দোষগুণবিচার, ভাবকে মুখ্য প্রসঙ্গ করিয়া ও ভাবকে কেন্দ্র ধরিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু এই কথা বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে একেবারে গোড়াকার সূত্রই অস্ফুট থাকিয়া যাইবে। ভাবপ্রবণ চিত্র কি, অন্য ধরনের চিত্র হইতে উহার প্রভেদ কোথায়, ভাব বলিতে চিত্রকলায় ঠিক কোন জিনিসটা বোঝায়, চিত্রে ভাবের স্থান কি, ভাবেতর অন্য জিনিসেরই বা স্থান কি, চিত্রকলায় ভাব নানারকমের হইতে পারে কিনা, তাহা হইলে ভাবের শ্রেণীবিভাগই বা কি, চিত্রসমালোচনা করিতে নামিয়া এই সকল প্রশ্ন এড়াইবার উপায় নাই, অথচ উত্তর দেওয়া সহজ কাজ নয়। সকল কথা পরিষ্কার করিবার স্পর্ধা রাখি না, কিন্তু মোটের উপর যে প্রস্তাবের উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রবিচার খাড়া করিতে যাইতেছি, উহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

## একটি ফ্যাশনেবল্ থিওরি

চিত্রকলায় ভাবের অবলম্বন যাহা চিত্রকলার মুখ্য অবলম্বন তাহাই—অর্থাৎ বাস্তববস্তুর প্রতিচ্ছবি। স্বভাবানুকৃতিকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের রূপকে বর্ণে রেখায় অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্রকলা সম্ভব, এই কথাটা হালে পাশ্চাত্যে, সুতরাং পাশ্চাত্যের দেখাদেখি আমাদের দেশেও, চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভদ্রতার খেলাপ করিয়াও বলিতে হইবে—এই ফ্যাশনেবল্ থিওরিটি নির্জলা ধাপ্পাবাজী। এই ফ্যাশনেবল্ থিওরিটি মানিয়া লইলে আর দুইটি প্রস্তাবও বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইতে হইবে। সে দুটি এই—(১) নকশা বা অলংকারই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ; (২) পুরাতন প্রস্তরযুগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা চিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে তাহা মোটেই চিত্র নয়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবানুকারিতা বা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি যদি চিত্রে নিষ্প্রয়োজন বা দূষণীয় হয় তাহা হইলে শাল কিংখাব বিদ্রির কাজ, মন্দির মসজিদে ও মকবরার দেওয়ালের কারুকার্য, চীনামাটির উপর রঙ ও রেখার অদ্ভুত খেলা, এই সকলকে চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে বাধা কি ? মোগল ছবির ছবিটুকু বাদ দিয়া হাঁসিয়াটুকু লইয়া মাতামাতি করিবার বিপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে ? বাস্তব বস্তুর বিকৃত বা অবিকৃত প্রতিচ্ছবির সহায়তায় চিত্রকর যত সুন্দর 'কম্পোজিশ্যন'ই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা কি কখনও বিশুদ্ধ অলংকার বা কারুকার্য হিসাবে পূর্বোক্ত জিনিসগুলির সমান হইয়াছে, না হইতে পারে ? অথচ কোনও যুগে কেহই কারুকার্যকে চিত্র বলিয়া স্বীকার করে নাই, কারুকার্য শত মনোরম হইলেও উহাকে চিত্রের সম্মান দেয় নাই। বিশুদ্ধ অলংকার সর্বদাই অন্য বড় কোনও সৃষ্টির মণ্ডন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে আসল চিত্র ও ভাস্কর্যের নীচে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া শুধু এইকুটু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মামুলি চিত্রকলাতেও 'কম্পোজিশ্যন' বলিতে যাহা বুঝায় তাহারও নামগন্ধ অজন্তার বড় চিত্রগুলিতে নাই। এগুলি ফঁ দ্য গোম বা আলতামিরার গুহাগাত্রে প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানবের দ্বারা চিত্রিত বাইসন, অতিকায় হস্তী প্রভৃতির ছবির মতোই যথাতথা বিন্যস্ত। তাই বলিয়া কি অজন্তার ছবি চিত্রকলার নিদর্শন নয় ?

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, আধুনিক আর্ট-ক্রিটিকরা পুরাতন চিত্রকলার নূতন তাৎপর্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা পুরাতন চিত্রকে বিশুদ্ধ ডিজাইন হিসাবে, 'সিগ্‌নিফিক্যান্ট ফর্ম' বা 'অর্থপূর্ণ রূপ' হিসাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইঁহাদের মতে চিত্রে বিষয়বস্তুর স্থান নাই, উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় স্থানগত সম্পর্ক' (স্প্যাশিয়াল রিলেশ্যন্‌স্)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"এক ধরনের চিত্র থাকা সম্ভব যাহার উদ্দেশ্য নিছক 'অর্থপূর্ণ রূপ', যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে স্থানগত সম্পর্ক ও রঙ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু 'অর্থপূর্ণ রূপ' কোন না কোন জিনিসের অর্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই করে। এমন কি সঙ্গীত যে সকল আর্টের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বস্তুগন্ধহীন, যে সঙ্গীতের সহিত এই নবীনপন্থীরা চিত্রকলাকে লীন করিতে চান, হান্‌স্‌লীকের সুবিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী সেই সঙ্গীতেরও বিষয় গতির ধারণা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'কিসের রূপ', 'কিসের অর্থ' এই দুইটি প্রশ্ন চিত্রকলা কি করিয়া এড়াইতে পারে তাহা বোঝা কঠিন।" (স্যামুয়েল আলেকজান্ডার—"আর্ট অ্যান্ড ইন্‌স্টিন্‌ক্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ, "ফিলসফিক্যাল অ্যান্ড আদার পীসেজ," ২৫৫ পৃঃ)

## পাশ্চাত্য চিত্রকরদের সাক্ষ্য

কিন্তু আধুনিক দার্শনিকের কথা বাদ দিলেও চিত্রকলার বিষয়বস্তু বর্জিত ব্যাখ্যার জড় বড় বড় চিত্রসমালোচক ও চিত্রকরেরাই মারিয়া রাখিয়াছেন। চিত্রকলা বাস্তব বা স্বভাবের অনুকরণের উপরই যে প্রতিষ্ঠিত এই কথাটা লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁহার সুবিখ্যাত নোটবুকের বহু স্থলে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এখানে তাঁহার দুই একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি ও চিত্রকরের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,

"আকৃতি, কর্ম ও দৃশ্যকে কাব্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা করে, চিত্রকর এই সকল দৃশ্যবস্তুকে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরাবির্ভূত করিবার উদ্দেশ্যে উহার অবিকল প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত করে। মানুষের পক্ষে কোন্ জিনিসটা বেশি আবশ্যক—মনুষ্যনাম না মনুষ্যমূর্তি, তাহা বিবেচনা কর। দেশ পরিবর্তনের সঙ্গে নাম পরিবর্তন হয়; কিন্তু এক মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায়ে রূপ পরিবর্তিত হয় না।" (ম্যাক্‌কাডি সম্পাদিত ইংরেজি সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)

একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন,

"চিত্রকলা প্রকৃতির চক্ষুগোচর সকল সৃষ্টির একমাত্র অনুকরণকারী।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২২৯ পৃঃ)

ইহার অপেক্ষাও সাংঘাতিক একটা কথা লেওনার্দো বলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মতে "দর্পণই চিত্রকরদের গুরু!" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৫৪ পৃঃ)

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"যুগে যুগে চিত্রকলার পতন ও অধোগতি হইয়াছে তখনই যখন চিত্রকরেরা পূর্ববর্তী চিত্রকরদের চিত্র ভিন্ন অন্য আদর্শ পায় নাই। অন্যের সৃষ্টিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিত্রকর যে চিত্র সৃষ্টি করিবে উহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর হইবে কিন্তু সে যদি স্বাভাবিক বস্তু হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা করে তাহা হইলে সুফল লাভ করিবে।"

ইহার পর রোমান আর্ট ও জোত্তোর দৃষ্টান্ত দিয়া লেওনার্দো আবার বলিতেছেন,

"তাঁহার [অর্থাৎ জোত্তোর] পরও চিত্রকলার আবার অবনতি হয়, এবং ফ্লোরেন্সবাসী তম্মাসো যাঁহার জনপ্রচলিত নাম মাসাচ্চো, তাঁহার কাল পর্যন্ত শত শত বৎসর ধরিয়া এই অবনতি চলিতে থাকে। মাসাচ্চো তাঁহার চিত্রের উৎকর্ষের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সকল চিত্রগুরুর শ্রেষ্ঠ গুরু প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোনও আদর্শ যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা বৃথা শ্রম করিতেছেন।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৭৬ পৃঃ)

এই উক্তির মধ্যে নব্যভারতীয় চিত্রকলার জন্য কি কোনও নির্দেশ নাই? লেওনার্দো চিত্রকর হিসাবে যাহা বলিয়াছেন জর্জো ভাজারি চিত্রকর ও চিত্রকলার ইতিহাস লেখক হিসাবে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লেওনার্দোর সুবিখ্যাত 'মোনা লিজা' সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,

"চিত্রকলা কত অবিকলভাবে স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে তাহা যদি কেহ দেখিতে চায় তাহা হইলে এই মাথাটি হইতে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে, কারণ অঙ্কন-কৌশলের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সেই সবটুকু সূক্ষ্মতাই ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে। দেখ, জীবন্ত মানুষে যাহা দেখা যায় এই চোখেও সেই জ্যোতি ও তারল্য, আর চক্ষুর চারিদিকে সেই গোলাপ ও মুক্তার বর্ণ, আরও দেখ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত আঁকা পক্ষ্মযুগ্ম।"

তারপর ভ্রূ, নাসা, মুখ ও ওষ্ঠাধরের স্বাভাবিকতার প্রশংসা করিয়া ভাজারি বলিতেছেন,

"গলদেশের নিম্নাংশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মনে হইবে যেন ধমনীর স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি।" (ডি. ভিয়ার কর্তৃক অনূদিত ও লী-ওয়ার্নার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড ১০০-১০১ পৃঃ)

## প্রাচ্য ধারণা

কেহ এ-কথা বলিতে পারিবেন না যে, চিত্রে বাস্তবানুকারিতা ও স্বাভাবিকতার এই প্রশংসা শুধু পাশ্চাত্য চিত্রকলা ও চিত্রসমালোচনারই লক্ষণ, প্রাচ্যে উহা নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাচ্যে এই ব্যাপারটা আরও বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য, ইতিহাস


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কলাসমালোচনা হইতে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, চিত্রকলায় প্রাচ্য দেশেও সকলেই স্বভাবানুকারিতা এবং বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়াছে। 'আদর্শ' বা 'ভাব' বলিয়া যে ধোঁয়াটে জিনিসটা আধুনিক লেখকরা প্রাচ্য আর্টের উপর চাপাইতে চাহিতেছেন উহার আসল অস্তিত্বই নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় চিত্রের কথাই প্রথমে ধরা যাক।

ভাজারি 'মোনা লিজা' চিত্রের যে ধরনের প্রশংসা করিয়াছেন, শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বিদূষককে দিয়া কালিদাস কি শকুন্তলাচিত্রের বা চিত্রগতা শকুন্তলার (দুই-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য কবি করেন নাই) ঠিক সেই ধরনের প্রশংসা করান নাই? বিদূষক বলিতেছে,

> "সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি এব মে দৃষ্টিনিম্নোন্নত প্রদেশেষু।[২] কিং বহুনা সত্ত্বানুপ্রবেশশঙ্কয়া আলপন কৌতূহলং মে জনয়তি।" (বুঝিবার সুবিধার জন্য মূল প্রাকৃত না দিয়া বিদূষকের উক্তির সংস্কৃত ভাষান্তর উদ্ধৃত করিলাম।)

ইহার কিছু পরে বিদূষক আবার বলিতেছে,

> "ভোঃ কিং নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়শোভিনা অগ্রহস্তেন মুখমাবার্য্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। (সাবধানং নিরূপ্য) আঃ এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরস্তত্রভবত্যা বদনকমলমভিলঙ্ঘতে মধুকরঃ।"

রাজাও উত্তর দিয়া বসিলেন,

"ননু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ।"

শুধু একটি নয়, চিত্র বাস্তবেরই ভ্রম—এই ধারণা সূচনা করে এরূপ বহু প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করা যায়। নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, কর্পূরমঞ্জরী ও অন্যত্র চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বত্রই চিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ও মনোভাব এক—চিত্র বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি। চিত্রসংক্রান্ত বিধিনির্দেশও এই একই কথা। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রে বলা হইয়াছে, চিত্রের আটটি গুণের মধ্যে একটি গুণ—'সাদৃশ্য'। আরও সবিস্তারে বলা হইতেছে—

> "শূন্যদৃষ্টিং চেতনারহিতং বা স্যাত্তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম," "হসতীব চ মাধুর্য্যং সজীব ইব দৃশ্যতে।"

আরও পরিষ্কার কথা—

> "সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১৯-২২ শ্লোক)

ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের ব্যাপার স্বভাবানুকৃতি সম্বন্ধে চীনা চিত্রকরদের মনোভাব। প্রাচ্য চিত্রকলার মধ্যে চীনা চিত্রকলাই বেশি 'ভাব'-ঘেঁষা। এমন কি একজন চীনা চিত্রকর (নি-জান, চতুর্দশ শতাব্দী, য়ুয়ান যুগ) বলিয়াছেন,

"আমি যাহাকে চিত্র বলি তাহা তুলির অযত্নকৃত খেয়াল ছাড়া কিছু নয়, সাদৃশ্য উহার

২ 'নিম্নোন্নত প্রদেশে'র উল্লেখ শকুন্তলার অঙ্গলাবণ্যের প্রতি বিদূষকসুলভ শ্লেষ নয়, রাজার চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা বলিয়া মনে হয়। 'নিম্নোন্নত' কথাটি সম্ভবত পারিভাষিক। বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণের চিত্রসূত্রেও উহা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে 'নিম্নোন্নত বিভাগং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।" (৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) এই কথার অর্থ কি 'প্ল্যাস্টিসিটি' বা 'রিলীফ' হইতে পারে না? উচ্চতানীচতা বা বস্তুর তিন ডাইমেনশ্যন দেখানই চিত্রকলার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। বিদূষক সম্ভবত বলিতে চাহিতেছে রাজা উহাতে খুব কৃতকার্য হইয়াছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্য নয়, উহার উদ্দেশ্য চিত্রকরের চিত্তবিনোদন।" (আর্থার ওয়েলী, "অ্যান্ ইন্‌ট্রোডাকশ্যন টু দি স্টাডি অফ চাইনিজ পেন্টিং", ২৪৩ পৃঃ)

এই চীনারাও বাস্তবানুকরণকে চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শিয়ে হো (পঞ্চম শতাব্দী, "ছয়-বংশ" যুগ)—যিনি চিত্রকলার ষড়ধর্মের প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত—তাঁহার ষড়ধর্মের বেশির ভাগই স্বভাবের অনুকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে ওয়েলী বলিতেছেন,

"প্রথম ধর্মটি না থাকিলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতাম শিয়ে হো'র আদর্শ সবর্ণ ফটোগ্রাফির আদর্শ।" (উপরোক্ত পুস্তক, ৭৩ পৃঃ)

শুধু একটি ধর্মে তিনি 'ভাব-সামঞ্জস্য' ও 'জীবন্ত গতি'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা সুনিশ্চিত নন।

আর একজন 'ভাব'-প্রধান চীনা চিত্রকরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া চীনা নজীর সমাপ্ত করিব। ইনি ওয়াং-লি (চতুর্দশ শতাব্দী)। ওয়াং-লি বলিতেছেন,

"যদিও চিত্রকলা আকৃতির প্রতিচ্ছবি তবু 'ভাব'ই (অর্থাৎ চিত্রিত বস্তুর 'ভাব') উহাতে প্রাধান্য পায়। ভাবকে অবহেলা করিলে, শুধু প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টির সার্থকতা নাই। কিন্তু এই 'ভাব' আকৃতির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায় এবং আকৃতি ভিন্ন প্রকাশ্য নয়। আকৃতির প্রতিচ্ছবি-সৃষ্টিতে সাহায্য লাভ যে করিয়াছে সে দেখিবে ভাব আসিয়া এই আকৃতিকে পূর্ণ করিবে। কিন্তু আকৃতির প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করিতে যে অক্ষম সে দেখিবে শুধু ভাবই নয়, সবই গিয়াছে।"

ইনিও লেওনার্দোর মতো চিত্রকরকে প্রাকৃতিক বস্তু দেখিতে ও প্রকৃতি হইতে আঁকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সহিত লেওনার্দোর উপদেশের সাদৃশ্য কতটুকু দেখুন। তিনি বলিতেছেন,

"কেহ যখন কোন জিনিস আঁকিতে আরম্ভ করে তখন সে চায় বস্তুটার সহিত তাহার চিত্রের সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু জিনিসটার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ও যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া উহা সম্ভব হইতে পারে? পুরাতন চিত্রগুরুরা কি অন্ধকারে হাতড়াইয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন? এই যে লোকগুলি নকল করিয়া সময় কাটায়, নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাহাদের অনেকেরই পরিচয় শুধু অন্যের ছবির ভিতর দিয়া, উহারা ইহার অপেক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয় না। প্রত্যেকটি নকলেই সত্য আরও দূরে সরিয়া পড়ে। ক্রমশ আকৃতি নষ্ট হয়, আকৃতির বিলোপের পর ভাবের অস্তিত্বও সম্ভব নয়।

"এক কথায় বলিব, হুয়া পর্বতের আকৃতি না জানা পর্যন্ত আমি কি করিয়া উহার ছবি আঁকিতাম? উহাকে দেখিবার এবং বাস্তব হইতে উহাকে আঁকিবার পরও উহার 'ভাব' অপরিণত ছিল। পরে আমার গৃহে নির্জনে বসিয়া উহার ধ্যান করিতে লাগিলাম; বাহিরে বেড়াইবার সময়েও তাহাই করিতাম; শয়নে, ভোজনে, সঙ্গীত শুনিবার সময়ে, কথাবার্তা ও রচনার অবকাশেও তাহাই করিতাম। একদিন বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় শুনিলাম বাঁশি ও মৃদঙ্গ বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। পাগলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম, 'পাইয়াছি।' তারপর পুরাতন খসড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আঁকিলাম। এবারে একমাত্র হুয়া পর্বতই আমার পথনির্দেশক। 'স্কুল' ও 'স্টাইলে'র যে ভাবনা সাধারণত চিত্রকরের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে আমি তাহার কথা চিন্তাও করিলাম না।" (উপরোক্ত পুস্তক, ২৪৫ পৃঃ)


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াং-লি'র এই উক্তি পড়িবার সময়ে প্রণিধান করিতে হইবে তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, চিত্রের আকৃতি ও 'ভাব' দুই-এরই প্রেরণা মূল প্রাকৃতিক বস্তু হইতে আসে।

চীনাদের পর মুসলমান চিত্রকরদের বহু নজীর দিতে পারিতাম। স্থানাভাবে ও বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পারস্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বিহ্‌জাদের যশের একটি কারণ ইহাই যে, তাঁর তুলিকাস্পর্শে জড় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

## চিত্রের প্রধান অবলম্বন

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে কোথাও চিত্রকর, চিত্রসমালোচক, ও চিত্রের সমঝদারদের মধ্যে এই ধারণা কখনও ছিল না যে, স্বভাবানুকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি বাদ দিয়া ছবি আঁকা যাইতে পারে—বা, এমন কি, দেখা পর্যন্ত যাইতে পারে। সুতরাং বাস্তবের অনুকরণই যে চিত্রের প্রধান অবলম্বন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিচ্ছবি-বর্জিত চিত্র শুধু যে ডেনমার্কের যুবরাজ-বর্জিত হ্যামলেট নাটক তাহাই নয়, সকল পাত্রপাত্রী বর্জিত নাটক। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে উহা চিত্রই নয়—কারুকার্য হইতে পারে, কিন্তু কারুকার্য হিসাবেও আসল কারুকার্য যাহাকে বলে তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন, চিত্রকলা ফোটোগ্রাফি নয়। কথাটা অনাবশ্যক, অবান্তর, এমন কি অর্থহীন। কাব্য উপন্যাস সমালোচনা করিতে গিয়া কি আমরা কখনও বলি, কাব্য ইতিহাস নয়, উপন্যাস খবরের কাগজ নয়? সাহিত্যবোধযুক্ত ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্ন উঠেই না। বাস্তব জীবনের উপাদান ও কাব্য উপন্যাসের উপাদান যে একই জিনিস এ-কথা সে সহজভাবে মানিয়া লয়, নিরর্থক তর্ক করে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে এক স্থাপত্য ও সঙ্গীত ছাড়া[৩] সব আর্টই বাস্তব জীবনের এক বা অন্য উপাদানের অনুকরণ। চিত্রকলাও তাহাই, বরঞ্চ সাহিত্য অপেক্ষাও চিত্রের ক্ষেত্রে কথাটা বেশি সত্য। বাস্তব জীবনের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানই চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র উপজীব্য।

॥৩॥

## আর্টে সৃষ্টি

বাস্তবানুকারিতা চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন হইলেও চিত্রকলা শুধু বাস্তবানুকারিতাতেই পর্যবসিত নয়।[৪] বাস্তবের প্রতিচ্ছবি উহার আশ্রয় বটে, কিন্তু চিত্রকলাতে প্রতিচ্ছবি বা

৩ সঙ্গীতেও বাস্তব জীবনের অনুকরণ যে নাই তাহা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেটোভেনের ষষ্ঠ সিম্‌ফনিতে নদীর কলকল মেঘের গর্জন ও পাখির ডাকের অনুকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সিম্‌ফনিটির দ্বিতীয় মুভমেন্টে ফ্লুটে বুলবুলের, ওবায়ে তিত্তিরের ও ক্ল্যারিনেটে কোকিলের ডাকের অনুকরণ হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত এবং স্থাপত্য মূলত একেবারে বাস্তব গন্ধহীন বা 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট' আর্ট। বেটোভেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, ষষ্ঠ সিম্‌ফনিতে পাখির ডাকের অনুকরণ তামাশামাত্র।

৪ এই সূত্রে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল মনে করি। চিত্রকলার প্রধান অবলম্বন বাস্তবের অনুকরণ বলিলাম বটে, কিন্তু অনুকরণ ব্যাপারটা সাধারণ লোকে যত সহজ বলিয়া মনে করে চিত্রকরের কাছে তত সহজ নয়, সাধারণে যত সহজবোধ্য মনে করে দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিকের কাছে তত সহজবোধ্যও নয়। প্রথমত, বাস্তবের অনুভূতি বা জ্ঞান নানা জনের নানাপ্রকার। দ্বিতীয়ত, বাস্তবকে নানা উপায়ে অনুকরণ করা যাইতে পারে, তৃতীয়ত, সমগ্র বা অখণ্ড বাস্তবকে চিত্রে অর্পণ করা সম্ভব নয়, নানা দেশে নানা জনে বাস্তবের নানা অংশ বাছিয়া লইয়া থাকে; চতুর্থত, চিত্রে বাস্তবকে অনুকরণ করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে চিত্র বাস্তবানুকারী হইয়াও নানা রকমের হইতে পারে, এমন কি সাধারণের চক্ষে অবাস্তব বলিয়াই মনে হইতে পারে। এই বড় প্রশ্নের আলোচনা গগনেন্দ্রনাথের সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু জিনিসটার জটিলতা ও সূক্ষ্মতার কিছু ধারণা যাঁহারা করিতে চান তাঁহারা হাইনরিশ ভোয়েল্‌ফলিন প্রণীত "প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ আর্ট হিস্টরি" পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুকৃতির উপর আরও কিছু আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন উপাদান জোগায় চিত্রকরের মন। এদিক হইতে কবিতা বা উপন্যাসের সহিত চিত্রকলার কোনও প্রভেদ নাই। তিনটি আর্টই বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনটিই বাস্তবাতিরিক্ত কিছু, বাস্তবের রূপান্তর—সুতরাং সৃষ্টি।

## নূতন ইমার্জেন্ট

চিত্রকলা যে সৃষ্টি, তাহা দুইটি চিত্রবিরোধী মত হইতে যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য কোথাও এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আমি দেখি নাই। দুটি মতই উদ্ধৃত করিব। বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ধর্মসাধক-লেখক প্যাস্কাল চিত্রকলার প্রতি বিমুখ ছিলেন, অন্ততপক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লিখিবার সময়ে তাঁহার বিরাগ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন,

> "কি অসার মোহ চিত্রকলা! যে জিনিসকে মূলে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই না, সেই জিনিসের সহিত সাদৃশ্যের বলে সে আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে!" ('লে গ্রাঁজেক্রিভেঁ দ্য লা ফ্রাঁন্স', গ্রন্থমালা সংস্করণে প্যাস্কালের গ্রন্থাবলী, ১৩শ খণ্ড, ৫০ পৃঃ)

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে চিত্রকলা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ, তাহার সংবাদ লইলে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকারদের দ্বারা নরকবাসী-দণ্ডে দণ্ডিত চিত্রকরও সান্ত্বনা পাইবে। পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেয় বলিয়া নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টির স্পর্ধিত অনুকরণ করিতে যায় বলিয়াই মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে চিত্রকর মহাপাপী। চিত্রকর ঈশ্বরের শত্রু। বুখারী-কৃত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক হদিস সংগ্রহে আছে—

> "আল্লাহ্ বলেন, আমার সৃষ্টির মতো সৃজন করিতে যায় যে ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হইতে পারে?" (অল-বুখারী সংকলিত শাহী বুখারীর যুইনবল-কৃত সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১০৪ পৃঃ ৯০ নং)

তারপর আরও কথা আছে। বুখারী-কৃত আর একটি হদিস এইরূপ,

> "ছবি অঙ্কন করে যাহারা, কেয়ামতের দিনে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে জীবন দান কর'।" (উপরোক্ত পুস্তক, ১০৬ পৃঃ ৯৭ নং)

কিন্তু চিত্রকর তাহা পারিবে না ও উদ্ধত স্পর্ধার জন্য দণ্ডিত হইবে।

চিত্রকরকে মুসলমান সমাজ সৃষ্টিকর হইবার স্পর্ধায় স্পর্ধিত বলিয়া যে মনে করে তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। আরবি ভাষায় চিত্রকরের প্রতিশব্দ "মুস্বব্বির"—অর্থাৎ "যে গঠন করে বা আকৃতি দেয়।" এই শব্দটি কোরানে স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তিনি ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকর্তা, গঠনকারী।" (কোরান, ৫৯ সুরা ২৪ আয়ৎ)

প্যাস্কাল ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকার চিত্রকলার যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, উহার অপেক্ষা উচ্চ সার্টিফিকেট পাইবার ভরসা কোন্ চিত্রকর রাখে?

আর্ট যে সৃষ্টি মোটের উপর দার্শনিকরা তাহা মানিয়াই লইয়াছেন। যদিও আর্টকে বিশ্বসৃষ্টির অবিকল প্রতিরূপ মনে করা ভুল হইবে, আর আর্টিস্ট কর্তৃক আর্ট সৃষ্টিকে ভগবান বা ঐ প্রকার কোনও অনৈসর্গিক শক্তি কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির সমর্থক যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা আরও ভুল হইবে, তবু মোটা কথায় বলা যাইতে পারে, বিশ্বসৃষ্টি যে 'প্রোসেস্' আর্টকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় অথবা সেই প্রোসেস্' হইতে উদ্ভূত বলিয়া মানা যায়। এই প্রসঙ্গে আলেকজান্ডারের একটি কথা আমার নিকট অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান বলিয়া

মনে হইয়াছে। তিনি বলেন,

> দেশ-কালের (স্পেস-টাইমে'র) সৃষ্টিপ্রেরণা ('নিসাস্') বিশ্বের নানাস্তরের ও নানাধরনের যে-সব অস্তিত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আর্ট সেই সৃষ্টিরই একটা ফল, জীবনের উচ্চতম রূপ বলিয়া যাহা আমাদের নিকট জ্ঞাত আর্ট উহারই একটা 'ঘটনা'। ("আর্টিস্টিক ক্রিয়েশ্যান অ্যান্ড কস্‌মিক ক্রিয়েশ্যান" শীর্ষক প্রবন্ধ, আলেকজান্ডার প্রণীত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত পুস্তক, ২৭৮ পৃঃ)

অধ্যাপক ল্যয়ড মরগ্যানের কথায় বলা যাইতে পারে আর্ট একটা নূতন "ইমার্জেন্ট"—বা আবির্ভাব।

আর্ট সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু কি সৃষ্টি ? এটাই সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন। সাধারণ লোকে যখন ছবি দেখে এই জিনিসটাই তাহার কাছে সবচেয়ে ঝাপসা ঠেকে। ছবি দেখিয়া উহারা যে সকল মন্তব্য করে তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, একটা ভাষা তাহাদের কানে যাইতেছে বটে, কিন্তু সে ভাষা তাহাদের অজানা। স্বভাবতই উহারা জানা ভাষার সাহায্যে অজানা ভাষার অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আর্টের ভাষায় ও তাহাদের জানা ভাষায় গুরুতর প্রভেদ থাকায় উহাদের কৃত অর্থ অনেক সময়ে চিত্রের আসল অর্থের বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। কি সাধারণভাবে চিত্রের অর্থ বুঝিবার জন্য, কি গগনেন্দ্রনাথের চিত্র বুঝিবার জন্য, এই প্রশ্নটার একটা পরিষ্কার উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

## চিত্র ডিজাইন নয়

www.amarboi.com

চিত্রকরের সৃষ্টি ডিজাইন মাত্র নয় তাহা একরকম জোর করিয়াই বলা চলে। শুধু ছন্দ যেমন কবিতা নয়, শুধু তাল যেমন সঙ্গীত নয়, শুধু স্টাইল যেমন উপন্যাস নয়, তেমনই শুধু ডিজাইনও চিত্র নয়, তা সে ডিজাইন যাহারই আঁকা হউক না কেন। ডিজাইন বা অলংকারজাতীয় বস্তু যত মনোরমই হউক না কেন, তাহা কখনও আমাদের মনকে চিত্রের মতো জোরে ঘা দেয় না, আমাদের সমস্ত সত্তাকে সে রকম উদ্বেলিত এবং আলোড়িত করিয়াও তুলে না। এই ধরনের মানসিক উত্তেজনার জন্য বাস্তবের প্রতিচ্ছবির আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা সত্য, দুই ডাইমেন্‌শ্যানে আবদ্ধ ডিজাইনের তুলনায় মনকে আকৃষ্ট ও বিচলিত করিবার শক্তি তিন ডাইমেনশ্যন্ যুক্ত ডিজাইনের বেশি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ-কথা বলিবার উপায় নাই যে, তিন ডাইমেনশ্যন্ যুক্ত ডিজাইনও মানুষের মনকে চিত্রের মতো আলোড়িত করিতে পারে। তাহার জন্য ডিজাইনের সহিত বাস্তবের প্রতিচ্ছবি যোগের আবশ্যক। দুই-এর সংযোগ, কাব্যে ধ্বনি, অর্থ, ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সংযোগের মতো মানুষের মনের মধ্যে একটা বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। এই রসায়নের সূত্র এখন বাহির হয় নাই, কিন্তু চিত্র যে বিষয়সাপেক্ষ, শুধু ডিজাইন নয় তাহা সুনিশ্চিত।

প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্রের ডিজাইনের বিচার সমগ্র চিত্রের বিচার নয়। অবশ্য ডিজাইনের বিচার করিতে বাধা নাই, যেমন বাধা নাই কবিতার ছন্দের বিচার করিতে। আমরা তো কবিতার ব্যাকরণ লইয়াও আলোচনা করি। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক চিত্রের ডিজাইনের বিচার শুধু উহার অংশবিশেষের বিচার।

এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে, 'ডিজাইন' সৃষ্টি চিত্রাঙ্কনের লক্ষ্য নয়, উহা উপায় মাত্র। কবিতায় কবির 'বক্তব্য' ছন্দের সাহায্যে তীব্রতর হইয়া উঠে। ছন্দের জন্য কবিতা মানুষের মনকে অপেক্ষাকৃত সহজে অভিভূত করিতে পারে। ছন্দ না থাকিলে শ্রোতার চিত্তে প্রবেশলাভ কবির পক্ষে আরও দুরূহ হইত। তেমনি চিত্রকরের 'বক্তব্য'—অর্থাৎ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপপাদ্য ডিজাইনের সহায়তায় আমাদের মনে আরও সহজে প্রবেশ করে, এবং আমাদিগকে আরও বেশি অভিভূত করে। অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, ডিজাইন চিত্রের বহির্ভূত বস্তু, নিঃসম্পর্কিত সহায়কমাত্র। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মিলন ভিন্ন দাম্পত্যজীবন নাই, ছাদ ভিত্তি দেয়ালের যোগাযোগ ভিন্ন গৃহ নাই, তেমনই ডিজাইন ও বিষয়বস্তুর সংযোগ ভিন্ন চিত্র নাই। দুই-ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবু দুইটিকে বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, এবং ইহাও অনুভব করা যায় যে, চিত্রের চিত্রসত্তা আর ডিজাইনের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা নাই।

## চিত্রকলা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎ

তাহা হইলে চিত্রকলায় সৃষ্টি কোন্ জিনিসটা, কাহাকেই বা চিত্রের 'বক্তব্য', 'উপপাদ্য' বা 'বিষয়' বলিব ? সঙ্গীতের কারবার যেমন ধ্বনি লইয়া চিত্রকলার কারবার তেমনিই দৃষ্টিগ্রাহ্যবস্তু লইয়া,—চিত্রকলা দ্রষ্টব্য আর্ট, এই কথা বলিয়া অনেকে চিত্রকলাকে বিশিষ্ট ও অন্য আর্ট হইতে পৃথক করিতে যান। অবশ্য ইহা সত্য যে, চিত্রকলার একমাত্র অবলম্বন দৃষ্টিগ্রাহ্যবস্তু, কিন্তু এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, কেন না চিত্রকলা ভিন্ন সাহিত্যেরও আংশিক উপাদান দৃশ্যবস্তু ; তাহা ছাড়া দৃশ্যবস্তু প্রথমত নানাপ্রকারের, দ্বিতীয়ত আমাদের মনকে নানাদিক হইতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। ইহার জন্য শুধু দৃশ্যবস্তুর আর্ট বলিলে চিত্রকলার ধর্মকে বিশিষ্ট করা হয় না।

সাহিত্যের উপাদান দৃশ্যবস্তু এই যুক্তি অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু বর্ণনামূলক রচনা ও চিত্রের মধ্যে তফাত কোথায় ? "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"—এই ভাষাচিত্র এবং রঙে ও রেখায় সম্বদ্ধ দৃশ্যচিত্রের মধ্যে মূলত প্রভেদ কোথায় ? আর একটা দৃষ্টান্ত ধরুন।

AMARBOI.COM

—ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,—

এই ছবি ও টার্নারের আঁকা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য কি অনেকটা একধর্মী নয় ? একটা বড় পার্থক্য অবশ্য আছে। চিত্রকলা দৃশ্যবস্তুকে একেবারে সাক্ষাৎভাবে না পারিলেও অন্য পর্যায়ের দৃশ্যবস্তু হিসাবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, ভাষাচিত্র তাহা পারে না, ভাষাচিত্রকে দৃশ্যে পরিণত করে আমাদের মন—কল্পনা ও ভাবসংশ্লেষের সহায়তায়। এই কথা ভাষার দ্বারা সৃষ্ট সকল আর্ট সম্বন্ধেই খাটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল অভিজ্ঞতাকে কমবেশি পুনরাবির্ভূত করিবার ক্ষমতা ভাষার আছে। সেজন্য ভাষার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট ও বর্ণরেখার দ্বারা সৃষ্ট আর্ট খানিকটা সমানাধিকারযুক্ত অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'ওভারল্যাপিং'। বর্ণনার সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সৃষ্টি ভাষা যতটুকু করিতে পারে সেই অনুপাতে ভাষা চিত্রধর্মী। দৃশ্যবস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ও গৌণভাবে উপলব্ধির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা চিত্রগত বর্ণনা ও ভাষাগত বর্ণনার মধ্যে অবশ্য বাহ্যত না থাকিয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না, কিন্তু আমাদের মনে রসসৃষ্টির দিক হইতে ভাষাচিত্র ও আসল চিত্রের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশি নাই। দুই-ই আমাদের মনে একই পর্যায়ের ভাব সৃষ্টি করে।

তেমনি চিত্র আবার ভাষার নিজস্ব এলাকায় আসিয়া প্রভেদও করিতে পারে। ঘটনাবর্ণন বা আখ্যান ভাষার বিশিষ্ট ক্ষমতা। চিত্র তাহা অহরহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধরুন, বাইবেলে যীশুর শেষ ভোজনের কাহিনী। "আসবাব যুক্ত একটি বড় খাইবার ঘর...যীশু বারো জন শিষ্য লইয়া ভোজনে বসিলেন..." ইত্যাদি। এই আখ্যান ও লেওনার্দোর 'লাস্ট সাপারে'র মধ্যে তফাত কি ? নিছক বর্ণনা হিসাবেই বা কি, আমাদের মনে ভাবাবেশের দিক হইতেই বা কি ? অবশ্য দৃশ্য সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে ভাষার যেমন খানিকটা অসুবিধা আছে তেমনই আখ্যানের ব্যাপারে চিত্রেরও একটা অক্ষমতা আছে। চিত্র ঘটনাপরম্পরা দেখাইতে পারে না, কালক্ষেপকে প্রকাশ করিতে পারে না, চিত্রের বর্ণনা কালমুহূর্তের মধ্যে আবদ্ধ স্থাণু অবস্থার বর্ণনামাত্র। কিন্তু শুধু এইটুকুই একটা আখ্যান হইতে পারে, এবং একটি মুহূর্তব্যাপী আখ্যানাংশ আখ্যানের বাকি অংশটুকুকে ভাবসংশ্লেষের সাহায্যে আমাদের মনে আনিয়া দিতে পারে। এইখানেও ভাষাগত আর্ট ও বর্ণরেখাগত আর্টের মধ্যে সমানাধিকার রহিয়াছে।

## দৃশ্যবস্তুর বৈচিত্র্য

চিত্রকলায় দৃশ্যের লক্ষণ ও প্রকার ভেদের কথা ধরিলে, এবং এই দৃশ্যবৈচিত্র্যের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে যে ভাববৈচিত্র্য হয় উহার বিশ্লেষণ করিলে, ব্যাপারটা আরও অনেক জটিল হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমত চিত্র মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ও মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইতে পারে। আমাদের মনকে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবি যে-ভাবে প্রভাবান্বিত করে মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত ছবি ঠিক সে-ভাবে করে না। মনুষ্যসম্পর্কবর্জিত চিত্র দেখিবার সময়ে আমরা মানুষের জীবনের আনুষঙ্গিক আবেগ, উচ্ছ্বাস, নৈতিক ধারণাকে, সংক্ষেপে বলা চলে আমাদের মনের সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারি, ছবিটিকে প্রধানত দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত ছবিকে আমরা সাধারণত এইভাবে দেখিতে পারি না। উহা দেখিবার সময়ে চিত্রগত বিষয়বস্তু আমাদের মনে এমন সব ভাব আনিয়া দেয় যাহা বাস্তবজীবনে অনুরূপ দৃশ্য দেখিলেও আমাদের মনের মধ্যে উদয় হয়।

তারপর মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত চিত্রও নানা ধরনের হইতে পারে। উহা ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ধর্মবিষয়ক বা সাহিত্যিক কোনও উপাখ্যানের ছবি হইতে পারে, লৌকিক জীবনের কোনও ঘটনা হইতে পারে অর্থাৎ মিলন, বিরহ, শোক, বীরত্ব ইত্যাদি সূচক কোনও দৃশ্য হইতে পারে, কিংবা ঐতিহাসিক বা অখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি হইতে পারে। এই প্রত্যেকটি ধরনের চিত্র দেখিবার সময়ে আমাদের মনের ভাব বিভিন্ন ধরনের হয়। উপাখ্যানের ছবিতে আমরা মূল উপাখ্যানের রস পাই বা খুঁজি। এক্ষেত্রে আমাদের মন ছবি দেখা আর গল্প পড়ার মধ্যে কোনও তারতম্য করে না ; তারতম্য হয় শুধু উপলব্ধির উপায়ের মধ্যে ; একটির উপলব্ধি হয় ভাষার সহায়তায়, আর একটির হয় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির সহায়তায়। লৌকিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিলে আমাদের মনে যে আবেগ হয় তাহাও প্রায় অবিকল লৌকিক জীবনের বাস্তব ঘটনার দ্বারা উদ্রিক্ত আবেগেরই মতো। আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি দেখিলে সেই ব্যক্তির চরিত্র, মানসিক ধর্ম, এই ধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মন কৌতূহলী হইয়া উঠে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্রপ্রসূত এই সকল মনোভাব এবং বাস্তবজীবনের ঘটনা ও দৃশ্যের দ্বারা প্রসূত মনোভাবের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। বড় জোর সূক্ষ্মতা, তীব্রতা ও বিশুদ্ধতার কম বেশি হইতে পারে। কিন্তু চিত্রগত দৃশ্যকে আমরা অন্য চোখেও দেখিতে পারি, উহাদের দ্বারা অন্য বৃত্তিকেও তৃপ্ত করিতে পারি। চিত্রকলার যে-সব বিষয়বস্তুর কথা এইমাত্র বলা হইল উহাদের প্রায় সবগুলিকেই আমরা উপাখ্যান হিসাবে দেখা ছাড়া শুধু চোখে দেখিবার সুসমঞ্জস এবং সুসম্বদ্ধ দৃশ্য হিসাবেও নিতে পারি। তখন উহার দ্বারা আমাদের মানসিক বৃত্তি—অর্থাৎ আবেগ ইত্যাদির—উত্তেজনা না হইয়া শুধু সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মনুষ্যসম্পর্কযুক্ত হইলেও একই ছবিকে আমরা একাধিক উপায়ে উপভোগ করিতে পারি।

আবার এমন সব ছবিও আছে যাহা হইতে লৌকিক জীবনের আবেগ সংগ্রহ করা কঠিন, যদিও অসম্ভব না হইতে পারে। ফলের ছবি দেখিয়া অত্যন্ত নির্বোধ না হইলে আমাদের রসনা সরস হইয়া উঠে না, আমরা চিত্রকরের নিপুণতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্র দেখিলে উহার লক্ষণ অনুযায়ী আমাদের মনে একদিকে যেমন শুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতি হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই ভয়, আনন্দ বা বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে পারে। এক্ষেত্রে মন মনুষ্যসম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, চিত্র হইতে গৃহীত রস বা মনোভাব চিত্রগত বিষয়ের মতোই বহুবিচিত্র, বহুমুখীন, এমন কি সময়ে সময়ে বিপরীতধর্মী। এর কোন্‌টা চিত্রকরের আসল লক্ষ্য ? সে কি আঁকিবে ? বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাহার স্বাধীনতা কতটুকু ? কি ধরনের মনোভাব উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে সঙ্গত, আর কোন্‌টা অসঙ্গত ? উহার সৃষ্টি বিচিত্রতায় বাস্তবের মতোই ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর হইতে পারে কি, না উহার একটা গণ্ডি ও নিয়ম আছে ?

॥ ৪ ॥

## চিত্রের বিচিত্র ধর্ম

চিত্রসমালোচকের পক্ষে এইগুলি গুরুতর প্রশ্ন, কিন্তু তর্ক এবং গণ্ডগোলও পাকাইয়া উঠিয়াছে এই সব প্রশ্ন লইয়াই। বিতর্কটা সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা এবং আর্ট-ক্রিটিকের মধ্যে নয়, আর্ট-ক্রিটিকে আর্ট-ক্রিটিকে। সাধারণ চিত্রদ্রষ্টা, চিত্রকরের বা চিত্রসমালোচকের বক্তব্য বা উদ্দেশ্যের কোনও তোয়াক্কা রাখে না, তাহার মন যাহা চায় চিত্র হইতে সে উহাই বাছিয়া লয়, প্রেমের দৃশ্য দেখিলে কল্পনায় প্রেমাভিভূত হয়, বাৎসল্যের দৃশ্য দেখিলে বাৎসল্য অনুভব করে, গল্প পাইলে তাহাকেই ধরিয়া বসে। অপরপক্ষে বর্তমান যুগে চিত্রকর এবং সমালোচকও ধরিয়া লইয়াছেন, সাধারণের দ্বারা বোধ্য ও সমাদৃত হইবার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যে তাঁহাদের কাজের অবলম্বন পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য সমব্যবসায়ী-চিত্রকর বা চিত্রসমালোচক, বড়জোর চিত্রানুযায়ী সমঝদার ব্যক্তি।

এই সকল "বিশেষজ্ঞ"দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের একটা দিক পুরাতন ও নূতন থিওরির সংঘাত, আর একটা দিক নব্য থিওরিস্টদের মধ্যে মতানৈক্য।

## বিশেষজ্ঞদের গৃহযুদ্ধ

বহু প্রাচীনকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কাহারও মনে এই ধারণাটা জাগে নাই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, চিত্রসৃষ্ট রসের ধর্ম এবং সাহিত্যসৃষ্ট রসের ধর্ম একই পর্যায়ের বস্তু নয়,—এ দুটি জিনিসের প্রকাশোপায় যতই বিভিন্ন হউক না কেন। সুতরাং চিত্রার্পিত উপাখ্যান বা ঘটনা, বা বস্তুর মধ্যেই সকল চিত্রের রস খুঁজিয়াছে। ইহাও কাহারও মনে জাগে নাই যে, চিত্র বা সাহিত্যের দ্বারা সৃষ্ট রস বাস্তবজীবনে অনুভূত মানসিক আবেগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা জিনিস। অবশ্য একটা ব্যাপার রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়াছে যে, আর্টসৃষ্ট জগতের রস এবং বাস্তবজীবনের রস হুবহু এক ধরনের নয়—প্রথমটা দ্বিতীয়টার অপেক্ষা অনেক বেশি সংস্কৃত, ঘনীভূত, একত্রীকৃত ও স্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দুইটি জিনিসকে মনের দুইটি স্বতন্ত্র এলাকায় ফেলিয়া দিবার কল্পনা কাহারও মনে উঠে নাই ; এই দুইটি জিনিসের উপভোগ যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৃত্তির দ্বারা হয় এ-কথাও কেহ বলে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের প্রাচীন আর্ট-ক্রিটিকদের কথাই ধরা যাক্। এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণকার একেবারে স্পষ্ট কথা বলিয়া খালাস, "শৃঙ্গারহাসকরুণবীররৌদ্র ভয়ানকাঃ বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতা।" এখানে চিত্র ও সাহিত্যের রসের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই। চিত্ররস সম্বন্ধে এই পুরাণের দুই একটা ব্যাখ্যা উক্ত পুরাণ হইতেই দিতেছি। "যৎ কান্তিলাবণ্যলেখামাধুর্যসুন্দরম্ বিদগ্ধবেশাভরণং শৃঙ্গারে তু রসে ভবেৎ" (দৃষ্টান্ত—অজন্তার প্রসাধনচিত্র, ১৭ নং গুহা—গ্রিফিথ, প্রথম খণ্ড, ৫৫ নং চিত্র)। "যৎ কুব্জবামণপ্রায়মীষদ্‌বিকটদর্শনম বৃথা চ হস্তং সংকোচ্য তৎ স্যাদ্‌ধাস্যকরং রসে।" (এই ধরনের ছবিও অজন্তায় আছে।) "যদ্‌যৎ সৌম্যাকৃতি ধ্যান ধারণাসন বন্ধনম্ তপস্বিজনভূয়িষ্ঠং তত্তুশান্তে রসে ভবেৎ।" (অজন্তায় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির চিত্র, ১ নং ও ১৯ নং গুহা, গ্রিফিথ, ২য় খণ্ড, ১৫১ নং চিত্র ও ইয়াজদানি ১ম খণ্ড, ২৪ নং চিত্র)। ইহার পর বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কোথায় কোন্ রসের চিত্র আঁকা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহাও বলা হইয়াছে—যেমন, "শৃঙ্গারহাস্যশান্তাখ্যা লেখনীয়া গৃহেষু তে।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩য় খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়, ১-১৭ শ্লোক)।

সংস্কৃত সাহিত্যেও যেখানে যেখানে চিত্রের উল্লেখ আছে সেখানেও কোথাও ইঙ্গিতমাত্রও নাই যে, চিত্রের অনুভূতি বাস্তবের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শন উপলক্ষ্যে রাম সীতার কথাবার্তা উহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

সমসাময়িক কয়েকজন সমালোচক এতদূর না গেলেও মোটের উপর এই ধরনের মতেরই পক্ষপাতী। ইঁহাদের মধ্যে আই. এ. রিচার্ডস্ ও হাওয়ার্ড হ্যানের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাইতে পারে, এ-কথা ইঁহারা জানেন না, একটা বিশিষ্ট 'এস্‌থেটিক' বোধের অস্তিত্বও ইঁহারা স্বীকার করিতে চান না। মোটের উপর ইঁহাদের মতামত অনেকটা প্রাচীনপন্থী।

ইঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই প্রমুখ। ইঁহারা চিত্রকলার সুলতান মহম্মদ গজনবী—পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইঁহাদের মূলকথা দুইটি—(১) চিত্ররস চিত্রার্পিত বিষয়বস্তু সাপেক্ষ নয়, (২) চিত্ররসের উপলব্ধি আমাদের হয় বিশিষ্ট একটা বোধশক্তির দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ 'এস্‌থেটিক' বোধ বা আবেগের সহায়তায়।[৫] দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্লাইভ বেলের হালের রচনা হইতে একটা জায়গা উদ্ধৃত

৫ রিচার্ডস, হ্যানে, বেল, ফ্রাই প্রমুখ সমালোচকদের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। রিচার্ডস-এর "প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ লিটারারী ক্রিটিসিজম্", হ্যানের "রজার ফ্রাই অ্যান্ড আদার এসেজ", ক্লাইভ বেলের "আর্ট" ও রজার ফ্রাই-এর "ভিশ্যন অ্যান্ড ডিজাইন" এবং "ট্রান্‌স্‌ফর্মেশান" এই কয়েকটি বই পড়িলেই এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া যাইতে পারে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, "চিত্রকলা (পেন্টিং) মনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত করে। চিত্রাখ্যান (ইলাস্ট্রেশ্যন) চায় বাস্তবের প্রতিচ্ছবির দ্বারা উদ্রিক্ত ভাবসংশ্লেষ ও ধারণার সহায়তায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতে, তৃপ্ত করিতে, মার্জিত করিতে, আমোদ দিতে, ভয় দেখাইতে বা কষ্ট দিতে : আমার মতে এই কাজ ভাষার সাহায্যে আরও সুসম্পন্ন হইতে পারে।"("নিউ স্টেটস্‌ম্যান অ্যান্ড নেশ্যন' পত্র, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪২ সন, ২৩৭ পৃঃ)

এই যুক্তির তাৎপর্য বড়ই গুরুতর। সুতরাং উহাকে ভাল করিয়া যাচাই করা দরকার।

## নূতন মত অগ্রাহ্য

প্রথমত, ছবিকে ক্লাইভ বেল দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেছেন—একটি আসল চিত্রকলা (পেন্টিং) যাহার উদ্দেশ্য শুধু "দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য" (ভিজিব্‌ল্ হার্মনি) সৃষ্টি করা, অপরটি "চিত্রাখ্যান" (ইলাস্ট্রেশ্যন)। দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্য এবং আখ্যান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা ক্লাইভ বেল পূর্বোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহিত একমত অন্য সমালোচকদের রচনা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, চিত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য সামঞ্জস্যের অর্থ রেখা ও বর্ণের সাহায্যে দৃষ্ট 'ডিজাইন' বা 'কম্পোজিশ্যন' আর আখ্যানের অর্থ ছবিতে গল্প ঘটনা, প্রতিকৃতি বা বাস্তবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু আছে সবই। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিকেল এঞ্জেলোর 'পুরুষ ও নারী সৃষ্টি'কে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব ? রাফায়েলের 'সিস্টাইন ম্যাডোনা'কে, রেমব্রান্টের 'চিত্রকর ও তাহার পত্নী'কে, ভেল্যাস্‌কুয়েথের 'ব্রেডার আত্মসমর্পণ'কে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব ? অজন্তার জাতকের চিত্র, ওস্তাদ মন্‌সুরের অঙ্কিত জাহাঙ্গীর ও কৃষ্ণসারের চিত্র, ফুকাইচির অঙ্কিত "উপদেশ ও শিক্ষা" চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব ? এমন কি ইম্প্রেশ্যনিস্ট স্কুলের 'ল্য দেজোনের স্যুর লর্ব', 'ল্য বঁ বক', 'বাকে নর্তকী' প্রভৃতি চিত্রকেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলিব ? এই কয়টি বিখ্যাত ছবির উল্লেখ শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে করিলাম। চিত্রকলার নিদর্শন অল্পই আছে যাহার সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা উঠিবে না। ক্লাইভ বেলও পূর্বোল্লিখিত চিত্রগুলিকে 'চিত্রাখ্যানে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসল চিত্রকলার পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে সাহস পাইবেন না, অথচ তাঁহার সংজ্ঞানুযায়ী এগুলির কোনটাই চিত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্রকলার ক্লাইভ বেল-কৃত শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্রকলার মধ্যে অবান্তর ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করাও কখনও সম্ভব নয়।

ক্লাইভ বেলের দ্বিতীয় কথা—প্রকৃতচিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যানুভূতির উদ্রেক করে, 'ইলাস্ট্রেশ্যন' শিক্ষা দেয়, আমোদিত করে, ভয় বা কষ্টের উদ্রেক করে, চিত্তসংস্কার করে। চিত্রের ধর্মনির্ধারণে এই যুক্তিও ভিত্তিহীন। প্রথম আপত্তি, সৌন্দর্যানুভূতি আমাদের শুধু চিত্র হইতেই হয় না, সাহিত্য হইতে হয়, ভাস্কর্য হইতে হয়, স্থাপত্য হইতে হয়, সঙ্গীত হইতে হয়, তাহার উপর বাস্তব জগত হইতেও হয়। সৌন্দর্যানুভূতি একমাত্র কলাজগতেই আবদ্ধ নয়। এখানে হয়তো বলা হইবে, ক্লাইভ বেল শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য সুন্দর বস্তু চিত্রকলায় যেমন আছে তেমনই ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যেও আছে, বাস্তবজীবনে তো আছেই। বাস্তব নারীদেহ আমরা যেমন লৌকিক চক্ষে দেখিতে পারি, তেমনই নিছক সুন্দর বস্তু হিসাবেও দেখিতে পারি। সুতরাং সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে চিত্রকলার একটা বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার সপক্ষে কোনও যুক্তি নাই।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় আপত্তি, একই চিত্র আমাদের মনে সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করিতে পারে, সেই সঙ্গে লৌকিক আবেগের উদ্রেক করিতে পারে, আবার নীতিমূলক চিন্তাও জাগাইতে পারে। ধরুন মিকেল এঞ্জেলোর "শেষবিচার"। উহাতে সৌন্দর্যসৃষ্টি যতটুকু আছে, ভয় বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ উহার অপেক্ষা কম নাই, মানুষের শেষগতি স্মরণ করাইয়া তাহাকে ধর্মানুবর্তী করিবার উদ্দেশ্যও নয়। কিংবা ধরুন ফুকাইচি অঙ্কিত পূর্বোল্লিখিত চিত্রমালার তৃতীয় চিত্র। ইহাতে হানবংশীয় সম্রাট ইয়ুয়ানের উপপত্নী ফেং-এর বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি ভালুক তাঁহার (প্রকৃত) স্বামীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, ফেং নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে কি করিয়া বাঁচাইলেন তাহাই দেখান হইয়াছে। এই চিত্রটির মূল উদ্দেশ্যই তো নীতিমূলক। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

আবার এমন কোনও ছবি নাই যাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যবর্জিত। ব্যঙ্গচিত্র একান্তভাবে উপদেশমূলক, কিন্তু এমন কোনও ব্যঙ্গচিত্র আছে কি যাহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য নাই? যে ব্যঙ্গচিত্র ডিজাইন হিসাবে সুন্দর নয়, তাহাকে কেহ সার্থক ব্যঙ্গচিত্র বলেই না। সুতরাং একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যকে ও অন্যদিকে আবেগ ও উপদেশকে কষ্টিপাথর হিসাবে ধরিয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় সম্ভব নয়।

ক্লাইভ বেলের তৃতীয় কথা—যাহা ভাষায় প্রকাশ্য তাহা চিত্রকলার ন্যায্য ও নিজস্ব অবলম্বন হইতে পারে না। এই কথাও মানা যায় না। ভাষাশ্রয়ী আর্ট ও চিত্রকলা কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে সমানাধিকার যুক্ত তাহা আগেই বলা হইয়াছে। লেওনার্দোর মন এবিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় ছিল। তিনি বলিতেছেন,

"কবি! তুমি আখ্যান বর্ণন কর লেখনীর সাহায্যতায়, চিত্রকর করে তাহার তুলিকার সাহায্যে এবং এমনইভাবে সে তাহা করে যে উহা আরও সহজে আনন্দদান করে এবং বুঝিতে কম শ্রম হয়। তুমি যদি চিত্রকে 'মূক কাব্য' বল, চিত্রকর বলিতে পারে কবির কাব্যকলা 'অন্ধচিত্র'। বিবেচনা কর কোনটা অধিকতর দুর্ভাগ্য—দৃষ্টিহীনতা অথবা বাক্যহীনতা। কবির এবং চিত্রকরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা সমবিস্তীর্ণ, কিন্তু কবির সৃষ্টি মানবজাতিকে চিত্রের সমতুল্য তৃপ্তি দিতে অক্ষম।" (লেওনার্দোর নোটবুক, পূর্বোল্লিখিত সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)।

আর একটি নজীর দেওয়া যাক্। একজন চীনা চিত্রকর তাঁহার চিত্রের জন্য নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছেন—

"নিসর্গে এমন কিছু নাই যাহা উন্নতস্থান হইতে অধঃপতিত না হয়...সূর্য মধ্যাহ্নের পর নিম্নগামী হয়; চন্দ্র পূর্ণ হইবার পর ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে। গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠা ধূলিকণা দিয়া পর্বত গড়ার মতোই কঠিন; কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত হওয়া সঙ্কুচিত ধনুর পুনঃপ্রসারণের মতোই সহজ।" (ওয়েলী প্রণীত পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ৫১ পৃঃ)

এই বিষয়টা একান্তভাবে ভাষায় প্রকাশের বিষয়—উহাকে চিত্রে কি করিয়া দেখান যাইতে পারে? চিত্রকর কিন্তু নির্ভয়। তিনি একটি খাড়া পাহাড় আঁকিলেন, তার ডানদিকে বসাইলেন একটি কাক—সূর্যের প্রতীক; বাঁদিকে বসাইলেন একটি খরগোস—চন্দ্রের প্রতীক; পাহাড়টি মহাশূন্য পাখি, অদ্ভুত জন্তু, গাছ ইত্যাদিতে পূর্ণ; একটা মানুষ হাঁটু গাড়িয়া ধনু টানিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত। এই ছবিটি আমি দেখি নাই, সুতরাং ছবি হিসাবে উহা সুন্দর কি অসুন্দর বলিতে পারিলাম না, না হইবার কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু আসল বক্তব্য এই, চিত্রকর এই স্থলে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত ভাষাশ্রয়ী আর্টের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়াছেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও বর্ণরেখাশ্রয়ী চিত্রকলা পরস্পরের অস্পর্শ্য, চিত্রকলার ইতিহাস হইতে উহা কোনওক্রমেই প্রমাণ হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্লাইভ বেল চিত্রকলার যে সংজ্ঞা দিতে গিয়াছেন, উহা না লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরদের মতামত ও কর্মপদ্ধতি, না চিত্রকলার ইতিহাস, না বিচারবিশ্লেষণ—কাহারও দ্বারাই সমর্থিত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা একটা অনুদার গোঁড়ামি, শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত গোঁড়ামিকে সাধারণের উপর চাপাইবার চেষ্টা। কেহ যদি ভাষার মুখাপেক্ষী বলিয়া গানকে বা অপেরাকে সঙ্গীতের পর্যায় হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে যে সংকীর্ণতা দেখান হইবে, ক্লাইভ বেল প্রমুখ সমালোচকদের পক্ষ হইতে চিত্রকলাকে বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও সেই ধরনের সংকীর্ণতা।

এই সংকীর্ণতা এড়াইয়া চিত্রকলার ধর্ম নির্ণয় করিতে হইবে। এমন কোনও থিওরি আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না যাহার ফলে আবহমানকাল হইতে যাহা চিত্র বা চিত্রকলার লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে উহাকে চিত্রকলা বা চিত্র হইতে নির্বাসিত করিতে হয়। এই সংকীর্ণ পথ ধরিলে চিত্রকলার থিওরি আর চিত্রসাপেক্ষ থাকিবে না, চিত্র থিওরি-সাপেক্ষ হইয়া উঠিবে এবং অবশেষে এই সংজ্ঞাহীন সংজ্ঞায় আসিয়া পৌঁছিতে হইবে যে, চিত্রকলা উহাই যাহাকে চিত্রসমালোচকেরা চিত্র বলেন। বর্তমান কালে এই তামাশা যে না চলিতেছে তাহা নয়, কিন্তু উহাকে তামাশা ভিন্ন আর কিছু জ্ঞান করিবার কারণ দেখি না।

## চিত্রকলা মিশ্র আর্ট

এই পথ ছাড়িয়া চিত্রকলার ধর্মান্বেষণ 'ইন্‌ডাক্টিভ' বিশ্লেষণের দ্বারা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা দুইটি জিনিস দেখিতে পাইব। প্রথমটি এই যে, চিত্রকলার ধারা সব যুগে এক ছিল না, সব দেশেও এক নয়, দেশে দেশে কালে কালে পরিবর্তনশীল। চিত্রকলার উদ্দেশ্য বা প্রেরণাও সব যুগে এক ছিল না। এই যে আমরা এখন চিত্রকে ব্যক্তিগত সৌন্দর্যভোগের উপকরণ এবং গৃহসজ্জা বলিয়া মনে করি, উহা তিন চার শ' বছরের বেশি পুরাতন ধারা নয়। যে নৈসর্গিক চিত্রকে এখন সকলেই চিত্রকলার একটা অবর্জনীয় অংশ বলিয়াই গণ্য করেন, উহাও ইউরোপীয় চিত্রকলায় সপ্তদশ শতাব্দীর আগে চিত্রের আখ্যানাংশ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই, এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ে তাহা এই চিত্রের রূপ যেমন বিচিত্র, রসও তেমনই বহুধা। গান একটা 'কম্পোজিট' বা মিশ্র আর্ট, এ-কথা সকলেই জানেন ; কারণ গানে কবিতা ও সুর দুই-ই আছে, দুটিই অবর্জনীয়, অথচ দুইটির পরস্পর সম্পর্ক কি তাহা এ পর্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, এমন কি গানে কাব্য বা কথার স্থান কতটুকু, সুরেরই বা স্থান কতটুকু, উহা লইয়া ঝগড়া মিটে নাই, মিটিবারও নয়। তবু গান উপভোগে এই মিশ্রতার জন্য আমাদের কোনও বাধা জন্মে না। তেমনই চিত্রকেও মিশ্র আর্ট বলিয়াই মানিতে হইবে—মানিতে হইবে উহাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের যেমন স্থান আছে, আখ্যান বা বর্ণনা এমন কি নীতিপ্রচারের পর্যন্ত তেমনই স্থান আছে ; উহার দ্বারা সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি যেমন ন্যায্য, আবেগের তৃপ্তিও তেমনই ন্যায্য। শুধু তাই নয়, উহাতে আখ্যান বহু প্রকারের হইতে পারে ; বর্ণনা বহু প্রকারের হইতে পারে, নীতিপ্রচার বহু প্রকারের হইতে পারে ; উহার সৌন্দর্য বিশ্বের সৌন্দর্যের মতোই বহু বিচিত্র হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে ; সতরাং চিত্রোদ্ভূত মানসিক প্রতিক্রিয়াও বহু প্রকারের হইতে পারে।

এত বৈচিত্র্যের উপরেও আর একটি বিচিত্রতার সম্ভাবনা মানিতে হইবে, তাহা এই—একটি চিত্রেই একাধিক রস ও একাধিক লক্ষণ মিলিতে পারে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সেটি অতি পরিচিত। লেওনার্দোর মোনা লিজা।

ভাজারি উহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা পূর্বোদ্ধৃত একটি বিবরণ হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উহা রিনেসেন্সের যুগের ফ্লোরেন্টাইন চিত্রকরের চোখ। তাঁহার দৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে, দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎকে একান্তভাবে, মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিবার আশঙ্কা। এই উপলব্ধি শুধু চোখের দ্বারা হয় না, উহার জন্য স্পর্শেরও প্রয়োজন। তাই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্টাইন চিত্র আমাদের স্পর্শানুভূতিকে এতটা সজাগ করিয়া তুলে। ফ্লোরেন্টাইন চিত্রকলার এই ধর্ম মোনা লিজায় পূর্ণভাবে বর্তমান। ভাজারি মোনা লিজার যে-সব অবয়বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিয়া শুধু চুলের দিকে চাহিলেই এই জিনিসটা অনুভব করা যায়। মনে হয় ওই উন্মুক্ত চিক্কণ কেশভার ত্বকে ঠেকিয়া সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলিতেছে। এইজন্যই ইটালিয়ান চিত্রকলার বিচক্ষণ সমালোচক বেরেনজন বলিয়াছেন, "মোনা লিজাতে স্পর্শরস যেমন তীব্র ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, এক ভেল্যাসকুয়েথ ভিন্ন অন্যত্র, কিংবা রেমব্রান্টের ও দ্যগার শ্রেষ্ঠ চিত্র ভিন্ন অন্যত্র, তাহার তুলনা খোঁজা বৃথা।" ("দি ফ্লোরেন্টাইন পেন্টার্স অফ্ দি রেনেসন্স", তৃতীয় সংস্করণ, ৬৫/৬৬ পৃঃ)

কিন্তু ওয়াল্টার পেটার কি চক্ষে মোনা লিজাকে দেখিয়াছেন এখন তাহা স্মরণ করুন ; পেটারের "রিনেসেন্সে" লেওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রবন্ধের সেই বিখ্যাত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের অবমাননা করিব না, অনুবাদ করিতে গিয়া পেটারের লাঞ্ছনা করিব না, শুধু এইটুকু বলিব, উহা ভাজারির অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি, কবির অনুভূতি, রোমান্টিক কবির অনুভূতি। এই অনুভূতিকে বেরেনজন সাহিত্যিক অনুভূতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, একটু ব্যঙ্গও করিয়াছেন।[৬] তবু মানিতে হইবে, ওয়াল্টার পেটারের অনুভূতিও সঙ্গত, তাঁহার ব্যাখ্যাও একদিক হইতে ঠিক। মোনা লিজা চিত্রে মোনা লিজার প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু পিছনের শ্যামধূসর প্রস্তরমালা ও বিসর্পিত জলপ্রবাহের কথা ধরিলেও পেটারের মনে যে ভাব জাগিয়াছে উহার যাথার্থ্য অনুভব করা যায়।

## চিত্রের যুগধর্ম

চিত্রকলার রূপ ও রস যে বিচিত্র (অন্তত একাধিক) তাহা মানিতেই হইবে।[৭] তবে মোটের উপর এই বহু বিচিত্র রূপ ও রসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে রূপের কথাই ধরা যাক্।

আমাদের আবেগ ও রসানুভূতি বর্জন করিয়া চিত্রকে শুধু যথাযথভাবে দেখিলে

৬ হ্যানে—পূর্বোদ্ধৃত পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'দি ট্র্যাজেডি অফ্ মি. বেরেনজনস্ থিওরি অফ্ আর্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি স্থান দ্রষ্টব্য ; ও বেরেনজন প্রণীত "থ্রী এসেজ ইন্ মেথড" পুস্তকে ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৭ না মানিলে কি কুযুক্তি ব্যবহার করিতে হয় উহার একটি কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত স্বয়ং বেরেনজন দিয়াছেন। তিনি রাফায়েল এবং পেরুজিনোর অঙ্কিত স্ত্রীমূর্তির প্রতি অনুরাগ নানা জায়গায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই অতিকমনীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণা সুন্দরীদের চিত্র তাঁহার মতো স্পর্শ-থিওরি প্রচারকের কাছে প্রীতিজনক হইতে পারে উহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু বেরেনজন বলেন, উহাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই, এই তৃপ্তি খুবই ন্যায্য, কিন্তু উহার সহিত আর্টের কোনও যোগ নাই, এই সকল স্ত্রীমূর্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, স্পর্শানুভূতিকে স্পর্শ করে না। (হ্যানে, পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ৬৫ পৃঃ)। চিত্রে আমাদের হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তিও হয়, সৌন্দর্যানুভূতির পরিতৃপ্তিও হয় এই কথা মানিলে চিত্রকলার একটি থিওরি প্রচার করিবার সার্থকতা থাকে না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্রকলায় আমরা দুইটা জিনিস পাই—(ক) **বিশুদ্ধ দৃশ্য** ও (খ) **আখ্যানমূলক দৃশ্য**। মনে রাখিতে হইবে, চিত্রমাত্রেই দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু, সুতরাং উহাদিগকে শুধু "আখ্যান" ও "দৃশ্য" এই দুই ভাগে ভাগ করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু সব চিত্রই দৃষ্টিগ্রাহ্য হইলেও, একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই, চিত্রার্পিত সব দৃশ্য এক পর্যায়ের নয়—উহাদিগকে পরিষ্কার দুইটি পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলি শুধু চোখে দেখিবার জিনিস, যেমন কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা গৃহের অভ্যন্তর, বা ফলফুলের ছবি, উহাদের মধ্যে চোখে দেখিবার জিনিস ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু কতকগুলি ছবিতে দৃশ্যের অতিরিক্ত আরও কিছু থাকে, চিত্রার্পিত দ্রষ্টব্য বস্তুর সহায়তায় উহারা আমাদিগকে কিছু বলে। এই বক্তব্য কখনও বা হয় কোনও গল্প, কখনও বা হয় কোনও একটা ঘটনা, আবার ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও হইতে পারে। চিত্রের ভিতর দিয়া চিত্রকর যাহা বলিতে চায় এবং বলে, তাহা কোনও নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই বিষয়ে চিত্রকরের সাহিত্যিকের মতোই অবাধ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বক্তব্য বিষয় যতই বিচিত্র হউক না কেন, সবগুলিই "বক্তব্য", এই কারণে এই জাতীয় চিত্র একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পর্যায়ে পড়ে, উহাদিগকে বিশুদ্ধ দৃশ্য বলা যায় না। এই শ্রেণীর চিত্রে দৃশ্য ভাষার কাজ করে, অর্থাৎ ভাষাতে যেমন ধ্বনির অতিরিক্ত কোনও না কোনও অর্থ থাকে, তেমনই এইসকল চিত্রে দৃশ্যবস্তুতে দৃশ্যাতিরিক্ত কোনও না কোনও অর্থ থাকে। বিশুদ্ধ দৃশ্যমূলক চিত্রে এই অর্থ থাকে না, উহা শুধু দেখিবার জিনিস।

এবারে চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির কথা ধরা যাক। এখানেও আমরা দুইটি পর্যায়ে পাই—(অ) শুধু দ্রষ্টব্য বিষয়ের উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধি হইতে জাত রসোপভোগ; (আ) দ্রষ্টব্য বিষয় হইতে কারুণ্য, হাস্য, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগের এবং ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি মানসিক ধারণার উপকরণ সঞ্চয়।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার (অ) পর্যায়ের উপলব্ধি চিত্রের ডিজাইনের উপলব্ধি নয়, চিত্রার্পিত বিশিষ্ট বস্তুটির বা বস্তুসমষ্টির উপলব্ধি। যেমন ধরুন, কোনও চিত্রকর একটি কলসী আঁকিলেন। ডিজাইন হিসাবে দেখিলে আমরা উহাকে শুধু সুসমঞ্জস বৃত্তাংশ বা গোলকাংশ হিসাবে দেখি, কিন্তু চিত্র হিসাবে দেখি কলসী হিসাবে—আমরা উহার আকৃতি, স্থূলত্ব, ধাতব ধর্ম, এমন কি ভার পর্যন্ত অনুভব করি; 'ডিজাইন' এই অনুভূতিকে সহায়তা করে মাত্র। চিত্র যত উচ্চশ্রেণীর হয় চিত্রলিখিত বস্তুর অনুভূতিও আমাদের ততই তীব্র হয়, ততই আমাদের মনকে আলোড়িত করে। দৃশ্যবস্তুকে এইভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে সাধারণ মানস আবেগ বা ধারণার কোনও স্থান নাই, দৃশ্যবস্তু সাক্ষাৎভাবে আমাদের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। এই অনুভূতির যে একটা নিজস্ব রস আছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বাস্তবজগতের যে কোনও জিনিস দেখিবার সময়েই অনুভব করিয়াছেন।

এই ধরনের অনুভূতির খুব ভাল দৃষ্টান্ত আমরা পাই রেমব্রান্টের একটি চিত্রে। চিত্রটির বিষয় অতি তুচ্ছ—একটি বালক একটি ডেস্কের পিছনে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এই চিত্রটি দেখিবার সময়ে বক্তব্য বিষয়ের কথা আমাদের মনে উদয় হয়ই নাই—আমরা শুধু চিত্রার্পিত বস্তুগুলির বস্তুসত্তা অনুভব করি—কাঠকে কাঠের পরাকাষ্ঠা হিসাবে দেখি, অঙ্গুষ্ঠের চাপে বালকের গাল যেখানটাতে টোল খাইয়াছে, সেই জায়গাটাতে জীবন্ত ত্বক ও পেশীর উপর জড়শক্তির ক্রিয়া আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ভেরমিয়ারের "সঙ্গীত-শিক্ষা"ও এই ধরনের চিত্রের আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ছবিটি দেখিবার সময়ে উপাখ্যানভাগের কথা আমাদের মনে উঠে না, আমরা শুধু দেখি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহাভ্যন্তরের আয়তন, আলো-ছায়ার সমাবেশ, ভিত্তি দেওয়াল ও ছাদের পরস্পর সম্পর্ক, ও আসবাবপত্র এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ। তেমনই মিকেল এঞ্জেলোর চিত্রে আমরা বিশেষ করিয়া অনুভব করি, মানবদেহের বস্তুসত্তা, টারবর্খের চিত্রে অনুভব করি রেশমী কাপড়ের বিশিষ্ট ধর্ম, বেরেনজন এই শ্রেণীর চিত্রের ধর্ম বুঝাইতে গিয়া এই কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন—"মেটেরিয়্যাল্ সিগ্‌নিফিক্যান্স্ অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।" চিত্রদ্রষ্টার মানসিক অনুভূতির যে দিকটাকে (অ) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, উহার উপজীব্যও কি তাহা নির্দেশ করিবার জন্য আমিও এই কথাগুলিই ব্যবহার করিব। আমি বলিব, এই উপলব্ধি 'মেটেরিয়্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজে'র উপলব্ধি।

(আ) পর্যায়ের উপলব্ধি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহা অনেকাংশে বাস্তব জগতের লৌকিক উপলব্ধির অনুরূপ। বেরেনজনের কথা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি (আ) পর্যায়ের উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন—"ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজ।"

তাহা হইলে আমরা চিত্ররূপের দুটি পর্যায় পাইতেছি—উপরোক্ত (ক) এবং (খ); চিত্রোপলব্ধিরও দুটি পর্যায় পাইতেছি—উপরোক্ত (অ) এবং (আ)। এখন বলা প্রয়োজন, কোনও বিশেষ চিত্ররূপ কোনও বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট নয়—অর্থাৎ (ক) পর্যায়ের রূপ যে (অ) পর্যায়ের উপলব্ধির উদ্রেক করিবে বা (খ) যে (আ)-রই করিবে তাহার কোনও অর্থ নাই। একই পর্যায়ের চিত্ররূপ দুই পর্যায়ের চিত্রোপলব্ধিরই উদ্রেক করিতে পারে বা যে কোনটারই উদ্রেক করিতে পারে। ইহার অর্থ আরও একটু বিশদ করা প্রয়োজন। ধরুন, আমরা একটা বিশুদ্ধ নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি দেখিতেছি। চিত্ররূপের দিক হইতে উহা যে বিশুদ্ধ দৃশ্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে এই ছবি দেখিয়া চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা আমরা যেমন অনুভব করিতে পারি, তেমনই শান্তি, বিস্ময়, বা ভয়ও অনুভব করিতে পারি। (ক), (খ), (অ), (আ)-র মধ্যে সন্ধিবিচ্ছেদ কিভাবে হইবে তাহা নির্ভর করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চিত্র ও বিশিষ্ট দ্রষ্টার উপর। কিন্তু মোটের উপর ইহাই দেখা যায়, প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্ব একটা ঝোঁক আছে বর্ণনির্বাচন ও বর্ণসংযোগের বেলাতে, যেমন প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্বতা পরিষ্কার বোঝা যায়, তেমনই চিত্ররূপ এবং চিত্রোপলব্ধির বেলাতেও আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, একজন চিত্রকরের একপ্রকার চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধির প্রতি ঝোঁক, অন্যের অন্য প্রকারের প্রতি ঝোঁক। প্রত্যেক চিত্রকরই একটা বিশেষ চিত্ররূপের সঙ্গে বিশেষ চিত্রোপলব্ধির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব একটা স্টাইল সৃষ্টি করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাফায়েলে আমরা উপরোক্ত দুই প্রকারের চিত্ররূপ ও চিত্রানুভূতি প্রায় সমান সমান পাই। কিন্তু সেজানের মধ্যে পাই (ক) ও (অ)-এর সংযোগ। আবার প্রি-রাফায়লাইটদের মধ্যে পাই প্রায় বিশুদ্ধ (খ) ও (আ)-র সংযোগ।

আর একটা কথা বলিলেই, এই নীরস বিশ্লেষণ সমাপ্ত হয়। কথাটা এই—প্রত্যেক শ্রেণীর চিত্রেই চিত্রকর দুই প্রকার সৃষ্টির প্রয়াস করিতে পারেন। প্রথমত তিনি নিজেকে বাস্তব জগতের দৃশ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, এবং বাস্তব জগতের দৃশ্যকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিবার ফলে বিশেষ অর্থপূর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন। কিংবা তিনি পারেন, কল্পনার সাহায্যে বাস্তব জগতের উপাদানকে এইভাবে রূপান্তরিত করিতে যাহাতে আমাদের মনে সম্পূর্ণ অসাধারণ ও অলৌকিক কতকগুলি দৃশ্যের বা সত্তার ধারণা জন্মে। রিয়্যালিস্টিক উপন্যাস ও রূপকথার মধ্যে যে তফাত এই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই ধরনের চিত্রের মধ্যেও সেই তফাত। সাহিত্যে যেমন দুই-ই ন্যায্য, চিত্রেও তেমনই দুই-ই ন্যায্য।

॥ ৫ ॥

## গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্ম

এতক্ষণে প্রসঙ্গের অবতারণা হইল। সকলেই উপক্রমণিকার ভারে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন নিশ্চয়। এই বাগ্‌বিস্তারের দুইটি কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিব, হয়তো পাঠক সঙ্গত মনে করিবেন। প্রথম কথা এই, গগনেন্দ্রনাথকে উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর বলিয়াই আমি জ্ঞান করি, সুতরাং আমার বিশ্বাস তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনাও শ্রদ্ধা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক হওয়া উচিত। চিত্রকলা ও চিত্রকর সম্বন্ধে গোটাকতক ছেঁদো কথা বলিয়া দায়মুক্ত হওয়া অতি সহজ কাজ, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথকে লইয়া এই প্রকার আলোচনা করিলে তাঁহার অবমাননা হইত।

দ্বিতীয় কৈফিয়ত এই, গগনেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব, বহুমুখীনতা ও নিজস্বতা এত বেশি যে, তাঁহার চিত্রের আলোচনা পরিচিত সূত্র বা 'ফরমুলা'র সাহায্যে করা সম্ভব নয়। নব্যবঙ্গীয় ও 'কিউবিস্ট'—এই দুইটি 'ফরমুলা' দিয়া এতদিন পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে—ইহাতেই তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্যায় করা হইয়াছে। ইহার উপর আর কোনও একটা উপমানের সঙ্গে উপমিত করিয়া তাঁহার চিত্রধর্ম নির্ধারণ করিতে গেলে, সম্ভবত—দুধ বকের মতো, বক কাস্তের মতো, সুতরাং দুধ কাস্তের মতো—এই ন্যায় অনুযায়ী সত্য অপেক্ষা অসত্যেরই প্রচার করা হইত। তাই তাঁহার চিত্রগুলিকে বিশেষ স্মরণে রাখিয়া চিত্রকলার সাধারণ ধর্ম ও লক্ষণের পর্যায় ভেদ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমার ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে, সুতরাং আশা করি পাঠকের কাছেও আমার বক্তব্য বেশি পরিষ্কার হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, গগনেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' চিত্রকর এই 'ফরমুলা' ব্যবহার করিয়া আমি সহজেই ত্রাণ পাইতে পারিতাম, এবং কথাটা অসঙ্গতও হইত না। কিন্তু এও ঠিক, পাঠক আমার অর্থ বুঝিতেন না। 'রোমান্টিক' কথাটা সাহিত্যের বেলাতে একভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বিশিষ্ট একটা অর্থে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্যলাক্রোয়া, গেরিকো প্রভৃতি চিত্রকরের প্রসঙ্গেই এই কথাটি চিত্রকলার আলোচনায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়। দ্যলাক্রোয়া ও গেরিকোর চিত্রধর্ম ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতি অন্যপ্রকার। রূপকথার লেখক হ্যানস এন্ডারসন যে অর্থে রোমান্টিক, গগনেন্দ্রনাথকে বরঞ্চ অনেকটা সে অর্থে রোমান্টিক বলা যাইতে পারে। হ্যানস এন্ডারসন কি অর্থে রোমান্টিক তাহার ব্যাখ্যা না করিলে, এই মন্তব্যেরও কোনও সার্থকতা থাকে না। সুতরাং যাইতে হইবে গোড়াকার কথায়, একটা পরিচিত ও প্রচলিত সূত্রের অনুবৃত্তি করিলে চলিবে না।

### পর্যায় নির্ণয়

প্রথমে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের একটা হিসাব লওয়া যাক্। বিষয়বস্তু বা চিত্ররূপ অনুযায়ী ভাগ করিলে তাঁহার চিত্র এই কয়েকটা শ্রেণীতে পড়ে—(১) ব্যঙ্গচিত্র, (২)


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকৃতি, (৩) পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী, বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবন সংক্রান্ত চিত্র ; (৪) ঘটনা বা ক্রিয়াত্মক চিত্র, যেমন "মন্দিরদ্বারে" ; (৫) স্থানীয় দৃশ্য (কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ দুই-এরই) ; (৬) সম্পূর্ণ কাল্পনিক দৃশ্য বা প্রতিকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে গগনেন্দ্রনাথ উপরোক্ত (ক) অর্থাৎ "বিশুদ্ধ" দৃশ্য ও (খ) "আখ্যানমূলক" দৃশ্য দুই-ই আঁকিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহার চিত্রের মধ্যে (ক) পর্যায়ের চিত্র (খ) পর্যায়ের চিত্রের অপেক্ষা অনেক বেশি : শুধু চিত্ররূপের কথা ধরিলে গগনেন্দ্রনাথ দৃশ্যঘেঁষা চিত্রকর।

কিন্তু চিত্রোপলব্ধির দিক হইতে তাঁহার চিত্রে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্য নাই বলিলেই চলে। বিশুদ্ধ দৃশ্যের ভিতর দিয়াও তিনি দ্রষ্টার মনে যে জিনিসটার উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন উহা উপরোক্ত (আ) পর্যায়ের রস—অর্থাৎ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি মানস আবেগ ও ভালমন্দ প্রভৃতি মানসিক ধারণা। ইহাকেই ইংরেজিতে আমি "ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌ফিক্যান্স অফ্ ভিজিবল্ থিংজ" বলিয়াছি। সুতরাং চিত্ররূপ ও চিত্রোপলব্ধি যোগ করিলে গগনেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধানত (ক) ও (অ)-র সমন্বয় দেখিতে পাই।

এই জিনিসটা কিন্তু খুব সহজপ্রাপ্য নয়। যদিও আগে বলিয়াছি, চিত্ররূপের যে কোনও পর্যায়ের সহিত চিত্রোপলব্ধির যে কোনও পর্যায়ের সংযোগ ঘটিতে পারে, তবু, সাধারণত, দ্রষ্টাকে বাদ দিয়া শুধু চিত্রকরের হিসাব লইলে দেখা যায়, যে চিত্রকর "বিশুদ্ধ" দৃশ্য আঁকেন, তাঁহার নিজের চিত্রোপলব্ধি সাধারণত আবেগ বা ধারণামূলক না হইয়া নির্ভাঁজ দৃষ্টিমূলক অর্থাৎ (অ) পর্যায়ের হয়। গগনেন্দ্রনাথ এই নিয়মের একেবারে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে তাঁহাকে সেজানের সম্পূর্ণ বিপরীত বলা হয়। সেজানের চিত্র যেখানে আখ্যানমূলক, সেখানেও উপলব্ধির সময়ে বিশুদ্ধ দৃশ্যাত্মক চিত্রে রূপান্তরিত হইয়া যায়। গগনেন্দ্রনাথের চিত্র যেখানে দৃশ্যমূলক সেখানেও আবেগাত্মক বা ধারণাত্মক হইয়া উঠে।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। এই প্রবন্ধের সঙ্গে কয়েকটি কাকের ছবি ছাপা হইয়াছে। বিষয় হিসাবে এটি দৃশ্যাত্মক ছবি—কারণ একেবারে 'স্টিল্ লাইফ' জাতীয় না হইলেও পাখির ছবিতে আবেগ বা ধারণা ফুটাইবার অবকাশ খুবই কম। বিশুদ্ধ দৃশ্যের দ্বারা শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর এই ছবিটিতে কাকের অবয়ব ও গতির বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কাকের শরীর ঘুঘু, পায়রা, চড়াই, এমন কি চিলের শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের—অত্যন্ত আঁটসাঁট, শক্ত, বৃত্তাংশ হইয়াও যথাসম্ভব সোজা কাটা কাটা রেখার দিকে ঘেঁষা। বসিয়া থাকিলে এক শুকনো ডাল ও শুকনো ডাল দিয়া গড়া নিজের বাসা ভিন্ন সবুজ পাতাওয়ালা গাছের সহিত সে কখনও খাপ খায় না। কাকের গতি, কি শূন্যে কি মাটিতে, সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। হাঁস যখন সাঁতার কাটে তখন সে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, চিল যখন উড়ে তখন সে-ও বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু কাক উড়িবার সময়ে কখনও বায়ুর সঙ্গে মিশে না। কাকের ওড়া দেখিলে মনে হয় যেন বায়ু অপেক্ষা ভারী একটা জিনিস বাহ্যিক কোনও 'মোটিভ ফোর্সের' জোরে বায়ু কাটিয়া চলিতেছে—ঠিক যেন একটা ঢিলের শূন্যে গতি। তৃতীয়ত, কাক সামাজিক বিহঙ্গ, কিন্তু তাহাদের সামাজিকতা স্টক্ এক্সচেঞ্জ বা হাটের সামাজিকতার মতো, কাজের কথায় আবদ্ধ। কাকের দল পায়রার মতো দল বাঁধিয়া বসিয়া অসার আড্ডা দিতেছে তাহা কখনও দেখা যায় না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকের বস্তুসত্তা ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা থাকিলে চিত্রকর কখনও কাকের এই বস্তুধর্মগুলি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে কাকের শরীর অত্যন্ত কোমল ও কমনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের ওড়া ভাসিয়া থাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাকের সামাজিকতা পদ্মপত্রে জলের মতো সংযোগ ও বিয়োগের একেবারে নিক্তিধরা 'ইকুইলিব্রিয়াম' না হইয়া প্রায় প্রেমাবিষ্ট নরনারীর আলিঙ্গনের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলির টান, কালির ঘনতা-লঘুতা ও কম্পোজিশ্যনের ফলে গগনেন্দ্রনাথের কাক 'রিফর্মড' ও 'রোমান্টিক' কাকে পরিণত হইয়াছে—যেন গগনেন্দ্রনাথ কাকের ওকালতি করিয়া কাকের প্রতি আমাদের স্নেহ জন্মাইতে চাহিতেছেন। ইহার অর্থ—দৃশ্যে আবেগের প্রবেশ।

কিংবা 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণের সহিত প্রকাশিত তাঁহার দৃশ্যচিত্রগুলির কথা ধরুন। এই চিত্রগুলিতে আমরা যে শুধু চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা অনুভব করি তাহাই নয়—বরঞ্চ তাহা বড় একটা করিই না—আমাদের মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিসগুলির অতিরিক্ত একটা ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই ভাবাবেশের স্বরূপ কি তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায়। এই ছবিগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্যগুলি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চিত্রে যতটা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৯ পৃষ্ঠায় বটগাছের গোড়ার একটি ছবি আছে। প্রাচীন বৃক্ষের গোড়ার একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণ (সুতরাং গুণোপলব্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট রসও) আছে। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে তাহা উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা নাই, তিনি এই গাছটির সহিত জড়িত রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকেই বিষয়বস্তু করিয়া লইয়াছেন।

> "পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারের জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—
>
> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,<br>
> ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?"

গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বটে, শুধু বট গাছ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনও আসিয়া পড়িয়াছে। ৯৮ পৃষ্ঠায় "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে," ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় "আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না" এই দুটি চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনা মিলাইয়া দেখিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হইবে।

অনেকেই বলিবেন, চিত্রকর যদি কবির মনোভাবকেও এভাবে ধরিয়া দিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই তো তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সার্থক একদিক হইতে হইয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন্ দিক হইতে হইয়াছে তাহা বোঝা দরকার। এক প্রকার দেখা ও অন্যপ্রকার দেখাতে সুগভীর পার্থক্য আছে। গগনেন্দ্রনাথের এই চিত্রগুলিতে যে দৃষ্টির পরিচয় পাই, উহার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এই চৈতন্য মনস্তাত্ত্বিকের চৈতন্য নয়, কবির চৈতন্য—অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর সহিত অন্য ভাব অর্থাৎ আবেগ বা ধারণার যোগ। শুধু এইভাবে দেখিলেই যে আমাদের দেখা জীবন্ত ও তীব্র হইয়া উঠে তাহা নয়; রবীন্দ্রনাথ যাহাকে চৈতন্য বলিয়াছেন উহা বর্তমান না থাকিলেও আমাদের দৃষ্টি সমানভাবেই তীক্ষ্ণ, অর্থগ্রাহী ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। তখন দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অর্থগ্রাহিতা ও আনন্দসঞ্চার করিবার ক্ষমতা আসে দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তুর একাত্মতা হইতে। এই দৃষ্টির কথাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার "টিনটার্ন অ্যাবী" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার ৬৬-৮৫ পংক্তিতে বলিয়াছেন, এবং দৃষ্টির ফলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা এই কবিতারই ৩৭-৪৫ পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টি চৈতন্যনিরপেক্ষ, সাধনার আনন্দের মতো। যে সকল চিত্রকর বিশুদ্ধ দৃশ্যের সহায়তায় আমাদিগকে বস্তুসত্তা উপলব্ধি করান, তাঁহাদের চিত্র হইতে আমরা এই জাতীয় রসই উপভোগ করি। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের রস স্বতন্ত্র।

চিত্রকলায় কিউবিস্ট 'মোটিফ' সর্বদাই বিশুদ্ধ নকশা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যেও গগনেন্দ্রনাথ যে আবেগ উদ্রেক করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কালো-শাদায় কিউবিস্ট ধাঁচে অঙ্কিত গৃহাভ্যন্তরের চিত্র হইতে এই গৃহাভ্যন্তর আমাদিগকে শুধু বস্তুসত্তা উপলব্ধি করাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, আমাদের মনে একটা অলৌকিক মায়াপুরীর ধারণা জন্মাইয়া ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করে।

ব্যঙ্গচিত্র ও উপাখ্যানমূলক চিত্র স্বভাবতই আবেগ বা ধারণাত্মক, সুতরাং গগনেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর যে-সব ছবি আঁকিয়াছেন উহারা যে আমাদের মনে এই ধরনের ভাবেরই সঞ্চার করে তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গগনেন্দ্রনাথের সব চিত্রেরই প্রধান লক্ষণ—আবেগ ও ধারণার সংযোগ, ইংরেজিতে আমি যাহাকে বলিয়াছি—"ইমোশ্যনাল অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল সিগ্‌নিফিক্যান্স অফ্ থিংজ।" এই সকল 'ইমোশ্যন' ও 'আইডিয়া' বা আবেগ ও ধারণাকে সংক্ষেপে "ভাব" বলা যাইতে পারে। এই ভাবেরই উপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত—এই কারণেই তাঁহার চিত্রধর্মকে আমি প্রথমেই ভাবাত্মক বলিয়াছিলাম।[৮]

## ভাবের রোমান্টিকতা

গগনেন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসাবে শুধু যে ভাবধর্মী তাহাই নয়, তাঁহার ভাবেরও একটা বিশিষ্ট নিজস্ব ধর্ম আছে। চিত্রের ভাব সাহিত্যের ভাবের মতোই নানাপ্রকারের হইতে পারে। উহাতে নৈতিক উপদেশ যেমন থাকিতে পারে, তেমনই নিছক তামাশাও থাকিতে পারে; করুণ বা বাৎসল্য রস যেমন থাকিতে পারে, তেমনই বীর বা রুদ্ররসও থাকিতে পারে। স্প্যানিশ চিত্রকর গোইয়া ভাবধর্মী, তাঁহার চিত্রে সাধারণত মানবজীবনের দুঃখ, গ্লানি, অবিচার, উৎপীড়ন, লালসা, হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবের দিক হইতে রাফায়েল্‌ বা মুরিলোর চিত্র কখনও সাধারণ মানুষের স্নেহ মমতার স্তর ছাড়াইয়া

৮ একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ নিতান্তই আবশ্যক মনে করি। "মন্দির-দ্বারে" চিত্রটি নামেও উদ্দেশ্যের দিক হইতে আখ্যানমূলক ও ভাবাত্মক, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দৃশ্যমূলক ও বস্তুসত্তাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখুঁত ড্রয়িং ও কম্পোজিশানের সহায়তায় এই চিত্রটি আমাদের দৃষ্টিকে মুহূর্তের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং চিত্রার্পিত দৃশ্যটি বিশুদ্ধ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু হিসাবে আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ করে। এই ছবিটি ভাবের উদ্রেক করেই না বলা চলে। এই ধর্মের আভাস গগনেন্দ্রনাথের কোনও কোনও চিত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর কোথাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগদীশের ধ্যানভঙ্গ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

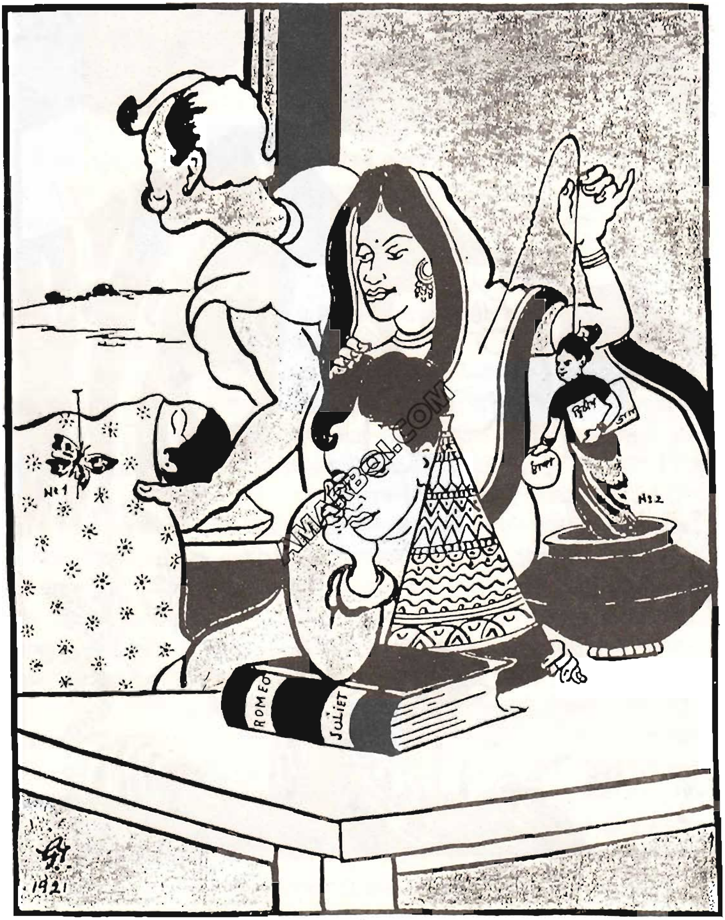


ক'নের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো বাংলার গঙ্গাযাত্রা : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে নাই। গগনেন্দ্রনাথের ভাবের বিশেষ ধর্ম—উহা রোমান্টিক। তাঁহার এই রোমান্টিক ভাবের একটা নিজস্ব চেহারা ও সুর আছে। উহা ব্যক্তিগত সুতরাং অকপট। গগনেন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক পথ ধরিয়াছেন উহা ছাঁচে ঢালা রোমান্টিকতা নয়, অনুকরণও নয়।

এই রোমান্টিকতার কয়েকটা বিশিষ্ট লক্ষণ ধরিতে পারা যায়। প্রথমত, উহাতে সুদূরের প্রতি একটা টান আছে, কালের দূরত্বের কথা বলিতেছি, দেশের সুদূরত্বের নয়। রোমান্টিক কবি বা চিত্রকর মাত্রেই সুদূর দেশের ঘটনাবলী বা দৃশ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন। দ্যলাক্রোয়ার "কিয়সের হত্যাকান্ড", গেরিকোর "মেডুসা জাহাজের ভেলা" ও জেরারের "মিসেনাস অন্তরীপে করিনা"র কথা স্মরণ করুন। গগনেন্দ্রনাথ কিন্তু সুদূরের অন্বেষণে সুদূর দেশে একেবারেই যান নাই! তাঁদের সব চিত্রই তাঁহার নিজের চোখে দেখা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ। বরঞ্চ চিত্রের ভিতর দিয়া দেশ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়—কলিকাতা, উত্তর-নদীয়া ও পাবনা অঞ্চল, এবং বীরভূম, ব্যস ওই পর্যন্ত। কলিকাতার মধ্যেও আবার তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজেকে শ্যামবাজার, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, চোরবাগান অঞ্চলেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে নূতন কলিকাতার নামগন্ধও নাই। এমন কি তিনি যে স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা আঁকিয়াছেন, তার সবগুলিই খানদানী কলিকাতাবাসীর মুখ। তাঁহার ব্যঙ্গচিত্রে যে মুখ দেখা যায়, তাহা কলিকাতার বাহিরে বাংলার কোথাও মিলিবে না।

দেশসম্পর্কে এত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও গগনেন্দ্রনাথ সুদূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন কালের ব্যবধান টানিয়া। পুরীর মন্দিরের দৃশ্য যে ছবিটিতে আছে, উহা বিবেচনা করুন। বর্তমানে পুরীর মন্দিরের যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় উহা চিত্রে সম্বদ্ধ করিয়া গগনেন্দ্রনাথ অতিসহজেই এমন একটি দৃশ্য দেখাইতে পারিতেন যাহা আমাদিগকে মেরিয়োঁর এচিং-এর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি কিন্তু উহার ধার ঘেঁষিয়াও যান নাই, শত শত বৎসর পিছাইয়া গিয়া নীলাচলের সেই রূপ দেখাইয়াছেন যাহা চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

অনেক সময়ে আবার গগনেন্দ্রনাথ এতদূরও যান নাই, "দূরত্ব-রস" ফুটাইবার ও উপভোগ করিবার জন্য অন্য একটা পথ ধরিয়াছেন। কাল গণনা করিলে বাল্যকাল পূর্ণবয়স হইতে বেশি দূর নয়, কিন্তু উপলব্ধির দিক হইতে বহু দূরে মনে হয়। ইহার কারণ বাল্যের চৈতন্য ও পূর্ণবয়সের চৈতন্যের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই চৈতন্যবৈষম্যের জন্যই বাল্যকালকে পৃথিবীর শৈশবের সমতুল্য সুদূর অতীতের মতো জ্ঞান হয়। চিত্রে বাল্যে দৃষ্ট দৃশ্য বা মুখচ্ছবি আঁকিয়া গগনেন্দ্রনাথ দূরত্বের ধারণা জন্মাইয়াছেন। যে কলিকাতার দৃশ্য তিনি আঁকিয়াছেন, উহা সমসাময়িক কলিকাতা নয়, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেকার কলিকাতা। ড্যানিয়েলের আঁকা ছবি দেখিলে মনে যেমন একটা রোমান্টিক ভাব জাগে, গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্র দেখিলেও তেমনই বহুবিস্মৃত জিনিসকে স্মরণ করিলে যেমন হয় তেমনই একটা সকরুণ ব্যাকুলতা জাগে। গগনেন্দ্রনাথের অন্য চিত্রেও অবিরত পুরাতনের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—ব্যঙ্গ চিত্রগুলিতেও ইহার অপ্রতুল নাই।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিকতার আর একটা লক্ষণ—লোকোত্তর অনুভূতির প্রতি আসক্তি। লৌকিক জগতের লৌকিক অনুভূতিতে তাঁহার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কোনও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত কাহিনী বা ঘটনাকে পরিচিত লক্ষণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদাই নূতন আশ্লেষ এবং বিশ্লেষের ("অ্যাসোসিয়েশ্যন" ও "ডিস্যাসোসিয়েশ্যন") সহায়তায় পরিচিত বস্তুকে অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "নবহুল্লোড়" শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্রমালায় অপ্রত্যাশিত আশ্লেষের দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। একটি—জগদীশের ধ্যানভঙ্গ; অপরটি—বুড়োবাংলার গঙ্গাযাত্রা। দুটি ব্যঙ্গচিত্রেরই বিষয় নন-কোপারেশ্যন আন্দোলন। প্রথম চিত্রটিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্রুতিকটু ধ্বনির সহিত জগদীশচন্দ্রকে যেভাবে যুক্ত করা হইয়াছে, ও দ্বিতীয়টিতে সমসাময়িক জনসভার প্যান্ডেলে বাংলার প্রাচীন আভিজাত্যকে যেভাবে টানিয়া আনা হইয়াছে, উহা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই অসঙ্গতিপূর্ণ। এই সংযোগের সম্ভাবনা আগে আমাদের মনে জাগেও নাই বলিয়াই যেন উহা আরও বেশি রসসঞ্চার করে। রেমি দ্য গুঁস্মো এই নূতন আশ্লেষকে বাহবা না দিয়া পারিতেন না।

অন্য চিত্রের মধ্যেও উহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে "বিজয়ার দৃশ্য", "অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা" এবং "উদয়-সাগরের তীরে পদ্মিনী", এই তিনটি ছবির উল্লেখ করা যায়। বিজয়ার দৃশ্য আমাদের যেমন পরিচিত, পদ্মিনীর উপাখ্যান এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীও আমাদের কাছে তেমনই জানা। কিন্তু নাম না দেখিয়া ছবি তিনটি দেখিলে, অতিপরিচিত বিষয়ের ছবি দেখিতেছি তাহা সহজে মনে হইবে না। কিন্তু নাম দেখামাত্র মনে একটা বিস্ময়-উদ্দীপক ধাক্কা লাগিবে। তবে চিত্রকরের অভিনবত্ব অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না, শুধু মনে হইবে পুরাতন জিনিস রূপান্তরিত হইয়া নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। এই নূতন রূপের মধ্যে পরিচিতকেই দেখিতেছি, কিন্তু উহা জলেস্থলে যে আলো কেহ কখনও দেখে নাই তাহার রশ্মিপাতে বিস্ময়ময় হইয়া উঠিয়াছে।

গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার তৃতীয় লক্ষণ—সূক্ষ্মতা। শুধু সূক্ষ্মতা বলি কেন—এই সূক্ষ্মতা সূক্ষ্মতার স্তর ছাড়াইয়া ছায়াজগতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড ও ডন জুয়ানের সহিত কীটসের "লা বেল দাম সঁ মেয়ার্সি" বা কোলরিজের "ক্রিস্টাবেলের" যে প্রভেদ সাধারণ রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনুভূতির সেই প্রভেদ। এই ধরনের রোমান্টিক ব্যাকুলতাই পেটার মোনা লিজার বর্ণনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কালিদাসও উহারই আভাস দিয়াছেন। অদৃষ্টপূর্ব রূপ চাক্ষুষ করিবার যে প্রয়াস আমরা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যে পাই, তাহা সব সময়েই সফল হইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু অন্তত ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়—গগনেন্দ্রনাথ—"চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"

গগনেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রাবলীতে দুইটি বিভিন্ন ধারায় এই রোমান্টিক অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত, তিনি বাস্তব জগৎ ও জীবনের দৃশ্যের মধ্যে রোমান্টিক রস খুঁজিয়াছেন, এই সকল দৃশ্যের রোমান্টিক রূপ দিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পর বা কোনও কোনও মুহূর্তে তাঁহার রোমান্টিক মনোভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, বাস্তব জগতের কাঠামোর মধ্যে তিনি আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তখন এই রোমান্টিক অনুভূতি বাঁধন ছিঁড়িয়া নিজের জগৎ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, নিজের জগৎ সৃষ্টি না করিতে পারা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। এই কারণে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে রহিয়াছে বাস্তব জগতেরই চিত্র, রোমান্টিক রসাশ্রিত; অন্যদিকে রহিয়াছে, একেবারে অবাস্তব ও কাল্পনিক একটা রোমান্টিক জগৎ। শেষোক্ত জগতে পৌঁছিয়া গগনেন্দ্রনাথ রোমান্টিক অনুভূতির স্রোতে একেবারে গা ভাসাইয়া


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়াছেন,—বাস্তবকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের রোমান্টিক দৃষ্টির অনুকূল করিয়া লইয়াছেন ; এবং বাস্তবের সহিত ততটুকুই সম্পর্ক রাখিয়াছেন যতটুকু না রাখিলে লোকের মনে প্রত্যয় জন্মান যাইবে না।

কোনও রোমান্টিক ঔপন্যাসিক উপন্যাসে নিজের রোমান্টিক অনুভূতিকে তৃপ্ত করিতে না পারিয়া যদি রূপকথাও লিখিতেন তাহা হইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখিতে পাইতাম, চিত্রের ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি দুইটি শ্রেণীতে পড়ে—একদিকে "চিত্রোপন্যাস", আর একদিকে "চিত্র-রূপকথা"। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই "দ্বিমুখীনতা" একেবারে বিরল নয়, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে উহার কথা পড়ি নাই।

**বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০**

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

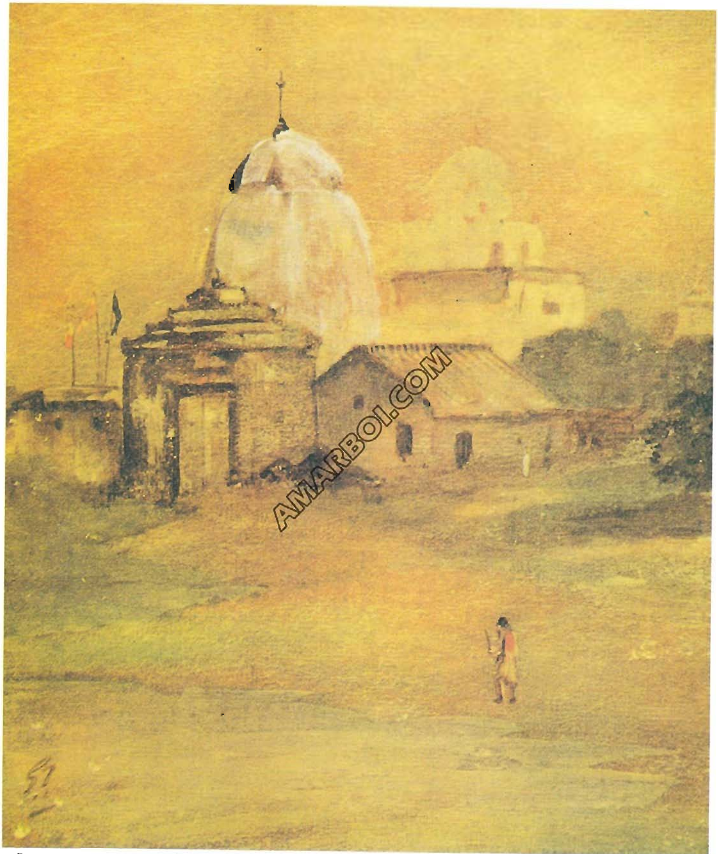


পুরীর মন্দির : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত ভাই চম্পা : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুষার প্রাসাদ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

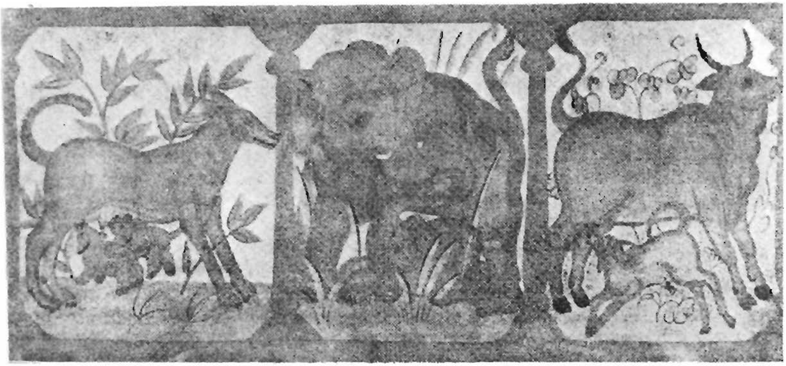

জননী : নন্দলাল বসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

উদয়-সাগরের তীরে পদ্মিনী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

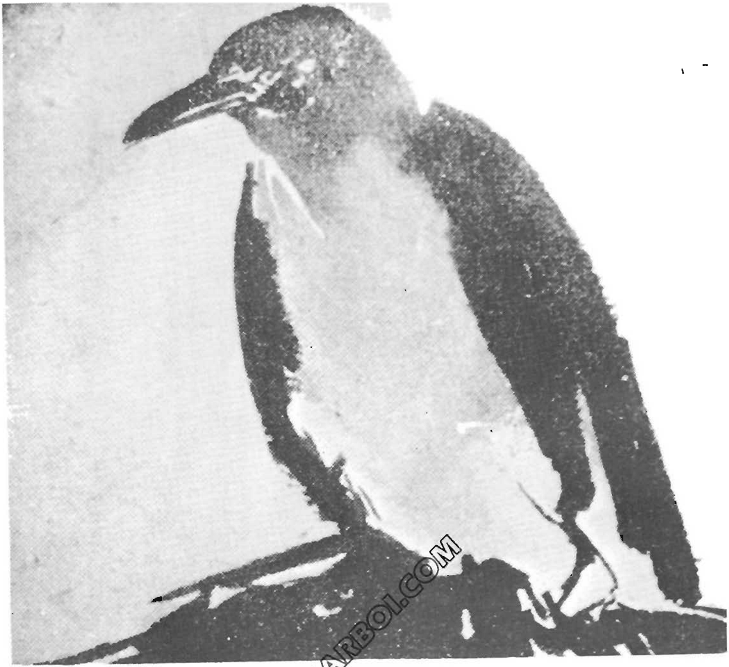

কাক : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AMARBOI.COM

নির্জন বাড়ি : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল

নন্দলাল বসুর বয়স এখন একাত্তর বছর হল। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিল্পচর্চা করেছেন। এই সময়ের কিছুটা তাঁর কেটেছে নবিশি করে, কিছুকাল তিনি ছিলেন কারিগর, শেষে আচার্যের গুরুদায়িত্ব বর্তালো তাঁর ওপর। নব্য ভারতীয় কলমের ভ্রাতৃসংঘের আদি সদস্যদের তিনি অন্যতম। এই ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে যদি আমরা ফরাসি দেশের ইমপ্রেসেনিস্ট ভ্রাতৃসংঘ বা বিলাতের প্রি-রেফেলাইট ভ্রাতৃসংঘের তুলনা করি তাহলে একটা তফাৎ ধরা পড়বে। ফরাসি এবং বিলাতি ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন এবং প্রত্যেকের অধিকার সমান ছিল। নব্য ভারতীয় কলমের কিন্তু একজন প্রধান ছিলেন, যাঁকে গুরু বলে মানতেন ওঁরা সকলে। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চা এবং শিল্পানুরাগে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব খুবই গভীর। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সরকারিভাবে তাঁকে শিল্পকলা শিখিয়েছেন, বাড়িতেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে গুরুর মতো দেখিয়েশুনিয়ে দিয়েছেন। তবুও নব্য ভারতীয় কলমের পরিণত রূপের জন্য নন্দলালের অবদান অবনীন্দ্রনাথের তুল্যমূল্য। এই কলমের সকল শিল্পীর মধ্যে তিনজন প্রধান। তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু। রেখাঙ্কন, নকশা, কল্পনাশক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কাজের বহর তুলনা করলে এ-কথা মনে হতে পারে, নন্দলাল বসু তাঁর দুই সমসাময়িকদের চেয়ে হয়তো বড় শিল্পী।

নন্দলাল বসু আপন কলমের অন্যান্য শিল্পীর তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন। নব্য ভারতীয় শিল্পকলার অভিব্যক্তিকে তিনি অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রথমদিকের কাজ, যেমন ধরুন "সীতার অগ্নিপরীক্ষা" আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি এগুলি পোর্টফলিও আকারে ছেপে বের করেছিল। ঐ ছবিটি সূক্ষ্ম অঙ্কন এবং বর্ণপ্রয়োগে তিনি এঁকেছিলেন অণুচিত্র (মিনিয়েচার)-এর শৈলীতে। মুঘল এবং রাজপুত কলমের শেষ দিকের পরিণত কাজের সঙ্গে এই ছবিটিকে সমান আসন দেওয়া যায়। এরপর কিছু রেখাচিত্র আঁকলেন যেগুলির রেখাঙ্কন এবং রচনাসৌকর্যে অজন্তার গভীর প্রভাব পড়ল। এসব অবশ্যই অজন্তার ওপর লেডি হেরিংহামের সুপরিচিত গ্রন্থের জন্য ছবি আঁকার প্রত্যক্ষ ফল। ১৯১৭ সাল থেকে নন্দলাল তাঁর অনুসৃত চিত্ররাজির রীতিপদ্ধতির প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব শৈলী এবং কলাকৌশল আবিষ্কার করলেন। আজকের ভারতবর্ষে তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশিষ্ট চিত্রকর। তাঁর হাতে আঁকা কোনও ছবিকে কোনও কলম বা অন্য কোনও শিল্পীর কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া বা গুলিয়ে ফেলা যাবে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক শিল্পী— কবি, চিত্রকর কিংবা সুরকার— পর্যায়ক্রমে যে আবর্তে পরিণতিতে পৌঁছন নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনে সেই চক্রাকার আবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে এঁরা অনুকরণ করেন, মাঝখানের পর্যায়ে তাঁদের কাজে বহির্মুখী প্রবণতা দেখা যায়। এই সময়ে অতীতের বন্ধনমুক্ত হয়ে একা চলতে শুরু করে ক্রমে সমসাময়িকদের মধ্যে নিজের আলাদা আসন করে নেন তাঁরা। তখন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করেন এবং আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। শেষে সর্বস্ব পণ করে তাঁরা ধ্যানে মগ্ন হয়ে অনুকৃতির সকল অভ্যাসের মায়ামোহ মুক্ত হন। এরপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন হৃদয়ের চিন্তাভাবনা ঢেলে দিতে তাঁদের আর ভাল লাগে না, কারণ জনসাধারণের বেশিরভাগেরই নতুন শিল্পকৃতিকে স্বাগত জানানোর মতো প্রস্তুতি থাকে না। তখন শিল্পীরা বাণপ্রস্থ নেন অন্তর্লোকে। সম্পূর্ণভাবে তাঁরা অন্তর্মুখী জীবনযাপন শুরু করেন। শুদ্ধ আনন্দ এবং বেদনায় সৃষ্টিলীলা শুরু করেন। লক্ষ্য থাকে একটাই, হৃদয়কে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের গরিমা মহিমায় ভরে তুলে আপন শিল্পকর্মে সৃজনশক্তি সম্পূর্ণভাবে কাজে প্রয়োগ করার দিকে। এসব কথা নেহাৎ বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু মহৎ শিল্পীর বিষয় আলোচনার সময় তাঁর মনের তুরীয় এবং উচ্চমার্গের বিচরণের কথা বাদ দেওয়া যায় না আদৌ। সে যাই হোক, নন্দলাল বসু নবিশি থেকে শিল্পকৃতির স্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হলেন।

এই উত্তরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি না তাঁর মনে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতো, হয়তো সেটা সজ্ঞান নয় কিন্তু সজ্ঞাপ্রসূত তো বটেই এবং তদুপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুঃসাহসের অভাব তাঁর ক্ষেত্রে কখনই দেখা যায়নি। নন্দলাল বসু অস্থিরভাবে রূপবন্ধ এবং কলাকৌশলের পরীক্ষা করে গেছেন সতত। রঙের গুঁড়োমশলা থেকে শুরু করে কি দিয়ে রঙ গোলা হবে এসব নিয়ে যেমন পরীক্ষা করেছেন তেমনি দৃশ্যমান জগতের সৎস্বরূপ আবিষ্কার এবং উপলব্ধি এবং নামরূপ জগতের বস্তুগত তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। অর্থাৎ, কৌশল থেকে ভাব, সব বিষয়ই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নব্য ভারতীয় কলমের বেশিরভাগ শিল্পীর সম্বন্ধে এ-কথা হয়তো বলা যায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে শিল্পীজীবন শুরু করলেও, কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা আর অগ্রসর হননি, একটা বিশেষ "শৈলীর" কর্দমে তাঁদের রথচক্র দেবে বসে গেছে। নন্দলাল বসু সতত চঞ্চল হয়ে আগুয়ান হলেন বলে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন, যদিও সমকালীন শিল্পীদের এই বাঁক নেওয়াটা একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াও অবশ্যই।

ইদানীং কোনও শিল্পী তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর শিল্পকর্মের ওপর অমোঘ "নিয়ন্ত্রণের" নিরাপদ দুর্গে অধিষ্ঠানের সুখ একালে আর ভোগ করতে পারেন না। আধুনিক সময়ে, ইদানীংকার সমাজে, সেই নিশ্চয়তা, স্থিরতা এবং ভোক্তাদের সুরুচিপূর্ণ বোধের ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারেন না সমকালীন কোনও শিল্পী। অথচ প্রাচীন গ্রিস এবং রেনেসাঁসীয় ইতালিতে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করতেন বলেই তাঁদের শিল্পকর্ম বিকার বা বিপথগমন থেকে রক্ষা পেত। সমকালীন প্রতীচ্যের শিল্পীদের যদি এমন সমস্যায় পড়তে হয়ে থাকে, তবে সংকটের রূপ ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে আরও কতই না ভয়াবহ। সুতরাং প্রবৃদ্ধির দরুনই আধুনিক শিল্পকলা অবশ্যই আত্মসচেতন, সমন্বয়বাদী স্ববৈপরীত্যে আক্রান্ত এবং প্রায়শ লক্ষ্যভ্রষ্ট। আধুনিক শিল্পীকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাগৈতিহাসিক পুরাতন প্রস্তরযুগের শিল্পকলা থেকে শুরু করে আজকের ভবিষ্যবাদী এবং অভিব্যক্তিবাদী রূপবন্ধের রূপান্তরকে অনুধ্যান করতে হয় এবং এটা করার জন্যই তাঁকে মধ্যবর্তী পর্যায়ের রেনেসাঁস, বারোক, মুঘল, রাজপুত, চৈনিক এবং


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাপানী চিত্রকলার বিষয় জানতে হয়। আশ্চর্যের কি যে এই গহীন-বনে সমকালীন শিল্পী পথ হারিয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়ান। কিংবা তাঁদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে নানান যুগের এমন কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস অনুকরণ করার প্রবণতা থেকে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারেন না এমন নজিরও আছে। এই লোভেই তাঁরা মারা পড়েন।

পূর্বসূরীদের কাজ হুবহু না টুকে কোনও শিল্পী যদি সেটাকে ঢেলে সাজতে পারেন এবং পাখির মতো যত্রতত্র থেকে নানা বিচিত্র জিনিস এনে বাসা বাঁধার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন, তবেই কেবল শিল্পকলার অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন। আধুনিক শিল্পী পূর্বসূরীদের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধ্যান করবেন এটা রীতিসিদ্ধ। কিন্তু যদি অনুকরণ করেন এবং নানা প্রভাবের চিহ্ন তাঁর কাজে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। বরং এসব থেকে তাঁর ব্যক্তিগত শৈলী তৈরি করবার রসদ পাওয়া উচিত এবং অবশ্যই অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাপ্তি এবং বিস্তার লাভ করার কথা। আধুনিক শিল্পকলার মহারথীদের সম্বন্ধে এ-কথা বলতে পারা চাই যে পূর্বজ কলমগুলি না থাকলে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হতো না, কিন্তু তাঁদের কাজ দেখে যদি ধরা যায় যে এটা ওখান বা সেখান থেকে নিয়েছেন তাহলেই চিত্তির।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্যিই কঠিন। তবে আমার মতে, সে-মতের মূল্য যাই হোক, নন্দলাল বসু সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রায় কুড়ি বছর আগে তাঁকে পুরাতন প্রস্তরযুগের শিল্পকলার ওপর একটি সচিত্র গ্রন্থ দেখাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কৌতূহলে তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল তিনি যেন বিস্মরণের ওপারে গিয়ে বিস্ময়ে দেখলেন কিভাবে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী শিশুর সারল্যে দৃশ্য জগতের আকারের ধাঁধার সমস্যা সমাধান করেছে, কিভাবে রূপ ধ্যান করেছে, এবং পরিশেষে আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ এবং তীব্র ছিল বলেই কিভাবেই বা আকারের মৌলিক ব্যাপারটা সার্থকভাবে রূপায়িত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বস্তুত তাঁদের ভাগ্যবান উত্তরসূরী প্রযুক্তির নানা উপকরণও সত্ত্বেও এমনটি তো পারেননি। আমার এক বন্ধু আমার কাছে গল্প করেছেন তিনি একবার গিয়ে দেখেন নন্দলাল বসু একটা তালগাছের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নন্দলাল অতি সরলভাবে সোজাসুজি উত্তর দিলেন, বড় পাতার যথাযথ আকারটা কিরকম সেটা ধরার চেষ্টা করছিলুম। তাঁর কাছে এমন উত্তরই প্রত্যাশিত ছিল। তিনি তো সহজভাবে দৃশ্যজগৎটা দেখবেন। কোনও পূর্বধারণার কলঙ্ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করবে না। অন্য শিল্পীর কাজের ধারা থেকে দরকারী কিছু পেলে তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু তাঁর কাজের নিজস্ব ধারা, রূপবন্ধের ধরন এবং ব্যক্তিগত অনুভবের সঙ্গে যদি কোনও কিছু না মেলে তবে তার কিছুই গ্রহণ করবেন না।

ছোট নিবন্ধে নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবন এবং শিল্পকর্ম সম্বন্ধে চুম্বক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও এসব ক্ষেত্রে চুম্বকের কথা উঠতে পারে কিনা সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। চুম্বকটা হল এই : নন্দলাল বহু কষ্ট করে রূপবন্ধ, রচনাসৌকর্য এবং কলাকৌশল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে নিজস্ব শিল্পী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন সফল হতে পেরেছেন। তথাপি তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব, যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং কলাকৌশলের যোগফল, যদি সেই প্রসঙ্গে কিছু না বলি তবে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নন্দলাল বসুর শিল্পকলা পারসিক, ভারতীয়, চীনা, জাপানী রৈখিক ধারণা সঞ্জাত। অর্থাৎ যখন তাঁর কোনও আলেখ্য দর্শন করি তখন যেটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে সেটা হলো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জীব এবং বস্তুর অবয়বের সীমারেখা। এইরকম ভাবে ছবি আঁকতে হলে অঙ্কনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। সীমারেখার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য উৎসারিত ছন্দের আবেদন যদি শিল্পীকে তৈরি করতে হয়, তাহলে তাঁর অঙ্কনক্ষমতা যথাযথ হলেই চলবে না। কিন্তু নান্দনিক বিচারে তাঁকে হতে হবে জোরালো, এবং ছন্দিত। নন্দলাল বসু এতটা সাফল্য লাভ করতে পারতেন না যদি না তাঁর আয়ত্তে থাকতো এমন রেখাঙ্কন।

কিন্তু তিনি এখানেও থেমে থাকেননি। তাঁর প্রথমদিকের কাজে যেমন এবং পরিণত বয়সের কাজেও তেমনি রেখার প্রাধান্য আছে। তথাপি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শেষদিকের কাজে দেখা যায় তিনি ভাস্কর্যগুণান্বিত ভাবটা ধরার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে রৈখিক বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ না করে। এসব কাজে জীবের অবয়ব এবং বস্তুর আকার নতোন্নত ভাস্কর্যের মতো পট থেকে বেরিয়ে আসে। যেখানে তাঁর কাজে বর্ণছায়ের প্রাধান্য সেখানেও নতোন্নত ভাস্কর্যের মতো তারা উঠতে থাকে। এইভাবে তিনি তাঁর শৈলীর বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। মাইকেল এঞ্জেলো নিজের পরিচয় দিতেন ভাস্কর বলে, চিত্রকর বলে নয় এবং তাঁর চিত্রাবলী অবশ্য ভাস্কর্যদৃষ্টির ফসল। কিন্তু তিনি, চারিদিক প্রদক্ষিণ করা যায় এমন মূর্তির ভাস্কর, যাঁকে বাধ্য হয়ে ছবি আঁকতে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ের নন্দলাল বসুর কাজকে নতোন্নত দ্বিমাত্রিক ভাস্করের চিত্র বলা যায়।

নন্দলাল বসুর পরিণত জীবনের কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সেগুলি বীরাত্মক ভাব রঞ্জিত। নব্য ভারতীয় কলমের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের বীরব্যঞ্জক ছবি আঁকার জন্য হয়তো পুরাণ, কিংবদন্তী বা ইতিহাসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না। নন্দলাল বসু এককালে এমন ছবি যে আঁকেননি তা নয়। এখন তিনি ইচ্ছা এবং চেষ্টা করে এমন ছবি আঁকাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তাও নয়। কিন্তু তিনি সমকালীন জীবনের একটা দৃশ্যেরও এমন উত্তরণ ঘটাতে পারেন। বিষয়বস্তু নয়, তাঁর বীরত্বব্যঞ্জনা আছে তাঁর ব্যবহার এবং ধরনে। এমন কি ছটা পশু এবং একটি মানব মাতা নিয়ে তিনি যে মজার পাটা এঁকেছিলেন বহু বছর আগে তার মধ্যে এই বীরভাব আছে। জোরালো অঙ্কন, মধুর ভঙ্গি— মানবী বা পশুগুলির মধ্যে— সবকিছুই এই ভাবমাধুর্যমণ্ডিত। ছোট ছোট ছবিগুলিকে বিরাট বিস্তারিত ভিত্তিচিত্র হিসাবে ভেবেছেন সেটা স্পষ্ট।

শেষ করবার আগে বলব, নন্দলাল বসু, ১৯০৫— বর্তমান পর্যন্ত নব্য ভারতীয় কলমের গতিপথ অনুসরণ করেননি। নন্দলাল বাদে বাংলা কলমের অন্যান্য শিল্পীদের ক্ষেত্রে ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল মুঘল, রাজপুত অণুচিত্রের অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে ওঁদের কাজে অজন্তা, বাঘ, চীনা এবং জাপানী ছবির প্রভাব পড়ল এবং শেষে আত্মসন্তুষ্টভাবে পুরানোর পুনরাবৃত্তিই শুরু হয়ে গেল, আজ যেমন তরুণেরা অপেক্ষাকৃত কম আত্মতুষ্টভাবে ইমপ্রেসেনিজমের এবং পরবর্তী চিত্ররীতির অনুকরণ করছেন। নন্দলাল কিন্তু অলসগতি অনুকরণের গড্ডলস্রোতে গা ভাসাননি। তাঁর প্রতিভা শুধু নিজের জন্য, নিজের ধরনে ভগীরথ হতে পেরেছেন।

'মার্চ অব ইন্ডিয়া' ১৯৫৩ থেকে অনূদিত। দেশ বিনোদন ১৩৮৯, নন্দলাল জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# নন্দলাল বসুর একটি ছবি

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্টের ১৯২৬-১৯২৭ সনের প্রদর্শনীতে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ছবি আমার বেশ একটু চোখে ধরিয়াছিল। ছবিখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা। এই প্রদর্শনীতেই বসু মহাশয়ের আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র ছিল— কৃষ্ণার্জুন, নদীয়া, দুইখানি নৃত্যের ছবি ; কিন্তু এ-সকলের মধ্যেও যে ছবিখানার কথা প্রথমে বলিলাম সেখানি আঁকিবার ধরন ও বিষয়বস্তু উভয় দিক হইতেই আমার কাছে নূতন ঠেকিয়াছিল।

আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবুর মুদ্রাদোষ নাই ইহা তাঁহার চিত্রাঙ্কন-রীতির একটা কথা বটে, কিন্তু উহার চেয়েও বড় কথা, তাঁহার পটুয়া জীবন সচল— জীবন্ত নদীর মতো প্রবহমান। অনেকে হয়তো বলিবেন, এই শ্রান্তিহীন পরীক্ষণ-প্রীতির মধ্যে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কালাতীত সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুকূল নয়, নন্দবাবু এখনও তাঁহার রূপের আদর্শ ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই বহুবিধ 'স্টাইল' ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলেও নিন্দার বিষয় নাও হইতে পারে। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে— শুধু সুকুমার কলা কেন, ধর্ম, নীতি, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই এমন এক যুগ অবশ্য ছিল যখন সমাজ ও আদর্শের ভিত্তি অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মানুষের মনও সংশয়মুক্ত ছিল। তখনকার দিনে চিত্রকর বা শিল্পী প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যেই তাঁহাদের কাজের সুদৃঢ় অবলম্বন পাইতেন, রূপ ও বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যের জন্য তাঁহাদিগকে সজ্ঞানে নিজেকে ও জগৎকে পরীক্ষা করিতে হইত না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিসের ভাস্কর্য, রিনেসেন্সের কালে ইতালির চিত্রকলা, প্রাচীন চৈনিক ও জাপানী চিত্র, সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ও ফ্লেমিশ চিত্রাঙ্কন সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা বলা চলে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বশে আমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই যুগে মানবজাতির চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও গবেষণার প্রসার, যাতায়াত ও ভাব আদান-প্রদানের সুবিধা, শিক্ষা ও শিক্ষার ভানের অতি বিস্তার এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর একটা দুর্বহ চাপ আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে আমাদের সেই পুরাতন দ্বিধাহীনতাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শুধু চিত্রাঙ্কনের দৃষ্টান্তই লওয়া যাক না কেন— আজকাল যিনি ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয়, চীন জাপানের চিত্র হইতে শুরু করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। এই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তির ফল পাত্রের যোগ্যতা ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে— প্রথম, ক্লৈব্য ও জড়তা ; দ্বিতীয়, অনুকরণ এবং জোড়াতালি ও গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা, (আর্ট সম্বন্ধীয় পরিভাষায় ইহাকে Pastiche বলা হয়) ; তৃতীয়, অবিরত পরীক্ষা এবং জগতের 'আর্ট ট্রেডিশ্যন'গুলিকে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত রূপ দিবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টার সবগুলিই যে সফল হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই, কিন্তু দৈবক্রমে যদি একটি চিত্রেও প্রতিভার স্ফুরণ ও প্রচলিত রীতির মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমাদের এই অশান্ত যুগে ইহার অপেক্ষা বড় কীর্তি সম্ভবপর নয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশের বর্তমান যুগের বহু আর্টিস্ট সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারা যায় না, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাহা বলা চলে— অর্থাৎ তিনি এই তৃতীয় পর্যায়ের চিত্রকর। তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্যন্ত বহু চিত্রের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে চিত্রাঙ্কন রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। 'মিডিয়ম' সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও সুবিদিত। অথচ তাঁহার কোনও ছবিই বিশুদ্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না। নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহাকে স্বায়ত্ত ও নিজস্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়, এবং এই কারণেই তাঁহার চিত্রগুলি স্থায়ী হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

বর্তমান যুগের বাঙালি চিত্রকরদের মধ্যে নন্দবাবুর স্থান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তা স্পষ্ট হইল কিনা বলিতে পারি না। স্পষ্ট না হইলেও উপায় নাই, কারণ অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া মূল বক্তব্যই ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। নন্দবাবুর যে চিত্রটির কথা বলিতেছিলাম সেটি একটি ছোট টেম্পেরা প্যানেল। মাঝখানে একটি মানবী মাতা, শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া, দুই পাশে তিনটি করিয়া পশুমাতা, শাবকের স্তন্য দিতে রত। মাতৃমূর্তি, চিত্রকলাতে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের বিশিষ্ট দান। যীশু ও মাতা মেরীর পূজাকে অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় চিত্রকরদের বাৎসল্যের আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতালিয়ান চিত্রকরদের নিকট ওই বিষয়বস্তুটির আকর্ষণ আরও অনেক প্রবল ছিল। শিশুপ্রীতি ইতালিয়ান চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাই ইতালিয়ান চিত্রকরেরা নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে 'বাম্বিনো'কে আঁকিয়া তাঁহাদের মনের সাধ মিটাইয়াছেন। কালক্রমে মাতৃমূর্তি শুধু মাতা মেরী ও যীশুর চিত্রেই আবদ্ধ থাকে নাই, সাধারণ সাংসারিক চিত্রেও প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আমি যত দূর জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এই রেওয়াজটি হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাতৃমূর্তি অঙ্কন প্রসঙ্গে দুইটি চিত্রের কথা সকলেরই মনে পড়িবে। উহাদের একটি স্যার জসুয়া রেনোল্ডস-এর "ডাচেজ অব ডিভনশায়ার ও তাঁহার শিশু", অপরটি মাদাম ভিজে লেব্রাঁর "মা ও মেয়ে"। ইহাদের মধ্যে স্যার জসুয়া রেনোল্ডস-এর ছবিটির ভঙ্গি ও অঙ্কনরীতি আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে ম্যাডোনার চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে বর্তমান কালে মাতৃমূর্তি আঁকিবার যে ধারা দেখা দিয়াছে তাহাও ইউরোপের ম্যাডোনা মূর্তি হইতেই উদ্ভূত। তবে আমাদের দেশে মাতা ও পুত্রের একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত থাকায় মাতৃমূর্তি এখানে যশোদা ও গোপালে রূপান্তরিত হইয়াছে— বিদেশীর মাতা মেরী ও যীশুর চিত্র হয় নাই, আবার সাধারণ সাংসারিক চিত্রও হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু আবার এই মাতৃমূর্তিকে চৈতন্যের জননীরূপে আঁকিয়া ইহার একটি একান্ত বাঙালি রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩০ সনে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলিকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস-এর প্রদর্শনীতে "চৈতন্য-জননী" নামে নন্দবাবুর যে ছবিটি প্রদর্শিত হয় তাহা এই যুগের ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমার মনে হয়, "চৈতন্য-জননী"র মাতৃমূর্তির রূপ ও আদর্শ নন্দবাবুর কল্পনায় এই চিত্রটি আঁকিবার পূর্বেই আসিয়াছিল, কারণ ১৯২৬-২৭ সনের মাতৃমূর্তিটি ও "চৈতন্য-জননী"র মাতৃমূর্তির মধ্যে একটি আদল বর্তমান।

কিন্তু আগের ছবিটির বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নন্দবাবু যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার চেষ্টা পরে তিনি আর করেন নাই। বোধ করি এই নূতনত্বটুকু নিতান্তই খামখেয়ালির বশে হইয়াছিল, তাই কোনও বড় ছবিতে তিনি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। কিন্তু ছোট প্যানেলখানিতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা উপভোগ করিবার মতো একটি জিনিস। এ পর্যন্ত যাঁহারা মাতৃমূর্তি আঁকিয়াছেন তাঁহাদের কেহই মানবেতর মাতার কথা স্মরণ করেন নাই। নন্দবাবু পশুমাতাকে মানবী মাতার সঙ্গিনী করিয়া শুধু যে সমদৃষ্টি দেখাইয়াছেন তাহাই নয়, সূক্ষ্ম রসিকতারও পরিচয় দিয়াছেন। পরিহাস ও বাৎসল্যের অপ্রত্যাশিত সম্মিলনে এই সাতটি ম্যাডোনার চিত্র মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

এই তো গেল চিত্রটির বিষয়বস্তুর কথা। উহার আঁকিবার ভঙ্গি সম্বন্ধেও সামান্য কিছু না বলিলে উহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ছবি মাত্রেরই দুইটি দিক আছে— (১) উহার বিষয়বস্তু ও (২) উহার 'ডেকরেটিভ' বা আলঙ্কারিক মূল্য, এ-কথা সকলেই মানিয়া থাকেন ; কিন্তু গোল বাধে এ দুয়ের স্থান ও সম্পর্ক লইয়া। সাধারণ লোকে ছবিটি শুধু প্রতিচ্ছবি বলিয়াই ধরে, এবং সেজন্য ছবি দেখাকে কনে দেখায় পরিণত করিয়া চেহারা পছন্দসই না হইলেই অনর্থের সৃষ্টি করে। যে ছবিটির কথা বলা হইতেছে উহাতে মায়ের নাকটি অত্যন্ত লম্বা হইয়াছে বলিয়া একজন আমার নিকট অত্যন্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের আবার অতি-অসাধারণ একদল প্রতিপক্ষ আছেন। শেষোক্ত অতি-আধুনিক আর্ট-সমালোচকেরা চিত্রাঙ্কনকে প্রতিচ্ছবি বলিয়াই মানিতে প্রস্তুত নন। ইঁহাদের গোঁড়ামি প্রথমোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা কম উগ্র নয়, বোধ করি কম অন্ধও নয়। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, নিসর্গানুকরণই চিত্রাঙ্কনের মূল প্রেরণা। তাহা না হইলে মানুষ শুধু 'ডেকরেটিভ প্যাটার্ন' সৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, কারুকার্য ভিন্ন ছবি আঁকিবার বা মূর্তি গড়িবার কোনও চেষ্টা করিত না। চীনা, জাপানী, পারস্য দেশীয়, মোগল ও রাজপুত চিত্রের "ডেকরেটিভ" বা আলঙ্কারিক মূল্য খুবই বেশি। কিন্তু এই সকল চিত্রও যাঁহারা আঁকিয়াছেন তাঁহারাও মুখ্যত প্রতিচ্ছবি আঁকিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। আসল কথাটা এই, সকল চিত্রেই স্বভাবানুকরণ ও অলঙ্কার এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, ছবির এই দুইটি দিককে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করাই চিত্রাঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য 'মিডিয়াম' ও 'ফর্মেল' সৌন্দর্যের ধারণা, এই দুইটি জিনিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, শুধু সীমাবদ্ধই নয়, শৃঙ্খলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ড্রয়িং বা রেখাচিত্রের কথা বলা যাইতে পারে। রেখাচিত্র ছবি হিসাবে সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে, কিন্তু বর্ণ ও পূর্ণ "কিয়ারস্কুরো"বিহীন ছবি যে কখনও স্বভাবানুযায়ী হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

নন্দবাবুর বর্তমান চিত্রটিতেও প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যে চিত্রকরের 'ফর্মেল' সৌন্দর্যের ধারণা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে মাঝের প্যানেলটির মাতৃমূর্তির কথাই ধরা যাক। ইহাতে মা যেভাবে নুইয়া আছেন, তাহা শিশুর প্রতি স্নেহের ফলও হইতে পারে, আবার মাঝের ফাঁকা জায়গাটিকে সুসমঞ্জসভাবে ধরিয়া তুলিবার জন্যে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্রকরের একটি পিরামিড সৃষ্টির ফলও হইতে পারে। আবার মাতৃমূর্তির পিছনে যে তিনটি কলাগাছ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও 'ডেকরেটিভ' দিক হইতে না দেখিলে অবান্তর। এবারে জীব-জন্তুর প্যানেলগুলি দেখা যাক। উহাদের প্রত্যেকটিতেই গাছ আছে। এই গাছগুলি সম্পূর্ণ 'ডেকরেটিভ'। তারপর হাতির বাচ্চাটি। হাতির ছানার সম্মুখের পা দুটি যেভাবে আঁকা হইয়াছে, কোনও সত্যকার হস্তিশাবক সেভাবে পা রাখে না। কিন্তু রেখাপাতের সৌন্দর্য বিবেচনা করিলে এই রূপে পা দুটি আঁকা অন্যায় হইয়াছে এ-কথা বলিতে পারি না। এইরূপে সমস্ত ছবিগুলি দেখিলে এই জিনিসটা উপলব্ধি করা যায় যে, ইহাতে যে সকল রেখা বা রঙের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কোনও না কোনও নৈসর্গিক বস্তুর প্রকাশ হইলেও উহাদের আর একটি উদ্দেশ্যও আছে— সে উদ্দেশ্য একটি 'ফর্মেল' সৌন্দর্যসৃষ্টি।

এ পর্যন্ত আমি নন্দবাবুর 'ফর্মেল' সৌন্দর্যের আদর্শ কী বা উহার উৎপত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। কারণ বিষয়টি বড় এবং জটিল। তবে বর্তমান ছবিটিকে উপলক্ষ করিয়া এটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নন্দবাবুর 'ফর্মেল' সৌন্দর্যের আদর্শ প্রধানত 'লিনিয়ার'। সেজন্য রেখাপাতের সৌন্দর্য ও ছন্দেই তাঁহার শিল্প-চাতুরীর চরম বিকাশ হইয়াছে। যদি 'লিনিয়ারিজম' ও 'প্ল্যাস্টিসিটি'ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হয় তাহা হইলে নন্দবাবু পুরাদস্তুর "অরিয়েন্ট্যাল"। তাঁহার এই ক্ষুদ্র ছবিখানির প্রত্যেকটি প্যানেলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রেখাপাতে যে সামঞ্জস্য ও ছন্দ দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার।

আর একটি কথা। চিত্রটিতে বাংলাদেশের পটের প্রভাব দেখা যায়। কয়েকটি জন্তু যেভাবে আঁকা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ছায়া আছে, এ সকল কথা উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি নাই। কারণ, এগুলি সহজেই ধরা যায়। চিত্রকর যে যুগেই আবির্ভূত হন না কেন, তাঁহার হাতের কাছে কতকগুলি ধরা-বাঁধা 'ফর্ম' থাকেই, সেগুলি তিনি কাজে লাগাইতে বাধ্য। নন্দবাবুর উপরেও নানারূপ পূর্বতন 'ফর্ম'-এর প্রভাব আছে। প্রথম জীবনে তাঁহার চিত্রে অজন্তার ছায়া ছিল, এখন হয়তো পটের প্রভাব আছে। কিন্তু এই অনুচিকীর্ষাই তাঁহার চিত্রকলার সবটুকু নয়। প্রচলিত ধারাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন জীবন ও নূতন রূপ দিতে পারাই প্রতিভাসাপেক্ষ। নন্দবাবুর এই প্রতিভা আছে, ইহা সকলেই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবেন।

প্রথম প্রকাশ : "বঙ্গশ্রী" প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৪০। দেশ, ১৪ মে ১৯৬৬ (৩০ বৈশাখ ১৩৭৩)-এ পুনর্মুদ্রিত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# নন্দলাল বসু

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতী সংলগ্ন কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর চতুঃপঞ্চাশতম জন্মদিনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার নন্দলাল সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ও উহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নন্দবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সম্মান নন্দবাবুর সম্পূর্ণ প্রাপ্য। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তন যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নাম করিতে হয়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক হইতেও নন্দবাবুর স্থান অতি উচ্চ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্তমানে আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের অনেকের অঙ্কন-রীতিই এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবুর সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। তাঁহার পটুয়া-জীবন সচল,—নদীর মতো প্রবহমান। অনেকে হয়তো বলিবেন, এই অবিরত 'এক্স্‌পেরিমেন্ট' প্রীতির মধ্যে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কালাতীত সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুকূল নয়, নন্দবাবু এখনও তাঁহার আদর্শ খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াই বহুবিধ 'স্টাইল' ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলেও দোষের জিনিস না হইতে পারে।

আর্টের ক্ষেত্রে, শুধু আর্টের ক্ষেত্রেই বলি কেন, ধর্ম নীতি সাহিত্য প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই এমন এক যুগ ছিল যখন সমাজ ও আদর্শের ভিত্তি অনেক বেশি দৃঢ় ছিল এবং মানুষের মনও সংশয়মুক্ত ছিল। তখনকার দিনের চিত্রকর বা লেখক প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যেই তাঁহাদের কাজের সুদৃঢ় অবলম্বন পাইতেন; তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর জন্য সজ্ঞানে নিজেকে ও জগৎকে পরীক্ষা করিতে হইত না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের ভাস্কর্য, রিনেসেন্সের কালে ইতালির চিত্রকলা, প্রাচীন চৈনিক ও জাপানী চিত্র, সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ও ফ্লেমিশ ছবি, সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা বলা চলে। কিন্তু আমরা যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে-যুগে মানব জাতির চিত্তে আর স্থৈর্য নাই। জ্ঞান ও গবেষণার প্রসার, ভ্রমণ ও ভাব আদানপ্রদানের সুবিধা, শিক্ষা ও শিক্ষার ভানের অতিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর একটা দুর্বহ চাপ আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু চিত্রাঙ্কনের দৃষ্টান্তই লওয়া যাক না কেন। আজ যিনিই ছবি আঁকিতে যাইবেন, তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় চিত্র পর্যন্ত, চীন জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তি যাঁহার উপর পড়িবে তাঁহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি ও যোগ্যতা ভেদে ফল তিন রকমের হইতে পারে,— প্রথমত, ক্লৈব্য ও জড়তা ; দ্বিতীয়ত, অনুকরণপরায়ণতা ; তৃতীয়ত, অবিরত পরীক্ষা ও জগতের 'আর্ট ট্রেডিশ্যন'গুলিকে আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব রূপ দিবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত চেষ্টার সবগুলিই যে সফল হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই, কিন্তু দৈবক্রমে যদি একটি চিত্রেও 'এক্সপেরিমেন্ট' ও প্রতিভার মিলন দেখা যায়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমাদের এই অশান্ত যুগে ইহার অপেক্ষা বড় কীর্তি সম্ভবপর নয় বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান কালের বহু চিত্রকর সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাহা বলা চলে— অর্থাৎ তিনি এই তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চিত্রকর। তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্যন্ত বহু রীতির প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান, এবং ভারতবর্ষের বাহিরের চিত্রাঙ্কন রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। ছবি আঁকিবার উপকরণ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও সুবিদিত। অথচ তাঁহার কোনও ছবিই অনুকরণে পর্যবসিত হয় নাই। নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে স্বায়ত্ত ও নিজস্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় এবং এই কারণেই তাঁহার চিত্রগুলি স্থায়ী হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

এই তো গেল তাঁহার চিত্রের সাধারণ ধর্মের কথা। উহার পর তাঁহার সৌন্দর্য বোধ ও সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। বিষয়টি বিস্তৃত এবং জটিল, সুতরাং এখানে উহার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, নন্দবাবুর সৌন্দর্যের আদর্শ প্রধানত 'লিনিয়ার' বা রেখাবলম্বী। সেজন্য রেখাপাতের সৌন্দর্য ও ছন্দেই তাঁহার শিল্পচাতুরীর চরম বিকাশ হইয়াছে। 'লিনিয়ারিজম্' প্রাচ্য চিত্রকলার ও 'প্ল্যাস্টিসিটি' পাশ্চাত্য চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য, রজার ফ্রাই-এর এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নন্দবাবু পুরাদস্তুর প্রাচ্য। তাঁহার প্রত্যেকটি চিত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রেখাপাতের যে সামঞ্জস্য ও ছন্দ দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার।

নূতন পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

WWW.AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# নন্দলাল বসু : চিত্রকর

চব্বিশ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪২ সনের পর বাংলাদেশ দেখি নাই। কিন্তু সুদূর প্রবাসে যখনই একজনের পর একজন বিশিষ্ট বাঙালির মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছি, তখনই আমি এবং আমার স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছি—"আর একজন গেলেন, একেবারে শেষ হইতেও দেরি নাই।"

দিল্লিতে বসিয়া মনে হইয়াছে পূর্বাকাশে তারা খসিয়া পড়া দেখিতেছি। সত্যকার আকাশ যখন তারাখচিত থাকে, তখনও যদি একটি মাত্র তারা দিকচক্রবালের কাছে আসিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। কিন্তু এমন যদি হইত, আকাশের দুইটি বা তিনটি মাত্র তারা, আর একটি একটি করিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সে-দৃশ্য দেখিলে মনে ত্রাসের সঞ্চার নিশ্চয়ই হইত। নন্দবাবুর মৃত্যুতে এই ভাবই আসিয়াছে। যাঁহারা বাংলার নবযুগের সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই প্রায় গিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের মহাবিনিষ্ক্রমণ হইলে, শুধু কে বড়, কে ছোট, তাহার ঝগড়া থাকিবে, শক্তির অবিসম্বাদিত মাপে কলহ মিটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সুতরাং প্রতিযোগিতারও নিবৃত্তি হইবে না। অবশ্য আত্মপ্রচারের কথা স্বতন্ত্র। তবে মহীরুহ লুপ্ত হইবার পর কাঁটানটের কোন্দল শুনিবার কোনও আগ্রহ আমার নাই।

নন্দবাবুর মৃত্যু একটি কারণে আরও শোকাবহ। বাঙালির নূতন কীর্তিতে সাহিত্যের যে মহিমা, একমাত্র সঙ্গীতেই তাহার তুল্য সৃষ্টি হইয়াছে। কাব্য বা সঙ্গীতের তুলনায় চিত্রকলায় কিছুই হয় নাই বলা চলে—নন্দবাবুকে এবং তাঁহার পর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিলে। সেও আমাদের গেল। তিনি বহুকাল আঁকেন নাই, তবু সৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া স্রষ্টার উপস্থিতিরও একটা ভরসা আছে।

আমি অল্পবয়স হইতে—প্রায় দশ-বারো বৎসর হইতে ছাপায় নন্দবাবুর চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে আরম্ভ করি। উহাতে কৌতূহল জাগিত, কিন্তু অত্যন্ত ভাল বা মন্দ লাগিত বলিতে পারি না। ভাল প্রথম লাগিল কলেজে পড়ার সময়। তখন লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি হইতে প্রকাশিত একটি অ্যালবামে নন্দবাবুর 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' বা 'সতী'-র প্রতিলিপি দেখি। এই ছাপার বিশেষ উৎকর্ষ ছিল। আগে যে-ছাপা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বাংলার চিত্রকলার রঙ ও রেখাপাতের নৈপুণ্য বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং পুরাপুরি সৌন্দর্যও পাই নাই। ছবিটি আগে 'প্রবাসীতে'ও দেখিয়াছিলাম, তবু সেই অ্যালবামে নূতন ছবি বলিয়া মনে হইল। মনে আছে, ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি হইতে ফিরিয়া জ্যেষ্ঠকে এই কথা বলিয়াছিলাম। তখন হইতে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা জন্মিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২১ সন হইতে মূল চিত্র দেখিতে আরম্ভ করি। যতদিন কলিকাতা ছিলাম, যখনই কোনও প্রদর্শনী হইয়াছে, তখনই গিয়াছি। ইহার ফলে ক্রমশ এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হইল যে, নব্যভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে নন্দবাবুই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার পরে গগনেন্দ্রনাথের নাম করা যাইতে পারে ; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ইঁহাদের একজনেরও সমকক্ষ ন'ন।

ইহা আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত। ইহা লইয়া আমি আজকালকার কোনও চিত্র-বা-কলা-সমালোচকের সঙ্গে তর্ক তুলিতে চাই না। তাঁহারা মহারথী, আমি চিত্রদ্রষ্টা মাত্র। পাঁচজন শিক্ষিত লোক একটা জিনিস দেখিয়া পরস্পরের মত শুনে ; তাহার মূল্য যতটুকু, আমার মতের মূল্যও ততটুকু। তবে মিথ্যা বা কপট বিনয়ও করিব না। আর্ট উপভোগ ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রাণের ব্যাপার, চোখের ব্যাপার ; উহাতে পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না। সেইজন্য এই বিষয়ে মতামতও অত্যন্ত নিজস্ব খাঁটি মনের কথা হওয়া দরকার। অর্থাৎ এ-বিষয়ে মনকে চোখ ঠারিলে আর্টের প্রফেসর হওয়া যায়, কাগজের আর্ট-ক্রিটিকও হওয়া যায়, বাদ পড়ে শুধু ছবি দেখিবার আনন্দ। ফ্যাশনের খাতিরে, অথবা পণ্ডিতের ভয়ে, অথবা বুক্‌নির গাঁজার নেশায় আমি এই আনন্দ ছাড়িয়া বাঁধাবুলি আওড়াইতে পারিব না। হয়তো অপরাধ বাড়িবে, কিন্তু আমি বলিবই—রবীন্দ্রনাথের ছবিকে চিত্র বলিয়া স্বীকার করিবার আগে আমার চোখ যেন অন্ধ হয়।

অবশ্য এই ধরণের অভিমত—তা সে যত ব্যক্তিগতই হউক না কেন—প্রকাশ করিবার অধিকার অর্জন করিবার আগে দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন। বহু ছবি দেখিয়া চোখের শিক্ষা না হইলে এইভাবে কথা বলা উচিত নয়। এক্ষেত্রে চোখের শিক্ষা হাজার বই-এর বুক্‌নির চেয়ে বড়। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিব যে, পুরাতন প্রস্তরযুগের ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া আজকালকার অতি-মডার্ন ছবি পর্যন্ত বহু চিত্র ছাপায়—ভাল ছাপায়—দেখিয়াছি ; ইহার উপর মূল চিত্র, দেশী বা বিদেশী, যেখানেই এবং যখনই সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই এবং সেই সময়েই দেখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সারা জীবন (আমার বয়স আটষট্টি বছর) দেখিবার পর আমার চোখের ক্ষমতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, বা বুদ্ধির পরিমাণ যাহা আছে তাহার সহায়তায় যে-টুকু সূক্ষ্মতা জন্মিয়াছে, তাহার ফলে আমি নন্দবাবুকে উচ্চস্থান দিতেছি। ইহাকে যদি কেউ স্থূলতার পরিচয় বলেন, আমি নাচার।

কিন্তু নন্দবাবুকে ঠিকভাবে বিচার করিবার পথে তাঁহার জীবিতকালে একটা বাধা ছিল। কোনও এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার ছবি দেখিয়া তাঁহার চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি যে-ধারণা করিতাম, তাহা অনেক সময়ে আমাকে পরের বৎসরই বদলাইতে হইয়াছে। অনেক সময়ে নূতন ছবি দেখিয়া যাহাকে চলিত কথায় ভেকা বনিয়া যাওয়া বলে, সেই অবস্থাও হইয়াছে। তাহার সঙ্গত কারণও ছিল। সেই সময়ে আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই আঁকিবার রীতি এক জায়গায় থামিয়া ঠেকিয়া গিয়াছিল। নন্দবাবুর তাহা কখনও হয় নাই। তাঁহার পটুয়া-জীবন চির-সচল ছিল, নদীর মতো চির-প্রবহমান ছিল। এই নিরবচ্ছিন্ন 'এক্সপেরিমেন্ট' প্রীতির মধ্যে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কালাতীত সৌন্দর্যসৃষ্টির অনুকূল নয়—এ-কথা অনেকে বলিতে পারিতেন ; এ-কথাও বলা যাইত যে নন্দবাবু তখনও তাঁহার একান্ত নিজস্ব আদর্শ বা স্টাইল খুঁজিয়া পান নাই, তাই বহুবিধ স্টাইল ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলেও দোষের বিষয় ছিল না, বিশেষত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্টের বর্তমান অবস্থায়। এ অবস্থা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নয়, পৃথিবীব্যাপী। কথাটা আরও একটু বিশদ করা আবশ্যক।

আর্টের ক্ষেত্রে, শুধু আর্টের ক্ষেত্রেই বা বলি কেন ; ধর্ম, নীতি, সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের যা-কিছু কার্যকলাপ আছে তাহার সবগুলিতেই এমন এক যুগ অতীতে ছিল, যখন সমাজ, জীবনযাত্রা ও আদর্শের ভিত্তি অনেক বেশি দৃঢ় ছিল, সেজন্য মানুষের মনও সংশয়মুক্ত ছিল। সে-যুগের চিত্রকর ও লেখক তাই প্রধানত জনমত ও রুচির মধ্যেই তাঁহাদের কাজের অবলম্বন পাইতেন, তাঁহাদিগকে পা ফস্কাইবার ভয়ে সভয়ে অগ্রসর হইতে হইত না। সেই কারণেই তাঁহাদিগকে বিষয়বস্তু এবং প্রকাশের উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য সজ্ঞানে নিজেকে ও জগৎকে পরীক্ষা করিতে হইত না। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের ভাস্কর্য, রিনেসেন্সের কালে ইতালির চিত্রকলা, প্রাচীন চীন ও জাপানের চিত্রকলা, সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ও ফ্লেমিশ ছবি, সকলের সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। বস্তুত, ইংরেজিতে যাহাকে 'ট্রেডিশ্যন' বলে, তাহা বাদ দিয়া আর্ট সৃষ্টিতে নূতনত্বও করা যায় এ-কথা কখনও কেহ বলে নাই। বেঠোফেনের ত্রিশ বৎসর বয়সে রচিত প্রথম সিম্‌ফনিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাছ হইতে বিদায়গ্রহণ বলা হয়, অথচ উহা যখন প্রথম শোনানো হয়, ভিয়েনার সমালোচকেরা উহার কোনও নূতনত্ব ধরিতে পারেন নাই।

কিন্তু আমরা যে-যুগে জীবন যাপন করিতেছি, সে-যুগে মানুষের মনে আর স্থৈর্য নাই। জ্ঞান ও গবেষণার প্রসার, ভ্রমণ ও ভাব আদান-প্রদানের সুবিধা, শিক্ষা ও শিক্ষার ভানের অতিবিস্তার, অবকাশের অভাব, আমোদ-প্রমোদের একান্ত আধিক্য—এই সবেরই সঙ্গে মানুষের মনের উপর একটা দুর্বিসহ চাপ আসিয়া পড়িতেছে।

শুধু চিত্রাঙ্কনের কথাই ধরা যাক্। আজ যিনিই ছবি আঁকিতে যাইবেন, তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় চিত্র পর্যন্ত, চীন-জাপানের আর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত, অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে, পালেও স্বাভাবিক হাওয়া মিলিবে না। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তি যাহার উপর পড়িবে তাঁহার শক্তি ও যোগ্যতা ভেদে ফল তিন রকমের হইতে পারে—প্রথমত, ক্লৈব্য ও জড়তা ; দ্বিতীয়ত, অন্ধ-অনুচিকীর্ষা ; তৃতীয়ত, অবিরত পরীক্ষা ও জগতের 'আর্ট-ট্রেডিশ্যন'গুলিকে যাচাই করিয়া ও আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব রূপ দিবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত চেষ্টার সবটুকু যে সফল হইবে তাহার কোনও সম্ভাবনাই নাই, সে-আশা করারও সার্থকতা বিশেষ নাই। তবু দৈবক্রমে একটি চিত্রেও 'এক্সপেরিমেন্ট' ও নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার মিলন যদি দেখা যায়, তাহা হইলে একটা অপ্রত্যাশিত রকমের আনন্দের ব্যাপার হইয়াছে বলা চলে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমাদের এই অশান্ত যুগে ইহার অপেক্ষা বেশি কিছু সম্ভবপর নয় বলিয়াই মনে হয়।

এখন আমার বক্তব্য এই, আমাদের দেশের বহু চিত্রকর সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না, নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাহা বলা চলে—অর্থাৎ তিনি তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্যন্ত বহু রীতির প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান, এবং ভারতবর্ষের বাহিরের চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। ছবি আঁকিবার উপকরণ সম্বন্ধেও তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সুবিদিত ছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা—আমি তাঁহাকে পুরাতন প্রস্তরযুগের ভাস্কর্য ও অন্যান্য খোদাইকরা কাজের একখানি বড় বই দেখাইয়াছিলাম। বইখানি তখন আমি সবে কিনিয়াছি তাই উৎসাহ ছিল, ওজনে প্রায় ছয়-সাত সের ভার হইলেও বহিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। আমার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে নন্দবাবু চোখে যেন একটা নূতন জ্যোতি দেখা দিল। আমার মনে হইল, পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ এই জিনিসগুলি তৈরি করিয়া সৌন্দর্যের যে নূতন রূপ দেখিয়া উল্লাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তারই দ্যুতি নন্দবাবুর মুখেও দেখা দিয়াছে। আর্টে যে কালবৈষম্য নাই, তাহা বুঝিলাম। আর একদিন আমার এক বন্ধু শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, নন্দবাবুকে তিনি একদৃষ্টিতে একটি তালগাছের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করাতে, সলজ্জভাবে বলিলেন তালের পাতার আকৃতিটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। চোখে দেখা, অনুভব করা, চিন্তা করা, এবং দৃষ্ট জিনিসের রূপে যে অন্তর্নিহিত আবেগ থাকে, এগুলির মধ্যে একটা সূত্র আছে। এই সূত্র অনেকের কাছে বিচ্ছিন্ন ; দৃষ্টি হইতে কোনও ধাক্কা প্রাণ পর্যন্ত পৌঁছায় না। ইহারা কখনই আর্টিস্ট বা চিত্রকর হইবে না। নন্দবাবুর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হইতে অতিসূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতি পর্যন্ত স্রোত অব্যাহত ও প্রবল ছিল। তাই তিনি চিত্রকর হইতে পারিয়াছিলেন।

সুতরাং কোনও বাহ্যিক রীতিই তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে নাই। আমাদের বর্তমান চিত্রকরদের ধারকরা রীতিই তাঁহাদের নাগপাশ। পক্ষান্তরে নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না, তাহাকে স্বায়ত্ত ও নিজস্ব করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়।

এই তো গেল তাঁহার চিত্রধর্মের মোটামুটি পরিচয়। কিন্তু তাঁহার রীতি সম্বন্ধে ও তাঁহার ছবির প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রসঙ্গটা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তাই সংক্ষেপে আমার যাহা বক্তব্য বলিতেছি।

প্রথম কথা এই, নন্দবাবুর চিত্র ইংরেজিতে যাহাকে 'লিনিয়ার' বলে তাই, অর্থাৎ রেখাধর্মী। রজার ফ্রাই প্রভৃতি চিত্রসমালোচক বলিতেন, প্রাচ্যচিত্র 'লিনিয়ার' ও পাশ্চাত্য 'প্ল্যাস্টিক'। ইহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ পারস্যের, চীনের, জাপানের, ও ভারতবর্ষের চিত্রকলার যাহা মূল ধর্ম, নন্দলালের অঙ্কনপদ্ধতির এবং চিত্রেরও মূলধর্ম তাহাই। সহজ কথায় বলিতে গেলে, এই ধরনের ছবি দেখিবার সময়ে যে জিনিসটা সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি চোখে পড়ে তাহা মানবদেহে বা অন্য কোনও বস্তুর রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ রূপ। বাস্তব জগতের কোনও জিনিসকেই চর্মচক্ষে এভাবে দেখা যায় না। মানুষের চোখ যাহা দেখে তাহা বুঝাইবার জন্য সহজবোধ্য ও পরিচিত কোনও বাংলা শব্দ পাইলাম না, তাই ইংরেজি ব্যবহার করিতেছি—আমরা স্বভাবত দেখি 'প্লেন' বা 'ভলুম' ; রেখা বিভিন্ন 'প্লেনের'ই সংযোগ মাত্র। সুতরাং কোনও চিত্র যদি রেখাধর্মী হয়, তখন সেটি আর বাস্তবের প্রতিকৃতি থাকে না, বাস্তবের রূপান্তরিত মানসিক ছায়াতে পর্যবসিত হয়। আজকালকার অর্থে না হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এই চিত্রও 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'। তবে উহাতে কখনই বাস্তবের চেহারা এত রূপান্তরিত হয় না যে, তাহাকে বাস্তবের বিকৃতি বলা চলে। এই অর্থে নন্দলাল একই সঙ্গে বাস্তবানুকারী এবং বাস্তবের রূপান্তরকারীও বটেন।

কিন্তু এই ধরনের ছবি যাঁহারা আঁকেন তাঁহাদের একটা বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকা দরকার, উহার অভাব ঘটিলে রেখাধর্মী চিত্র উচ্চস্তরে উঠিতে পারে না। সেটি রেখার সজীবতা, সচলতা ও ছন্দ। প্রতিটি রেখার একটা স্পন্দন দর্শকের মনে অনুভূত হওয়া চাই। যাহার তুলিতে ইহা ফুটিয়া উঠে না, তিনি সত্যকার রেখাধর্মী চিত্রকর কখনই হইতে পারেন না। রেখাপাত অসাড়, জড় ও নিশ্চল হইলে রেখাধর্মী চিত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় চিত্রকরদের মধ্যে রেখার ছন্দে বত্তিচেল্লিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয় চিত্রকরদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাঁহার ড্রয়িং-এ প্রাণ ও ছন্দের অভাব দেখা যায়। প্রাচ্য চিত্রের উহাই বিশিষ্ট লক্ষণ। এমন কি প্রাচ্যে ভাস্কর্যও রেখাধর্মী। প্রস্তরনির্মিত মূর্তি বস্তুধর্মে জড় হইবে, নিশ্চল হইবে, ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনও মূর্তির দিকে চাহিলেই উহার স্পন্দিত রূপ চোখে আসিয়া আঘাত করে। তখন আর 'চিত্রার্পিতের মতো নিশ্চল', এই কথাটার অর্থবোধ হয় না।

নন্দলালের চিত্রেও এই সজীব ভাব, এই স্পন্দিত চাঞ্চল্য, ও এই ছন্দ অতিসহজেই উপলব্ধি হয়। তাঁহার রেখাপাত অর্থাৎ ড্রয়িং-এর ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি যদি অন্যদিকেও অতি চিত্তাকর্ষক ছবি না আঁকিতে পারিতেন, তাহা হইলেও শুধু রেখাপাতের গুণেই তাঁহাকে বড় চিত্রকর বলিতাম। অবশ্য রেখাপাতের মাধুর্য বা মঞ্জুলতার বিচার করিলে তিনি বত্তিচেল্লির সমকক্ষ বা সেই পর্যায়ের এ-কথা বলিব না। কিন্তু নন্দবাবুর রেখার ছন্দ দৃঢ় ও শক্তিমান। তাঁহার রেখা-সমষ্টির একটা বলিষ্ঠতা আছে উহা নবমল্লিকার মতো না হইলেও, ধনুর মতো।

কিন্তু তাঁহার চিত্রাঙ্কন রেখাতেই আবদ্ধ নাই। তাঁহার প্রথম জীবনের ছবি সাধারণত রেখাধর্মী। পরজীবনের তিনি রেখা হইতে সরিয়া একদিকে 'প্ল্যাস্টিসিটি' ও অন্যদিকে 'টোনে'র দিকে গিয়াছিলেন। অবশ্য সেজন্য তাঁহার ছবি হইতে রেখা কখনই নির্বাসিত হয় নাই। যখন তিনি এই নূতন ধরনে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন, তখন ছবিগুলিতে বর্ণ সমাবেশ (কখনও উগ্র বর্ণ সমাবেশ, কখনও কমনীয় বর্ণ সমাবেশ) থাকিলেও, কিংবা ভাস্কর্যের ছাপ পড়িলেও (মনে রাখিবেন, মিকেল্এঞ্জেলোর ছবি চিত্রে ভাস্কর্য), রেখার জোর প্রায় আগের মতোই অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং তাঁর পরজীবনের ছবিতেও সচল ছন্দের অভাব কখনই দেখা যায় নাই। তাঁহার ছবি জড়ধর্মী হইয়াছে, সে-কথা কখনই বলা যাইত না। তবে এই সব পরবর্তী ছবি দেখিয়া অনেক সময়ে খোদাই করা পাথরের কাজ—অর্থাৎ 'বা-রিলিফ'—বলিয়া মনে হইত। এই ধরনটা তিনি আসিরীয় ভাস্কর্য হইতে পাইয়াছিলেন।

বিষয়নির্বাচনের দিক দেখিলেও নন্দবাবুর সাহস ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বাংলাদেশের চিত্রকলায় একমাত্র পৌরাণিক চরিত্র বা উপাখ্যান থাকাই রেওয়াজ ছিল, তখনও তিনি লৌকিক জীবন লইয়া ছবি আঁকিতে ভয় পাইতেন না। আবার নিছক আধুনিকতার জন্যে পৌরাণিক বিষয়কে বর্জন করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিষয়নির্বাচনের সময়ে শুধু এইটুকু বিচার করিতেন যে, বিষয়টার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দেওয়া যায় কিনা, এবং সেই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করা সম্ভব কিনা। তাঁহার চোখ যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর সৌন্দর্য ও অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিত, তাঁহার হাত এবং তুলিও তেমনই সেই সৌন্দর্য ও অর্থ প্রকাশ করিতে পারিত। বাগর্থ-প্রতিপত্তির কথা কালিদাস বলিয়াছেন, কবির তাহাই কাম্য। চিত্রকরের কাম্য সেই স্থলে বোধ হয়—রূপার্থ-প্রতিপত্তি। নিশ্চয়ই নন্দবাবুর এই প্রার্থনা সফল হইয়াছিল।

তবে তাঁহাকে মানস আবেগের চিত্রকর না বলিয়া, দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের চিত্রকর বলা উচিত। এই চিত্রধর্মই একমাত্র সঙ্গত চিত্রধর্ম এ-কথা বলিব না। অন্য ধরনে অন্য উদ্দেশ্য লইয়া, বহু বিখ্যাত চিত্র আঁকা হইয়াছে, বহু চিত্রকর তাহা আঁকিয়া চিত্রকলার ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমার বক্তব্য এই—চিত্রের বিচিত্র ধারা ও বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে নন্দবাবু যেটিকে নিজের ধারা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার উর্ধ্বে যাওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বর্তমান ভারতবর্ষের মাপেও শ্রেষ্ঠ, চিত্রের বিশ্বব্যাপী প্রকাশের মাপেও শ্রেষ্ঠ।

দুঃখের কথা এই—তাঁহার চিত্রবিচারের উপযুক্ত সুযোগ নাই, এবং হইবে কিনা সন্দেহ। আমি বৎসরের পর বৎসর যাহা দেখিয়াছি, তাহার স্মৃতি হইতে মাত্র লিখিয়াছি। এক জায়গায় বা কয়েকটি গ্যালারিতে তাঁহার ছবি দেখিয়া যে আমার মতামতের পুনর্বিচার করিব, সে উপায় নাই। এই জন্যই এই প্রবন্ধটিকে আমার ব্যক্তিগত অর্ঘ্য ভিন্ন আর কিছু বলিব না।

AMARBOI.COM

**কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৭৩**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে

[১৯৪০]

একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত শখের কথা বলিতে যাইতেছি। ইহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কল্পনা নাই, তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্য নাই, রুচিসংস্কারের সাহস নাই—এক কথায় 'ইডিওলজি'র নামগন্ধও নাই। তবে কোনও অভিসন্ধিই নাই এ-কথা বলিতে পারি না। চার ফেলিয়া লোকে মাছ ধরে। আমারও মনে একটা আশা আছে হয়তো বা এই প্রবন্ধরূপ চার ফেলিয়া এক-আধ জন সম-খেয়ালীকে গাঁথিয়া তুলিতে পারিব।

## আমার যাত্রা শুরু হইল

আমি ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে ঠিক কোন জায়গাটি হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম তাহা বুঝাইতে হইলে পাঠকদিগকে আজকালকার ফ্যাশন একটু ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেকে (বিশেষ করিয়া যুবকযুবতীরা) ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে উৎসুক হইয়াছেন। আমার ওদিকে ঝোঁক আছে শুনিলে কেহ কেহ হাসিমুখে এ-বিষয়ে নিজেদেরও 'দরদ' আছে স্বীকার করেন, লাইট হাউস ও মেট্রো সিনেমায় শ্রুত ভিন্ন-দেশী সুর গুঞ্জন করেন; কেহ জিজ্ঞাসা করেন, হাওয়াইয়ান গীটারের বাদ্য আমার কাছে আছে কি না; এমন কি কেহ বা ক্রাইস্‌লারের বেহালা ও পাডেরেভ্‌স্কির পিয়ানো বাজনার রেকর্ড সম্বন্ধেও খোঁজ করেন। যদিও ঠিক এই পথে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে বাহির হই নাই, তবু এই কথাটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে যে, আমাদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ভাষা, খেলাধূলা, পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদির মতো আমাদের গানবাজনাতেও এত দিন পরে বিদেশী হাওয়া লাগিতে শুরু হইয়াছে। ইহার ফল একেবারে যুগান্তকারী বা প্রলয়ঙ্করী না হইলেও কিছু নিশ্চয়ই হইবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাংলা ভাষাকে ইঙ্গস্কৃত করা সমাপ্ত করিয়া এই ব্যাপারেও অগ্রণী হইয়াছেন মনে হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহারা রেকর্ডে 'বন্দে মাতরম' গানের যে অর্কেস্ট্রেল-সঙ্গতি-অসঙ্গতি-সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয়, আমরা কালক্রমে 'বেজিক' ইংরেজি ভাষা ও 'বেজিক' ইংরেজি পোশাক (অর্থাৎ হাফ-শার্ট ও প্যান্ট) ও অন্যান্য 'বেজিক' ইংরেজি হালচালের মতো একটা বেজিক ইংরেজি সঙ্গীতও হয়তো আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিব।

কিন্তু যে-সময়ে আমি স্কুলকলেজে পড়ি তখন ইউরোপীয় সঙ্গীতের এই ল. সা. গু-টুকুও আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে নাই। মনেও আসিয়া পৌঁছে নাই বলিলাম না এই জন্য যে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার বিষম প্রয়াসে 'মুনলাইট সোনাটা' ও 'নাইন্‌থ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিম্‌ফনি'র নাম শুনিয়াছিলাম, টলস্টয়ের উপন্যাস 'ক্রয়েট্‌সার সোনাটা' পড়িয়া উক্ত 'সোনাটা' সম্বন্ধে অসম্ভব রকম ভুল ধারণা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম, আর রমৗঁ রলাঁর 'জন ক্রিস্টফার' পড়িতে গিয়া যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাকে বাঁশবনে ডোম কানা বলিলেই চলে। ফল যে অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল তাহা বোধ করি বলা নিষ্প্রয়োজন। নিজের ও সমপাঠীদের এই অগ্নিমান্দ্যের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি ও একটি মিশনারী পরিচালিত হস্টেলে থাকি। আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট এক 'ফাদার'। তাঁহার একটি পিতলের বাঁশি ছিল, যেমন পিতলের বাঁশি সকলের হাতেই দেখা যায়। 'ফাদার' মাঝে মাঝে এই বাঁশিতে দু-চারিটি ফুঁ দিতেন, বিশেষ কিছু বাজাইতেন না। আমরা সম্ভবত উহাকেই ইউরোপীয় সঙ্গীত মনে করিতাম। গল্প আছে (সত্য গল্পই বোধ হয়) পারস্যের কোনও ভূতপূর্ব শাহ ইউরোপে একটা অতি উচ্চাঙ্গের কনসার্ট শুনিতে গিয়াছিলেন। বাজনা শেষ হইবার পর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল কোন জিনিসটি তাঁহার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে তখন তিনি উত্তর দিলেন—লাঠি ভাঁজে যে লোকটা সে (অর্থাৎ কণ্ডাক্টর) আসিবার পূর্বে যে গৎটা বাজান হইয়াছিল (অর্থাৎ বেহালা প্রভৃতির টুং টুং করিয়া সুর বাঁধা) উহাই তাঁহার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে।

আমরাও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে পারস্যের শাহের মতোই সমঝদার ছিলাম। তাই 'ফাদারে'র বাঁশি বাজান আমাদের ভালই লাগিত। একদিন সাহেব বাঁশিতে কয়েকটি ফুঁ দিয়া রাখিয়া দিবার পর আমাদের এক সহপাঠী তাঁহার কাছে গিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "Father, now please play the Moonlight Sonata." সাহেব ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "Oh! Oh! Pankaj knows something about European music!" পরেই, যুবক অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "My boy, the Moonlight Sonata is a very difficult piece of pianoforte music." (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিয়া রাখি, পিয়ানোর বনিয়াদি নাম যে 'পিয়েনো' নয়, 'পিয়োনো' নয়, 'পিয়ানোফর্টে' এই প্রথম শুনিলাম, এবং বলাই বাহুল্য সরলপ্রাণ সমপাঠীদের ঘায়েল করিবার অস্ত্র হিসাবে মস্তিষ্কের তূণের ভিতর সযত্নে গুঁজিয়া রাখিলাম।)

আর একটি জনপ্রবাদও কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিয়াছি আমাদের সমকালীন কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক নাকি একটি উপন্যাসে নায়িকাকে দিয়া বসিবার ঘরে পিয়ানোতে 'নাইন্‌থ সিম্‌ফনি' বাজাইয়া ছাড়িয়াছেন।

আমাদের পুঁথিগত বিদ্যাতেই যখন এই বিপর্যয় তখন শ্রুতিগত অভিজ্ঞতায় ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেশ যে কি সুরে বাজিত তাহা না বলাই উচিত। এই অবস্থায় অনেক বৎসর কাটিয়াছিল। এমন সময় ১৯৩০ সনের একটি দিনে কলেজ-স্কোয়ারের একটি সুপরিচিত বই-এর দোকানে দৈবক্রমে নূতন জগতের সন্ধান মিলিয়া গেল—incipit vita nova!

## যাঁহারা অসহায়ের সহায় হইয়াছেন

সেই দোকানে ঢুকিয়া দেখি কাউন্টারের উপর একটি পোর্টেবল্‌ গ্রামোফোন ও তিনটি রেকর্ডের অ্যালবাম। কাছে দোকানের স্বত্বাধিকারীর ভ্রাতা, আমার বন্ধু দাঁড়াইয়া। এই বন্ধু আজ আর ইহজগতে নাই, কিন্তু কলিকাতার পাঠানুরাগী সমাজ বহুদিন তাঁহার অমায়িকতা, সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি ও মার্জিত রুচির কথা মনে রাখিবে। প্রথমে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসগুলির প্রতি বিশেষ কোনও মনোযোগ দিই নাই, কারণ নিকটেই একটি অল্পবয়স্ক ডাক্তার বসিয়াছিলেন। তিনি বিলাতি জাহাজ কোম্পানির ডাক্তার, বিলাতি হাবভাবের বিশেষ অনুরক্ত। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনিই আর একটা বিলাতি ঢং আমদানি করিয়াছেন। তাই সোজা দোকানের পিছন দিকে গিয়া শেল্‌ফ হইতে নূতন বই নামাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ওদিকে গান আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কানে আসিবার পর মনে হইল নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় যেন নয়। কৌতূহলী হইয়া আগাইয়া গেলাম। শুনিতে লাগিলাম, এবং শেষ হইলে গানের নাম দেখিতে লাগিলাম। যে গানটি সর্বপ্রথমে মনে ছাপ দিয়াছিল উহার রচয়িতা কে তাহা আর মনে নাই, কিন্তু উহার প্রথম চরণ ছিল এই, "Obeissons quand leurs voix apellent, (তাৎপর্য—তাহাদের ডাকে যেন আমরা সাড়া দিই), আমেলিতা গাল্লিকুর্চির গাওয়া। ইহার পরই রিমস্কি-কর্সাকফের রচিত এবং আলমা গ্লুক কিংবা লুক্রেৎসিয়া বোরির গাওয়া "সঙ্গ অফ দি সেপার্ড লেল" ভারী ভাল লাগিয়া গেল।[১] রেকর্ডগুলির মধ্যে যেন ফ্রিডা হেম্পেল ও এলেনা গেরহার্টের গাওয়া কয়েকটি গানও ছিল, শালিয়াপিন এবং ক্লারা বাট ছিল, দুই একটা জার্মান লোকসঙ্গীত (ফোক সঙ্গ) ছিল।

দুই এক দিনের মধ্যে নেশা ধরিয়া গেল—গানের সুরের নয়, গলার মাধুর্যের। বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলাম যে, ইউরোপীয় গায়কদের গলা সারমেয়ের ও ইউরোপীয় গায়িকার গলা শৃগালের কণ্ঠের স্মারক। এই কিংবদন্তী নিতান্তই অপবাদ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু দুই একটি গানে ভিন্ন অন্যত্র সঙ্গতি কিছুতেই পাই না, সম্পূর্ণ গানটি জমিয়া উঠে না, মনে হয় যখন পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত তখন পুনরাবৃত্তি হইতেছে না ; আস্থায়ীর পর যেখানে অন্তরা আসা উচিত সেখানে প্রত্যাশিত জিনিস আসিতেছে না, মোটের উপর মহা এলোমেলো ব্যাপার। ভাবিলাম ভুল পথে হয়তো চলিয়াছি, ব্রাম্‌স শুবার্টের রস উপভোগ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া যাহা গোড়ায় ভাল লাগিয়াছিল তাহারই অনুসরণ করি। ধারণা জন্মিল রিমস্কি-কর্সাকফ ভাল লাগিয়াছে নিশ্চয়ই প্রাচ্য সুরের ছোঁয়াচ আছে বলিয়া, সুতরাং রিমস্কি-কর্সাকফই আরও ভাল করিয়া শুনিতে হইবে। যখন দেখা গেল তাঁহার একটি গানের নাম "Chanson Hindoue" (হিন্দু গান) তখন আরও আশা হইল। কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ নাই, উক্ত গান স্বকর্ণে শুনিবার পর পাশ্চাত্য সঙ্গীতস্রষ্টার রচিত 'হিন্দুত্ব' হইতে সবেগে পলায়ন করিয়া জার্মান লোকসঙ্গীতে ফিরিয়া গেলাম।

আমার বন্ধু কৌতূহলের বশে কোনও বিলাতফেরৎ বন্ধুর কাছ হইতে রেকর্ডগুলি ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার কৌতূহল শীঘ্রই মিটিয়া গেল। যখন আমি কোন গানটা সবচেয়ে বেশি ভাল লাগিয়াছে এই প্রশ্নের উত্তেজিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম, তখন বন্ধু বলিতেন, "আমি চেষ্টা করি কোন গানটা সবচেয়ে কম খারাপ লাগিয়াছে শুধু তাহা বুঝিতে।" তবু তিনি আমার খাতিরে রেকর্ড ধার করিবার জন্য মোটা চাদর গায়ে দিয়া শুধু পায়ে কলিকাতার রাস্তায় বহু হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। কিন্তু পরের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া কতদিন এই শখ চালান যায় ? তাই কিছুকাল পরে আমার ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চায় ছেদ পড়িয়া গেল। তবে ভবিষ্যতের আশা ছাড়িলাম না। তরুণ হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আমেজের পর যেমন পাত্রপাত্রী নির্বিশেষে শুধু প্রেমের জন্যই প্রাণ উন্মুখ হইয়া থাকে তেমনই ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা টান রহিয়া গেল।

১. এখন জানিয়াছি উহা আন্‌স গ্লুক গাহিয়াছিলেন।—লেখক (১৯৯২)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৎসর খানেক পরে অবস্থাচক্রে এই চক্ষুর ক্ষুধাকে আসল জিনিসে পরিণত করিবার সুযোগ মিলিল। সে এক ইংরেজ বন্ধুর সহায়তায়। বিলাত যাইবার সময় তিনি তাঁহার গ্রামোফোনটি, কয়েক শত রেকর্ড ও ফিলহার্মনিয়া সংস্করণের কতকগুলি স্বরলিপির বই আমার কাছে রাখিয়া গেলেন। দুই বাক্স চেম্বার মিউজিক, প্রধানত স্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট,—শুবার্টের ১ নং পিয়ানো ট্রিয়োটিও ইহার মধ্যে ছিল ; এক বাক্স সিম্ফনি ; এক বাক্স অপেরার গান ও অন্য বাজনা ইত্যাদি। যেখানে হাত দিই সেখান হইতেই হাইডন, মোৎসার্ট, বেটোভেন, শুবার্ট, ভাগনার উঠিয়া আসে। একেবারে নির্ভাঁজ খানদানী ব্যাপার, কোথাও একটুকু ভেজাল নাই। সুতরাং মহোৎসাহে পাশ্চাত্য সঙ্গীতচর্চায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কিন্তু গুরুতর বাধাও যে ছিল না তা নয়। কেবল মাত্র রেকর্ড ও স্বরলিপি জোগাড় হইলেই হয় না, বুঝাইয়া দিবার লোক দরকার। তাহার সন্ধানমাত্রও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া লাইব্রেরিতে গ্রোভস-এর 'ডিক্সনারি অফ্ মিউজিক' ও 'অক্সফোর্ড হিস্টরি অফ্ মিউজিক'-এর শরণাপন্ন হইলাম ; বিশেষ সুবিধা হইল না। এমন কি মরিয়া হইয়া গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়াইয়া স্বরলিপি কোলে রাখিয়া ডেঁয়ো পিপীলিকার-সারির মতো মিনিম ক্রচেট, কোয়েভার, সেমি-কোয়েভার ডেমি-সেমি-কোয়েভার প্রভৃতির উপর দাগা বুলাইতে লাগিলাম। স্বরলিপি যেখানে আরম্ভ রেকর্ডও সেইখানেই আরম্ভ সুতরাং গোড়াটা সনাক্ত করিতে কষ্ট হইত না ; আমার বন্ধু নিজের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি রেকর্ডের একটা পিঠ যেখানে শেষ হইয়াছে স্বরলিপির সেই 'বারে' পেন্সিলে ঢেঁরা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সেদিকটা সনাক্ত করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু গোল বাধিল মাঝের অংশ লইয়া—যখন ভাবি 'এক্সপজিশ্যন' শুনিতেছি তখন হয়তো বাজিতেছে 'ডেভেলাপমেন্ট' ; যখন ভাবি 'ডেভেলাপমেন্ট' শুনিতেছি তখন হয়তো বাজিতেছে 'এক্সপজিশ্যন' ; আঙুল স্বরলিপির উপরে নিজস্ব চালে ও তালে চলিতে থাকে, বাজনার সঙ্গে কিছুতেই চলে না।

হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে পার্সি স্কোল্স্ তাঁহার 'লিসনার্স গাইড টু মিউজিক' পুস্তকের ভিতর দিয়া গুরুরূপে আবির্ভূত হইলেন। শুনিয়াছি বিলাতে সহস্র সহস্র নরনারীকে 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীতের অনুরাগী তিনি করিয়াছেন। বিলাতের নরনারীর এ-বিষয়ে কতটুকু সহায়তার প্রয়োজন ছিল জানি না. তবে তিনি আমাকে হাত ধরিয়া গভীর জল হইতে তুলিলেন বলিতে পারি। 'লিস্নার্স গাইড' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ যে ডোনাল্ড ফ্রান্সিস টোভী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছি (বুঝিতে পারিতেছি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে) তাহা একমাত্র পার্সি স্কোল্সের কৃপায়।

## আর যাঁহারা সাহায্য করেন নাই

এইবারে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাই নাই তাঁহাদের কথা একটু বলিব। মানুষ স্বচরিত্র, বিশেষ করিয়া স্বকীয় খেয়াল, অন্যে আরোপ করে। ভাইবন্ধু স্ত্রীপুত্র সকলেই সাক্ষী দিবেন আমার বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু দস্যু রত্নাকর পিতামাতা স্ত্রীপুত্রের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিল, জুডাস চীফ প্রীস্টদের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিল আমার ভাগ্যে এক শিশু পুত্র ছাড়া অন্যের কাছ হইতে উহা হইতে ভিন্ন উত্তর জুটে নাই। অর্থাৎ সকলেই বলিয়াছেন,—তোমার পাপের ভার তুমিই বহন কর। ইহাদের মধ্যে সহধর্মিণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি সকল কর্মে ও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় সহচারিণী হইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াও সত্যপালনে আমার আদর্শ মতো উৎসাহ দেখান নাই। আমি যতবারই সদাচারধর্ম আচরণ করিতে চাহিয়াছি ততবারই তিনি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য এই বাক্য আওড়াইয়া গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রবোধ দিবেন, ইহা কোনও বিশেষ স্বামীর বিশেষ পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়—ইহা শাশ্বত স্বামীর অভিযোগ শাশ্বত পত্নীর বিরুদ্ধে। কথাটার যাথার্থ্য স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। কারণ সেদিনও একটি বিবরণ পড়িয়াছি, যাহা হইতে মনে হয় এই অভিযোগ কোনও বিশেষ দেশকালপাত্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। একটি বিলাতি পত্রিকায় একজন লেখক সঙ্গীতপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে, বিশেষ করিয়া গ্রামোফোন সঙ্গীতপরায়ণ ব্যক্তিকে, উদ্বাহবন্ধন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"beware of any such fancies which so inevitably lead to the alter and matrimony."

কেন না, উহার ফল দাঁড়াইবে এই,—

"One day you will arrive home and find that instead of the old and well-beloved mistress, your gramophone, there is another, a wife, waiting for you. No man can serve two masters and to serve two mistresses is even more incredible."

বিবাহিত কোনও ব্যক্তি যদি কোনও খেয়ালের বশবর্তী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই সাক্ষী দিবেন, এই ব্যাপারে "la belle dame" একান্তই "sans merci."

তবে ইহাও বলিতে হয়, এক হাতে তালি বাজে না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন লিখিয়া গিয়াছেন, "ভার্য্যানিপীড়ন করিয়া আমার ধর্মজীবন আরম্ভ হইল।" পুরুষ মাত্রেরই ধারণা ভার্যানিপীড়ন না করিয়া কোনও মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের উল্লেখ করিতে পারি, এমন কি নেপোলিয়নও ভার্যানিপীড়ন না করিয়া স্বকীয় রাজনীতির অনুসরণ করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি বোধ হয় সক্রেটিস, যিনি ভার্যানিপীড়ন করিতে পারেন নাই পরন্তু ভার্যার দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহাকে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল। আমি এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিব। কিন্তু অপর পক্ষ তাহা শুনিবে কেন? দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে লোহেনগ্রীনের গান বা স্মেতানার কোয়ার্টেট 'আউস মাইনেম লেবেন' চাপাইতে যাওয়া অত্যাচার বই কি, তা হোক না কেন সেই গানের প্রথম চরণ Nun zei Bedank mein lieber Schwan। আর স্মেতানার কোয়ার্টেট? উহার শেষের দিকে যেখানে স্মেতানার বধিরতার সূচনা আছে তাহাতে ইউরোপের বিদগ্ধসমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা শুনিয়া প্রথম প্রথম আমার নিজেরই মনে হইত বধির হইয়া যাই; সুতরাং অপর পক্ষ হইতে আপত্তি যে আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি।

আরও একটা গুরুতর কথা আছে। বিবাহিত জীবনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা করিতে গেলে (কিংবা যে কোনও শখ করিতে গেলে) দ্রুত চরিত্রের অবনতি হইতে বাধ্য। জীবনে কখনও হিসাবনিকাশ দিতে ভয় পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এখন কিন্তু বাজার দেনা স্বীকার করিতে পারি না, চেক বই লুকাইয়া রাখি, যে মাসে রেকর্ডের বিল দিতে হইবে তাহার মাস দুই আগে হইতেই গার্হস্থ্য বাজেটে ও ফাইনান্সে ঘোরতর গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি যাহাতে গোলে হরিবোলে বিশ-ত্রিশটা টাকা বাহির করিয়া লইতে পারি। গভীর রাত্রিতে কিংবা নিঝুম মধ্যাহ্নে রেকর্ড লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কি ইহাও মনে হয় স্ত্রী শয্যাগত কাতর হইয়া পড়িলে ভাল হয়, ঐ ফাঁকে এক গাদা নতুন রেকর্ড আনিয়া পুরাতন রেকর্ডের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিব, তিনি টেরও পাইবেন না ! একবার এইরূপ করিতে গিয়া কিভাবে ধরা পড়িয়াছিলাম বলি। দুই বৎসর পূর্বে বুশ স্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট ও রেজিলান্ড কেল মিলিয়া ব্রাম্‌সের সুবিখ্যাত ক্ল্যারিনেট কুইন্টেটের একটি অপূর্ব রেকর্ড করিয়াছেন। এই সংবাদ শোনা অবধি মনে শান্তি নাই, কি করিয়া কিনি। একটি দিন যায়, না তো একটি বৎসর যায়। তবু আটটি মাস কাটাইয়া দিলাম। আর থাকিতে পারি না, সোজা দোকানে গিয়া অর্ডার দিয়া আসিলাম। তখন জবাবদিহির প্রশ্ন নাই। মাস দুই পরে যখন রেকর্ড আসিল তখনও নিরাপদ, কারণ ঠিকানা অন্যত্র দিয়া রাখিয়াছি, খবর ঐখানেই যায়। কিন্তু রেকর্ড বাড়িতে আনি কি করিয়া ? দৈবক্রমে পত্নী একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে রেকর্ডগুলি বাড়িতে আনিয়া পুরাতন রেকর্ডের সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে মিশাইয়া দিয়া অ্যালবামটি আলমারিতে বই-এর পিছনে লুকাইয়া রাখিলাম। এক সপ্তাহ যায়, দুই সপ্তাহ যায়, বাড়িতে পিস্তল রাখিয়া বিপ্লববাদীদের যে অবস্থা, মনের অবস্থা অনেকটা সেই প্রকার, কখন বাড়ি ঢুকিয়া দেখিব খানাতল্লাসি হইতেছে বা হইয়াছে। দুই মাস কাটিয়া গেল, মন অনেকটা স্থির হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় এক দিন বাড়ি ফিরিয়া দেখি বিছানার উপরে একখানি ব্রাউন রং-এর অ্যালবাম, সোনার জলে বড় বড় অক্ষরে লেখা—ব্রাম্‌স কুইন্টেট ইন বি মাইনর (ওপাস—১১৫)।

এক একবার মনে গ্লানি হয়, নির্বেদ উপস্থিত হয়—দূর হউক ইউরোপীয় সঙ্গীত, আমি মাথা উঁচু করিয়া লোকের চোখে চোখে চাহিয়া বাঁচি।[২]

বন্ধুদের কথা আর বলিব না। সে আরও শোকাবহ ব্যাপার। যাঁহারা চিন্তা এবং কর্মের সাথী ছিলেন, যাঁহাদের সঙ্গে এক সৌরজগতের গ্রহমালার মতো সমান্তরাল কক্ষে বহু বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়াছি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের কল্যাণে তাঁহারা ধূমকেতুতে পরিণত হইয়াছেন। কেহ হ্যালির ধূমকেতুর মতো ছিয়াত্তর বৎসর পর পর আসেন, অন্যেরা একবার নিকটে আসিয়া প্যারাবোলিক কক্ষ বাহিয়া চলিয়া যে যান আর ফিরেন না।

AMARBOI.COM

## বেসুরা হইতে সুরে লইয়া যাও

নিজের কথা বলিতে মত্ত হইয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এইবার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। আমার যে বন্ধুটি বলিয়াছিলেন, ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিবার সময়ে তাঁহার একমাত্র বিচার্য বিষয় হয় কোনটা সবচেয়ে কম খারাপ লাগিয়াছে, তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। শৈশব হইতে ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিতে অভ্যস্ত নন এরূপ কোনও বাঙালি শুবার্ট, ব্রাম্‌স বা বেটোভেন প্রথম দিন শুনিয়াই যদি আহা মরি করিতে আরম্ভ করেন তবে বুঝিব তিনি লোক সোজা নন, তাঁহার চরিত্রে প্যাঁচ আছে। ইউরোপীয় সঙ্গীত ভাল লাগাইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রত্যেক অকপট বাঙালিকেই গোড়ার দিকে এই প্রার্থনাটি করিতে হইবে—বেসুরা হইতে সুরে লইয়া যাও। এই প্রার্থনা কতদূর পূরণ হইবে তাহা নির্ভর করিবে অধ্যবসায়ের উপর ; এই ব্যাপারে একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই ভগবান সহায়তা করিবেন।

বেসুরা হইতে সুরে যাইবার বহু সিঁড়ি। প্রথমত কানে ভাল লাগা, দ্বিতীয়ত সুর চিনিতে পারা, তৃতীয়ত সঙ্গীতের কাঠামো ধরিতে পারা, চতুর্থত বিভিন্ন পার্টগুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে শুনিতে পারা, পঞ্চমত যন্ত্রের ধ্বনি চিনিতে পারা, ষষ্ঠত হার্মনি ও কাউন্টার

২. শেষে লেখকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। —লেখক (১৯৯২)।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়েন্টের ধাক্কা সামলান, তারপর ঠাট বুঝিতে পারা, তারপর এইভাবে সমগ্রতার অনুভূতি ও রসবোধ পর্যন্ত।

যাঁহাদের কান আছে তাঁহারা হয়তো সুর চিনিবার কথা শুনিয়া হাসিবেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্ত সোজা নয়। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি দশ বিশটা সমান আকৃতির ও সমান বয়সের বাঘ বা সিংহ দেখিয়া প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ভাবে চিনিতে পারিবেন ? অথচ মার্টিন জনসন তাঁহার সিংহ সংক্রান্ত বই-এ বলিয়াছেন, মানুষের চেহারা যেমন ব্যক্তিগত সিংহের চেহারাও তেমনই ব্যক্তিগত। কিংবা সাহেবদের কথা ধরুন, সব সাহেবের চেহারাই প্রথম প্রথম আমাদের কাছে এক রকম ঠেকে। তেমনই সব ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুরও নূতন শ্রোতার কাছে এক বলিয়া জ্ঞান হয়।

নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। মাইস্টারসিঙ্গারের ভূমিকার সুর ও ধরন এত বিশিষ্ট যে কাহারও ভুল হইবার নয়। প্রথম আমি উহা শুনি কলিকাতা সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রার একটি কনসার্টে। যাহাতে শুনিতে একটু সহায়তা হয় সেইজন্য ঘণ্টাখানেক আগে বাড়িতে গ্রামোফোনে উহা শুনিয়া গিয়াছিলাম। তবু কনসার্ট হলে গিয়া মনে হয় নাই, যে জিনিসটি শুনিতেছি উহা আর গ্রামোফোনে শোনা জিনিস এক। আমার সুরবোধ স্থূল বলিতে পারেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই যে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বড় কোনও নিদর্শন তিন-চার বার না শুনিলে এখনও চিনিতে পারি না, প্রথম প্রথম পনর-ষোল বার না শুনিলে চিনিতাম না।

কোলের শিশু যেমন একবার দেখিয়া কাহাকেও চেনে না, দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়, এবং কবে কাহাকে চিনিয়াছে স্মরণ করিতে পারে না, আমিও তেমনি প্রথম দিকে শোনা জিনিস কবে পরিচিত হইয়া উঠিল এখন আর তাহা বলিতে পারিব না। একসঙ্গে হাইডন মোৎসার্ট ও বেটোভেনের অনেকগুলি কোয়ার্টেট ধরিয়াছিলাম। কোন্‌টা কি, কিছুমাত্র বোধ ছিল না, ধীরে ধীরে একটা জিনিস মনের ভিতর দানা ধরিয়া উঠিল। সেটি মোৎসার্টের কোয়ার্টেট ইন বি ফ্ল্যাট মেজরের (কে ৪৫৮, যেটি হান্ট কোয়ার্টেট নামে পরিচিত) প্রথম মুভমেন্ট। তারপর চিনিলাম উহারই 'মিনুয়েট' ও 'ট্রিয়ো', তারপর উহার অন্য মুভমেন্টগুলি। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে মোৎসার্টের কোয়ার্টেট ইন সি মেজর (কে ৪৬৫), বেটোভেনের কোয়ার্টেট ইন এফ মেজর (ওপাস ১৩৫), কোয়ার্টেট ইন এ মাইনর (ওপাস ১৩২), কোয়ার্টেট ইন ই মাইনর (ওপাস ৫৯, ২ নং) রূপ ধরিতে লাগিল।

সিম্‌ফনি আরও ঘোরালো ব্যাপার। প্রথমে ওদিকে একেবারেই ঘেঁষি নাই। কিন্তু নিতান্ত দৈবক্রমে এমন একটি জিনিস দিয়া এই বিষয়ে আমার হাতেখড়ি হইল যাহা আমি চিরদিন সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিব। সেটি বেটোভেনের দ্বিতীয় সিম্‌ফনির দ্বিতীয় মুভমেন্ট। বোধ করি উহার সুর ও অর্কেস্ট্রেশ্যনের অপরূপ মাধুর্যই আমাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন উহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। পরে টোভীর উক্তি পড়িয়াছি যে, "To many a musical child, or child in musical matters, this movement has brought about the first awakening to a sense of beauty in music." উহা আমার বেলাতে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। ইউরোপীয় সঙ্গীতের কোনও নিদর্শন এখনও আমার কাছে এর চেয়ে বেশি ভাল লাগে কিনা বলিতে পারি না।

ইউরোপীয় সঙ্গীতে মুশকিল আমাদের হয় কাঠামো লইয়া। আমাদের নিজেদের সঙ্গীত প্রথমত আয়তনে বড় নয়, তারপর সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত ; এই প্রত্যেকটি ভাগও


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিয়া বা বাজাইয়া শ্রোতার কানে নিবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপীয় সঙ্গীতে এই পুনরাবৃত্তির আতিশয্য একেবারেই নাই। সোনাটা ফর্মে পুনরাবৃত্তি এক রিক্যাপিটুলেশ্যনে ভিন্ন হয় না, কারণ 'ফুগে'র যে কি রকম পুনরাবৃত্তি তাহা বাখের দুই-এক খানা 'প্রেল্যুড ও ফুগ' চাখিবার চেষ্টা করিয়াই বুঝিয়াছি। ইহার উপর আবার আর একটা ঝঞ্ঝাট আছে। আমাদের সঙ্গীতের প্রত্যেকটি অংশকে আমরা যথাসম্ভব স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি; আমাদের কাছে মনে হয়, ইউরোপীয় সঙ্গীত স্রষ্টারা চেষ্টা করেন যথাসম্ভব অস্পষ্ট করিবার। বেটোভেনের 'এরোইকা'র (তৃতীয় সিম্ফনির) প্ল্যান বুঝিবার চেষ্টা এখনও আমি পারতপক্ষে করি না। 'সোনাটা-ফর্ম'কে আক্রমণ করিয়া যেটুকু আংশিক ফল পাইয়াছি সে একমাত্র মোৎসার্টের দয়ায়।

তবে এ-কথা বলিতে পারি, কাঠামোই হউক আর সুরই হউক, আর অর্কেস্ট্রেশ্যনই হউক—সবই ভাল লাগাইবার একমাত্র উপায় বারবার, অসংখ্য বার, শোনা। শুনিতে শুনিতে কোনটা না কোনটা ভাল লাগিয়া যাইবে, কোনটা না কোনটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবেই। কিন্তু এখানেও সমস্যা—কতগুলি শোনা, কি লইয়া আরম্ভ করা? বিচিত্র যন্ত্রবাহুল্য, পিয়ানো বেহালা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাবয়ব অর্কেস্ট্রা পর্যন্ত; বিচিত্র রূপবাহুল্য, সোনাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সিম্ফনি পর্যন্ত, বিচিত্র গঠনবাহুল্য, মিনুয়েট বা ট্রিয়ো হইতে আরম্ভ করিয়া 'সোনাটা ফর্ম' ও 'ফুগ' পর্যন্ত; বিচিত্র সৃষ্টিবাহুল্য, প্যালেস্ট্রিনা হইতে আরম্ভ করিয়া শোয়েনবার্গ পর্যন্ত। কোথায় তাহার আরম্ভ কোথায় শেষ বলা দুরূহ। আমার বেলাতে এই বিশালতা মধ্যে পথ হইয়া গিয়াছিল নিতান্তই দৈবক্রমে, নিজের অভিরুচিতে নয়, জ্ঞানে নয়, ইচ্ছায় নয়। তবে পথ না চিনিয়া ঘোরা হইতে এইটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি যে, ইউরোপীয় সমালোচকেরা প্রায় সকল বিষয়েই সহায়ক হইলেও আমাদের দেশের প্রথম শিক্ষার্থীর ভাল-লাগা মন্দ-লাগা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, চেম্বার মিউজিক সম্বন্ধে প্রায়শই উপদেশ পাইবেন, চাইকভস্কির কোয়ার্টেট ইন ডি মেজরের (ওপাস ১১) 'আন্দান্তে কান্তাবিলে' দিয়া আরম্ভ করা উচিত। টলস্টয় নাকি এইটি শুনিয়া করুণ রসে আপ্লুত হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, আমি কিন্তু উহা শুনিয়া অন্য কারণে কাঁদিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। পক্ষান্তরে প্রথম শিক্ষার্থীকে যদি কোনও বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে সে বেটোভেনের শেষ চারিটি কোয়ার্টেট সম্বন্ধে; কিন্তু ঠিক বেটোভেনের সর্বশেষ কোয়ার্টেটই (ইন এফ মেজর, ওপাস ১৩৫) আমার সকলের আগে ভাল লাগিয়াছিল। তেমনই, হাইডনের বেলাতেও ই ফ্ল্যাট মেজর কোয়ার্টেট (ওপাস, ২০, ১ নং) সম্বন্ধে টোভী লিখিয়াছেন, "perhaps there are not more people who can appreciate this work than there are connoisseurs of Tang China." আমার মতো আনাড়ীরও প্রথম শুনিয়াই ইহা ভাল লাগিয়াছিল, অথচ হাইডনের যে কোয়ার্টেট সর্বজনপ্রিয় বলিয়া ঘোষিত (ওপাস ৫৫, ৩ নং) উহা আমার কানে প্রথমে তেমন শ্রুতিসুখকর বলিয়া মনে হয় নাই। এই ব্যাপারের কোনও সূত্র নাই, নিয়ম নাই। কুপর্যাঁ, বাখ, হ্যাণ্ডেল, করেল্লি, স্কারলাত্তি এক দিক হইতে ভাল লাগে, আবার ভাগনারও ভাল লাগে কিন্তু রোমান্টিক বলিয়া যতদিনই লিস্ট্ শুনিতে গিয়াছি ততদিনই নিরাশ হইয়াছি। বলিতে ভয় এবং সঙ্কোচ হয় এখনও শপ্যাঁ ভাল করিয়া বরদাস্ত হয় নাই আর চাইকভস্কি আমার কাছে একেবারেই দুঃসহ ঠেকে। যন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে মোটের উপর পিয়ানোর আওয়াজ আমার কাছে স্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেটের সম্মিলিত আওয়াজ অপেক্ষা অনেক কম মিষ্ট বলিয়া মনে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু দিতে পারি।

## পরের প্রতি উপদেশ ও আত্মপরীক্ষা

উপসংহারে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রথম বিষয়, যাঁহারা ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এত হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত নন তাঁহারা কি করিয়া বিদগ্ধসমাজে আত্মসম্মান রাখিয়া চলিতে পারিবেন ; দ্বিতীয় বিষয়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের পল্লবগ্রাহিতা করিয়া আমি নিজে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

কোনও ভদ্রলোক ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধার ধারেন না অথচ কালচারড সমাজে প্রতিপত্তিও হারাইতে চান না, তিনি কি করিবেন ? পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি তিনি পিয়ানোকে পিয়ানোফর্টে বলিবেন। ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি ঘাঁতঘোতও বলিয়া দিতেছি। পিয়ানো বাজনার আলোচনা উঠিলে পাডেরভ্স্কির নাম যথাসম্ভব কম করিবেন, কিন্তু রুবিনস্টাইন, বুসোনি ইত্যাদি যথেষ্ট বলিবেন, অর্দ্ধস্বগতভাবে 'পিয়ানিজ্ম্' এই কথাটি ব্যবহার করিবেন। কেহ যদি 'মুনলাইট সোনাটা'র উল্লেখ করেন তাহা হইলে প্রথমে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবেন, পরে বলিয়া উঠিবেন, "ওঃ, সোনাটা ইন সি শার্প মাইনর" কিংবা "সোনাটা কোয়াসি ফ্যান্টাসিয়া।" কিন্তু 'হামারক্লাভিয়ার সোনাটা', 'পাউকেনশ্লাগ সিম্ফনি', 'ফোরেলেন কুইন্টেট' ইত্যাদি বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না। বেহালা বাদন সম্বন্ধে ক্রাইসলারের নাম কিছুতেই করিবেন না, বলিবেন যোয়াখিমের কথা। কণ্ডাক্টর হিসাবে তস্কানিনির নাম না করিয়া পারিবেন না কিন্তু সুকৌশলে নিকিশকে টানিয়া আনিবেন। যদি বড়লোকের দ্বারা সঙ্গীতের পৃষ্ঠাপোষণের আলোচনা উঠে তাহা হইলে বড়লোকের সমর্থন করিবার ইচ্ছা থাকিলে এস্তোয়ারহাৎস ও এস্তোয়ারহাৎসি, মিঃ ক্রিস্টি, গ্লাইণ্ডবোর্ণ এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিবেন ; আর যদি বড়লোকের নিন্দাই আপনার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আর্চবিশপ হিয়েরোনিমাসের নাম করিবেন। এইভাবে চলিলে ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ মহলেও আপনাকে হতমান হইতে হইবে না।

কিন্তু এই পথে চলিবার অসুবিধাও আছে একটি। একটি বন্ধুর দৃষ্টান্ত দিব। বন্ধু কিছুদিন আমার সঙ্গে বসিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের আলোচনা করিয়াছিলেন। কারণ—আংশিকভাবে বন্ধুপ্রীতি (প্যালিঅন্টলজি অধ্যয়নের বেলাতে আমি সহযোগিতা করিয়াছিলাম উহার প্রতিদান দিবার ইচ্ছা) কিছু কালচারড হইবার লোভ (বন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিদগ্ধসমাজে চলাফেরা করেন), কিছু সঙ্গীতপ্রীতি (বন্ধু সঙ্গীত ভালবাসেন এইরূপ একটা ধারণার বশবর্তী ছিলেন, আসলে ভালও যে না বাসেন তাহা নয়)। সুতরাং আমার কাছে বসিয়া এক্সপজিশ্যন, ডেভেলাপমেন্ট, রিক্যাপিটুলেশ্যন, কোডা ; সোনাটা, ট্রিও, কোয়ার্টেট, কুইন্টেট, সেক্সটেট, সেস্টেট, অক্টেট, ননেট, সিম্ফনি ; লার্গো, লার্গেতো, আদাজিও, আন্দান্তে, আলেগ্রো, আলেগ্রেতো, ভিভাচে, প্রেস্তো, প্রেস্তিসিমো ইত্যাদি মুখস্থ করেন, আর যখনই কোনও সঙ্গীত একটু কম বেসুরা মনে হয় তখনই চিৎকার করিয়া উঠেন, "ঐ, 'টনিকে' ফিরিয়া যাইতেছে।" একটা বিষয় এইরূপে একটু সড়গড় হইয়া গেলেই তিনি কিছুদিনের মতো আর আসিতেন না, বোধ করি কালচারড সমাজে সেই কালটুকু ক্ষেপণ করিতেন। আমার কিন্তু বন্ধুর জন্য সর্বদাই একটা ভাবনা ছিল—যেমন ভাবনা অভিভাবকের থাকে বালকের হাতে তুবড়ি দিয়া, কারণ বন্ধু সরল-অন্তঃকরণ। একদিন তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহভরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুবড়িতে মুখ পুড়িয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে। তিনি উত্তর দিলেন, "সেদিন তোমার এখান হইতে অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে ছিলেন। আমি বলিলাম এই বেটোভেন শুনিয়া আসিতেছি, খুব ভাল লাগিল। একটি ভদ্রলোক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া একটা মন্তব্য করিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলিলেন তিনি ?" বন্ধু জবাব দিলেন, "একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন তিনি বলিলেন, তা আর আশ্চর্য কি ইন্ডিয়ান মিউজিক মাইনর স্কেলে বেটোভেনও মাইনর স্কেলে লিখিয়াছেন, তাই ভাল লাগিয়াছে।" এই কালচার্যাল্ দমবাজীর কাছে পরাস্ত হইয়া ভাগিয়া আসার জন্য বন্ধুকে আমি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, এমন কি ক্রোধান্ধ হইয়া রসবোধ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিলাম। বলিতে লাগিলাম, "কেন ওর মন্তব্য মানিয়া লইলেন ? বলিতে পারিলেন না ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় মাইনর মোডের যতটুকু সম্পর্ক মেজর মোডের সঙ্গেও ততটুকু সম্পর্ক, বলিতে পারিলেন না বেটোভেনের নয়টা সিম্‌ফনির মধ্যে সাতটাই 'মেজর মোডে' ; যোলটা কোয়ার্টেটের মধ্যে, এগারটা 'মেজর মোডে' ; বত্রিশটা পিয়ানো সোনাটার মধ্যে বাইশটাই 'মেজর মোডে' ; ইত্যাদি"। কিন্তু ইহাতে লাভ হইল এই, বন্ধু মনের দুঃখে চলিয়া গেলেন আর আজ পর্যন্তও ইউরোপীয় সঙ্গীতে ফিরিয়া আসিলেন না।[৩]

নিজের সম্বন্ধে বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতে পারি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের পিছনে ছোটা একটা বড় 'এডভেঞ্চার'। ইহাতে নৈতিক অবনতি কিছু হইয়া থাকিলেও (প্রবন্ধের পূর্বাংশ দ্রষ্টব্য) মোটের উপর লাভও কম হয় নাই। প্রথম বার চ্যাপম্যানের হোমার পড়িয়া মনের অবস্থা কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কীটস্ একটি বিখ্যাত সনেটে লিখিয়াছেন। সেই অনুভূতির প্রসারতা,[৪] গভীর শান্তি, অতল রহস্য ও উচ্ছল আনন্দ তাঁহাকে যে ভাষা দিয়াছিল সে ভাষা সাধারণ মানুষের জুটিবার নয়। তবে এইটুকু আভাস দিতে পারি, ইউরোপীয় সঙ্গীত একটা স্বতন্ত্র জগৎ, স্বতন্ত্র বিশ্ব বলিলে বোধ করি আরও ভাল হয়। আমাদের প্রতিদিনের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কষ্টিপাথরে উহাকে যাচাই করিতে পারি না। হয়তো ইহা আমার অজ্ঞান এবং সংকীর্ণতার ফল, তবে আমার কাছে অনেক সময়েই মনে হইয়াছে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত ধ্বনির নকশা (প্যাটার্ন) মাত্র, ইউরোপীয় সঙ্গীত একটা ভাষা। হৃদয়ের সঙ্গে, অন্তরতম অন্তরের সঙ্গে সাধারণ অনুভূতি ও আবেগকে অতিক্রম করিয়া শর্টহ্যান্ডে কথা কহিবার ক্ষমতা উহার আছে, উহার বোধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও উহা শুধু শ্রুতি ও হৃদয়াবেগ হইতেই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না।

৩. এখন বলিতে বাধা নাই যে, এই বন্ধু—বিখ্যাত ব্যক্তি—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অপর জনও বিখ্যাত, তবে নাম করিব না। —লেখক (১৯৯২)।

৪. একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বাঙালি 'সমসাময়িক'-এর প্রথম সংখ্যা পড়িয়া বলিয়াছিলেন উহা 'Curate's egg'। মন্তব্যটা Punch-এর একটা বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র হইতে সুপরিচিত হইয়াছিলাম, সকল বিলাত ফেরৎ বিদগ্ধ বাঙালিরই জানা থাকিবার কথা। 'ডিকার' প্রাতরাশের সময়ে 'কিউরেট'কে বলিলেন, 'আপনার ডিমটা যেন খারাপ।' 'কিউরেট' কর্তার গৃহব্যবস্থার মর্যাদা রাখিবার জন্য উত্তর দিলেন, 'No, sir, parts of it are excellent.' তিনি হয়তো আমার প্রবন্ধটাকে excellent অংশের অন্তর্ভুক্ত করিতে বিবেকের খাতিরে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু করিতে হইল বলিয়া কিছু মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাই বলিলেন, 'নীরদবাবু কিন্তু "প্রসারতা" লেখেন।' অর্থাৎ 'প্রসার' যখন কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য, তখন উহার পিছনে 'তা' তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়া ডবল-বিশেষ্য করিতে ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাব দেখা গেল। ইহাতে বোঝা গেল তিনি লেখাটি মন দিয়াই পড়িয়াছিলেন, নহিলে একটামাত্র অপপ্রয়োগ কি করিয়া ধরিলেন ? আসলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথও 'প্রসারতা' ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রসার' এবং 'প্রসারতা' এক অর্থে প্রয়োগ হয় না। 'প্রসার' বস্তুগত বিস্তার, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় ; 'প্রসারতা' বিস্তারিত হওয়ার 'ধর্ম' বা 'ভাব'—মানসিক অনুভূতির প্রকাশ। —লেখক (১৯৯২)


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যাহাই হউক, তত্ত্ব লইয়া তর্ক করিবার মতো সাহস আমার নাই ; ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিবার সময়ে মনের যে অবস্থা হয়, শুধু তাহাই স্বীকার করিলাম। ইহাকেই যদি আপনারা অতিরঞ্জন জ্ঞান করেন তাহা হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত না শুনিবার সময়ে আমার মনে যাহা হয় তাহা শুনিলে কি বলিবেন অনুমান করিতেও ভয় পাইতেছি। যখন অবকাশ বা উপায় থাকে না তখন বসিয়া বসিয়া ভবিষ্যতের প্ল্যান করি, ক্যাটালগ পত্রিকা পুস্তক ঘাঁটিয়া ইহার পর কোন জিনিসটি শুনিব, কোন রেকর্ড কিনিব তাহার তালিকা করিতে ব্যস্ত থাকি। তালিকা ক্রমেই বড় হইয়া উঠে। ছাঁটাই করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কোনদিকে ছাঁটিব। কিছুদিন কি খালি কণ্ঠসঙ্গীত শুনিব ? অপেরা শুনিব ? না ইন্‌স্ট্রুমেন্ট্যাল মিউজিক শুনিব, না একেবারে 'পলিফনিক স্কুলে' চলিয়া যাইব—পালেস্ট্রিনা, ভিত্তোরিয়া, অর্লাণ্ডো ডি লাসো ?[৫] কোনটাই ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, শুনিয়াছি ব্রাম্‌সের 'ফির এর্নস্টে গেসেঙ্গে' নাকি ভারি চমৎকার, কাজাল্‌স্ চেলোতে বাখের যে সুইটগুলি বাজাইয়াছেন সেগুলি নাকি অপূর্ব, দনিৎসেত্তির লুসিয়া ডি লামারমুরের যে রেকর্ড হইয়াছে তাহা নাকি অসম্ভব রকম ভাল, ভ্যাটিক্যান হইতে নাকি ভিত্তোরিয়ার কতকগুলি রেস্পন্সরী প্রকাশিত হইয়াছে, কুপর্যাঁ-র তেনেব্রি নাকি শুনিবার মতো একটা জিনিস। কলিকাতার কোনও দোকানে এইগুলি শুনিবার উপায় নাই, তাই কোনটা কি রকম আন্দাজ করিবার জন্য বই-এর শরণাপন্ন হইতে হয়। এটা এই ধরনের, ওটা ঐ ধরনের। পড়িতে পড়িতে মাথা যখন ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় এই সবগুলি অশ্রুত অজানা সুর কানে শুনিতেছি, প্রত্যেকটার সুর স্বতন্ত্র ভাবে কানে বাজিতেছে।

হাসিতেছেন এবং বলিতেছেন বোধ হয় যে ব্যক্তি না শুনিয়াও নিজেকে এইভাবে সম্মোহিত করিতে পারে তার শোনাও আত্মসম্মোহন মাত্র, তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার আত্মনিরপেক্ষ কোনও মূল্য নাই—

"Hold this sea shell to your ear,
And you shall hear,
Not the andante of the sea,
Not the wild wind's symphony,
But your own heart's minstrelsy."

খুবই সত্য, কিন্তু ইহার উত্তরে আমিও বলিব, বাসনার নিন্দা করিবেন না, বাসনা ছোট জিনিস নয়, জীবনের রস শেষ ফোঁটা পর্যন্ত নিঃশেষিত করিয়া লইবার উহাই একমাত্র উপায়—

"For in truth the mind
is indissociable from what it contemplates,
as thirst and generous wine are to a man that drinketh
nor kenneth whether his pleasure is more in his desire
or in the savor of the rich grape that allays it."

আর রসস্রষ্টার প্রতিও কি আমাদের কর্তব্য নাই ?

"You do poets and their song

৫. এখন ইহাদের সকলেরই শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। অপূর্ব, সন্দেহ নাই। —লেখক (১৯৯২)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

A grievous wrong
If your own heart does not bring
To their deep imagining
As much beauty as they sing."

## লেখকের পুনশ্চ

[১৯৯২]

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'আপনি এই লেখাটি পুনর্মুদ্রণ উপলক্ষে নিজে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বা উপসংহার (post script) লিখলে খুবই ভাল হয়। তাহলে সেটি যেমন প্রাসঙ্গিক হবে, তেমনি আমরা জানতে পারি ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধান এতদিনে আপনাকে কোথায় নিয়ে এল।' তাঁহার এই অনুরোধে খুবই খুশি হইলাম। বক্তব্য আছে।

প্রবন্ধটা যখন লিখিয়াছিলাম ৪৩ বৎসর চলিতেছিল, এখন ৯৫ বৎসর চলিতেছে। এই বাহান্ন বৎসরে যদি কিছু অগ্রসর না হইয়া থাকি তাহা হইলে তখন হইতেই জরা আরম্ভ হইয়াছিল বলিতে হইবে।

তবে এ-বিষয়ে বাখ, হ্যান্ডেল, মোৎসার্ট, বেটোভেন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও রসবোধ কতটা বাড়িয়াছে তাহার কথা না বলিয়া দুইটি শাখা যে প্রসারিত হইয়াছে, শুধু তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

১। ইউরোপীয় কণ্ঠসঙ্গীতের সূত্রপাত হইতে আজ পর্যন্ত কিরূপ হইয়াছে তাহার চর্চা করিতেছি। সুতরাং Gregorian Chant (দশম শতাব্দী হইতে) শুনি। আমার রেকর্ডটি বিখ্যাত Choralschola Maria Einsiedeln-এর গাওয়া। তাহার পর ত্রুবাদুর-এর শুনি, এমন কি Roman de la Rose-এর সময়কার গানও শুনি। ইহার পরেই যাহারা—তাহাদের কথা না বলিয়া অতি-আধুনিকদের মধ্যে Pavarotti পর্যন্ত আসিয়াছি। তাহা ছাড়া যে-সব গায়ক-গায়িকারা আমেরিকার বিখ্যাত মেট্রোপলিট্যান অপেরায় গাহিয়াছিলেন ১৯০২ হইতে ১৯৬৫ পর্যন্ত, তাঁহাদের সকলের গানেরই রেকর্ড আছে। শুধু আরম্ভ ও শেষ যাঁহাদের রেকর্ড দিয়া হইয়াছে সেই দুই জনের নাম করিব—Melba (1861-1931) ও Kiri Te Kanawa (জন্ম ১৯৪৪ সন)। মাঝেকার সকল বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার রেকর্ড তো আছেই।

২। এখন একটি আবিষ্কারের কথা বলি। দেখিয়াছি, লোকসঙ্গীত (folk music) স্পেন হইতে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত এক। আমি বাল্যকালে ময়মনসিংহে যে-সব গান শুনিতাম তাহা একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরানো স্পেনীয় সঙ্গীতের মতো। ইহা পুরাতন স্পেনীয় 'লাদিনো' ভাষার গান ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া গান শুনাইয়া—বিশেষ করিয়া 'নাইয়ারে পুরানো নাইয়া' এই গানটি—বুঝাইতে চেষ্টা করি। এ যাবৎ এখানকার বাঙালিদের মধ্যে এ-বিষয়ে কোনও ঔৎসুক্য দেখিয়াছি বলিতে পারি না, তবে উৎপাত করি। তাহার পর Troubadours-দের গানের সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখাই, এইভাবে গ্রিস পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি। মাঝখানে তুর্কি ও পারস্য বাকি আছে।

এই সাদৃশ্যের কারণ কি বলি। উত্তরাপথের সঙ্গীত প্রধানত মুসলমানী সঙ্গীত।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার এটাও বলা উচিত, মুসলমানী সঙ্গীত পরে বিশিষ্ট হইলেও গ্রিক সঙ্গীত হইতে গৃহীত। আরবি ভাষায় সঙ্গীতের নাম মৌসিকি, গ্রিক mousike শব্দ হইতে। আরবরা পশ্চিমে স্পেন জয় করিয়াছিল, তাই তাহাদের সঙ্গীতও সেই পর্যন্ত গিয়াছিল। উহার দ্বারা মধ্যযুগের দক্ষিণ ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রভাবান্বিত হয়। ত্রুবাদুরদের গানের স্বরলিপি নাই, তাই আমার রেকর্ডগুলিতে যাহারা ইহাদের গান গাহিয়াছে তাহারা আরব গান ও বাজনার সহায়তা লইয়াছে।

মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করায় তাহাদের সঙ্গীত আমাদের দেশেও আসে। পুরাতন হিন্দু সঙ্গীত দাক্ষিণাত্যেও অব্যাহত থাকে। পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান বলিয়া সেখানকার লোকসঙ্গীতেই মুসলমান প্রভাব বেশি। আমি রাঢ় অঞ্চলের লোকসঙ্গীতও যতটুকু শুনিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে, উহা হইতে পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত বিভিন্ন। সে-সব গান বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের।

একেবারে হালে অক্সফোর্ডে থাকিয়া যে-ভাবে সঙ্গীতচর্চা করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'দেশে'র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দিয়াছি।

ইহার অতিরিক্ত শুধু এইটুকু বলিবার আছে যে, দিল্লি থাকার সময়ে আমাদের তিন পুত্রকেই ইউরোপীয় সঙ্গীত বাজাইতে শিখাই। একজন বেহালা বাজাইত, একজন ভিয়োলা ও আর একজন পিয়ানো। বাল্যবয়স হইতে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনিয়া অভ্যস্ত হওয়াতে তাহারা আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি সুর ধরিতে পারে ও আরও বেশি মনে রাখিতে পারে। আমাকে স্মরণ করিতে কিছু চেষ্টা করিতে হয়। তবে পুঁথিগত বিদ্যা হয়তো আমার বেশি।

অক্সফোর্ড
১লা আগস্ট, ১৯৯২

AMARBOI.COM

## রচনা-প্রসঙ্গে

অনেকদিন আগে (৭০-এর দশকের শেষদিকে) সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে নানা কথাবার্তার মধ্যে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গ ওঠে। নীরদবাবু যে দিলীপকুমার সান্যালের সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন, সে-খবর তাঁর কাছে জানতে পারি। পত্রিকার নাম 'সমসাময়িক' এবং দু'টি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে (আষাঢ় ও আশ্বিন ১৩৪৭ ; ইং ১৯৪০) পত্রিকাটি উঠে যায়।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই 'ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়—লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন 'একেলা'। সত্যজিৎ রায় আমাদের জানান 'একেলা' আর কেউ ন'ন—স্বয়ং সম্পাদক নীরদবাবু এবং এই প্রবন্ধের সূত্রেই সত্যজিৎবাবু নীরদবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন। পাশ্চাত্য রেকর্ড-সঙ্গীত শোনার সূত্রে তাঁদের যোগাযোগ বেশ কিছুদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।

'ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে' সম্ভবত পশ্চিমী সঙ্গীত নিয়ে বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা। প্রসঙ্গত বলা চলে, সে-সময়ে কলকাতা শহরে এই জাতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সংগ্রাহক ছিলেন নীরদবাবু। সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর যিনি মাঝে মাঝে নীরদবাবুর কাছে রেকর্ড শুনতে যেতেন তিনি পশ্চিমী সঙ্গীতের অপর এক বিশেষজ্ঞ,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। চঞ্চলবাবু জানিয়েছেন, তিনি যখন রেকর্ড শুনতে যেতেন তখন নীরদবাবু থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায়।

'সমসাময়িক' পত্রিকা অনেক খোঁজ করেও সন্ধান করতে পারি না। আর মাত্র দু'টি বিচ্ছিন্ন সংখ্যা কোথাও পাওয়ার আশাও ছিল না। কিন্তু ১৯৮৬-র সেপ্টেম্বর মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে লিট্ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের সন্দীপ দত্তর কাছে তাঁদের সদ্য-সংগৃহীত ঐ পত্রিকার দু'টি সংখ্যা পেয়ে যাই। তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। অতঃপর পুরনো সেই লেখা সত্যজিৎ রায়কে দেখাতে তিনি এটি পুনর্মুদ্রণ করার পরামর্শ দেন।

১৯৮৭-তে নীরদবাবুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে প্রথম যোগাযোগ করলেও এতদিন পরে পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হল। এ-ব্যাপারে নীরদবাবুর অনুমতি যেমন আমরা পেয়েছি তেমনি তিনি আমাদের অনুরোধে নতুন পাদটীকা ও 'লেখকের পুনশ্চ' অংশটি সংযোজন করেছেন। আগের মুদ্রণের ভুলগুলিও তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন। লেখাটির এই পরিমার্জিত পুনঃপ্রকাশে সত্যজিৎ রায় যে খুবই আনন্দিত হতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক পত্রালাপে নীরদবাবুর কাছে জানতে চাই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিবরণ। এ-বিষয়ে তিনি নানা খবরাখবর দিয়েছেন। আপাতত প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গটিই কেবল আমরা উদ্ধৃত করছি :

ক. 'সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা এই লেখাটার সূত্রেই হয়। তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, আমি ভাবলাম, তাঁর পিতা সুকুমার রায় সম্বন্ধে সেই সংখ্যায় [পরবর্তী সংখ্যায়] দিলীপবাবুর [দিলীপকুমার সান্যাল] লেখা একটা প্রবন্ধ ছিল ["কবি সুকুমার রায়চৌধুরী"]—সেই সম্বন্ধেই এসেছেন। তিনি বলেন—তা নয়—ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখাটা পড়ে এসেছেন।

—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর চিঠি। ৩০ জুন ১৯৯২।

খ. 'সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয় সম্বন্ধে জানাচ্ছি। আপনি যা জেনেছেন তাতে ভুল আছে। প্রথম ১৯৪০ সনে ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তিনি একা এসেছিলেন। সঙ্গে কেউ ছিল না। আর আমরা তখন শ্যামবাজারে ২০/২২ বি, যতীন্দ্র ম্যানশনে থাকতুম, ভবানীপুরে নয়। এর পর বাজনা শুনবার জন্যে তিনি আরও বার কয়েক আসেন।'

—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর চিঠি। ২৮ জুলাই ১৯৯২।

সম্প্রতি নীরদবাবুর সহধর্মিণী শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরাণী 'দিদিমার যুগ ও জীবন' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯২) নামে স্মৃতিকথায় 'সমসাময়িক' পত্রিকার প্রসঙ্গ তুলেছেন (দ্র. পৃ ২১১)। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন : 'পত্রিকাখানা বের হওয়ার দিনকয়েক পরেই একদিন দুপুরে সত্যজিৎ রায় এক কপি 'সমসাময়িক' হাতে করে আমাদের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে দেখা করতে এলেন।...ওঁর লেখা ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে প্রবন্ধটা পড়ে সত্যজিতের এত ভাল লেগেছে যে সেই বিষয়ে আলোচনা করবার বাসনায় এসেছেন। সেই অবধি সত্যজিৎ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এসে মিউজিকের আসরে যোগ দিতেন।'

—সম্পাদক, এক্ষণ

এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# গরুর গাড়ি ও রবারের টায়ার

গত বৎসর ঠিক এমনই দিনের কথা। গড়ের মাঠ হইতে বাড়ির দিকে ফিরিতেছি, হঠাৎ সামনে রশিখানেক দূরে একটা নূতন ধরনের যান চোখে পড়িল। শীতশেষের মিহি উড়ানির মতো কুয়াশা চারিদিক অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তার উপর গাড়িটা আগাইয়া যাইতেছে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টার পর লক্ষ্য করিলাম, গাড়োয়ানের দুই পাশে দুই জোড়া বাঁকানো শিং। সুতরাং কোন-জাতীয় প্রাণী গাড়িটি টানিতেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই যানটির মধ্যে গরুর গাড়ির সেই ঝাঁকুনি, ধ্বনিবৈচিত্র্য বা অসমান গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। যে গরুর গাড়িতে কার্যাপণ বোঝাই করিয়া অনাথপিণ্ডদ জেতবন ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, যে গরুর গাড়িকে ভারুত স্তূপের রেলিং-এ উৎকীর্ণ দেখিয়াছি, যে গরুর গাড়ির কথা 'আলালের ঘরের দুলালে' পড়িয়াছি, যে গরুর গাড়ি কলিকাতার রাস্তায় ট্রাম, লরি ও মোটরগাড়িকে স্পর্দ্ধা করিয়া বিরাজ করিতেছে, যে গরুর গাড়ি তার দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য যুগে যুগে অপরিবর্তিত রাখিয়াছে, যে গরুর গাড়ি সনাতন হিন্দুসমাজের প্রতীক না হইলেও একমাত্র সমধর্মী, তাহার সহিত এই নব্যপন্থী যানটির সাদৃশ্য ছিল না। বরঞ্চ সনাতনপন্থীরা দেখিলে দুঃখিত হইতেন, উহার নীচের দিকটা হুবহু এরোপ্লেনের নীচের দিকটার মতো। এ যেন নামাবলী-পরা পুরোহিত ব্রাহ্মণ পল্টনের বুট-পটি আঁটিয়া চলিয়াছে।

তখনই ধাঁ করিয়া মনে হইল, তাও তো বটে ! এ যে টায়ার-ওয়ালা গরুর গাড়ি। এই নূতন যানটির আর সবই গরুর গাড়ির মতো, শুধু কাঠের বড় বড় চাকা দুইটির জায়গায় মোটরলরির চাকার মতো দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট চাকা ও তাহাদের গায়ে সংলগ্ন দুইটি সুপুষ্ট রবারের টায়ার। কোথায় গরুর গাড়ি, আর কোথায় ডান্‌লপ কোম্পানির রবার টায়ার ! প্রথমটির অতি-প্রাচীনতার সহিত দ্বিতীয়টির অতি-অবচীনতার সামঞ্জস্য যে করিয়াছে তাহাকে মনে মনে বাহবা দিতে দিতে বাড়ি ফিরিলাম। তারপরই খবরের কাগজ খুলিয়াও দেখি, সেই রবার-টায়ার-ওয়ালা গরুর গাড়ির মস্ত বিজ্ঞাপন। বিখ্যাত কোম্পানি জানাইতেছেন, এই টায়ার ব্যবহার করিলে মাল অনেক বেশি বোঝাই করা যায়, রাস্তার অনিষ্ট কম হয়, গরুর উপর অত্যাচার হয় না,—এমনই ধরনের আরও অনেক যুক্তি।

জিনিসটা মনে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই পরেও উহার কথা অনেক ভাবিয়াছি। সেই রবার-টায়ার-ওয়ালা গরুর গাড়ির ছবি কল্পনার চোখে ভাসিয়া উঠিলে প্রথম প্রথম বড় বিসদৃশ ঠেকিত। মনে হইত, কেহ যেন 'হার্মনি' যোগ করিয়া ধ্রুপদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, গরুর গাড়িতে টায়ার যোজনা বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার একেবারে গোড়ার কথা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ একশত বছরেরও



AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি দিন ধরিয়া সমুদ্রের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে আমাদের উপর আছাড় খাইতেছে। আমরা বেলাভূমির প্রাণহীন সিকতা নই ; তাই তাহাকে অসাড় ভাবে ফিরাইয়া দিই নাই। তেমনই আবার বর্বর, অতীত-গৌরবহীন জাতিও নই যে, উহাকে লইয়া একেবারে অশোভন ভাবে মাতিয়া উঠিব। আমরা ভারতবর্ষকেও ছাড়ি নাই, ইউরোপকেও ছাড়ি নাই ; এ-দুয়ের, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় বলিতে গেলে, "ব্যাঘ্র ও বৃষভের" সমন্বয় করিবার জন্য বিজ্ঞান ও বেদান্তের 'লোয়েস্ট কমন্ ফ্যাক্টর' বাহির করিয়াছি। তাই গরুর গাড়িতে টায়ার লাগানো আমাদের পক্ষে অতি-স্বাভাবিক। আজ যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, ইঞ্জিন, টায়ার, ইলেকট্রিক বাতি, গদি ও ঢাকনা-ওয়ালা সম্পূর্ণ মোটরগাড়ি চাও, না রবার-টায়ার-ওয়ালা গরুর গাড়ি চাও ; আর যদি আমাদের চাওয়া-না-চাওয়ার স্বাধীনতা থাকে, তবে যে আমরা ষোল আনা মোটর না লইয়া এক আনা লক্ষণযুক্ত গরুর গাড়ি লইব, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে কি ?

বোধ করি এত বড় একটা কথার প্রমাণ চাহিবেন। দিতেছি। যদি 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্' এই প্রাচীন বাক্যটিতে পিতাদের মনোবাঞ্ছার প্রকৃত ইঙ্গিত থাকে, তাহা হইলে এ-যুগের সুতা কাটিবার কলের নিকট হার মানিয়া চরকার নিশ্চয়ই গর্বভরে বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে যাইতে দিতেছি কই ? শুধু যাইতে না দিলেও কথা ছিল না, হতভাগ্য বৃদ্ধকে আমরা আমাদের অনেকের হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতার মতো সংস্কারও করিতে চাহিতেছি। আমাদের মতো আধ্যাত্মিক জাতি যন্ত্রকে যন্ত্রদানব বলিয়া জ্ঞান করিবে ইহা তো স্বাভাবিক ঘটনা ; কিন্তু ইহার চেয়েও স্বাভাবিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইতেছে 'অটোম্যাটিক' চরকা তৈরি করিবার আগ্রহ।

তারপর জ্যোতিষের কথাই ধরিব না কেন ? পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের এই প্রাচীন বিজ্ঞানটির প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ভুল ভাঙিতে বেশি দিন লাগিবে না। ডাক্তার ও গণৎকার আমাদের রোগশয্যার ভরসা ; উকিল ও জ্যোতিষী আমাদের আদালতের অবলম্বন। তবে নূতন যুগের জ্যোতিষীরা ফুটপাথের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আমাদের ভাগ্যনির্ধারণ করিবেন না। তাঁহাদের আপিস থাকিবে, আপিসে টেবিল-চেয়ার থাকিবে, টেলিফোন থাকিবে ; বাহিরে মস্ত সাইনবোর্ড ঝুলিবে, তাহাতে পড়িব—সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের কোষ্ঠীকারক, বাংলার গভর্নরের বৃত্তিধারী, সুভাষচন্দ্র বসুর রিষ্টিবিচারক। এতগুলি রবার টায়ার জুড়িবার পরও কি জ্যোতিষের গরুর গাড়ি অচল হইয়া যাইবে ?

এইবার আয়ুর্বেদের কথা ভাবিয়া দেখুন। পাস্তোর খুবই ভাল, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু চরককে ছাড়িবে কেন ? সেজন্য কবিরাজের পকেটে স্টেথোস্কোপ, কবিরাজের নামের পিছনে এম. এস-সি., এম. বি.।

তবু তো আয়ুর্বেদে, জ্যোতিষে, চরকার ক্ষেত্রে শুধু রবার টায়ারটি গরুর গাড়িতে গিয়া লাগিয়াছে, আমাদের সিনেমায় কিন্তু পুরা গরুর গাড়িটি সম্মিলিত হইয়াছে পুরা মোটরকারের সঙ্গে। পুরাণে ও গল্পে দেবদেবীর কথা কত শুনিয়াছি ! কিন্তু কেহ কি দেবদেবী চোখে দেখিয়াছে ? আজ হলিউড ও কালীঘাট মিলিয়াছে। ছিন্নমস্তা পর্দার উপর নাচিতেছেন, শঙ্কর ক্যামেরার সহায়তায় দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। ইহাই তো 'সিন্‌থেসিস'—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন। ইহার বাণীই রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পর্যন্ত বর্তমান ভারতের সকল মনীষী আমাদের শুনাইয়াছেন।

'শ্রীবলাহক নন্দী' ছদ্মনামে লিখিত। নূতন পত্রিকা, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~